এহইয়াউ উলুমিদ্দীন
তৃতীয় খণ্ড
ইমাম গাযযালী (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ
মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
রমযান ঃ ১৪০৭ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১০ হিজরী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
যিলহজ্জ ঃ ১৪২০ হিজরী
বৈশাখ ঃ ১৪০৬ বাংলা
এপ্রিল ঃ ১৪৯৯ ইংরেজী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
রজব ঃ ১৪২৩ হিজরী

পঞ্চম সংস্করণ
ডিসেম্বর- ২০০৩ ইংরেজি
পৌষ- ১৪১০ বাংলা
শাওয়াল- ১৪২৪ হিজরী

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা

ISBN-984-8367-411

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদু লিল্লাহ! মহাগ্রন্থ "এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এর তৃতীয় খণ্ডেরও পুনঃ মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো। ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট তিনটি খণ্ডও যাতে শীঘ্রই পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়া যায়, সে জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায়, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই একে একে প্রতীক্ষিত সে খণ্ডগুলিও প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অবশ্য প্রত্যেক মহৎ কাজের সফল বাস্তবায়ন একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে।

"এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এর মত একটা মকবুল গ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বময় সমভাবে নন্দিত, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জ্ঞান সাধকের নিকটই এ গ্রন্থ সমভাবে সমাদৃত, কোন মানুষের রচিত অন্য কোন বইয়ের ভাগ্যে এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ আর সম্ভব হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। ফলে দুনিয়ার প্রায় সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষাতেই এই কিতাবের পূর্ণাঙ্গ বা অংশ বিশেষের অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তাই যতই দিন যাচ্ছে কিতাবটির আগ্রহী পাঠক সংখ্যার পরিধি ততই বিস্তৃত হচ্ছে।

প্রথম দুটি খণ্ড বের হওয়ার পর অনেকেই আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তী সংস্করণগুলি আরও সুন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকে আবার কটু কথা বলে আমাদের উদ্যমকে অবদমিত করারও চেষ্টা করেছেন। উল্লিখিত সবার জন্যই আমাদের আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ পাক যেন প্রত্যেককেই স্ব স্ব নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল দান করেন। কারণ, সবার দ্বারাই আমরা উপকৃত হয়েছি। ত্রুটিগুলি শনাক্ত করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়ার দিশা লাভ করেছি।

আবারও বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, আমাদের জ্ঞান যেহেতু সীমিত এবং তৎসঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত সময় ও সাজসরঞ্জাম আমাদের নাই, তাই মুদ্রণে এমনকি অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়। সহৃদয় সুধীগণ মেহেরবানী করে ভুল, ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিয়ে অশেষ নেকীর ভাগী হতে পারেন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়
শা'বান, ১৪০৯ হিজরী।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একাদশ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়
নির্জনবাসের আদব

প্রকাশ থাকে যে, নির্জনবাস ও মানুষের সাথে মেলামেশা– এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু অনিষ্ট আছে, যে কারণে মানুষ পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে না। আবার অনেক গুণও আছে, যে কারণে মানুষ এগুলোর প্রতি উৎসুক হয়। নির্জনবাস অবলম্বনের প্রতি অনেক আবেদ ও দরবেশের ঝোঁক দেখা যায়। তারা একে মেলামেশার উপর অগ্রাধিকার দান করেন। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে মেলামেশা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের যে ফযীলত বর্ণনা করেছি, তা বাহ্যতঃ নির্জনবাসের বিপরীত, যার প্রতি অধিকাংশের ঝোঁক রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে যা সত্য তা প্রকাশ করা জরুরী। পরবর্তী দু'টি পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি বিধৃত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
নির্জনবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দলীল

এ সম্পর্কে মতভেদ এত গভীর যে, তাবেয়ীগণের মধ্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে। সেমতে সুফিয়ান সওরী, ইবরাহীম ইবনে আদহাম, দাউদ তায়ী, ইবনে আয়ায, সোলায়মান খাওয়াস, ইউসুফ ইবনে আসবাত, হুযায়ফা মারআশী এবং বিশরে হাফীর মাযহাব হল, নির্জনবাস অবলম্বন করা উচিত। এটা মেলামেশার চেয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব, শা'বী, ইবনে আবী লায়লা, হেশাম ইবনে ওরওয়া, ইবনে শাবরামা, শোরায়হ, শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌, ইবনে ওয়ায়না, ইবনে মোবারক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্য আলেম অধিকাংশ তাবেয়ীর এই অভিমত পছন্দ করেন যে, মেলামেশা করা, অনেক বন্ধু করা, মুমিনদের মধ্যে সম্প্রীতি হওয়া, ধর্মের কাজে তাদের সাহায্য নেয়া মোস্তাহাব। আলেমগণ এ সম্পর্কে কতকগুলো মিশ্র বাক্য প্রয়োগ করেছেন। কোন কোন বাক্য দ্বারা উভয় মাযহাবের মধ্য থেকে কোন এক মাযহাবের প্রতি ঝোঁক এবং কোন কোন উক্তি দ্বারা ঝোঁকের কারণ বুঝা যায়। এখন প্রথম প্রকার উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকার উক্তি অনিষ্ট ও উপকারিতার আলোচনায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা সকলেই নির্জনবাস থেকে আপন আপন অংশ গ্রহণ কর। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ নির্জনবাস এবাদত। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধু হওয়ার জন্যে, কোরআন সঙ্গী হওয়ার জন্যে এবং মৃত্যু উপদেশদাতা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্কে সাথী করে নাও এবং মানুষকে এক তরফে রাখ। আবুর রবী' দরবেশ দাউদ তায়ীকে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ায় রোযা এবং আখেরাত ইফতারের জন্যে রাখ। মানুষের কাছ থেকে এমনভাবে পলায়ন কর, যেমন মানুষ ব্যাঘ্র থেকে পলায়ন করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তওরাতের কিছু বাক্য আমার স্মরণ আছে- তা হল, মানুষ অল্পে তুষ্ট হলে স্বাবলম্বী হয়। মানুষের কাছ থেকে আলাদা হলে আপদমুক্ত থাকে। কামপ্রবৃত্তি বর্জন করলে স্বাধীন হয়। হিংসা বর্জন করলে ভদ্র হয়। অল্পে সবর করে অনেক মুনাফা অর্জন করে। ওহায়ব ইবনুল ওয়ারদ বলেন ঃ আমি শুনেছি, হেকমতের দশটি অংশ আছে। তন্মধ্যে নয়টি চুপ থাকা এবং একটি নির্জনবাস অবলম্বন করার মধ্যে। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ এখন আপন গৃহে নিশ্চুপ বসে থাকার দিন এসেছে। কথিত আছে, হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) জানাযায় আসতেন, রোগীদের হাল জিজ্ঞেস করতেন এবং বন্ধুবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সবগুলো বর্জন করলেন। তিনি বলতেন ঃ মানুষ তার সকল ওযরই বর্ণনা করবে- এটা সহজ বিষয় নয়। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-কে কেউ বলল ঃ আপনি আমাদের জন্যে কিছু ফুরসত বের করলে ভাল হত। তিনি বললেন ঃ ফুরসত বিদায় হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই ফুরসত পাওয়া যাবে। ফোযায়ল বলেন ঃ মানুষ যদি পথিমধ্যে দেখা হলে আমাকে সালাম না করে এবং আমি অসুস্থ হলে আমার হাল জিজ্ঞেস না করে, তবে আমি তাদের কাছে ঋণী থাকব। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ রবী ইবনে খায়সাম তাঁর গৃহের দরজায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি পাথর এসে তাঁর বুকে আঘাত করল এবং রক্তাক্ত করে দিল। তিনি বুকের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিলেন- হে রবী, এখন তো তোর উপদেশ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং জানাযা বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনও দরজায় বসলেন না। বশীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ মানুষের সাথে পরিচয় কম কর। কেননা তুমি জান না, কেয়ামতে তোমার কি অবস্থা হবে? যদি লাঞ্ছনা হয়, তবে তোমার পরিচিত জন কম হলেই উত্তম। জনৈক শাসক হাতেম আসাম্মের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার কাছে আপনার কোন কাজ থাকলে বলুন ঃ

তিনি বললেন ঃ বড় কাজ হচ্ছে, তুমি আমাকে দেখো না এবং আমি তোমাকে দেখব না। এক ব্যক্তি সহল তস্তরী (রহঃ)-কে বলল ঃ আমি আপনার কাছে থাকার ইচ্ছা রাখি। তিনি বললেন ঃ যখন আমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মারা যাবে, তখন কে সাথে থাকবে? তখন যে সাথে থাকে, তার কাছেই তোমার থাকা উচিত। ফোযায়লকে কেউ বলল ঃ আপনার পুত্র আলী বলে– হায়, আমি যদি এমন জায়গায় থাকতাম, যেখান থেকে আমি মানুষকে দেখতাম, কিন্তু মানুষ আমাকে দেখত না। একথা শুনে ফোযায়ল কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আলীর জন্যে আফসোস, সে কথা বলেছে, কিন্তু অসম্পূর্ণ বলেছে। পূর্ণ কথা তখন হত, যখন বলত, না আমি কাউকে দেখতাম, না কেউ আমাকে দেখত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সেই মজলিস সর্বোত্তম, যা তোমার গৃহের অভ্যন্তরে হয়। সেখানে তুমি কাউকে দেখ না এবং কেউ তোমাকে দেখে না। মোট কথা, নির্জনবাসের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, এগুলো তাঁদের উক্তি। এখন উভয় পক্ষের প্রমাণাদি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়।

মেলামেশা পছন্দকারীদের প্রমাণ ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا الاية তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতভেদ করেছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে সম্প্রীতির কারণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এসব প্রমাণ দুর্বল। কেননা, প্রথম আয়াতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ কোরআন পাক ও শরীয়তের মূলনীতিতে মতের বিভিন্নতা, মাযহাবসমূহের মতবিরোধ। দ্বিতীয় আয়াতে সম্প্রীতি স্থাপনের মানে হচ্ছে, অন্তর থেকে সেসব হিংসা-দ্বেষ বের করে দেয়া, যা গোলযোগ ও কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে থাকে। নির্জনবাস এসব বিষয়ের পরিপন্থী নয়। নির্জনবাসের মধ্যে এগুলো হতে পারে। তাদের দ্বিতীয় দলীল এই হাদীস–

اَلْمُؤْمِنُ اِلْفٌ مَاْلُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَاْلَفُ وَلَا يُوْلَفُ

ঈমানদার বন্ধুত্ব করে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়। যে বন্ধুত্ব করে না এবং যার সাথে বন্ধুত্ব করা হয় না, তার মধ্যে কল্যাণ নেই।

এ দলীলটিও দুর্বল। এতে অসচ্চরিত্রতার অনিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার কারণে বন্ধুত্ব হতে পারে না। যে চরিত্রবান ব্যক্তি মেলামেশা করলে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং অপরও তার সাথে বন্ধুত্ব করে; কিন্তু নিজের নিরাপত্তা ও সংশোধনের নিমিত্ত মেলামেশা বর্জন করে, এ হাদীসে তাকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। তৃতীয় দলীল এই– রসূলে করীম (সঃ) বলেন- مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু মূর্খতা যুগের মৃত্যুর মত। অন্য এক হাদীসে আছে-

مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي إِسْلَامٍ دَامِجٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ـ

মুসলমানদের ইসলামে সুসংহত থাকা অবস্থায় যে মুসলমানদের বিরোধিতা করে, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের জাল ছিন্ন করে দেয়।

এ দলীলটিও অগ্রাহ্য। কেননা, এখানে দলের অর্থ সেই দল, যে একজন ইমামের বয়াতে একমত। অতএব যে এই দলের বিরোধিতা করবে সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। কাজেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ মতবিরোধ করা। এই হাদীসে নির্জনবাসের কোন উল্লেখ নেই। চতুর্থ দলীল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন দিনের বেশী সাক্ষাৎ বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। সেমতে তিনি বলেন ঃ যে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী সময় ত্যাগ করে এবং মরে যায়, সে দোযখে যাবে। তিনি আরও বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্যে হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করবে। তাদের মধ্যে যে আগে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে যাবে। আরও বলা হয়েছে– যে তার ভাইকে ছয় দিনের বেশী ত্যাগ করে, সে তার ঘাতকের মত। সুতরাং কেউ নির্জনবাস করলে সে তার বন্ধু ও পরিচিত জনকে ত্যাগ করবে, যা এসব হাদীসদৃষ্টে নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দলীলও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই ত্যাগ করার অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কথা বলা, সালাম করা ও মামুলী মেলামেশা বর্জন করা। অসন্তুষ্টি ছাড়া মেলামেশা বর্জন করা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া দুই স্থানে তিন দিনের বেশীও মেলামেশা বর্জন করা জায়েয। এক, যদি জানা যায়, তিন দিনের বেশী ত্যাগ করলে প্রতিপক্ষ সঠিক পথে এসে যাবে এবং দুই, যদি মেলামেশা বর্জন করার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত আছে বলে মনে করা হয়। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা যদিও ব্যাপক, কিন্তু এ দু'টি স্থান এর ব্যতিক্রম। কেননা, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে যিলহজ্জ, মহররম ও সফর মাসের কিছু দিন পর্যন্ত বর্জন

করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পত্নীগণকে এক মাস পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কসম খেয়ে তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে উপরের কক্ষে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর খাদ্য রাখা হত। সেখানে ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করার পর যখন তিনি নীচের তলায় নেমে আসেন, তখন আরজ করা হল, আপনি তো ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করেছেন। তিনি বললেন ঃ মাস কখনও ঊনত্রিশ দিনেও হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করবে, কিন্তু তখন, যখন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। এ হাদীসে ব্যতিক্রমের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এর উপর ভিত্তি করেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ নির্বোধ থেকে আলাদা থাকা উচিত। কেননা, নির্বুদ্ধিতার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সম্মুখে কেউ বলল, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেনি। তিনি বললেন ঃ এ কাজটি পূর্ববর্তীদের মধ্যেও কয়েকজন বুযুর্গ করেছেন। সেমতে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করে ওফাত পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। হযরত ওসমান গনী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বর্জন করে রেখেছিলেন। এসব সাক্ষাৎ বর্জন এই অর্থে ছিল যে, এই বুযুর্গগণ নিজেদের নিরাপত্তা এর মধ্যেই দেখেছিলেন। পঞ্চম দলীল, এক ব্যক্তি এবাদতের জন্যে পাহাড়ে চলে গেলে লোকেরা তাকে ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করল। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না এবং তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। সম্ভবতঃ এটা বলার কারণ ছিল, ইসলামের প্রথম যুগে জেহাদ অত্যাবশ্যকীয় ছিল। নির্জনবাসের কারণে জেহাদ বাদ পড়ে যেত। সেমতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র যুগে আমরা জেহাদের জন্যে বের হলাম। আমরা একটি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে নির্মল পানির একটি ছোট ঝরনা ছিল। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি লোকজন থেকে আলাদা হয়ে এখানে একান্তে বাস করলে চমৎকার হত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা না করে এরূপ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ এরূপ করো না। কেননা, আল্লাহ্র পথে তোমাদের অবস্থান করা আপন গৃহে ষাট বছর এবাদত করার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তোমরা জান্নাতে দাখিল হও, এটা কি তোমরা চাও না? আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর। দুধের

ধারাসমূহ বের করার মাঝখানে যতটুকু সময় থাকে, ততটুকু সময় যে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। ষষ্ঠ দলীল, হযরত মুআয ইবনে জাবালের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةَ وَالشَّاذَّ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَامَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ ـ

শয়তান মানুষের বাঘ। সে মানুষকে ছাগলের বাঘের ন্যায় গ্রাস করে। গ্রাস করে তাকে, যে দূরে থাকে, যে কিনারায় থাকে এবং যে একা থাকে। তোমরা ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে বেঁচে থাক। সকলের সাথে থাক এবং জমাত ও মসজিদের সাথে থাক। এ হাদীসে নির্জনবাস তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে জ্ঞানার্জনের পূর্বে নির্জনবাস অবলম্বন করে। এর বর্ণনা পরে আসবে।

নির্জনবাসের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ ঃ নির্জনবাসের সপক্ষদের প্রথম দলীল এই আয়াত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَادْعُوا رَبِّي الاية ـ

আমি পৃথক হচ্ছি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা এবাদত কর তাদের থেকে। আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করি। আর এক আয়াতে আছে–

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ـ

অতঃপর যখন সে পৃথক হয়ে গেল তাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের উপাস্যদের থেকে, তখন আমি দিলাম তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব এবং আমি প্রত্যেককে করেছি নবী।

এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্জনবাসের কারণে এই নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ দলীলটিও অগ্রাহ্য। কেননা, কাফেরদের সাথে মেলামেশার একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া। যখন এ ব্যাপারে নিরাশ হতে হয় এবং জানা যায়, তারা দাওয়াত মানবে না, তখন তাদেরকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আমাদের আলোচনা মুসলমানদের সাথে

মেলামেশা সম্পর্কে। তাদের সাথে মেলামেশায় বরকত হয়। সেমতে বর্ণিত আছে, কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আপনি মাটির আবৃত পাত্র থেকে ওযু করা অধিক পছন্দ করেন; না সেসব চৌবাচ্চা থেকে, যেগুলো থেকে মানুষ ওযু করে থাকে? তিনি বললেন ঃ পানির চৌবাচ্চা থেকে ওযু করা অধিক পছন্দ করি, যাতে মুসলমানদের হাতের বরকত হাসিল হয়। আরও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কা'বা গৃহের তওয়াফ করেন, তখন যমযম কূপের কাছে গেলেন তার পানি পান করার উদ্দেশে। এমন সময় দেখলেন, চামড়ার পাত্রে খেজুর ভিজানো আছে। মানুষ সেগুলো হাতে পিষে দিয়েছে এবং তাই হাতে নিয়ে পান করছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে এখান থেকে পান করাও। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এগুলো হাতে পেষা নবীয। আপনি বললে গৃহে রক্ষিত ও আবৃত মৃৎপাত্র থেকে পরিষ্কার শরবত এনে দেই। তিনি বললেন ঃ আমাকে এখান থেকেই পান করাও, যেখান থেকে সকলে পান করে। আমি মুসলমানদের হাতের বরকত চাই। সার কথা, কাফের ও প্রতিমাদের থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের কাছ থেকেও পৃথক হওয়া উচিত। অথচ তাদের সাথে মেলামেশা করলে অনেক বরকত লাভ হয়। দ্বিতীয় দলীল, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন– وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে আমা থেকে পৃথক হয়ে যাও। আসহাবে কাহফের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ الاية .

যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাস্যদের থেকে পৃথক হয়ে গেছ, তখন আশ্রয় গ্রহণ কর গুহায়। তোমাদের রব তোমাদের জন্যে কিছু রহমত ছড়িয়ে দেবেন।

এতে নির্জনবাসের আদেশ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর যখন কোয়ায়শরা নির্যাতন চালায়, তখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে পার্বত্য উপত্যকায় চলে যান এবং নিজের বিশেষ সহচরগণকে নির্জনবাস অবলম্বন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দেন। সেমতে সকলেই হিজরত করেন। পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হল, তখন সকলেই মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর সাথে মিলিত হন। এ প্রমাণের মধ্যেও একথাই বিধৃত হয়েছে যে, কাফেরদের কাছ থেকে নিরাশ হয়েই

তারা নির্জনবাস অবলম্বন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদের কাছ থেকে নির্জনে চলে যাননি। আসহাবে কাহফের সদস্যবর্গও একে অপরের কাছ থেকে নির্জনবাস অবলম্বন করেননি; অথচ তাঁরা সকলেই ঈমানদার ছিলেন; বরং তাঁরা কাফেরদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ছিলেন। সুতরাং তাদের নির্জনবাস প্রমাণ হতে পারে না। তৃতীয় দলীল, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একবার ওকবা ইবনে আমের জোহানী জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন– আপন গৃহে আবদ্ধ থাক, মুখ বন্ধ রাখ এবং পাপের জন্যে কান্নাকাটি কর। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল, কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ

هُوَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى قِيْلَ ثُمَّ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

ঈমানদার, জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদকারী। প্রশ্ন হল, এর পর কে? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি, যে পাহাড়ের কোন গুহায় আলাদা বসে আল্লাহর এবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ الْغَنِىَّ الْخَفِىَّ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা পরহেযগার, মালদার, গোপন বান্দাকে পছন্দ করেন।

এসব হাদীসও প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, ওকবা ইবনে আমেরকে উপরোক্ত রূপ জওয়াব দেয়ার কারণ ছিল, তিনি নবুওয়তের নূর দ্বারা বুঝে নেন যে, তাঁর জন্যে ঘরে বসে থাকা মেলামেশা করার তুলনায় অধিক উপযুক্ত ও নিরাপদ। এ কারণেই সকল সাহাবীকে তিনি এই আদেশ দেননি। প্রায়ই এমন হয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে নির্জনবাসের মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত থাকে– মেলামেশায় নয়। যেমন কারও পক্ষে জেহাদে যাওয়ার চেয়ে গৃহে বসে থাকা ভাল হয়। এর অর্থ এরূপ হয় না যে, জেহাদ বর্জন করা উত্তম। মানুষের সাথে মেলামেশা সাধনা ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে, সে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের কষ্টে সবর করে না। এমনিভাবে (رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ يَعْبُدُ رَبَّهُ) হাদীসে সেই ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে স্বভাবগতভাবে দুষ্ট। মানুষ তার

সাথে মেলামেশা করে কষ্ট পায়। আল্লাহ্ পরহেযগার, ধনী, গোপন বান্দাকে পছন্দ করেন– এই হাদীসে পরিচয়হীন মেলামেশা করতে এবং খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতে ইশারা করা হয়েছে। নির্জনবাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, অনেক সংসারত্যাগীকে দুনিয়ার মানুষ চেনে এবং অনেক মেলামেশাকারী অখ্যাতই থেকে যায়। চতুর্থ দলীল, রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে, আমি কি তা বলব না? তাঁরা আরজ করলেন ঃ অবশ্যই। আপনি এরশাদ করুন। তিনি হাতে পশ্চিম দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে আল্লাহ্র পথে আপন ঘোড়ার লাগাম ধরে নিজে ধাওয়া করার অথবা অপরের তার প্রতি ধাওয়া করার প্রতীক্ষায় থাকে। আমি তোমাদেরকে সে ব্যক্তির কথাও বলছি, যে তার পরে উত্তম। অতঃপর তিনি হেজাযের দিকে হাতে ইশারা করে বললেন ঃ তার পরে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে ছাগলের পালে নামায আদায় করে, যাকাত দেয়, নিজের মালের মধ্যে আল্লাহ্র হক চেনে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে একান্তে বাস করে।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার পর এখন আমরা বলছি, সন্তোষজনক প্রমাণ কোন পক্ষেই পাওয়া যায়নি। তাই সত্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে নির্জনবাসের উপকারিতা ও প্রয়োজনাদি পুংখানুপুংখরূপে খতিয়ে দেখা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্জনবাস সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, নির্জনবাস ও মেলামেশা সম্পর্কে মনীষীগণের মতভেদ বিবাহ এবং চিরকৌমার্যব্রতের মধ্যে মতভেদের অনুরূপ। বিবাহ অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করেছি যে, সর্বাবস্থায় একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির উপর বলা যায় না; বরং অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে কারও জন্যে বিবাহ এবং কারও জন্যে কৌমার্যব্রত উত্তম। সেমতে বিবাহের বিপদাপদ ও উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্জনবাসের উপকারিতা লিপিবদ্ধ করছি। নির্জনবাসের উপকারিতা দ্বিবিধ– একটি পার্থিব, অপরটি পারলৌকিক। দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন– এবাদত ও চিন্তা ভাবনায় মগ্ন থেকে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য অর্জন করা অথবা মেলামেশার উপর ভিত্তিশীল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যেমন, রিয়া, পরনিন্দা, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ থেকে চুপ থাকা, খারাপ সঙ্গীদের মন্দ চরিত্র ও দুষ্ট ক্রিয়াকর্ম নিজের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া ইত্যাদি। পার্থিব উপকারিতার উদাহরণ যেমন– নির্জনতায় কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হওয়া, সেমতে পেশাদার ব্যক্তিরা একাকিত্বে তাদের পেশার কাজও খুব করে নেয়, সেসব অনিষ্ট থেকেও বেঁচে থাকে যা মেলামেশার মধ্যে হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ জগতের চাকচিক্যের দিকে তাকানো, মনে-প্রাণে সে দিকে আকৃষ্ট হওয়া, অপরের বস্তুর জন্যে লালায়িত হওয়া, তার বস্তুতে অপরের লালসা করা ইত্যাদি। নির্জনবাসের কারণে মানুষ এসব জাগতিক আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে নির্জনবাসের উপকারিতা। এক্ষণে আমরা এগুলোকে ছয়টি উপকারিতায় সীমিত করে বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

প্রথম উপকারিতা, এবাদত ও চিন্তা-ভাবনার জন্যে অবসর লাভ করা, মানুষের সাথে বাক্যালাপের পরিবর্তে আল্লাহ্ আআলার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারাদিতে এবং মর্ত ও স্বর্গলোকে খোদায়ী রহস্য জানার কাজে আত্মনিয়োগ করার সৌভাগ্য নির্জনবাসের মাধ্যমে নসীব হয়ে থাকে। কেননা, এসব বিষয় অবসর মুহূর্ত চায়। মেলামেশা করলে অবসর মুহূর্ত থাকে না। সুতরাং নির্জনবাসই এসব সৌভাগ্য অর্জনের উপায়। এ

কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) শুরুতে হেরা পাহাড়ে সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে নির্জনবাস করতেন। নবুওয়তের নূর পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। এর পর সৃষ্টি তাঁর মধ্যে ও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে আড়াল হত না। বাহ্যিক দেহ দিয়ে তিনি সৃষ্টির সাথে ছিলেন এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতেন। মানুষ ধারণা করত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু), কিন্তু তিনি বলে দিলেন, তাঁর সবকিছু আল্লাহ্র মধ্যে নিমজ্জিত। তিনি বলেন ঃ

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا وَلٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ ـ

আমি যদি কাউকে খলীল করতাম, তবে আবু বকরকেই খলীল করতাম; কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ, আমি) আল্লাহ্র খলীল।

বাহ্যতঃ মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকা এবং অন্তরে মনে-প্রাণে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা নবুওয়তের শক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তিই যেন নফসের ধোঁকায় এসে এই মর্তবার লালসা না করতে থাকে। তবে কোন কোন ওলীর মর্তবা এতটুকু হয়ে যাওয়া অবান্তর নয়। সেমতে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলছি, অথচ মানুষ ধারণা করে, তাদের সাথে কথা বলছি। এটা সেই ব্যক্তির জন্যে সহজলভ্য, যে আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয় এবং তাতে অপরের জন্যে কোন অবকাশ না থাকে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, যারা মানুষের আশেক, তাদের অবস্থাও এমন হয়ে যায় যে, মানুষের সাথে দেখা করে, কিন্তু কাউকে চেনে না এবং কারও আওয়াযও শুনে না। বিবেকবানদের কাছে পরকালের ব্যাপার খুবই গুরুতর। এর চিন্তায় কারও অবস্থা এরূপ হয়ে যেতে পারে। তবে নির্জনবাস দ্বারা সহায়তা নেয়া অধিকাংশের জন্যে উত্তম। এ কারণেই জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নির্জনবাসের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন ঃ নির্জনবাস দ্বারা কাম্য চিন্তা ভাবনার স্থায়িত্ব এবং অন্তরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভ উদ্দেশ্য, যাতে উৎকৃষ্ট জীবন অর্জিত হয় এবং মারেফতের মিষ্টতা আস্বাদন করা যায়। জনৈক দরবেশকে বলা হল, নির্জনবাসে আপনার ধৈর্য অত্যধিক। তিনি বললেন ঃ আমি একা থাকি না। পরওয়ারদেগার আমার সাথে উপবিষ্ট থাকেন। আমি যখন চাই, তিনি আমাকে কিছু বলুন, তখন তাঁর কিতাব কোরআন পড়তে শুরু করি। আর যদি চাই, আমি তাঁকে কিছু বলি তবে

নামাযে রত হয়ে যাই। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ আমি ইবরাহীম ইবনে আদহামকে সিরিয়ার শহরসমূহে দেখে আরজ করলাম ঃ আপনি খোরাসান একদম ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি আরাম এখানেই পেয়েছি। আমার ধর্মকর্ম নিয়ে এখানে আমি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ঘুরাফেরা করছি। আমাকে কেউ দেখলে এ কথা বলে ঃ লোকটি সন্দেহজনক অথবা কোন উষ্ট্রচালক কিংবা মাঝি। হযরত হাসান বসরীকে লোকেরা বলল ঃ এখানে এক ব্যক্তিকে আমরা যখনই দেখি, একা একটি স্তম্ভের আড়ালে বসে থাকতে দেখি। সে আপনার মজলিসে শরীক হয় না। তিনি বললেন ঃ তাকে আবার দেখলে আমাকে জানাবে। সেমতে একদিন তাকে পুনরায় দেখে হযরত হাসানকে জানানো হল। তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমার মনে হয় তুমি নির্জনতা পছন্দ কর। কিন্তু মানুষের কাছে বসতে তোমার কিসে বাধা? লোকটি জওয়াব দিল ঃ আছে কোন ব্যাপার, যে কারণে আমি লোকজনের কাছে বসি না। হযরত হাসান বসরী বললেন ঃ তাহলে লোকে যাকে হাসান বলে তার কাছেই বস। সে বলল, আমি যে কাজে আছি, তাতে কারও কাছে বসার ফুরসত আমার নেই। তিনি বললেন ঃ মিয়া সাহেব, সে কাজটি কি? সে বলল ঃ সকাল সন্ধ্যায় আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে; আর আমি গোনাহ্ করি। তাই আমি উত্তম মনে করেছি যে, নেয়ামতের কারণে আল্লাহ্র শোকর করব এবং নিজের গোনাহের কারণে তাঁর কাছে মাগফেরাতের আবেদন করব। এ দু'টি কাজের কারণে আমি ফুরসত পাই না। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা, আমার মতে তুমি হাসানের চেয়ে অধিক সমঝদার। অতএব যে কাজে আছ, তাতেই মগ্ন থাক। কথিত আছে, হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হারম ইবনে হাব্বান তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি শুধালেন ঃ কেন এলে? হারম জওয়াব দিলেন ঃ তোমার কাছ থেকে মহব্বত লাভ কার জন্যে এসেছি। ওয়ায়েস বললেন ঃ আমি এমন কাউকে জানি না, যে তার পরওয়ারদেগারকে চেনার পর অন্যের কাছ থেকে মহব্বত লাভ করে। ফোযায়ল বলেন ঃ আমি রাত আসতে দেখে আনন্দিত হই যে, এখন পরওয়ারদেগারের সাথে একাকী থাকতে পারব। কিন্তু যখন সকাল হতে দেখি, তখন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করি। কারণ, এখন লোকজন এসে আমাকে ঘিরে ফেলবে এবং এমন কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসবে, যে আমাকে পরওয়ারদেগার থেকে গাফেল করে দেবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন ঃ ভাগ্যবান তারা, যারা দুনিয়াতেও বিলাস করে এবং আখেরাতেও বিলাস করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে তো তারা আল্লাহর সাথে সংগোপনে বাক্যালাপ করতেই থাকে, আখেরাতেও তাঁর পড়শী হয়ে থাকবে। যুন্নুন মিসরী বলেন ঃ একান্তে পরওয়ারদেগারের সাথে বাক্যালাপ করার মধ্যেই ঈমানদারদের খুশী ও আনন্দ। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ মানুষ যখন নিজের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্বের গুণ খুঁজে পায় না, তখন নিজ থেকেই আতংক অনুভব করে। এ কারণেই মানুষের সাথে মেলামেশা করে এই আতংক দূর করতে চাই। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের গুণ থাকে, তখন সে নির্জনতা তালাশ করে, যাতে নির্জনতা দ্বারা চিন্তা-ভাবনায় সাহায্য নেয় এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করে। মোট কথা, নির্জনবাসের বড় উপকারিতা হচ্ছে এবাদত ও চিন্তা-ভাবনার ফুরসত পাওয়া।

দ্বিতীয় উপকারিতা, মেলামেশার কারণে মানুষ প্রায়ই সে সকল গোনাহের সম্মুখীন হয়, নির্জনবাসের কারণে যেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এরূপ গোনাহ্ চারটি– গীবত (পরনিন্দা), রিয়া, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ থেকে চুপ থাকা এবং স্বভাবের মধ্যে গোপনে গোপনে কুচরিত্র ও অপকর্ম দাখিল হওয়া, যা জাগতিক লোভ-লালসা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। গীবতের অবস্থা হচ্ছে, এর কারণসমূহ জানতে পারলে বুঝতে পারবে, মেলামেশার অবস্থায় এ থেকে বেঁচে থাকা এক দুঃসাধ্য কাজ। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই গীবত থেকে বাঁচতে পারে না। কারণ, এটা সাধারণ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তারা যেখানে সেখানে বসে অপরের গীবত করতে থাকে এবং এতে অসাধারণ আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। তারা এর মাধ্যমেই একাকিত্বের আতংক দূর করে থাকে। সুতরাং যদি তুমি মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মতই কথাবার্তা বল, তবে তুমি গোনাহ্গার এবং পরওয়ারদেগারের ক্রোধের যোগ্য হয়ে যাবে। আর যদি নিশ্চুপ থাক তবুও গীবতকারী গণ্য হবে। কেননা, যে গীবত শুনে, সে-ও গীবতকারীর মতই দোষী। আর যদি মানুষকে গীবত করতে নিষেধ কর, তবে তারা তোমার দুশমন হয়ে যাবে এবং তোমারই গীবত করতে শুরু করবে। ফলে "করিতে ধুলা দূর, জগত হল ধুলায় ভরপুর"-এর মত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে; বরং এটাও আশ্চর্য নয় যে, তারা গীবতের সীমা পেরিয়ে তোমাকে গালিগালাজ করতে থাকবে। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ধর্মের মূলনীতিসমূহের

অন্যতম ও ওয়াজিব। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করবে, সে অবশ্যই খারাপ বিষয়াদি দেখবে। এমতাবস্থায় যদি সে নিশ্চুপ থাকে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে নিষেধ করলে নিজেকে নানা ধরনের ক্ষতির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবে; বরং আশ্চর্য নয় যে, যেসব কাজ করতে নিষেধ করবে, তার চেয়ে জঘন্য অপরাধ দেখতে হবে। নির্জনবাসে এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ লোকসকল, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

'মুমিনগণ, তোমরা নিজের চরকায় তেল দাও। তোমরা হেদায়াত পেয়ে গেলে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' কিন্তু একে যথার্থ স্থানে ব্যবহার করো না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

اِذَا رَأَى النَّاسُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ .

মানুষ যখন মন্দ কাজ দেখে এবং তা পরিবর্তন করে না, তখন আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আযাব দেবেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, এমন কি এ কথাও বলবেন– তুমি যখন মন্দ কাজ দেখেছিলে, তখন নিষেধ করলে না কেন? এর পর যদি আল্লাহ্ বান্দাকে জওয়াব অনুধাবন করান, তবে সে আরজ করবে, ইলাহী, আমি তোমার রহম আশা করতাম এবং মানুষকে ভয় করতাম। এটা তখন, যখন মারপিটের কিংবা অসাধ্য কোন কাজের ভয় করে। এর পরিচয় কঠিন অথচ বিপদ মুক্ত নয়। নির্জনবাসে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ পরীক্ষা করে, সে প্রায়শঃ অনুতপ্ত হয়। কেননা, সৎ কাজের আদেশ একটি ঝুঁকে পড়া প্রাচীর সোজা করার মত বিপদসংকুল কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীরটি তার উপরই পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। হাঁ, যদি কিছু লোক তাকে সাহায্য করে এবং প্রাচীরটি ধরে রাখে, তবে অবশ্য কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই প্রাচীর সোজা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে সৎ কাজের আদেশে সাহায্যকারী কোথায়? এজন্যেই নির্জনবাস অবলম্বন করা উত্তম।

রিয়া এমন একটি দুরারোগ্য ব্যাধি, যা থেকে বেঁচে থাকা আবদাল ও আওতাদের জন্যেও সুকঠিন– অন্যদের তো কথাই নেই। কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে তাদের আতিথ্য করতে হবে এবং তাদের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করতে হবে। যে এগুলো করবে– সে রিয়া করবে। যে মানুষকে দেখানোর জন্যে কাজ করবে, সে সেসব গোনাহে পতিত হবে– যাতে মানুষ পতিত আছে। ফলে তারা যেমন বরবাদ হয়েছে, সে-ও বরবাদ হবে। এতে কমপক্ষে ক্ষতি হচ্ছে, নেফাক তথা কপটতা অপরিহার্য হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ পরস্পরে শত্রু– এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুমি মেলামেশা করলে যদি প্রত্যেকের সাথে তার মর্জি মাফিক ব্যবহার না কর, তবে উভয়ের কাছে দুশমন বলে চিহ্নিত হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের সাথে তার মর্জি অনুযায়ী কথা বল, তবে তুমি হবে জঘন্যতম সৃষ্টি। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

تَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

'তোমরা দু'মুখো ব্যক্তিকে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ পাবে, যে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অন্য মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়।'

মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্যে সাক্ষাতের সময় আগ্রহ ও আনন্দ তো অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়। অথচ এটা মূলেই মিথ্যা অথবা অতিরিক্ত পরিমাণটি মিথ্যা হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারীকে তার কুশল জিজ্ঞাসা, তার প্রতি মায়া-মমতা প্রকাশ করাও জরুরী হয়ে থাকে। সুতরাং তুমি যদি কাউকে জিজ্ঞেস কর, আপনি কেমন আছেন? বাড়ীর সকলেই ভাল তো? অথচ তাদের প্রতি কোন মনোযোগই না থাকে, তবে এটা নির্ভেজাল মোনাফেকী। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ বাড়ী থেকে বের হয়; পথিমধ্যে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন ব্যক্ত করে বলে, আমার অমুক কাজটি করে দিন। এতে বাহ্যতঃ সে খুব কৃতার্থ হয় যে, তুমি তাকে একটি কাজ করে দিতে বলেছ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে কাজটি করে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি বাড়ী ফেরার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকেও রাগান্বিত করে এবং নিজের দ্বীনকেও বরবাদ করে। সিররী সকতী বলেন ঃ যদি আমার কাছে কোন বন্ধু আসে এবং আমি তাকে দেখানোর জন্য নিজের দাড়ি হাতে পরিপাটি করি, তবে আমি আশংকা করি, আমার নাম কোথাও মোনাফেকদের তালিকায় লেখা হয়ে না যায়। ফোযায়ল একাকী মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়

এক বন্ধু তাঁর কাছ গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন এলে? বন্ধু বলল ঃ মনোরঞ্জনের জন্যে। তিনি বললেন ঃ এটা তো আতংকের কাজ। কেননা, তুমি আমাকে দেখানোর জন্যে সাজসজ্জা করতে চাও এবং আমি তোমাকে দেখানোর জন্যে সেজেগুজে বসে থাকি। তুমি আমার খাতিরে মিথ্যা বল এবং আমি তোমার খাতিরে মিথ্যা বলি। সুতরাং এর চেয়ে ভাল হয়, তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, না হয় আমি তোমার কাছ থেকে উঠে পড়ি। জনৈক আলেম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে মহব্বত করেন, তার কাছে আপন মহব্বত গোপনও রাখতে চান। তাউস খলীফা হেশামের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ কেমন আছেন? হেশাম ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ তুমি আমাকে "আমীরুল মুমীনীন" বললে না কেন? তাউস বললেন ঃ সকল মুসলমান আপনার খেলাফতে একমত নয়। তাই আমার আশংকা হল, আমীরুল মুমীনীন বললে কোথাও আমি মিথ্যাবাদী হয়ে না যাই। যে ব্যক্তি এভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে, সে মানুষের সাথে মেলামেশা করলে দোষ নেই। নতুবা নিজের নাম মোনাফেকদের তালিকায় লেখাতে সম্মত হলে মেলামেশা করুক।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ যখন পরস্পরে মিলিত হতেন, তখন কুশল জিজ্ঞেস করা ও জওয়াব দেয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। কেননা, তাঁরা ধর্মের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন– দুনিয়ার অবস্থা নয়। সেমতে হাতেম আসাম্ম হামেদ লাফফাফকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ নিরাপদ ও সুস্থ আছি। হাতেমের কাছে এই জওয়াব ভাল মনে হল না। তিনি বললেন ঃ হামেদ, নিরাপত্তা তো পুলসেরাত পার হওয়ার পর পাওয়া যাবে এবং সুস্থতা জান্নাতে আছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, আজ আপনি কেমন? তিনি বলতেন ঃ এমন আছি, যে বস্তু আশা করি তা এগিয়ে আনতে পারি না এবং যে বস্তু ভয় করি তা পিছিয়ে নিতে পারি না। আমলের বদলে বন্ধক আছি। কল্যাণ সম্পূর্ণ অন্যের হাতে। সুতরাং কোন অভাবী আমার চেয়ে অধিক অভাবী নয়। রবী ইবনে খায়সামকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ দুর্বল গোনাহ্গার আছি। কিসমতের দানাপানি পূর্ণ করছি এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। হযরত আবু দারদাকে কেউ এ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ দোযখ থেকে মুক্তি পেলে ভালই আছি। সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ তাঁর শোকর তাঁর সামনে করি। এক মন্দ কাজ অন্য মন্দ কাজের সামনে এবং একটি থেকে পলায়ন করে অন্যটির কাছে যাই। হযরত ওয়ায়েস করনীকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি

বললেন ঃ তার অবস্থা কি জিজ্ঞেস কর, যে সন্ধ্যা হলে সকাল পাবে কিনা জানে না এবং সকাল হলে সন্ধ্যা পাবে কিনা বলতে পারে না। মালেক ইবনে দীনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ বয়স হ্রাস পাচ্ছে এবং গোনাহ্ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনৈক দার্শনিককে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ পরওয়ারদেগারের রিযিক খাচ্ছি আর তাঁর দুশমন ইবলীসের আনুগত্য করছি। কেউ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে জিজ্ঞেস করল ঃ কেমন আছেন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ আখেরাতের দিকে এক মনযিল অগ্রসর হচ্ছে, তার অবস্থা কি হবে নিজেই বুঝে নাও। হামেদ লাফফাফকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একটি দিন ও একটি রাত সহীহ সালামতে অতিবাহিত হওয়ার কামনা করছি। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনার কোন দিনই কি সহীহ-সালামতে অতিবাহিত হয় না? তিনি বললেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাফরমানী করি না, সেদিনটি সহীহ সালামতে যায়। এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলল ঃ সে ব্যক্তির অবস্থা কি হবে, যে দূরদূরান্তের সফর পাথেয় ছাড়াই অতিক্রম করতে চায়, সান্ত্বনাদাতা সাথী ছাড়া কবরে যায় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের সামনে প্রমাণ ব্যতীত উপস্থিত হয়। হাসসান ইবনে আবী সেনানকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনি কেমন? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি কেমন হবে, যে মরে যাবে, এরপর পুনরুত্থিত হবে এবং হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) জনৈক নিঃস্ব ছাপোষা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলল ঃ তার অবস্থা কি হবে, যার ঘাড়ে পাঁচশ দেরহাম ঋণ আছে এবং ঘরে অনেক পোষ্য রয়েছে? ইবনে সীরীন আপন গৃহে গেলেন এবং এক হাজার দেরহাম এনে লোকটিকে দিয়ে বললেন ঃ পাঁচশ' দেরহাম দিয়ে ঋণ শোধ করবে এবং পাঁচশ দেহাম বাল-বাচ্চাদের জন্যে রেখে দেবে। হযরত ইবনে সীরীনের কাছে তখন এই এক হাজার দেরহাম ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ আর কোন দিন কারও অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ, তিনি আশংকা করলেন, অবস্থা জিজ্ঞেস করার পর সাহায্য করতে না পারলে জিজ্ঞাসা রিয়া ও মোনাফেকী বলে গণ্য হবে।

সারকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধর্মের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে অন্তরের হাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। দুনিয়ার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে এবং অন্যের কিছু অভাব-অনটন জানা গেলে তা দূর করার জন্যে সাধ্যমতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি তাদেরকে জানি, যারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না; কিন্তু একজন

অপরজনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উজাড় করে দিলে দ্বিতীয়জন তাতে বাধ সাধতেন না। এখন আমি এমন লোক দেখি, যারা একে অপরের আতিথ্য ও সমাদর এতদূর করে যে, গৃহের মুরগীর অবস্থা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে ছাড়ে না। কিন্তু একজন যদি অকপট হয়ে অপরজনের এক পয়সাও নিতে চায়, তবে সে কখনও তা দেয় না। এটা রিয়া ও মোনাফেকী ছাড়া আর কি? এর আলামত হল, যখন দু'ব্যক্তি পরস্পরে সাক্ষাৎ করে তখন একজন বলে 'মেযাজ শরীফ'– অপরজন বলে, আপনার মেযাজ লতীফ? প্রথমজন জওয়াবের অপেক্ষা করে না এবং দ্বিতীয়জন তার প্রশ্নের জওয়াব দেয় না; বরং নিজের প্রশ্ন পেশ করে। এর কারণ এটাই যে, তারা উভয়ই জানে, এটা নিছক একটা লোকদেখানো লৌকিকতার ব্যাপার। মাঝে মাঝে অন্তরে থাকে হিংসা-বিদ্বেষ, কিন্তু মুখে জিজ্ঞেস করা হয় কুশল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা 'আসসালামু আলাইকুম' বলতেন এবং তখন বলতেন, যখন অন্তর সুস্থ থাকত। এখন বলা হয়, আপনি কেমন, খোদা তা'আলা আপনাকে সুস্থ রাখুন, আপনার মেযাজ মোবারক কেমন? আল্লাহ্ আপনাকে ভাল রাখুন ইত্যাদি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলো সব বেদআতের পথে আমদানী করা হয়েছে– সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে নয়। এতে কেউ অসন্তুষ্ট হয় হোক। এরূপ বলার কারণ, তুমি যদি সাক্ষাত হওয়া মাত্রই অপরকে বল মেযাজ শরীফ, তবে এটা বেদআত। এক ব্যক্তি আবু বকর ইবনে আইয়াশকে প্রশ্ন করল ঃ মেযাজ শরীফ? তিনি তাকে জওয়াব দিলেন না এবং বললেন ঃ আমাকে এই বেদআত থেকে মাফ রাখ। মোট কথা, মেলামেশা প্রায়ই লৌকিকতা, রিয়া ও মোনাফেকী থেকে মুক্ত হয় না। এগুলোর মধ্যে কোনটি নিষিদ্ধ ও হারাম এবং কোনটি মকরূহ, নির্জনবাসের কারণে এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে ও অভ্যাসে তাদের সাথে শরীক হয় না, মানুষ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং তাকে অসহনীয় মনে করবে। তারা তার গীবত করবে এবং তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হবে। ফলে তাদের ধর্মকর্ম এ ব্যক্তির কারণে বরবাদ হবে। অন্যের ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র দেখে তার মধ্যে সেই ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া একটি গোপন ব্যাধি, যা বুদ্ধিমানরাও টের পায় না– গাফেলদের তো কথাই নেই। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন ফাসেক পাপাচারী ব্যক্তির কাছে অনেক দিন বসে, তবে তার মনের অবস্থা পূর্বের তুলনায় বদলে যাবে। অর্থাৎ, তার কাছে বসার পূর্বে তার মনে যতটুকু ঘৃণা ছিল এখন ততটুকু থাকবে না। কেননা, মন্দ

কাজ দেখতে দেখতে মনের কাছে তা সহজ হয়ে যায় এবং তা যে মন্দ, তা মন থেকে মুছে যেতে থাকে। মানুষ মন্দ কাজকে গুরুতর মনে করে বলেই তা থেকে বিরত থাকে। বার বার দেখার কারণে যখন তা গুরুতর থাকে না, তখন বাধাদানকারী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ স্বয়ং সেই মন্দ কাজ করতে সম্মত হয়ে যায়। যখন মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত অন্যকে কবীরা গোনাহ করতে দেখে, সে সগীরা গোনাহ তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। এ কারণেই যে ব্যক্তি ধনীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তার উপর আল্লাহর নেয়ামতকে কম মনে করে। ধনীর সংসর্গ অবলম্বন করার কারণই হচ্ছে নিজের কাছে যা আছে তা কম মনে করা। পক্ষান্তরে ফকীরের সংসর্গ অবলম্বন করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যে সকল নেয়ামত দান করেছেন, সেগুলোকে বড় মনে করা। অনুগত ও অবাধ্যদের দিকে তাকানোর প্রভাবও তেমনি। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কেবল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দিকেই তাকায় যে, তারা এবাদত কিভাবে করেছেন, কিরূপে দুনিয়া থেকে আলাদা রয়েছেন, সে নিজেকে সব সময় সামান্য এবং নিজের এবাদতকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। ফলে সে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা অবশ্যই করবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াদারদের অবস্থা দেখবে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তাদের বিমুখতা, দুনিয়াতে ডুবে থাকা এবং গোনাহে অভ্যস্ত হওয়া, সে নিজের মধ্যে সৎ কাজের সামান্য আগ্রহ পেলেও তার কারণে নিজেকে বড় মনে করবে। এটাই ধ্বংসের পথ। মন বদলে যাওয়ার জন্য কেবল ভাল-মন্দ বিষয় শ্রবণ করা যথেষ্ট- দেখার কোন প্রয়োজনই হয় না।

নির্জনবাসের তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে, এর বদৌলতে গোলযোগ ও কলহ-বিবাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এগুলোতে জড়িত না হওয়ার ফলে ধর্ম ও প্রাণ উভয়ই নিরাপদ থাকে। গোলযোগ ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে খুব কম শহরই মুক্ত। তাই যে কেউ জনপদ থেকে আলাদা থাকবে, সে গোলযোগ ইত্যাদি থেকেও নিরাপদ থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) ফেতনা ও গোলযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন- এক সময় আসবে, যখন মানুষের অঙ্গীকার বিনষ্ট হয়ে যাবে, বিশ্বস্ততা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এমন হয়ে যাবে, অতঃপর তিনি হাতের অঙ্গুলিসমূহ একটি অপরটির ভিতরে রেখে দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ এমন দুঃসময়ে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ আপন গৃহে বসে থাক, মুখ বন্ধ রাখ, যা জান তা কর, যা জান না তা বর্জন কর এবং বিশিষ্ট লোকদের পথ অনুসরণ কর- জনসাধারণের পথ বর্জন কর। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর

রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يُوشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَبَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

সেদিন নিকটবর্তী, যখন মুসলমানের উত্তম মাল হবে ছাগল-ভেড়ার পাল। সে এগুলোকে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিপাতের জায়গায় নিয়ে ফিরবে এবং নিজের ধর্ম নিয়ে গোলযোগ থেকে পলায়ন করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ সত্বরই এমন দিন আসবে, যখন ধার্মিকের ধর্ম নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু যে তার ধর্মকে নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এবং এক গর্ত থেকে অন্য গর্তে শৃগালের ন্যায় পালিয়ে ফিরবে, তার ধর্ম বেঁচে যাবে। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপ কখন হবে? তিনি বললেন ঃ যখন আল্লাহ্র নাফরমানী ছাড়া জীবিকা অর্জিত হবে না। এ সময় এলে কৌমার্যব্রত পালন করা ওয়াজিব হবে। প্রশ্ন হল, আপনি আমাদেরকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন। কৌমার্যব্রত কিরূপে ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন ঃ সে সময় এলে মানুষের ধ্বংস তার পিতামাতার হাতে হবে; পিতামাতা না থাকলে স্ত্রী-সন্তানের হাতে এবং তারাও না থাকলে আত্মীয়-স্বজনের হাতে হবে। লোকেরা আরজ করল ঃ এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তারা তাকে দারিদ্র্যের জন্যে ভর্ৎসনা করবে। ফলে সে সাধ্যাতীত কাজ করবে, যা পরিণামে তার ধ্বংসের কারণ হবে। এ হাদীসটি যদিও কৌমার্যব্রত সম্পর্কে, কিন্তু নির্জনবাসও এ থেকে মুক্ত থাকে না এবং জীবিকা উপার্জন গোনাহ ছাড়া করতে পারে না। আমি একথা বলি না যে, হাদীসে যে যমানার কথা বলা হয়েছে, তার সময় এটাই; বরং এটা সময়ের আগেই হয়ে গেছে। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরীর এই উক্তি প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র কসম, নির্জনবাস ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফেতনা ও "হরজের" দিনগুলোর কথা বললে আমি আরজ করলাম ঃ হরজ কি? তিনি বললেন ঃ যখন মানুষ তার সঙ্গীর তরফ থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমি আরজ করলাম ঃ যদি আমি সে সময় পাই তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ নিজের প্রাণ ও হাত বিরত রাখ এবং গৃহের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আমি বললাম ঃ যদি কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে আমার কাছে চলে আসে? তিনি বললেন ঃ আপন কক্ষে ঢুকে পড়। আমি বললাম ঃ যদি

কেউ কক্ষের মধ্যেও এসে পড়ে? তিনি বললেন ঃ মসজিদে দাখিল হয়ে যাও এবং এমনিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। আমীর মোয়াবিয়ার খেলাফতকালে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে যখন লোকেরা যুদ্ধে বের হতে বলল, তখন তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি যুদ্ধে যাব না। হাঁ, এক শর্তে যেতে পারি তোমরা যদি আমাকে এমন তরবারি দাও, যে চোখে দেখে এবং মুখে বলে। সে কাফের দেখলে আমাকে বলে দেবে এবং আমি তাকে হত্যা করব। আর ঈমানদার দেখলে বলবে– সে ঈমানদার। আমি তাকে হত্যা করব না। তিনি আরও বললেন ঃ আমাদের ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কিছু লোক উন্মুক্ত পথে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ধূলিঝড় শুরু হয়ে গেল। ফলে পথ চেনার জো রইল না। কেউ বলল ঃ পথ ডান দিকে। কেউ কেউ সেদিকেই চলা শুরু করল এবং হতাশ হয়ে ঘুরাফেরা করল। আবার কেউ বলল ঃ পথ বাম দিকে। কেউ কেউ সে দিকে গিয়ে বিফল মনোরথ হল। কিছু লোক সেখানেই অবস্থান করল এবং ঝড় থেমে যাওয়া পর্যন্ত সবর করল। ঝড় থেমে যাওয়ার পর সঠিক পথ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। মোট কথা, হযরত সা'দ ও অন্য কতক সাহাবী গোলযোগে শরীক হলেন না এবং ফেতনা দমিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা করলেন না।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সংবাদ পেলেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইরাকের পথে রওয়ানা হয়েছেন। তিনিও রওয়ানা হলেন এবং তিন মনযিল দূরে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম বললেন ঃ ইরাক। অতঃপর তিনি ইরাক থেকে আগত চিঠিপত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্র তাঁকে দেখালেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আপনি এসব চিঠি ও প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর ভরসা করে ইরাক যাবেন না। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মানলেন না। হযরত ইবনে ওমর বললেন ঃ আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটি পছন্দ করতে বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আখেরাত পছন্দ করলেন। আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা। আল্লাহর কসম, আপনাদের মধ্য থেকে কেউ দুনিয়ার শাসক হবে না। আপনার জন্যে যা মঙ্গলজনক, তাই আপনাকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ হে শহীদ, আপনাকে

আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। তখন দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন; কিন্তু ফেতনার দিনগুলোতে চল্লিশ জনের বেশী সাহাবী এতে শরীক হওয়ার সাহস করেননি। তাউস (রহঃ) আপন গৃহে বসে রইলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে এবং শাসকরা জুলুম করতে শুরু করেছে। এসব দেখে বসে আছি। হযরত ওরওয়া (রাঃ) আকীকে অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে বসে রইলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মসজিদ ত্যাগ করে অট্টালিকায় বসে আছেন? তিনি বললেন ঃ আমি দেখলাম, তোমাদের মসজিদসমূহে ক্রীড়া-কৌতুক হয়, বাজারে এবং গলিতে অশ্লীল অনর্থক কাজ-কারবার চলে। তাই এ পথ অবলম্বন করেছি। এতে এসব বিষয় থেকে মুক্তি আছে। এসব বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, নির্জনবাসের এক উপকারিতা হচ্ছে কলহবিবাদ ও গোলযোগ থেকে নিরাপদ থাকা।

নির্জনবাসের চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, এতে মানুষের জ্বালাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষ কখনও তোমাকে গীবত করে জ্বালাতন করে, কখনও কুধারণাবশতঃ অপবাদ আরোপ করে এবং কখনও এমন প্রার্থনা করে, যা পূর্ণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মেলামেশা করলে তোমার ক্রিয়াকর্ম ও কথাবার্তা তাদের দৃষ্টির সামনে থাকে। যে কাজ ও কথার স্বরূপ তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না, তা স্মরণে রাখে এবং অনিষ্টের সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ করে দেয়। সুতরাং তুমি যদি নির্জনে থাক, তবে এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন হবে না। যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এতে সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করবে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মে শরীক হবে, তার দুশমন অবশ্যই থাকবে। সে গোপনে ষড়যন্ত্র করবে। কেননা, যে অত্যধিক দুনিয়ালোভী, সে অপরকেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। নির্জনবাসে এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। যারা নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন, তাদের উক্তি থেকেও এরূপ আভাস পাওয়া যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে পরীক্ষা করে নাও, যাতে তাকে শত্রু মনে না কর। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নির্জনবাসে কুসঙ্গী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-কে কেউ বলল ঃ ব্যাপার কি, আপনি মদীনা মোনাওয়ারায় গমন করেন না? তিনি বললেন ঃ এখন সেখানে যারা রয়ে গেছে, তারা নেয়ামত দেখে হিংসা করে অথবা অপরের কষ্ট দেখে আনন্দিত হয়। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু আমাকে পত্রে এই বিষয়বস্তু লেখেছে– মানুষ আগে ওষুধ ছিল, যদ্দ্বারা

আমরা চিকিৎসা করতাম। কিন্তু এখন মানুষ এমন ব্যাধি হয়ে গেছে, যার কোন চিকিৎসা নেই। অতএব তাদের কাছ থেকে পলায়ন কর, যেমন সিংহ দেখে পলায়ন করে থাক। জনৈক আরব সদাসর্বদা একটি বৃক্ষের কাছে থাকত এবং বলত ঃ আমার এই সঙ্গী তিনটি স্বভাব রাখে। আমি কথা বললে সে তা অপরের কানে পৌঁছায় না। আমি তার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করলেও সে বরদাশত করে। আমি অশালীন কাজ করলে সে ক্রুদ্ধ হয় না। হযরত হাসান বলেন ঃ আমি হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা করলে খ্যাতনামা ওলীআল্লাহ্ সাবেত বানানী সংবাদ পেয়ে বললেন ঃ আমি আপনার সাথে হজ্জে যেতে চাই। আমি বললাম ঃ মিয়া সাহেব, আল্লাহর দেয়া পর্দার মধ্যে থাকাই আমাদের জন্য উত্তম। আমার আশংকা হয়, এক সাথে থাকলে একের কাছে অপরের এমন অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়বে, যাতে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব উক্তি থেকে নির্জনবাসের আর একটি উপকারিতা জানা যায়। তা হল দ্বীনদারী, সৌজন্য, চরিত্র, ফকিরী ইত্যাদির সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে এবং দোষ গোপন থাকে। মানুষ তার দ্বীন ও দুনিয়ার ক্রিয়াকর্মে এমন দোষ অবশ্যই রাখে, যা গোপন রাখাই ইহকাল ও পরকালে তার জন্যে উপযুক্ত। এই দোষ প্রকাশ হয়ে পড়লে নিরাপত্তা বাকী থাকে না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আগেকার লোক কাঁটাবিহীন পত্র ছিল; কিন্তু আজকালকার লোক পত্রবিহীন কাঁটা। হযরত আবু দারদার যমানা ছিল প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তখন যদি এই অবস্থা হয়, তবে তাঁর পরবর্তীকালে অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মালেক ইবনে দীনারের খেদমতে পৌঁছে দেখি তিনি একাকী বসে আছেন। একটি কুকুর তাঁর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আমি কুকুরটিকে তাড়াতে চাইলে তিনি বললেন ঃ একে কিছু বলো না। সে কাউকে কষ্ট দেয় না। সে কুসঙ্গীর চেয়ে উত্তম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং লোকজন থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তারা উটে আরোহণ করলে উটের পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, ঘোড়ায় সওয়ার হলে তার কোমর ব্যথিত করে এবং ঈমানদারদের অন্তরে স্থান করলে তাকে বিনষ্ট করে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পরিচিতজনের সংখ্যা হ্রাস কর। তোমার অন্তর ও দ্বীনদারী নিরাপদ থাকবে। হক হালকা হবে। কারণ, পরিচিতজন যত বেশী হবে, হকও ততই বেশী হবে এবং সকল হক আদায় করা দুঃসাধ্য হবে। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ যাকে চেন, তার কাছে অপরিচিত হয়ে যাও এবং যাকে

চেন না, তার সাথে আর পরিচয় করো না।

নির্জনবাসের পঞ্চম উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে কেউ তোমার কাছে কিছু আশা করবে না এবং তুমিও অন্যের কাছে আশা করবে না। মানুষের আশা ছিন্ন হওয়া একটি নেহায়েত উপকারী বিষয়। কেননা, মানুষকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর নয়। কাজেই নিজের সংশোধনে ব্যাপৃত থাকাই উত্তম। নিম্নতম ও সহজ হক হচ্ছে জানাযায় যাওয়া, অসুখে-বিসুখে হাল জিজ্ঞেস করা, ওলীমা ও বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হওয়া। এগুলোর মধ্যে আছে অনর্থক সময় নষ্ট করা এবং বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া। মাঝে মাঝে এমনও হয়, মানুষ এগুলোর মধ্যে কতক হক আদায় করতে সক্ষম হয়। ওযর যদিও গ্রহণীয় হয়ে থাকে, কিন্তু কতক ওযর প্রকাশ করার যোগ্য হয় না। ফলে হকদার এ কথাই বলে, তুমি অমুকের হক আদায় করেছ এবং আমার হক আদায় করনি। এটাই শত্রুতার কারণ হয়ে যায়। সেমতে বলা হয়, যে ব্যক্তি রোগীর হাল জিজ্ঞেস করে না, সে চায়, রোগী মারা যাক, যাতে আরোগ্য লাভের পর তার কাছে লজ্জিত হতে না হয়। যে ব্যক্তি কারও সুখে-দুঃখে শরীক হয় না তার প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যে একজনের কাজে শরীক হয় এবং অন্য জনের কাজে শরীক হয় না, তাকে কেউ ভাল বলে না। যদি কেউ দিবারাত্র সর্বক্ষণ হক আদায়ে ব্যাপৃত থাকে, তবুও সকল হক আদায় করতে পারবে না। যার দ্বীন অথবা দুনিয়ার কোন ব্যস্ততা আছে, সে কিরূপে সকল হক আদায় করবে? হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধব বেশী থাকার মানে কর্জদাতা বেশী থাকা; অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধব যত বেশী হবে, তত বেশী হক আদায় করতে হবে। অন্যের কাছ থেকে তোমার আশা বিচ্ছিন্ন হওয়াও কম উপকারী বিষয় নয়। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার বাহার ও সাজসজ্জা দেখে, তার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাসনা থেকে লালসার উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ লালসায় ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ফলে কষ্ট ভোগ করতে হয়। নির্জনবাস অবলম্বন করলে দেখার সুযোগ হবে না। ফলে লোভ-লালসাও হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ -

অর্থাৎ, বিভিন্ন মানুষকে আমি যে ভোগ্যসামগ্রী দান করেছি, তুমি তার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করো না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكُمْ وَلَاتَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَاتَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ, তার দিকে তাকাও, যে তোমার চেয়ে কম এবং তার দিকে তাকিয়ো না, যে তোমার চেয়ে বেশী। এটা তোমার উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে না করার পক্ষে সহায়ক।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি প্রথমে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বসতাম। ফলে সর্বদা মনঃক্ষুণ্ন ও উদাস থাকতাম। এরপর আমি ফকীরদের সংসর্গ অবলম্বন করলাম। এখন বেশ সুখে আছি। কথিত আছে, মুযনী (রহঃ) একদিন ফুসতাতের জামে মসজিদের দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলেন, এমন সময় ইবনে আবদুল হাকাম তার বাহিনী সমভিব্যাহারে সেখান দিয়ে গমন করল। মুযানী তার অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্যে পরীক্ষা করেছি তোমরা সবর কর কি না তা দেখার জন্যে।

মুযনী বললেন ঃ হাঁ আমি সবর করব। তিনি ছিলেন নিঃস্ব ব্যক্তি। মোট কথা, যে আপন গৃহে থাকে, সে এ ধরনের পরীক্ষায় পড়ে না।

নির্জনবাসের ষষ্ঠ উপকারিতা হচ্ছে, এতে অভদ্র ও নির্বোধদেরকে দেখা এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার কষ্টভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরূপ লোকদেরকে দেখা যেন অর্ধেক অন্ধত্ব। আ'মাশকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার চক্ষু ঝলসে গেছে কেন? তিনি বললেন ঃ ঝগড়াটে লোকেদেরকে দেখার কারণে। কথিত আছে, ইমাম আবু হানীফাও আ'মাশের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন, এর বিনিময়ে তাকে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন। আপনি বিনিময়ে কি পেয়েছেন? আ'মাশ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন ঃ চোখের বিনিময়ে আমাকে এই দিয়েছেন যে, আমাকে ভারী লোকদের দেখা থেকে রক্ষা করেছেন। আপনিও তাদের একজন। ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছিল, একবার ভারী ব্যক্তিকে দেখে সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

প্রথমোক্ত উপকারিতা বাদে বাকীগুলো জাগতিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ধর্মের সাথেও এগুলোর সম্পর্ক হতে পারে। কেননা, মানুষ যখন ভারী লোককে দেখে কষ্ট পাবে, তখন তার গীবত করতে শুরু করবে। এটা পরিণামে ধর্মের জন্যে অনিষ্টকর। নির্জনবাসে এসব অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যায়।

অনিষ্ট ঃ এখন আমরা নির্জনবাসের অনিষ্ট বর্ণনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য অপরের সাহায্যে অর্জিত হয়, সেগুলো মেলামেশা ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। বলাবাহুল্য, নির্জনবাস অবলম্বন করলে এ সকল উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে। এগুলোর ফওত হওয়াই নির্জবাসের ক্ষতি। এখন মেলামেশার উপকারিতাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, নির্জনবাসের কারণে এতগুলোর উপকারিতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এগুলোই হচ্ছে নির্জনবাসের অনিষ্ট তথা বিপদ। নিম্নে বিপদগুলো এক একটি করে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

নির্জনবাসের প্রথম বিপদ হচ্ছে, এতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ফওত হয়ে যায়, যার ফযীলত আমরা এলেম অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি। এই উভয় কাজ দুনিয়াতে বড় এবাদতসমূহের অন্যতম। মেলামেশা ছাড়া এগুলো সম্ভবপর নয়। হাঁ, এটা ঠিক যে, শিক্ষার অনেক প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে কতক জরুরী নয়। যে শিক্ষা অর্জন করা মানুষের উপর ফরয, তা যদি না শেখে এবং নির্জনবাস অবলম্বন করে, তবে গোনাহগার হবে। যদি ফরয পরিমাণে শিখে নেয়, এরপর এবাদত করতে মনে চায়, তবে নির্জনবাস করতে দোষ নেই। আর যদি কেউ বর্ণনাগত ও যুক্তিগত সকল শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করার ক্ষমতা রাখে, তার জন্যে সেগুলো শিক্ষা করার পূর্বে নির্জনবাস অবলম্বন করা নেহায়েত ক্ষতির কথা। এ কারণেই ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য বুযুর্গ বলেন ঃ প্রথমে আলেম হও, এরপর নির্জনবাসী হও। যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভের পূর্বে নির্জনবাসী হয়, সে প্রায়ই নিদ্রায় অথবা অন্য কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চিন্তায় আপন মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে। বেশীর বেশী সে সম্পূর্ণ সময় ওযিফার মধ্যে ডুবে থাকে এবং দৈহিক আমল করতে থাকে; কিন্তু অন্তর নানারকম প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তার প্রচেষ্টা নিষ্ফল এবং আমল বাতিল করতে থাকে; অথচ সে টেরও পায় না। সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাতের বিশ্বাসে নানা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে মন ভুলিয়ে রাখে এবং প্রায়ই নানা দুষ্ট কুমন্ত্রণার সম্মুখীন হয়। ফলে সে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং মনে মনে নিজেকে "আবেদ" মনে করতে থাকে। মোট কথা, শিক্ষা ধর্মকর্মের মূল শিকড় এবং অজ্ঞ জনসাধারণ ও মূর্খদের নির্জনবাসে কোন কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নির্জনে এবাদত করার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয় এবং নির্জনে কি কি বিষয় জরুরী, তা জানে না, তার নির্জনবাসে কোন উপকার নেই। কেননা, মানুষের নফস রোগীর মতই বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসার মুখাপেক্ষী। যদি কোন মূর্খ রোগী

চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে থাকে, সে নিঃসন্দেহে কেবল রোগযন্ত্রণাই ভোগ করে যাবে। সুতরাং আলেম ব্যতীত অন্য কারও জন্যে নির্জনবাস সমীচীন নয়। শিক্ষাদান কার্যেও বিরাট সওয়াব আছে, যদি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের নিয়ত সঠিক হয়। এ যুগে আলেমরা যদি ধর্মের নিরাপত্তা কামনা করে, তবে নির্জনবাস অবলম্বন করুক। কেননা, আজকাল এমন কোন শিক্ষার্থী দৃষ্টিগোচর হয় না, যে ধর্মের উপকারের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করে। আজকাল শিক্ষার্থীরা কেবল মসৃণ কথাবার্তা অন্বেষণ করে, যদ্দ্বারা ওয়াযে জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে অথবা সমসাময়িকদেরকে পেছনে ফেলে দেয়ার জন্যে, শাসকবর্গের নৈকট্য লাভের জন্যে এবং গর্ব ও আত্মম্ভরিতার স্থলে ব্যবহার করার জন্যে তারা মুনাযারা তথা বিতর্কের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে। ফেকাহ্ সম্বন্ধীয় রেওয়ায়েতসমূহের উপর ভিত্তি করে ফতোয়াদান শিক্ষা আজকাল সর্বাধিক জনপ্রিয়। কিন্তু প্রায়শঃ সমসাময়িকদের অগ্রে থাকা এবং সরকারী পদ লাভ করে অর্থ সঞ্চয় করাই এ শিক্ষা অর্জনের কারণ হয়ে থাকে। অতএব এ ধরনের শিক্ষার্থীদের থেকে বেঁচে থাকাই ধর্ম ও সাবধানতার দাবী। যদি এমন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়, যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার কাছে শিক্ষা গোপন করা কবীরা গোনাহ। এরূপ শিক্ষার্থী পাওয়া গেলেও বড় বড় শহরে দু'একজনের বেশী পাওয়া যায় না। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আমরা অন্য উদ্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; কিন্তু আমাদের শিক্ষা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উদ্দেশের জন্য নিবেদিত হতে অস্বীকার করেছে। এ উক্তি দ্বারা ধোঁকা খেয়ে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আলেম ব্যক্তি অন্য উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করলেও পরবর্তীতে তারা আল্লাহ্র দিকে রুজু করে। কেননা, অধিকাংশ আলেমের অবস্থা আমাদের সামনেই রয়েছে। তারা দুনিয়ার অন্বেষণেই মৃত্যুবরণ করে এবং এ লালসায়ই জীবনপাত করে। সংসারবিমুখ আলেম খুব কমই দেখা যায়। এখন আমরা শুনা কথার উপর ভরসা করব, না দেখা ঘটনা বিশ্বাস করব। কথায় বলে, শুনা কথা দেখা ঘটনার মত বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। এছাড়া সুফিয়ান সওরী যে শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেটা হচ্ছে হাদীস, তফসীর এবং পয়গম্বর ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত শিক্ষা। এসব শিক্ষা খোদাভীতির কারণ হয়ে থাকে। এগুলো আপাততঃ প্রভাবশালী না হলেও পরবর্তীতে প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কিন্তু কালাম ও ফেকাহ্ শিক্ষা এরূপ নয়। এগুলো যারা দুনিয়া লাভের নিয়তে শিক্ষা করে, তারা আজীবন

দুনিয়ালোভীই থেকে যায়। সম্ভবতঃ এই কিতাবে আমরা যেসব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি, যদি শিক্ষার্থী দুনিয়ালাভের নিয়তেই এগুলো শিক্ষা করে, তবে তাকে অনুমতি দেয়া যায়। কেননা, আশা করা যায়, শেষ বয়সে সে সঠিক পথে ফিরে আসবে। কারণ, এই কিতাব আল্লাহ্ তাআলার ভয় সৃষ্টি করা, আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। এসব বিষয়বস্তু হাদীস ও কোরআনে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। কালাম ও ফেকাহ্ শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় না।

সুতরাং শিষ্য সংখ্যা কম করা এবং নির্জনবাস অবলম্বন করার মধ্যেই সবধানতা নিহিত। যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়তে শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত, তার জন্যে এ যুগে আপন কাজ পরিত্যাগ করাই উত্তম। কেননা, আবু সোলায়মান খাত্তাবী এ যুগের সঠিক চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন– যারা তোমার কাছে বসতে এবং পড়াশুনা করতে আগ্রহী, তাদেরকে বর্জন কর। তুমি তাদের কাছ থেকে অর্থ ও সুনাম কিছুই পাবে না। তারা বাহ্যতঃ বন্ধু হলেও অন্তরে দুশমন। যখন তোমাকে দেখে, তখন খোশামোদ করে এবং পশ্চাতে মন্দ বলে। কাছে এসে তোমার ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে এবং বাইরে গিয়ে তোমার কুৎসা রটনা করে। শিক্ষা অর্জন করা এদের উদ্দেশ্য নয়; বরং জাঁকজমক ও অর্থোপার্জনই এদের লিপ্সা। তারা তোমাকে নিজেদের মতলব হাসিলের সিঁড়ি বানাতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য সাধনে তোমার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তারা তোমার ঘোর শত্রু হয়ে যায়। তারা চায়, তুমি তোমার ইযযত, ধর্ম সব তাদের জন্যে ব্যয় কর। অর্থাৎ, তাদের শত্রুকে শত্রু মনে কর এবং তাদের প্রবঞ্চনায় সাহায্য কর। তাদের মর্জি, তুমি আলেম হয়ে তাদের জন্যে বোকা হও এবং অনুসৃত ও সরদার হয়ে তাদের হীন অনুসারী হও। এ কারণেই বলা হয়, অজ্ঞদের থেকে সরে থাকা পূর্ণ মনুষ্যত্ব।

নির্জনবাসের দ্বিতীয় বিপদ, এতে নিজে উপকার লাভ করা ও পরোপকার করা ফওত হয়ে যায়। নিজে উপকার লাভ করা লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটা মেলামেশা ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব যে ব্যক্তি লেনদেন ও উপার্জনের মুখাপেক্ষী, সে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নির্জনবাস বর্জনকারী হবে। লেনদেনে যদি শরীয়তের নিয়ম কানূন মেনে চলতে চায়, তবে মেলামেশা সুকঠিন হবে। যদি কারও কাছে এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, মিতব্যয়ী হলে যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে তার জন্যে নির্জনবাস উত্তম। কেননা, এখন গোনাহ ছাড়া জীবিকা উপার্জনের কোন পথ নেই। হাঁ, যদি কেউ হালাল উপায়ে উপার্জন করে দান-খয়রাত করতে চায়, তবে

তা সেই নির্জনবাস থেকে উত্তম, যা কেবল নফল এবাদতের জন্যে অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সেই নির্জনবাস থেকে উত্তম নয়, যা আল্লাহর মারেফত ও শরীয়ত শাস্ত্রের গবেষণার জন্যে অবলম্বন করা হয়। পরোপকার অর্থ ব্যয় করে অথবা দৈহিক খেদমতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, খাঁটি নিয়তে পারিশ্রমিক ছাড়া মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানোর অশেষ সওয়াব আছে। কিন্তু মেলামেশা ছাড়া এটা হতে পারে না। অতএব যে মানুষের কাজ করে দিতে সক্ষম, এর সাথে শরীয়তের সীমাও লঙ্ঘন না করে, তার জন্যে মেলামেশা নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম।

নির্জনবাসের তৃতীয় বিপদ, এতে সংশোধিত হওয়া ও সংশোধন করা ফওত হয়ে যায়। সংশোধিত হওয়া দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য নফসের সাধনা করা এবং মানুষের জ্বালাতন সহ্য করা, যাতে নফস শিথিল হয়ে যায় এবং কামভাব দমিত হয়। নফসের এরূপ হওয়াও মেলামেশা ছাড়া হতে পারে না। যার চরিত্র মার্জিত নয় এবং কামভাব শরীয়তের সীমার অনুগত নয়, তার জন্যে নির্জনবাসের চেয়ে মেলামেশা উত্তম। এ কারণেই খানকায় যারা সূফীদের খেদমত করে, তারা এ কাজটি ভাল বুঝে। মানুষের কাছে সওয়াল করার কারণে তাদের নফসের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যায় এবং সূফীগণের দোয়া দ্বারা বরকত লাভ হয়। অতীত যুগের শুরুতে এ খেদমতের এটাই ছিল কারণ। এখন এতে কুউদ্দেশ্য শামিল হয়ে গেছে। এখন খেদমতের জন্যে বলার কারণ হচ্ছে অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনেক ধনসম্পদ লাভ করা। যদি খেদমতের নিয়ত তাই হয়, তবে এর চেয়ে নির্জনবাসই উত্তম, যদিও কোন কবরের কাছে হয়। আর যদি বাস্তবেই নফসের অহমিকা দূর করার নিয়ত থাকে, তবে সে সাধনার মুখাপেক্ষী, তার জন্যে এই খেদমত নির্জনবাসের তুলনায় উত্তম। আধ্যাত্ম পথের শুরুতে সাধনার প্রয়োজন হয়। সাধনা অর্জিত হওয়ার পর এটা বুঝতে হবে যে, ঘোড়াকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশেই শিক্ষা দেয়া হয় না; বরং পথ অতিক্রমের জন্যে সওয়ারী করা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়ার জন্যে শিক্ষা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মানুষের দেহ তার অন্তরের সওয়ারী। এতে সওয়ার হয়ে অন্তর আখেরাতের পথ অতিক্রম করে। এতে অনেক কামনা-বাসনা আছে বিধায় সওয়ারী পথিমধ্যে অবাধ্য হয়ে যেতে পারে। তাই সাধনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সওয়ারীই। সুতরাং কেউ যদি সারা জীবন সাধনার মধ্যে অতিবাহিত করে দেয়, তবে সে হবে সেই ব্যক্তির মত, যে সারা জীবন ঘোড়াকে শিক্ষা দেয় এবং তার

পিঠে সওয়ার হয়ে পথ অতিক্রম করে না। এমতাবস্থায় ঘোড়ার শিক্ষিত হওয়ার উপকার এটাই হবে যে, সে ঘোড়ার কামড় ও লাথি মারা থেকে নিরাপদ থাকবে। যদিও এ উপকারটিও উদ্দেশ্য; কিন্তু এরূপ উপকার তো মৃত জন্তু থেকেও অর্জিত হয়। ঘোড়া তো রাখা হয় সেটির দ্বারা জীবনে কিছু কাজ নেয়ার জন্যে। এমনিভাবে দেহের কামনা বাসনা থেকে মুক্তি তো নিদ্রা ও মৃত্যু দ্বারাও অর্জিত হয়। কিন্তু কেবল কামনা বাসনা বর্জনই উদ্দেশ্য নয়; বরং এরপর আখেরাতের পথ অতিক্রম করাও উদ্দেশ্য। সুতরাং কামনা বাসনা বর্জন ও কেবল সাধনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের উচিত নয়। কাজেই সাধনার পর কি করতে হবে, সেটা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে এসে নির্জনবাস তার জন্যে মেলামেশার তুলনায় অধিক সহায়ক হবে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির জন্যে শুরুতে মেলামেশা উত্তম এবং পরিণামে নির্জনবাস উত্তম।

সংশোধন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অপরকে সাধনায় লিপ্ত করা; যেমন মুরশিদগণ সূফীগণের সাথে করে থাকেন। এটাও মেলামেশা ছাড়া হতে পারে না। অর্থাৎ মুরশিদ যে পর্যন্ত মুরীদদের সাথে মেলামেশা না করে, তাদের সংশোধন করতে সক্ষম হবে না।

নির্জনবাসের চতুর্থ বিপদ, এতে অপরের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ সঙ্গ হাসিল করা ও অপরকে বন্ধুসুলভ সঙ্গ দেয়া ফওত হয়ে যায়। এটা সেই ব্যক্তির কাম্য হয়, যে ওলীমা, ভোজসভা ও মনোরঞ্জনের জায়গায় যায় না। এর পরিণাম বিলাসগত আনন্দ এবং কখনও ধর্মপরায়ণতাও হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মাশায়েখের কাছ থেকে সঙ্গ হাসিল করে এ কারণে যে, তারা সর্বদা খোদাভীতি ও পরহেযগারীর মধ্যে মগ্ন থাকে। কাজেই তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা দেখে বন্ধুসুলভ সঙ্গ লাভ করা মোস্তাহাব।

নির্জনবাসের পঞ্চম বিপদ, মানুষ নিজে সওয়াব পাওয়া ও অপরকে সওয়াব পৌঁছানো থেকে বঞ্চিত থাকে। নিজে সওয়াব পাওয়ার উপায় হচ্ছে জানাযায় যাওয়া, রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা, ঈদের নামাযে শরীক হওয়া, জুমুআয় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। যে নির্জনবাস করে, তার জন্যে সকল নামাযের জামাতে যোগদান করা জরুরী। জামাত বর্জন করার অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। হাঁ, জামাতের সওয়াব না পাওয়ার সমতুল্য কোন বাহ্যিক ক্ষতির আশংকা থাকলে জামাত বর্জন করা যায়। কিন্তু এরূপ কমই হয়ে থাকে। অপরকে সওয়াব পৌঁছানোর উপায়, নিজের দরজা খোলা রাখবে, যাতে রুগ্ন অবস্থায় মানুষ এসে তার হাল

জিজ্ঞেস করে এবং বিপদে সান্ত্বনা ও আনন্দে মোবারকবাদ দেয়। কেননা, এতে মানুষ সওয়াব পায়।

নির্জনবাসের ষষ্ঠ বিপদ, এতে বিনয় ফওত হয়ে যায়। নির্জনতা অবলম্বনের কারণ কখনও অহংকারও হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈলের জনৈক দার্শনিক দর্শন শাস্ত্রে তেষট্টিটি পুস্তক রচনা করেছিল। এরপর তার ধারণা হল, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তার নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, অমুক ব্যক্তিকে বলে দাও সে তার বকবক দ্বারা সারা পৃথিবী ভরে দিয়েছে। আমি এর মধ্য থেকে কিছুই কবুল করি না। দার্শনিক নির্জনবাস অবলম্বন করল এবং মাটির নিচে কুঠরীতে চলে গেল। অতঃপর মনে মনে বলল ঃ আমি এবার পরওয়ারদেগারের মহব্বতে পৌঁছে গেছি। আল্লাহ তাআলা নবীর প্রতি আবার ওহী পাঠালেন, তাকে বলে দাও, সে আমার সন্তুষ্টি পাবে না যে পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা এবং তাদের জ্বালাতন সহ্য না করে। অতঃপর সে মানুষের সাথে মেলামেশা করল, তাদের কাছে বসল, সঙ্গে আহার করল এবং বাজারে ঘুরাফেরা করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন, তাকে বলে দাও, সে আমার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, কিছু লোকের নির্জনবাসের কারণ অহংকারই হয়ে থাকে। তারা এজন্যে মজলিসে যায় না যে, কেউ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না এবং অগ্রে বসাবে না। কিংবা তারা মনে করে, মানুষের সাথে মেলামেশা না করলে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। কিছু লোক এ জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করে যে, মেলামেশার কারণে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং দরবেশী ও এবাদতের যে বিশ্বাস তাদের প্রতি রয়েছে, তা খতম হয়ে যাবে। ফলে তারা তাদের গৃহকে আপন কুকর্মের জন্যে আড়াল করে নেয়। তারা গৃহে কোন সময়ই যিকির ফিকিরে ব্যয় করে না। তাদের পরিচয় হচ্ছে, স্বয়ং কারও কাছে যাওয়া পছন্দ করে না; কিন্তু অন্যরা তাদের কাছে আসুক, এটা খুব কামনা করে। বরং জনসাধারণ ও আমীর ওমরারা তাদের দরজায় সমবেত হলে এবং তাদের হস্ত চুম্বন করলে তারা অত্যন্ত খুশী হয়। এসব লোক যদি এবাদতে মশগুল থাকার কারণে মেলামেশা ঘৃণা করত, তবে নিজের যাওয়া যেমন তাদের কাছে ভাল মনে হত না, তেমনি অপরের আগমনও তারা অপছন্দ করত; যেমন ফোযায়ল (রহঃ)-এর অবস্থা এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে, তিনি বন্ধুকে দেখে বললেন ঃ তুমি শুধু এ জন্যে এসেছ যে, আমি তোমার সামনে সেজে বসে থাকি

এবং তুমি আমার সামনে। অথবা যেমন হাতেম আসাম্ম তাঁর সাথে সাক্ষাৎকামী আমীরকে বলেছিলেন ঃ আমার প্রয়োজন, না আমি তোমাকে দেখব, না তুমি আমাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি একাকিত্বে আল্লাহর যিকিরে মশগুল নয়, তার নির্জনবাসের কারণ এটাই যে, সে অতি মাত্রায় মানুষের সাথে মশগুল আছে; অর্থাৎ তার মন চায়, মানুষ তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখুক। এরূপ নির্জনবাস কয়েক কারণে মূর্খতা। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শিক্ষা ও ধর্মকর্মে বড় হয়, মেলামেশা ও বিনয়ের কারণে তার মর্যাদা হ্রাস পায় না। সেমতে হযরত আলী (রাঃ) খোরমা ও লবণ বাজার থেকে আপন কাপড়ে ও হাতে বহন করে আনেন। হযরত আবূ হোরায়রা, হোযায়ফা, উবাই ইবনে কাব ও ইবনে মসউদ (রাঃ) খড়ির বোঝা ও আটার পুটলি কাঁধে বহন করে আনতেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) যখন শাসনকর্তা ছিলেন, তখন খড়ির বোঝা মাথায় বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন– তোমাদের আমীরকে পথ দাও। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওদা ক্রয় করতেন এবং নিজেই গৃহে নিয়ে যেতেন। কোন কোন সাহাবী আরজ করতেন, আমার হাতে দিন। আমি নিয়ে যাই। তিনি বলতেন ঃ বস্তুর মালিক তা নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার। হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ভিক্ষুকদের কাছ দিয়ে গমন করতেন। তারা রুটির টুকরা ভক্ষণ করত এবং বলত সাহেবজাদা! থামুন, আমাদের সাথে আহার করুন। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং পথে বসে তাদের সাথে আহার করতেন। এরপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ যারা মানুষের সন্তুষ্টি ও ভক্তিশ্রদ্ধা কামনা করে, তারা বিভ্রান্ত। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থ চিনতে পারলে বুঝতে পারবে, মানুষ দ্বারা কোন কিছু হয় না। লাভ-লোকসান, উপকার ক্ষতি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। সহল তস্তরী তাঁর জনৈক মুরীদকে বললেন ঃ তুমি অমুক আমল কর। মুরীদ বলল ঃ লোকলজ্জার কারণে আমি এটা করতে পারি না। তিনি সকল মুরীদকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ দু'টি গুণের মধ্য থেকে একটি গুণে গুণান্বিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ মারেফতের স্বরূপ জানতে পারে না– হয় মানুষ তার দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে এবং দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারকে ছাড়া কাউকে দেখবে না, অন্য কাউকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে করবে না; না হয় তার নফস তার অন্তরের সামনে তুচ্ছ হয়ে যাবে। মানুষ কি

অবস্থায় তাকে দেখবে, এ ব্যাপারে সে নফসের পরওয়া করবে না। হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ এমন কেউ নেই, যার বন্ধু ও শত্রু নেই। অতএব যে আল্লাহ্র অনুগত তার সাথে থাকা ভাল। হযরত হাসান বসরীকে কেউ বলল ঃ আপনার মজলিসে কিছু লোক আসে। উদ্দেশ্য, আপনি ওয়াযে কোথায় কোথায় ভুল করেন তা লক্ষ্য করতে এবং আপনাকে প্রশ্ন করে করে বিরক্ত করতে। তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ এটা খারাপ মনে করো না। আমি আমার নফসকে জান্নাতে থাকা এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে রেখেছি। আমি এ বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী। আমি কখনও বলিনি যে, মানুষের মুখ থেকে অক্ষত থাকব। কারণ, আমি জানি, আল্লাহ্ তাআলা যিনি মানুষের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা এবং মৃত্যুদাতা, তিনিও মানুষ থেকে অক্ষত নন। অতএব আমি অক্ষত থাকব কিরূপে? হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন ঃ ইয়া রব, মানুষের রসনাকে আমা থেকে ফিরিয়ে রাখ। আদেশ হল ঃ হে মূসা, এটা তো এমন বিষয়ের প্রার্থনা, যা আমি নিজের জন্যে পছন্দ করিনি– তোমার জন্যে কিরূপে করব? আল্লাহ্ তাআলা হযরত ওযায়র (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠান- আমি তোমাকে মানুষের মুখে মেসওয়াকের মত করব, তারা তোমাকে চর্বণ করবে– এটা যদি তুমি পছন্দ না কর, তবে তোমাকে আমার কাছে বিনয়ীদের মধ্যে লেখব না। সারকথা, মানুষ ভাল বিশ্বাস রাখুক, সাধু বলুক, এ উদ্দেশে যে ব্যক্তি নিজেকে গৃহে আবদ্ধ রাখে, সে দুনিয়াতেও ক্লেশ ভোগ করে এবং আখেরাতেও আযাব থেকে নিস্তার পাবে না। নির্জনবাস এমন ব্যক্তির জন্যেই মোস্তাহাব, যে সদা-সর্বদা পরওয়ারদেগারের যিকির, ফিকির, এবাদত ও মারেফতে ডুবে থাকে।

নির্জনবাসের সপ্তম বিপদ, এতে অভিজ্ঞতা ফওত হয়ে যায়, যা মানুষের সাথে মেলামেশা ও তাদের প্রাত্যহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি-বিবেক, ইহকাল ও পরকালের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং উপযোগিতা অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পটু নয়; তার নির্জনবাসে কোন কল্যাণ নেই। তাই প্রথমে লেখাপড়া শিখতে হবে। এ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যাবে এবং এতটুকু যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট অভিজ্ঞতা পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনার মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে– মেলামেশার প্রয়োজন নেই। যেসকল অভিজ্ঞতা অধিক জরুরী, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের নফ্স, চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ পরীক্ষা করা। এটা নির্জনতায় হতে পারে না। উদাহরণতঃ যার মধ্যে হিংসা

বিদ্বেষ আছে, সে নির্জনে বাস করলে তার হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে না। মানুষের এসব গুণাগুণ অত্যন্ত মারাত্মক, যা পরীক্ষার মাধ্যমে দূর করা ওয়াজিব। যেসব কারণে হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো থেকে দূরে থেকে হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিকার সম্ভব নয়। কেননা, হিংসা বিদ্বেষের গুণাগুণসম্পন্ন অন্তর ফোঁড়া সদৃশ, যার মধ্যে পুঁজ ও রক্ত ভর্তি থাকে। ফোঁড়া নাড়া না দিলে কিংবা হাত না লাগালে ফোঁড়ার ব্যথা অনুভব হবে না। এখন যদি নাড়া দেয়ার কোন লোক ফোঁড়ার কাছে না থাকে, তবে যার ফোঁড়া, সে নিজেকে সুস্থই মনে করবে, কিন্তু কেউ নাড়া দিলে ফোঁড়া থেকে পুঁজ ও দূষিত পদার্থ বের হতে থাকবে; যেমন আবদ্ধ পানি ফোয়ারা দিয়ে বের হতে থাকে। এমনিভাবে যে অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, কৃপণতা, ক্রোধ ও অন্যান্য কুচরিত্র ভর্তি থাকে, সেই অন্তরকে নাড়া দিলেই এসব কুচরিত্র ফুটে উঠতে থাকে। এ কারণেই যারা আধ্যাত্ম পথের পথিক, তারা আপন নফসের পরীক্ষা নিতেন। পরীক্ষার পর যদি নফসের মধ্যে অহংকার দেখতেন, তবে পানির মশক কোমরে বেঁধে অথবা খড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে ফিরতেন, যাতে নফস থেকে অহংকার দূর হয়ে যায়। মোট কথা, নফসের বিপদ ও শয়তানের চক্রান্ত গোপন থাকে। খুব কম লোকই এগুলো জানে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ত্রিশ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছিলেন; অথচ এগুলো তিনি জামাতের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আদায় করেছিলেন। এই পুনরায় পড়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ একদিন আমি ওযরবশতঃ পেছনে পড়ে গেলাম এবং প্রথম সারিতে স্থান পেলাম না। আমি দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ালাম। পেছনে পড়ার কারণে কিছু লোক আমার দিকে তাকাচ্ছিল। এতে আমার নফস লজ্জা অনুভব করছিল। তখন আমি জানলাম, আমার অতীত নামাযগুলো রিয়া মিশ্রিত ছিল। সারকথা, মেলামেশার একটি বড় ও সুস্পষ্ট উপকারিতা হচ্ছে, এতে নিন্দনীয় গুণসমূহ জানা হয়ে যায়। এ জন্যেই বলা হয়, সফর চরিত্র প্রকাশ করে দেয়। কেননা, সফরও এক প্রকার মেলামেশা– যা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়।

নির্জনবাসের উপকারিতা ও বিপদাপদ জানার পর একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নির্জনবাস উত্তম কিংবা উত্তম নয়– সর্বাবস্থায় একথা বলা নিতান্তই ভুল; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার অবস্থা, তার সঙ্গী ও সঙ্গীর অবস্থা দেখা উচিত। আরও দেখা উচিত, মেলামেশার কারণ কি এবং মেলামেশার কারণে কোন্ কোন্ উপকারিতা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং কি উপকার পাওয়া যাবে? এরপর উপকার ও ক্ষতি তুলনা করতে হবে। তখন

গিয়ে সত্য বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে এবং কোন্টি উত্তম তা জানা যাবে। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য চূড়ান্ত মীমাংসা। তিনি বলেন ঃ হে ইউনুস, মানুষের কাছে সংকুচিত হয়ে থাকা শত্রুতার কারণ এবং তাদের সাথে অধিক খোলামেলা থাকা অসৎ সঙ্গী সৃষ্টি করে। অতএব এমনভাবে থাকা উচিত, না সংকুচিত, না খোলামেলা। শেখ সা'দী (রহঃ) বলেন ঃ

نه چند ان درشتی کن که از تو سیر
گردندنه چند ان نرمی که برتو دلیر

অর্থাৎ, মানুষের সাথে এতটুকু কঠোরতা করো না যে, তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং এতটুকু নম্রতাও করো না যে, তোমার মাথায় চড়ে বসে।

মোট কথা, মেলামেশা ও নির্জনবাসের মধ্যে সমতা আবশ্যক। এটা অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে এবং উপকারিতা ও বিপদাপদ দেখে নিলে উত্তম পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সত্য ঠিক এটাই। এছাড়া কেউ কেউ যা বলেছে, তা অসম্পূর্ণ; বরং প্রত্যেকেই এমন বিশেষ অবস্থা উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে সে নিজে রয়েছে। অন্য ব্যক্তি, যে এ অবস্থার মধ্যে নয়, তার সম্পর্কে একথা বলা ঠিক হবে? বাহ্যিক শিক্ষায় সুফী ও আলেমের মধ্যে এটাই পার্থক্য। সুফী সেই বক্তব্যই পেশ করে, যে অবস্থার মধ্যে সে নিজে থাকে। এ কারণে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সুফীদের জওয়াব বিভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে আলেম বাস্তব ক্ষেত্রে যা সত্য, তাই উদঘাটন করে এবং নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে না। এ কারণে আলেম যা বলে, তাই সত্য হয়। এতে বিরোধের অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা, সত্য সর্বদা একই হবে আর অসত্য অনেক হয়ে থাকে। এসব কারণেই সুফী বুযুর্গগণকে যখন দরবেশী কি, জিজ্ঞেস করা হল, তখন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব দিলেন। সেই জওয়াব যদিও জওয়াবদাতার অবস্থানুসারে সত্য; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কেননা, সত্য তো এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ আবু আবদুল্লাহ্কে দরবেশী কি, জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ নিজের উভয় আস্তিন প্রাচীরে মেরে বলা- আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা, এটাই দরবেশী। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) এর জওয়াবে বলেন ঃ দরবেশ সে ব্যক্তি, যে সওয়াল করে না এবং কারও অসুবিধা সৃষ্টি করে না। তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে সে চুপ হয়ে যায়। সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ দরবেশ সেই ব্যক্তি, যে সওয়াল করে না এবং সঞ্চয় করে না।

অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ দরবেশী হচ্ছে তোমার কাছে কিছু না থাকা। কোন সময় থাকলেও তাকে নিজের মনে না করা। ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ দরবেশী হচ্ছে অভিযোগ না করা এবং নেয়ামত প্রকাশ করা। উদ্দেশ্য, যদি একশ' জনকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে একশ'টি ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ দু'টি জওয়াবও একরকম হবে না। কিন্তু কোন না কোন দিক দিয়ে সবগুলো জওয়াবই সঠিক হবে। কেননা, প্রত্যেকের জওয়াব তার অবস্থার বর্ণনা হবে। এ কারণেই এ সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তি এমন দেখা যাবে না, যাদের একজন অপরজনকে সুফীবাদে সুদৃঢ় বলে এবং তার প্রশংসা করে; বরং প্রত্যেকেই দাবী করে, সেই প্রকৃত সত্যের সাধক। কিন্তু শিক্ষার নূর যখন চমকে উঠে, তখন সবকিছু বেষ্টন করে নেয় এবং গোপনীয়তার পর্দা ফাঁস করে দেয়। কোন মতবিরোধ থাকতে পারে না। সুফীগণের মতবিরোধের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমরা সূর্য ঢলে পড়ার সময় আসল ছায়া সম্পর্কে নানাজনের নানা উক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। কেউ বলে গ্রীষ্মকালে ছায়া দুকদম হয়। কেউ বলে অর্ধেক কদম হয়। কেউ এতে আপত্তি করে বলে শীতকালে সাত কদম হয়। আবার কেউ পাঁচ কদম বলে। সূফীগণের জওয়াবের অবস্থাও তেমনি। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শহরের আসল ছায়া দেখে জওয়াব দেয়। এটা সঠিক; কিন্তু অপরের জওয়াবকে ভুল আখ্যা দেয়া অন্যায়। কেননা, সে সারা বিশ্বকে নিজের শহর অথবা তার মত মনে করে নেয়। আলেম ব্যক্তি জানে, ছায়া কি কারণে ছোট বড় হয় এবং বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন হয়? নির্জনবাস ও মেলামেশার ফযীলত সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এখন যদি কেউ নির্জনবাসকে নিজের জন্যে শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর নিরাপদ মনে করে, তবে তার জন্যে নির্জনবাসের আদব কি, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিচ্ছি। প্রথমে নিয়ত করতে হবে, তার দ্বারা যেন অন্যের কোন অনিষ্ট না হয়। দ্বিতীয়, মানুষের যোগদান থেকে নিরাপদ থাকার নিয়ত করবে। তৃতীয়, মুসলমানদের হক আদায়ে ক্রটি থেকে মুক্তির নিয়ত করবে। চতুর্থ, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর এবাদতের জন্যে মুক্ত হওয়ার নিয়ত করবে। এভাবে নিয়ত করার পর নির্জনে এলেম, আমল ও যিকির ফিকিরে আত্মনিয়োগ করবে। মানুষকে অধিক আসা যাওয়া করতে বারণ করবে। নতুবা অধিকাংশ সময় একাগ্রতা হবে না। শহরের খবরাখবর শুনবে না। কেননা, খবরাখবর কানে পড়া এমন, যেমন মাটিতে বীজ পড়া, যা অবশ্যই অংকুরিত হয় এবং শিকড় ও ডালাপালা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে খবরও মনের মধ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে

এবং নানা কুমন্ত্রণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কুমন্ত্রণা থেকে অন্তর মুক্ত হওয়া নির্জনবাসের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। অল্প জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অধিক জীবিকা পেতে চাইলে বাধ্য হয়ে মেলামেশা করতে হবে। প্রতিবেশীদের জ্বালাতনে সবর করতে হবে। তারা যদি নির্জনবাসের কারণে প্রশংসা করে অথবা মেলামেশা বর্জন করার কারণে তিরস্কার করে, তবে কিছুই শুনবে না এবং আপন ধ্যানে মগ্ন থাকবে। কেননা, এসব বিষয় অল্প শুনলেও অনেক ক্ষতি করে। কোন ওযিফা পাঠ কিংবা যিকির করার সময় মনকে উপস্থিত রাখবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতাপ, গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে ফিকির করবে অথবা আমলের সূক্ষ্মতা ও মনের রিপুগুলোর কথা চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এগুলোকে দমন করতে সচেষ্ট হবে। গৃহের কোন লোক অথবা একজন সৎসঙ্গীও থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে নির্জনবাসী দিনে এক ঘন্টা তার সাথে মনোরঞ্জন করে এবং উপর্যুপরি মেহনত থেকে স্বস্তি লাভ করে। নির্জনবাসে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করতে হবে। একাকিত্বে মনে বিরক্তি দেখা দিলে মনে করবে, কবরে কে সাথে থাকবে? সেখানেও তো একা থাকতে হবে। যে আল্লাহ্র যিকির ও মারেফতের সঙ্গ লাভ করে, মৃত্যুর পরও তার এই সঙ্গ বিনষ্ট হয় না; বরং এই সঙ্গের কারণে সে জীবিত ও প্রফুল্ল থাকে যেমন– শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে শহীদ হয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত– পালনকর্তার রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ তাদেরকে দান করেছেন, তজ্জন্যে তারা প্রফুল্ল। আল্লাহ্র জন্যে মেহনতকারী ব্যক্তিও মৃত্যুর পর শহীদ হয়। কেননা, সে-ই মুজাহিদ, যে আপন নফস ও খাহেশের বিরুদ্ধে জেহাদ করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ নফসের জেহাদই বড় জেহাদ। সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি; অর্থাৎ, নফসের জেহাদের দিকে।

সপ্তম অধ্যায়

সফর ও তার আদব

প্রকাশ থাকে যে, সফর ঘৃণার বস্তু থেকে নিষ্কৃতির উপায় এবং কাম্য বস্তু পাওয়ার মাধ্যমে। সফর দু'প্রকার- এক, বাহ্যিক শারীরিকভাবে স্বদেশ থেকে আলাদা হয়ে নির্জন প্রান্তরে ভ্রমণ করা এবং দুই, অন্তরগত সফর; অর্থাৎ, অন্তরের মর্ত্যলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করা। উভয় প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার সফর উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি জন্মাবস্থার উপর স্থির থাকে এবং বাপদাদার কাছ থেকে যা শিখেছে তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ত্রুটি ও লোকসানের স্তরেই সন্তুষ্ট থাকে এবং জান্নাতের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের বিনিময়ে বর্বরতার অন্ধকার প্রকোষ্ঠই বেছে নেয়।

এ সফরে প্রবেশ করা সুকঠিন বিধায় এর জন্যে কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী দরকার। কিন্তু একে তো পথ অজ্ঞতার, দ্বিতীয়তঃ কোন পথপ্রদর্শক নেই, তাই এ পথে কোন ভ্রমণকারী নেই এবং দিগন্ত ও ঊর্ধ্ব জগতের বিচরণ ক্ষেত্রে কোন বিচরণকারী নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ পথের দিকেই আহ্বান করেন। তিনি বলেন ঃ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ আমি দেখিয়ে দেব তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। অন্যত্র বলেন ঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমরা কি দেখ না? এ সফর থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ঃ

إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছ দিয়ে গমন কর সকাল বেলায় এবং রাত্রে। তোমরা কি বুঝ না এবং এ আয়াতেও-

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ -

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যেগুলোর কাছ দিয়ে তারা গমন করে। কিন্তু এগুলোতে ধ্যান দেয় না।

এই সফর যে ব্যক্তির নসীব হয়, সে শারীরিকভাবে নিজ দেশে এবং বাসস্থানেই থাকে; কিন্তু অন্তর দ্বারা জান্নাতের সুবিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে। এ সফরের ঝরণায় ও ঘাটে ভয় সংকীর্ণতা নেই এবং অধিক ভিড়ের কারণে কোন ক্ষতি হয় না; বরং যাত্রীদের সংখ্যা বেশী হলে এর ফলাফল ও উপকারিতা বেশী হয়। এর চিরস্থায়ী ফলাফল থেকে কাউকে বাধা দেয়া হয় না এবং ক্রমবর্ধমান উপকারিতা থেকে নিষেধ করা হয় না। কোন যাত্রী নিজে অলসতা করলে অথবা নড়াচড়ায় বিরতি দিলে সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।

যারা দৈহিকভাবে সফর করে, তাদের সফরের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় জ্ঞানার্জন এবং ধর্মকর্মে সহায়তা লাভ হয়, তবে তারা আখেরাতের পথিক বলে গণ্য হবে। এরূপ সফরের কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করলে সফরকারী দুনিয়াদার ও শয়তানের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে এগুলোর প্রতি সদাসর্বদা লক্ষ্য রাখলে সফরকারী এমন উপকারিতা লাভ করবে, যদ্দরুন সে আখেরাত অন্বেষণকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। নিম্নে আমরা সফরের আদব ও শর্তসমূহ দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদব, নিয়ত ও উপকারিতা

সফর এক প্রকার গতিশীলতা ও মেলামেশার নাম। এতে অনেক উপকারিতা ও বিপদাপদ আছে। মানুষ সফর এ জন্যে করে যে, কোন বস্তু তাকে সজোরে স্বস্থান থেকে বের করে দেয়। সেই বস্তু না থাকলে সে সফর করত না। অথবা সফর করার কারণ কোন উদ্দেশ্য কিংবা কাম্য বস্তু অর্জন করা হয়ে থাকে। যে বস্তু থেকে পালিয়ে সফর করা হয়, তা কোন পার্থিব বিষয় হবে; যেমতে শহরে প্লেগ ও মহামারী থাকা কিংবা ফেতনা ও গোলযোগ থাকা, খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হওয়া ইত্যাদি। অথবা সেই বস্তু ধর্ম সম্পর্কিত হবে। উদাহরণতঃ শহরে থাকলে জাঁকজমক ও অর্থলিপ্সার সাথে জড়িত হয়ে পড়া। এ কারণেও শহর ত্যাগ করা উচিত। যে বস্তু অর্জন করার জন্যে সফর করা হয় তাও হয় পার্থিব হবে, যেমন অর্থসম্পদ ও প্রতিপত্তির অন্বেষণ, অথবা ধর্ম সম্পর্কিত হবে। এটা হয় এলেম হবে, না হয় আমল। এলেম তিন প্রকার– এক, ফেকাহ্, হাদীস, তফসীর ইত্যাদির এলেম। দুই, চরিত্র ও গুণাবলীর এলেম। তিন, পৃথিবীর নিদর্শন ও আশ্চর্য বিষয়সমূহের এলেম; যেমন যুলকারনাইন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করেছিলেন। আমল দুই প্রকার– এক এবাদত; যেমন হজ্জ, ওমরা ও জেহাদের সফর। দুই, যিয়ারতের সফর; যেমন মক্কা মদীনা ও বায়তুল মোকাদ্দাসের সফর। কখনও ওলী ও আলেমগণের যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা হয়। জীবিত থাকলে তাঁদেরকে দেখা বরকতের কারণ হয় এবং তাঁদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে তাঁদেরকে অনুসরণের আগ্রহ জোরদার হয়। মৃত হলে তাঁদের কবর যিয়ারত করা হয়। এই বক্তব্য অনুযায়ী সফরের যত প্রকার বের হয়, নিম্নে সবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকার– এলেমের জন্যে সফর করা। ফরয এলেমের জন্যে সফর করলে সফরও ফরয হবে এবং নফল এলমের জন্যে সফর করলে সফরও নফল হবে। উপরে এলেমের তিন প্রকার বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে যেকোন একটির জন্যে সফর করলে সওয়াব পাওয়া যাবে। ফেকাহ্, হাদীস, তফসীর ইত্যাদি ধর্মীয় এলেম সম্পর্কে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

অর্থাৎ, যে আপন গৃহ থেকে এলেমের অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে থাকে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ -

অর্থাৎ, যে এলেমের অন্বেষণে পথ চলে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রহঃ) একটি হাদীসের খোঁজে অনেক দিনের সফর করতেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) দশ জন সাহাবীসহ মদীনা থেকে মিসরে সফর করেছিলেন। কেননা, তিনি শুনেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীস আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সেমতে একমাস সামনে হেঁটে তিনি এ হাদীসটি শুনলেন। সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে আমাদের আমল পর্যন্ত এমন আলেম কমই হবেন, যাঁরা এলেম হাসিল করার জন্যে সফর করেননি।

আপন নফস ও চরিত্রের এলেমও জরুরী। কেননা, অভ্যাস সংশোধন ও চরিত্র গঠন ছাড়া আখেরাতের পথে চলা সম্ভবপর নয়। যে নিজের অন্তরের ভেদ ও গুণাগুণের অনিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে না, সে অন্তরকে এগুলো থেকে পবিত্র করবে কিরূপে? সফর তাকেই বলে, যদ্দ্বারা চরিত্র প্রকাশ পায়। কারণ সফর শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ হওয়া। চরিত্র প্রকাশ পায় বলেই একে সফর বলা হয়েছে। তাই হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি যখন কোন সাক্ষীর পরিচয় বর্ণনা করল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার সাথে কোন দিন সফর করেছ? সে বলল ঃ না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমার জানামতে তুমি তার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নও। বিশর (রহঃ) বলতেন ঃ কারীগণ, সফর কর, যাতে পবিত্র হয়ে যাও। কারণ, পানি যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন পবিত্র হয়ে যায়। আর অনেক দিন এক জায়গায় স্থির থাকলে বদলে যায়। সারকথা, মানুষ যতদিন দেশে থাকে ততদিন অভ্যস্ত বিষয়সমূহের সাথেই পরিচিত থাকে; খারাপ চরিত্র প্রকাশ পায় না। কেননা, মনের বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগই হয় না। আর যখন সফরের কষ্টভোগ করে এবং অভ্যস্ত বিষয়সমূহের মধ্যে পরিবর্তন দেখে, তখন চরিত্রের গোপন বিষয়সমূহ উদঘাটিত হয়ে যায় এবং দোষ গুণ ধরা পড়ে। ফলে প্রতিকার করা সম্ভবপর হয়। এ ছাড়া সফরে আল্লাহ্ তা'আলার

নিদর্শনাবলী তথা পরস্পরে মিলিত বিভিন্ন স্থান, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, রকমারি জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোর মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কারণ, এদের প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দান করে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু এই সাক্ষ্য ও তসবীহ্ সে-ই বুঝে, যে কান লাগায় এবং উপস্থিত অন্তর দিয়ে শুনে। নতুবা দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমোহিত অবিশ্বাসী ও গাফেলরা এগুলো দেখেও না, শুনেও না। কারণ তেমন কান ও চোখ তাদের নেই। কোরআনের ভাষায় তাদের অবস্থা এই ঃ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক অংশটা জানে। পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ বেখবর। আরও বলা হয়েছে- إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ তারা শ্রবণ থেকে বিচ্যুত। এখানে বাহ্যিক শ্রবণ উদ্দেশ্য নয়। কারণ বাহ্যিক শ্রবণ থেকে তারা বিচ্যুত ছিল না। বাহ্যিক শ্রবণ দ্বারা আওয়ায ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। এক্ষেত্রে মানুষের কোন বিশেষত্ব নেই; বরং সকল জীবজন্তু আওয়ায শুনে। কিন্তু অন্তরের কান দ্বারা অবস্থার ভাষা শুনা যায়, যা মুখের ভাষা থেকে ভিন্ন। যেমন– কেউ বাবুই পাখী ও চড়াইয়ের কিস্‌সা বর্ণনা করে যে, বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়ুই। কুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই। মোট কথা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কোন কণা নেই, যা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু মানুষ কণার সাক্ষ্য ও তসবীহ্ বুঝে না। কেননা বাহ্যিক কানের সংকীর্ণ গহ্বর থেকে অন্তরের অনন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে সফর তাদের নসীব হয়নি। যদি প্রত্যেক অক্ষম ব্যক্তিই এ সফর করে নিত, তবে পক্ষীকুলের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য হত না এবং হযরত মূসা (আঃ)-এরই খোদায়ী কালাম শ্রবণ করার বিশেষত থাকত না। যে ব্যক্তি পদার্থসমূহের পাতায় পাতায় খোদায়ী কলমে লিখিত সাক্ষ্যসমূহ অন্বেষণ করার নিয়তে সফর করে, তার দৈহিক সফর অনেক করতে হবে না; বরং সে এক জায়গায় অবস্থান করে আপন অন্তরকে সকল আবিলতা থেকে মুক্ত করবে, যাতে প্রতিটি কণার তসবীহ-ধ্বনি শুনে স্বস্তি পায়। এরূপ ব্যক্তির জঙ্গলে ঘোরাফেরা করার কি প্রয়োজন? তার উদ্দেশ্য তো রহস্যময় আকাশমণ্ডলী থেকে অর্জিত হতে পারে। কারণ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সকলেই তার আজ্ঞাবহ। অতএব যে ব্যক্তির আশেপাশে স্বয়ং কা'বা তওয়াফ করে, সে

যদি কোন মসজিদের তওয়াফের জন্যে শ্রম স্বীকার করে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

দ্বিতীয় প্রকার- এবাদতের জন্যে সফর করা; যেমন হজ্জ ও জেহাদের জন্যে সফর করা। হজ্জের রহস্য অধ্যায়ে আমরা এর ফযীলত, আদব এবং যাহেরী বাতেনী আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেছি। পয়গম্বর, সাহাবী, তাবেয়ী, আলেম ও ওলীগণের কবর যিয়ারতের জন্যে সফরও এর মধ্যে দাখিল। যাঁদেরকে জীবদ্দশায় দেখা বরকতের কারণ, মৃত্যুর পর তাঁদের কবর যিয়ারত করাও তেমনি বরকতের কারণ। এজন্যে সফর করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لاتشد الرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا ومسجد الاقصى .

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে সফর করবে না- মসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।

এ হাদীসটি আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মসজিদসমূহের বিধান। অর্থাৎ এ তিনটি মসজিদ একই পর্যায়ের। নতুবা এটা জানা কথা যে, পয়গম্বর ও ওলীগণের কবর যিয়ারতের মূল ফযীলতেও পার্থক্য হয়। স্থানের যিয়ারত করার কোন মানে নেই। কাজেই উপরোক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থান যিয়ারত করার জন্যে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ফযীলতও অনেক। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছেন এবং পাঁচটি নামায সেখানে আদায় করে পরের দিন সেখান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন- ইলাহী, যে ব্যক্তি এ মসজিদে আগমন করে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তার উদ্দেশ্য না থাকে, সে যতক্ষণ মসজিদে থাকে, ততক্ষণ তুমি তোমার রহমতের দৃষ্টি তার উপর থেরে সরিয়ে নিয়ো না। তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিয়ো যেমন সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করে নেন।

তৃতীয় প্রকার- ধর্মকর্ম ব্যাহত হওয়ার কারণে সফর করা। এ সফরও ভাল- কেননা, অসহনীয় বিষয় থেকে পশ্চাদসরণ করা নবী-রসূলগণের সুন্নত। যেসব বিষয় থেকে পলায়ন করা ওয়াজিব, সেগুলোর মধ্যে শাসনক্ষমতা, জাঁকজমক ও জাগতিক সম্পর্কের আধিক্য

অন্যতম। কেননা, এসব বিষয় অন্তরের একাগ্রতা বরবাদ করে দেয়। অন্তর যে পরিমাণে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে অবসর পাবে, সেই পরিমাণে ধর্মকর্মে মশগুল হওয়া সম্ভবপর হবে। জাগতিক কাজ-কারবার ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি থেকে অন্তরের অবসর পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক, প্রয়োজনাদি হালকা হোক কিংবা ভারী, যার প্রয়োজনাদি হালকা সে মুক্তি পাবে এবং যার ভারী, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলার শোকর, তিনি মুক্তিকে এ বিষয়ের সাথে জড়িত করেননি যে, সকল গোনাহ্ ও বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে; বরং তিনি আপন অসীম কৃপায় যাদের বোঝা হালকা, তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। হালকা বোঝা তার, যার প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা বেশীর ভাগ দুনিয়ার দিকে নয়। বিস্তৃত জাঁকজমক ও অধিক সম্পর্কের কারণে স্বদেশে এটা সম্ভব নয়। কেননা, সফর করা, অখ্যাত হওয়া এবং যথাসম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পর্যন্তও অন্তর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। এরপর আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন এবং মনে শক্তি ও অন্তরে প্রশান্তি দান করবেন। ফলে তার কাছে সফর ও দেশে থাকা উভয়টি সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর যিকির থেকে কোন কিছু তাকে বাধা দিতে পারবে না, কিন্তু এরূপ হওয়া খুবই বিরল। এখন তো অন্তরের উপর দুর্বলতাই প্রবল। এতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার একত্রে স্থান সংকুলান খুব কমই হয়। হাঁ, এ শক্তিতে পয়গম্বর ও ওলীগণ বলীয়ান হয়ে থাকেন। প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ পর্যন্ত পৌঁছা সুকঠিন; তবুও পরিশ্রম ত্যাগ করা উচিত নয়। প্রচেষ্টারও এতে অল্পবিস্তর দখল আছে। এ ক্ষেত্রে অন্তরগত শক্তির বিভিন্নতা এমন, যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাহ্যিক শক্তি বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কতক সবল সুঠাম পাহলোয়ান ব্যক্তি একাই আড়াই মণ বোঝা বহন করতে পারে। যদি কোন দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তি বোঝা বহনের অনুশীলন করে, সে-ও পাহলোয়ানের স্তরে পৌঁছে যাবে, তবে এটা কখনও হবার নয়। হাঁ, পারদর্শিতা ও প্রচেষ্টার ফলে তার শক্তি কিছুটা বেড়ে যাবে। সুতরাং উচ্চস্তরে পৌঁছার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পরিশ্রম বর্জন করা উচিত নয়। এটা নেহায়েত মূর্খতা ও চরম পথভ্রষ্টতা। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ফেতনার ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে দিতেন। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ এ সময়টা এত খারাপ যে, এতে অজ্ঞাতদেরও শান্তিতে থাকার উপায় নেই– খ্যাতিনামাদের তো কথাই নেই। এ সময় এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যাওয়া উচিত। আবু নয়ীম বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, খাদ্যের থলে কোমরে বেঁধে এবং হাতে মাটির পাত্র

নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি এক গ্রামে সুলভে দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। সেখানেই অবস্থান করতে চাই। তোমরাও এরূপ শুনলে তাই করো। তোমাদের দ্বীনদারী নিরাপদ থাকবে। বস্তুতঃ এ সফরটি ছিল দুর্মূল্যের কারণে। ইবরাহীম খাওয়াস এক শহরে চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করতেন না।

চতুর্থ প্রকার– দেহের ক্ষতি করে এমন বস্তু থেকে সফর করা; যেমন প্লেগ, মহামারী ইত্যাদি। প্লেগ ছাড়া এ ধরনের অন্যান্য কারণে সফর করায় কোন ক্ষতি নেই; বরং সফরের উপকারিতা যদি ওয়াজিব হয়, তবে সফরও ওয়াজিব হবে এবং মোস্তাহাব হলে সফরও মোস্তাহাব হবে। প্লেগ থেকে পলায়ন করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। ওসামা ইবনে যায়দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ فِي الْأَرْضِ فَيَذْهَبُ .. مَرَّةً وَيَأْتِي أُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَقْدَمْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ .

অর্থাৎ, এ রোগটি একটি আযাব। তোমাদের পূর্ববর্তী এক উম্মতকে এই আযাব দেয়া হয়েছিল। এরপর এটা পৃথিবীতেই থেকে যায় এবং একবার চলে যায় ও একবার আসে। কেউ যদি কোন দেশে এ রোগের কথা শুনে, তবে সে যেন সেখানে না যায়। আর তুমি যেখানে থাক, সেখানে এই রোগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত "তা'ন" (ঠাট্টা বিদ্রূপ) ও "তা'উন" (প্লেগ) দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমি আরজ করলাম ঃ "তা'ন"-এর অর্থ তো আমরা জানি; কিন্তু "তা'উন" কি? তিনি বললেন ঃ তা'উন হচ্ছে উটের স্ফীতির মত একটি স্ফীতি, যা মানুষের পিঠের নীচে ও নরম অংশে দেখা দেয়। এতে যে মুসলমান মারা যায় এবং যে সওয়াবের আশায় তা'উনের জায়গায় অবস্থান করে, সে যেন জেহাদের অপেক্ষায় বসে থাকে। আর যে পলায়ন করে, সে যেন জেহাদের সারি থেকে পলায়ন করে। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, প্লেগ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ এবং প্লেগের মধ্যে যাওয়াও নিষিদ্ধ। এর রহস্য চতুর্থ খণ্ডে তাওয়াক্কুল অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

সারকথা, সফর মন্দ, ভাল অথবা মোবাহ্ হবে। মন্দ সফর হয় হারাম হবে; যেমন গোলামের পলায়ন করা অথবা পিতামাতার অবাধ্য হয়ে সফর করা। না হয় মকরূহ হবে; যেমন যে শহরে প্লেগ থাকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। ভাল সফরও হয় ওয়াজিব হবে; যেমন হজ্জের সফর এবং ফরয এলেমের অন্বেষণে সফর। না হয় মোস্তাহাব হবে; যেমন আলেম ও মাশায়েখের যিয়ারত করার জন্যে সফর। সকল প্রকার সফরে নিয়ত আখেরাতই থাকা উচিত। ওয়াজিব ও মোস্তাহাব সফরে এরূপ নিয়ত থাকতে পারে; কিন্তু হারাম ও মকরূহ সফরে অসম্ভব। মোবাহ্ সফর নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সফরের উদ্দেশ্য যদি মাল অন্বেষণ হয়, যাতে সওয়াল করতে না হয়, পরিবার-পরিজনের কাছে সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত মাল সদকা করা যায়, তবে নিয়তের কারণে এই মোবাহ্ সফর আখেরাতের আমল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি রিয়া ও খ্যাতির নিয়তে হজ্জের সফরে যায়, তবে এই নিয়তের কারণে সফরটি আখেরাতের আমল হবে না। কেননা, হাদীসে আছে- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -আমল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। এটা ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহ্ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য- নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, নিয়তের প্রভাবে কোন নিষিদ্ধ বিষয় সিদ্ধ হয়ে যায় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সফরকারী ব্যক্তির উপর কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন। তারা তার উদ্দেশ্য দেখে এবং প্রত্যেককে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিফল দান করা হয়। যার উদ্দেশ্য দুনিয়া থাকে, তাকে দুনিয়া দেয়া হয় এবং তার আখেরাত থেকে কয়েক গুণ হ্রাস করে দেয়া হয়। তার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যার উদ্দেশ্য থাকে আখেরাত, তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয় এবং তার প্রচেষ্টা সুসংহত করা হয়। ফেরেশতারা তার জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করে।

নিম্নে সফরের কয়েকটি আদব বর্ণনা করা হচ্ছে-

(১) সফরের ইচ্ছা করার সময় পূর্বে কারও কোন হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা তাকে সমর্পণ করবে, ঋণ শোধ করবে, পোষ্যবর্গকে খরচ দেয়ার কথা ভাববে এবং আমানত থাকলে তা মালিকের হাতে পৌঁছে দেবে। পাথেয় এই পরিমাণে বেশী নেবে, যাতে প্রয়োজনে সফরসঙ্গীদেরকে দেয়ার অবকাশ থাকে। সফরে ভাল কথাবার্তা বলা, সফরসঙ্গীদেরকে খাওয়ানো এবং উত্তম চরিত্র প্রকাশ করা নেহায়েত জরুরী। কেননা, সফর অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করে।

(২) সফরের জন্যে সঙ্গী বেছে নেবে। একাকী সফর করবে না। ধর্মকর্মে সহায়তা করতে পারে, এমন সঙ্গী হওয়া উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সফরে তিন জন হয়ে গেলে একজনকে দলনেতা করে নাও। আগেকার যুগের বুযুর্গগণ তাই করতেন। তাঁরা দলের নেতাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিযুক্ত করা নেতা বলতেন। এমন ব্যক্তিকে নেতা করতে হবে, যার চরিত্র সর্বাধিক ভাল এবং যে সঙ্গীদের প্রতি অধিক দয়ালু। নেতার প্রয়োজন এ জন্যে যে, গন্তব্যস্থল, পথ ও সফরের উপযোগিতা নির্ধারণের ব্যাপারে নানাজনের নানামত হয়ে থাকে। যদি একজনের মতের উপর নির্ভর করা হয়, তবে ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকবে। নতুবা কথায় বলে– "অধিক বামুনে যজ্ঞ নষ্ট।" এরপর নেতার কর্তব্য হবে সঙ্গীদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং নিজেকে তাদের জন্যে ঢালে পরিণত করা; যেমন বর্ণিত আছে, একবার আবদুল্লাহ্ মরুযী সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আবু আলী রেবাতী তাঁর সঙ্গী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ এই শর্তে মঞ্জুর যে, হয় তুমি নেতা হবে, না হয় আমি নেতা হব। আবু আলী বললেন ঃ নেতা আপনিই হবেন। এর পর আবদুল্লাহ্ মরুযী সমগ্র সফরে নিজের এবং আবু আলীর পাথেয় আপন কাঁধে বহন করলেন। এক রাতে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি সমস্ত রাত্রি সঙ্গীর মাথার উপর চাদর ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, যাতে সে বৃষ্টির পানিতে ভিজে না যায়। আবু আলী তাকে বাধা দিলে তিনি বলতেন ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। তুমি আমাকে নেতা মেনে নিয়েছ। এখন আমি যা চাইব তাই করব। তোমার কর্তব্য আমার আনুগত্য করা। আবু আলী মনে মনে বলতেন ঃ কি কুক্ষণে আমি তাঁকে শাসক ও নেতা বলে মেনে নিয়েছি। এর চেয়ে তো আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। তিনি আমার জন্যে এত কষ্ট করে যাচ্ছেন!

(৩) রওয়ানা হওয়ার সময় পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত এই দোয়া করবে-

استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك ـ

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমানত রাখছি তোমার দ্বীনদারী, ঘড়বাড়ী এবং তোমার শেষ আমল।

বর্ণনাকারী তাবেয়ী বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফরে ছিলাম। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতে চাইলাম, তখন তিনি কয়েক পা আমার সাথে চললেন এবং বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লোকমানের এই উক্তি

বর্ণনা করতে শুনেছি– আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন বস্তু সোপর্দ করা হলে তিনি তার হেফাযত করেন। আমি আল্লাহ্‌কে তোমার ধর্মকর্ম, ঘরবাড়ী ও শেষ আমল সোপর্দ করছি। যায়দ ইবনে কাইয়েমের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সফর করতে চায়, তখন সে পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। কারণ, তাদের দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বরকত দেবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাউকে বিদায় দিতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ

زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমার গোনাহ্ মাফ করুন এবং যেখানেই তুমি যাও, তোমাকে কল্যাণমুখী করুন।

এ দোয়াটি সফরকারীর জন্যে তারা করবে, যারা তাকে বিদায় দিবে। মূসা ইবনে ওয়ারদান বলেন ঃ আমি এক সফরের ইচ্ছা করে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় শেখাচ্ছি, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বিদায় হওয়ার জন্যে শিখিয়েছিলেন। তুমি এই দোয়া কর–

استودعت الله الذى لايضيع ودائعه

অর্থাৎ, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছি। তাঁর হাতে যা সোপর্দ করা হয়, তা তিনি বিনষ্ট করেন না।

(৪) সফরের পূর্বে এস্তেখারার নামায পড়বে, যার নিয়ম আমরা নামায অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সফরের চার রাকআত নামায পড়ে নেবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল, আমি একটি সফরের মান্নত করেছি। একটি ওসিয়ত লেখে রেখেছি। এখন সফরে যাওয়ার পূর্বে ওসিয়তটি কার কাছে সোপর্দ করব– পিতার কাছে, পুত্রের কাছে, না ভাইয়ের কাছে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গৃহে রেখে যাওয়ার জন্যে এর চেয়ে উত্তম কোন কিছু নেই যে, রওয়ানা হওয়ার সময় গৃহে চার রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পড়বে, অতঃপর এই দোয়া পড়বে ঃ

اللهم انى اتقرب بهن اليك فاخلفنى بهن فى اهلى ومالى

–ইলাহী, আমি এই রাকআতগুলো দিয়ে তোমার নৈকট্য কামনা

করছি। অতএব এগুলোকে আমার নায়েব করে দাও আমার পরিবার পরিজন ও অর্থসম্পদের মধ্যে।

ফলস্বরূপ এই চার রাকআত নামায সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার গৃহের রক্ষক হয়ে যাবে।

(৫) গৃহের দরজায় পৌছে এই দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْ اُذَلَّ وَاَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ اُجْهَلَ عَلَىَّ

–আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ থেকে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই। পরওয়ারদেগার, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে ও অপরকে পথভ্রষ্ট করা থেকে, নিজে বিচ্যুত হওয়া থেকে ও অপরকে বিচ্যুত করা থেকে, নিজে জুলুম করা থেকে ও মজলুম হওয়া থেকে এবং নিজে মূর্খতা করা থেকে ও আমার সাথে কারও মূর্খতা করা থেকে।

(৬) কোন মনযিলে অবস্থানের পর সেখান থেকে খুব ভোরে রওয়ানা দেবে। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃহস্পতিবার দিন তাবুকের উদ্দেশে খুব ভোরে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং এই দোয়া করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার উম্মতকে তার ভোরবেলার চলায় বরকত দাও।

বৃহস্পতিবার দিন সফর শুরু করা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন লশকর প্রেরণ করতেন, তখন প্রত্যুষে প্রেরণ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কারও কাছে তোমাদের কোন কাজ থাকলে প্রত্যুষে যেয়ে তা করে নাও। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– ইলাহী, আমার উম্মতকে প্রত্যুষে গাত্রোত্থানে বরকত দাও। জুমুআর দিন ফজরের পরে সফর না করা উচিত। নতুবা জুমুআ তরকের গোনাহ্ হবে। কেননা, জুমুআর দিনের প্রথম অংশও জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ।

(৭) সূর্য খুব উত্তপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মনযিলে অবস্থান নেবে না। এটা সুন্নত। অধিকাংশ পথ রাতের বেলায় অতিক্রম করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রাতের আঁধারে চল। কেননা, রাতে যে পরিমাণ দূরত্ব

অতিক্রম করা যায়, দিনে তা পারা যায় না। পথিমধ্যে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করার সময় বলবে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

ইলাহী, সকল উচ্চের উপরে তুমি উচ্চ এবং তোমারই প্রশংসা সর্বাবস্থায়।

উচ্চভূমি থেকে নিম্নে অবতরণ করার সময় "সোবহানাল্লাহ্" বলবে।

(৮) দিনের বেলায় কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকবে এবং রাতে নিদ্রাকালে হুঁশিয়ার থাকবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত বিছিয়ে নিতেন এবং রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছুটা খাড়া রাখতেন, অতঃপর হাতের তালুতে মস্তক রাখতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল গভীর-নিদ্রা না আসা। এমন যেন না হয় যে, নিদ্রিত অবস্থায় সূর্যোদয় হয়ে যায়, ফলে নামায কাযা হয়। রাতের বেলায় সকল সঙ্গী মিলে পালাক্রমে প্রহরা দেয়ার ব্যবস্থা করা মোস্তাহাব।

(৯) সওয়ার হয়ে সফর করলে সওয়ারীর উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে না এবং তার মুখে প্রহার করবে না। সওয়ারীর পিঠে নিদ্রা যাবে না। কেননা, নিদ্রাবস্থায় মানুষ ভারী হয়ে যায়। ফলে জন্তুর কষ্ট হয়। পরহেযগার ব্যক্তিগণ একটু ঝিমিয়ে নেয়া ছাড়া জন্তুর উপর কখনও নিদ্রা যেতেন না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সওয়ারীর পিঠকে চৌকি বানিয়ে নিয়ো না। সকাল-সন্ধ্যায় সওয়ারী থেকে নেমে তাকে কিছু আরাম দেয়া মোস্তাহাব।

(১০) সফরে ছয়টি বস্তু সাথে নেয়া উচিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে পাঁচটি বস্তু সঙ্গে নিতেন- আয়না, সুরমাদানী, মেসওয়াক, চিরুনি ও কেঁচি। এক রেওয়ায়েতে ছয়টি বস্তুর উল্লেখ আছে ঃ অর্থাৎ, আয়না, শিশি, কেঁচি, মেসওয়াক, সুরমাদানী ও চিরুনি।

(১১) সফর থেকে ফিরে আসার আদব- রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ, ওমরা অথবা অন্য কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রত্যেক যমীনে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন এবং এই দোয়া করতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ـ

আপন বস্তি দৃষ্টিগোচর হলে হৈ দোয়া পড়বে ঃ

اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এই বস্তিতে আমাকে স্থিতিশীলতা ও উত্তম রিযিক দান কর।

এরপর কাউকে আগমনের বার্তা দিয়ে গৃহে প্রেরণ করবে, যাতে অকস্মাৎ গৃহে উপস্থিত হয়ে খারাপ কিছু দেখতে না হয়। রাতের বেলায় গৃহে না পৌঁছা উচিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন, এরপর গৃহে প্রবেশ করতেন। সফর থেকে ফেরার সময় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কিছু উপঢৌকন আনা সুন্নত। কেননা, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর দিকে সকলেই তাকিয়ে থাকে এবং উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হয়। সফরে তাদের কথা স্মরণ করা হয়েছে, একথা ভেবে তাদের আনন্দ আরও বেড়ে যায়।

এ পর্যন্ত সফরের বাহ্যিক আদবসমূহ বর্ণিত হল। এখন এর আভ্যন্তরীণ আদব সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে।

সফর তখনই অবলম্বন করবে, যখন সফরে ধর্মকর্ম বেশী হয়। ধর্মকর্মের প্রতি মনে বিরূপভাব লক্ষ্য করলে সেখানেই থেমে যাবে এবং ফিরে আসবে। মন যেখানে চায়, সেখানে মনযিল করবে। এর খেলাফ করবে না। কোন শহরে প্রবেশ করার সময় সেখানকার কামেল ব্যক্তিগণের যিয়ারত করার নিয়ত করবে। কোন শহরে এক সপ্তাহ অথবা দশ দিনের বেশী অবস্থান করবে না। হাঁ, যে কামেল ব্যক্তির কাছে যাও, তিনি যদি বেশী অবস্থান করতে বলেন তবে কোন দোষ নেই। যতদিনই অবস্থান কর, সত্য ফকীর ব্যতীত কারও কাছে বসবে না। যদি কোন ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাও, তবে তিন দিনের বেশী থাকবে না। এটাই আতিথেয়তার সীমা। কিন্তু ভাইয়ের কাছে বিচ্ছেদ কষ্টকর হলে বেশী থাকতে দোষ নেই। কোন শায়খের যিয়ারত করতে গেলে তার কাছে একদিন ও রাতের বেশী অবস্থান করবে না। নিজেকে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল করবে না। এতে সফরের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে। শহরে প্রবেশ করেই অন্য কিছুতে ব্যাপৃত না হয়ে সোজা শায়খের গৃহে চলে যাবে। শায়খ গৃহে থাকলে দরজায় খট্ খট্ শব্দ করবে না এবং ভিতরে যাওয়ারও অনুমতি চাইবে না; বরং তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শায়খ বাইরে আগমন করলে আদব সহকারে তাঁর

সামনে গিয়ে সালাম করবে এবং কিছু বলবে না। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলে যতটুকু জিজ্ঞেস করেন, ততটুকুরই জওয়াব দেবে। অনুমতি না নিয়ে শায়খকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করবে না। সফরে থাকাকালে শহরের খাদ্য ও কষ্টের কথা বেশী আলোচনা করবে না এবং বন্ধুদের নাম বেশী নেবে না; বরং শায়খ ও ফকীরগণের আলোচনা করবে। সফরে বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত বর্জন করবে না; বরং প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে এরূপ কবর তালাশ করবে। সফরে তেলাওয়াত ও যিকির এমনভাবে করবে, যাতে অন্যে না শুনে। কেউ কথা বলতে এলে যিকির মুলতবী রেখে কথা বলবে। এরপর পূর্ববৎ যিকির করবে। যদি সফর অথবা গৃহে অবস্থান থেকে মন ঘাবড়ে যায়, তবে এর বিরোধিতা করা উচিত। কারণ, নফসের বিরোধিতায় বরকত আছে। যদি সাধু পুরুষগণের খেদমত নসীব হয়ে যায়, তবে তাঁদের খেদমতে অতিষ্ঠ হয়ে সফর করা উচিত নয়। কেননা, এটা নেয়ামতের নাশোকরী। যদি নিজের মধ্যে গৃহে অবস্থানের তুলনায় সফরে ক্ষতি অনুভূত হয়, তবে জেনে নেবে যে, সফর ভাল নয়। এমতাবস্থায় গৃহে ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সফরের রুখসতসমূহের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, সফরের শুরুতে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কিছু পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজন হয়। দুনিয়ার পাথেয় হচ্ছে খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। যদি কাফেলার সাথে সফর করা হয় অথবা পথিমধ্যে স্থানে স্থানে জনপদ থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করে পাথেয় ছাড়া বের হলেও কোন ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে একাকী সফর করলে কিংবা যাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় নেই তাদের সাথে সফর করলে এবং পথিমধ্যে জনপদ না থাকলে পাথেয় ছাড়া সফর করা জায়েয নয়। যদি সফরকারী ব্যক্তি এমতাবস্থায় সপ্তাহ কিংবা আট-দশ দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকার ক্ষমতা রাখে, তবে পাথেয় ছাড়া সফর করা জায়েয হবে। আর যদি এরূপ ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে, তবে পাথেয় ছাড়া সফর করা গোনাহ্। কারণ, এটা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার শামিল। আসবাবপত্র সম্পূর্ণ বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

আখেরাতের পাথেয় হচ্ছে এলেম তথা শিক্ষা, যার প্রয়োজন ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি এবাদতের মধ্যে হয়ে থাকে। সফরকারী ব্যক্তি এ পাথেয়ও অবশ্যই সঙ্গে নেবে। কেননা, সফর কতক বিধানকে সহজ করে দেয়; যেমন নামায কসর (হ্রাস) করা, রোযা না রাখা ইত্যাদি। কাজেই কতটুকু সহজ করে এবং কখন সহজ করে, এসব বিষয় জানা থাকা দরকার। সফরে কতক বিধান কঠিনও হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বাড়ীতে থাকাকালে মোটেই থাকে না, যেমন কেবলার অবস্থা জানা এবং নামাযের সঠিক সময় নিরূপণ করা। বাড়ীতে থাকাকালে মসজিদ দেখেই কেবলা এবং মুয়াযযিনের আযান শুনে নামাযের সময় জানা যায়, কিন্তু সফরে এসব বিষয় কখনও নিজে জেনে নেয়া আবশ্যক হয়।

নিম্নে সফরে প্রাপ্ত রুখসত (সহজকৃত বিষয়সমূহ) বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) সফরে মোজার উপর মসেহ্ করা– সফওয়ান ইবনে আসসাল (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে মুসাফির অবস্থায় তিন দিবারাত্র পর্যন্ত পা থেকে মোজা না খুলতে বলেছেন। এ থেকে জানা গেল, পূর্ণ ওযু করার পর যে ব্যক্তি মোজা পরিধান করে, সে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার সময় থেকে তিন দিবারাত্র পর্যন্ত প্রত্যেক ওযুর মধ্যে মোজার উপর মসেহ করতে পারে। গৃহে অবস্থানকারী হলে এই মাসেহ্ এক

দিবারাত্র পর্যন্ত জায়েয। পাঁচটি শর্তে মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়েয। এক, পূর্ণ অযুর উপর মোজা পরিধান করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি ডান পা ধৌত করার পর ডান পায়ে মোজা পরিধান করে, অতঃপর বাম পা ধুয়ে বাম পায়ে মোজা পরিধান করে, তবে অসমাপ্ত ওযুর উপর মোজা পরিধান করার কারণে তার জন্যে মোজার উপর মসেহ্ করা জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত ডান পায়ের মোজা খুলে আবার পরিধান না করে। দুই, মোজা এমন মজবুত হতে হবে, যা পায়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা যায়। কারণ, মোজা পরিধান করে মনযিলের পর মনযিল চলে যাওয়াই অভ্যাস। তিন, যে পর্যন্ত পা ধৌত করা ফরয, ততটুকু জায়গায় যেন মোজা ছিন্ন না থাকে। ছিন্ন থাকলে ফরয খুলে যাওয়ার কারণে মসেহ্ দুরস্ত হবে না। চার, মোজা পরিধান করার পর তা খুলবে না। খুললে নতুনভাবে ওযু করে পরিধান করতে হবে। কেবল উভয় পা ধুয়ে নিলেও যথেষ্ট হবে। পাঁচ, ধৌত করার জায়গার ঠিক উপরে মসেহ্ করতে হবে। সুতরাং পায়ের গোছার উপর মসেহ্ করলে দুরস্ত হবে না। মসেহ্ করার সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে পায়ের পিঠের মোজার উপর ভিজা হাত বুলিয়ে দেবে। এমনভাবে বুলাবে, যাকে মসেহ্ বলা যায়। তিন অঙ্গুলি দিয়ে মসেহ্ করলে কারও মতভেদ বাকী থাকে না। পূর্ণাঙ্গ মসেহ্ হচ্ছে মোজার উপরে এবং নীচে একবার মসেহ্ করা– দু'বার নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করেছেন। মসেহ্ করার পদ্ধতি হচ্ছে, উভয় হাত ভিজিয়ে ডান হাতের অঙ্গুলিসমূহের মাথা ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলোর উপর রেখে নীচের দিকে আস্তে আস্তে টেনে আনবে। এমনিভাবে বাম হাতের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ বাম মোজার গোড়ালির নীচে রেখে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত পৌছাবে। যদি একামত (গৃহে থাকা) অবস্থায় মসেহ্ করে, এর পর মুসাফির হয়ে যায়, অথবা মুসাফির অবস্থায় মসেহ্ করার পর মুকীম হয়ে যায়, তবে উভয় অবস্থায় মুকীমের বিধান প্রবল থাকবে। অর্থাৎ এক দিবারাত্র পর্যন্ত মসেহ্ চলবে। মোজা পরিধান করার পর বেওযু হওয়ার সময় থেকে দিবারাত্রির হিসাব করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কেউ গৃহে বাসকালে সকালে মোজা পরিধান করে, এরপর মসেহ্ করার পূর্বেই সফরে বের হয় এবং সূর্য ঢলে পড়ার সময় বে-ওযু হয়, তবে তিন দিবারাত্রি গণনা সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে করবে। অর্থাৎ চতুর্থ দিন সূর্য ঢলে পড়লে পা ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি গৃহে অবস্থানকালে মোজা পরিধান করে এবং বেঅযু হয়, এরপর সফর শুরু করে, তবুও তিন দিবারাত্র পর্যন্ত মসেহ্ করবে। কিন্তু গৃহে থাকাকালে যদি মসেহ্ করে নেয়, এর পর সফর শুরু করে, তবে কেবল এক দিবারাত্র পর্যন্তই মসেহ্ করবে। যে ব্যক্তি গৃহে কিংবা সফরে মোজা পরিধান করতে চায়, তার জন্যে সর্প, বিচ্ছু, কাঁটা ইত্যাদির আশংকায়

মোজা ঝেড়ে নেয়া মোস্তাহাব। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মোজা-জোড়া আনিয়ে একটি মোজা পরিধান করলেন। একটি কাক এসে অপর মোজাটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং একটু দূরে নিক্ষেপ করল। তখন মোজার ভিতর থেকে একটি সর্প বের হল। এতে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা এবং কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন মোজা না ঝেড়ে পরিধান না করে।

(২) তায়াম্মুম করা। পানি পাওয়া সুকঠিন হলে মাটি পানির বিকল্প। সুকঠিন হওয়ার অর্থ, পানি এতটুকু দূরে, যেখানে গেলে চিৎকার করলে কাফেলা পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছে না। ফলে কেউ সাহায্যের জন্যে যেতে পারে না। কাফেলা থেকে এতটুকু দূরে কোন মুসাফির প্রস্রাব-পায়খানা করতে সাধারণতঃ যায় না। পানির কাছে কোন দুশমন অথবা হিংস্র প্রাণী থাকলেও পানি পাওয়া সুকঠিন হয়। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয। পান করার প্রয়োজনে পানি থাকলে এবং সঙ্গে অন্য কোন পানি না থাকলেও তায়াম্মুম করা দুরস্ত। যদি সঙ্গীদের মধ্য থেকে কারও পানি পান করার প্রয়োজন হয়, তবে সেই পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয নয়; বরং মূল্যের বিনিময়ে অথবা বিনা মূল্যে সেই পানি সঙ্গীকে দেয়া অপরিহার্য। যদি শুরবা পাকানো অথবা রুটি ভেজানোর জন্যে পানির প্রয়োজন থাকে, তবে তায়াম্মুম করা দুরস্ত হবে না। এমতাবস্থায় শুরবা পাকাবে না, রুটি ভেজাবে না; বরং ওযু করবে। অন্য কেউ পানি দান দান করলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, কিন্তু পানির মূল্য দান করতে হলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। পানি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হলে তা ক্রয় করা ওয়াজিব এবং বেশী মূল্যে বিক্রয় হলে ক্রয় করা ওয়াজিব নয়; ববং তায়াম্মুম করা জায়েয। পানির অভাবে যদি কেউ তায়াম্মুম করার ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে পানি তালাশ করবে। মনযিলের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে দেখবে, নিজের আসবাবপত্র ও ঘটিবাটি খুঁজে দেখবে। যদি আসবাবপত্রে রাখা পানির কথা ভুলে যায় অথবা কাছেই কূপ ছিল, কিন্তু তালাশ করেনি, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়, তবে পুনরায় নামায পড়া অপরিহার্য হবে। যদি জানা যায়, শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়া যাবে, তবে প্রথম ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়া উত্তম। কেননা, জীবনের ভরসা নেই এবং প্রথম ওয়াক্তে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকে। তাই এটা অগ্রগণ্য।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার সফরে তায়াম্মুম করলেন। লোকেরা আরজ করল ঃ আপনি তায়াম্মুম করলেন, অথচ মদীনার দালানকোঠা অদূরেই দেখা যাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত জীবিত থাকব কি? নামায শুরু করার পর পানি পাওয়া গেলে

নামায বাতিল হবে না এবং ওযু করাও জরুরী হবে না। তবে নামায শুরু করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে ওযু করতে হবে। তালাশ করার পর পানি না পাওয়া গেলে ধুলা মিশ্রিত মাটিতে দু'হাতের অঙ্গুলি বন্ধ করে একবার মারবে এবং উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মসেহ্ করবে। এর পর উভয় হাতের অঙ্গুলি ছড়িয়ে দ্বিতীয় বার মারবে এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ্ করবে। যদি একবারে সকল জায়গায় ধুলা না পৌঁছে, তবে আরও একবার হাত মাটিতে মেরে নেবে। তায়াম্মুম দ্বারা এক ফরয পড়ার পর যত ইচ্ছা নফল পড়া যায়। অন্য ওয়াক্তের ফরয পড়তে চাইলে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। (এ মাসআলাটি শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী লিখিত।) নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা যাবে না। যদি এই পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কতক অঙ্গ ধৌত করা যায়, তবে কতক অঙ্গে পানি ব্যবহার করে পূর্ণ তায়াম্মুম করে নেবে।

(৩) সফরের তৃতীয় রুখসত ফরয নামাযে কসর করা। মুসাফির ব্যক্তি যোহর, আসর ও এশার নামাযে চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত পড়বে। যদি মুসাফির মুকীম ইমামের এক্তেদা করে, তবে চার রাকআতই পড়বে।

(৪) সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে সাওয়ারীর উপর নফল পড়তেন– সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। এ ক্ষেত্রে সওয়ারীর কেবলামুখী হওয়া জরুরী নয়। যেব্যক্তি সওয়ারীর উপর নফল পড়বে, সে ইশারায় রুকু-সেজদা করবে। সেজদার জন্যে রুকু অপেক্ষা অধিক নত হবে।

(৫) পদব্রজে চলা অবস্থায় সফরে নফল পড়া দুরস্ত। এমতাবস্থায় রুকু ও সেজদার জন্যে ইশারা করবে এবং তাশাহ্হুদের জন্যে বসবে না। কেননা, বসতে হলে রুখসতের ফায়দা কি? তবে পদব্রজে চলন্ত ব্যক্তি নফল পড়লে কেবলামুখী হয়ে তকবীরে তাহরীমা করে নেবে। কারণ, এক মুহূর্তের জন্যে রাস্তা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু সওয়ার ব্যক্তির জন্যে সওয়ারীর মুখ ফেরানো অসুবিধাজনক। পথিমধ্যে নাপাকী থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা মাড়াবে না। মাড়ালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সওয়ার ব্যক্তির সওয়ারীর পায়ের নীচে নাপাকী পড়লে নামায নষ্ট হবে না।

(৬) মুসাফির ব্যক্তির জন্যে সফরে রোযা না রাখা জায়েয। কিন্তু সকালে গৃহে থাকলে এর পর সফর শুরু করলে সেদিনের রোযা রাখা অপরিহার্য হবে। রোযাদার মুসাফির দিন শেষ হওয়ার পূর্বে গৃহে এসে গেলে সেই রোযা পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়। ইচ্ছা করলে রোযা ছেড়ে দিতে পারে। মুসাফিরের জন্যে রোযা না রাখার চেয়ে রাখা উত্তম। কিন্তু রোযা ক্ষতির কারণ হলে না রাখাই উত্তম।

অষ্টম অধ্যায়

সেমা ও তার আদব

প্রকাশ থাকে যে, লোহা ও পাথরের মধ্যে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত এবং পানির নীচে মাটি আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি অন্তরের মধ্যে আন্তরিক উৎকর্ষ ও রহস্যসমূহ লুক্কায়িত আছে। এগুলো বিকশিত করার জন্যে রাগ তথা সঙ্গীতের সুর অপেক্ষা উত্তম কোন উপায় নেই। কর্ণ ছাড়া অন্তরে যাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। ভারসাম্যপূর্ণ ও সুমধুর সঙ্গীতলহরী অন্তরের আভ্যন্তরীণ ভালমন্দ রহস্যসমূহ ফুটিয়ে তোলে। কেননা, অন্তর ভর্তি পাত্রসদৃশ। একে উপুড় করলে তাই বের হবে, যা দ্বারা তা ভর্তি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সঙ্গীতের সুরও অন্তরের জন্যে সত্যিকার কষ্টিপাথর। সঙ্গীত দ্বারা যখন অন্তর আন্দোলিত হবে, তখন তাই প্রকাশ পাবে, যা অন্তরের উপর প্রবল। অন্তর স্বভাবগতভাবে সঙ্গীতের অনুগত। এমনকি, এর কারণে সে তার ভালমন্দ সবকিছু প্রকাশ করে দেয়। তাই "সেমা" (ধর্মসঙ্গীত) ও তা থেকে সৃষ্ট "ওয়াজদ" (উন্মত্ততা ও মূর্ছা) সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক। এতদুভয়ের উপকারিতা, বিপদাপদ এবং আকার-আকৃতিও ব্যাখ্যা করা জরুরী। এ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল একে নিষিদ্ধ ও একদল বৈধ বলেন। আমরা নিম্নে দু'টি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ

প্রথমে সঙ্গীত হয় এবং তা থেকে অন্তরে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে "ওয়াজদ" বলা হয়। ওয়াজদের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত হয়। এ আন্দোলন ভারসাম্যপূর্ণ না হলে "ইযতিরাব" (চাঞ্চল্য) বলা হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ হলে এর নাম হয় "তাল ও নাচ।" আমরা প্রথমে সঙ্গীতের বিধান লিপিবদ্ধ করব এবং এ সম্পর্কিত মতভেদসমূহ উদ্ধৃত করব। এর পর সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সবশেষে যারা একে হারাম বলে, তাদের প্রমাণসমূহের জওয়াব উল্লেখ করব।

কাযী আবু তাইয়েব তাবারী ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সওরী ও আরও অনেক আলেমের এমন সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা জানা যায়, তাঁরা সকলেই সঙ্গীত হারাম বলতেন। ইমাম শাফেয়ী "কিতাবুল কাযা" গ্রন্থে বলেন ঃ গান বাতিল

বিষয়সমূহের ন্যায় একটি মন্দ ক্রীড়া। যে অধিক গান করে. সে বেওকুফ। তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যবর্গের মতে, যে মহিলা মাহরাম নয়, তার কাছ থেকে সঙ্গীত শ্রবণ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়– সে প্রকাশ্যে থাকুক কিংবা পর্দার অন্তরালে, মুক্ত হোক কিংবা বাঁদী। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ বাঁদীর মালিক যদি বাঁদীর গান শুনার জন্যে লোকজনকে একত্রিত করে, তবে তাকে নীচ বলা হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা সুর-তান বাজানোকে খারাপ মনে করতেন এবং একে খোদাদ্রোহীদের আবিষ্কার আখ্যা দিতেন। কোরআন থেকে গাফেল করাই ছিল এ আবিষ্কারের উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন ঃ "নরদ" (দাবার মত এক প্রকার ক্রীড়া) খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিক মকরূহ। কেননা, এর অপকৃষ্টতা হাদীস দ্বারা জানা যায়। আমি "শতরঞ্জ" তথা দাবা খেলা পছন্দ করি না এবং অন্য যেসব খেলা রয়েছে, সবগুলো আমি মকরূহ মনে করি। কেননা, খেলা ধার্মিক ব্যক্তিদের কাজ নয়। ইমাম মালেক সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন, কোন বাঁদী ক্রয় করার পর যদি জানা যায় যে, সে গায়িকা, তবে তাকে ফেরত দেয়া ক্রেতার জন্যে জায়েয। মদীনাবাসী সকল আলেমের মাযহাবও তাই– একা এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনে সা'দ ছাড়া। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সকল ক্রীড়া-কৌতুক খারাপ মনে করতেন এবং সঙ্গীত শুনতে নিষেধ করতেন। সুফিয়ান সওরী, হাম্মাদ, ইবরাহীম, শাবী প্রমুখ কুফাবাসী সকল আলেমের অবস্থাও তাই।

আবু তালেব মক্কী (রহঃ) অনেক আলেমের তরফ থেকে সঙ্গীতের বৈধতা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর, ইবনে যোবায়র, মুগীরা ইবনে শো'বা, মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রমুখ সঙ্গীত শুনেছেন, অনেক তাবেয়ী এবং বুযুর্গগণও শ্রবণ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, আমাদের মতে মক্কার মধ্যে সর্বদাই হেজাযীরা বছরের শ্রেষ্ঠ দিনসমূহে সঙ্গীত শ্রবণ করে এসেছেন; যেমন তাশরীকের দিনসমূহে। মক্কাবাসীর ন্যায় মদীনাবাসীরাও আমাদের এই সময়কাল পর্যন্ত সব সময় সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন। আমরা আবু মারওয়ান কাযীকে দেখেছি, তাঁর কাছে কয়েকজন গায়িকা বাঁদী ছিল। তিনি সুফীদের জন্যে এদেরকে রেখেছিলেন। এরা তাঁদেরকে রাগ শুনাত। হযরত আতার কাছে দু'টি গায়িকা বাঁদী ছিল, যারা তাঁর বন্ধুদেরকে সঙ্গীত শুনাত। আবু তালেব মক্কী আরও বলেন ঃ আবুল হাসান

ইবনে সাম (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি কিরূপে সঙ্গীত অস্বীকার করেন, অথচ হযরত জুনায়দ, সিররী সকতী ও যুন্নুন মিসরী (রহঃ) সঙ্গীত শুনতেন? তিনি বললেন ঃ আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন একে জায়েয বলেছেন এবং শ্রবণ করেছেন, তখন আমি একে স্বীকার করব না কেন? সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়ার শ্রবণ করতেন এবং বলতেন, আমি তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক স্বীকার করি না। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন ঃ তিনটি বিষয় আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে– এক, সুশ্রী হওয়া নিরাপত্তাসহ; দুই, উত্তম কথাবার্তা ধর্মপরায়ণতাসহ এবং তিন, বন্ধুত্ব হৃদ্যতাসহ। আমি কোন কোন কিতাবে হুবহু এ উক্তি হারেস মুহাসেবী থেকে বর্ণিত দেখেছি। হারেস মুহাসেবী সংসারবিমুখ এবং ধর্মকর্মের হেফাযতে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও রাগ ও সঙ্গীত বৈধ জ্ঞান করতেন। ইবনে মুজাহিদের রীতি ছিল, তিনি দাওয়াত তখনই কবুল করতেন, যখন তাতে সঙ্গীতও থাকত। যেসকল আউলিয়া সঙ্গীত শুনে অজ্ঞান হয়ে যেতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবুল খায়ের আসকালানী। তিনি সেমা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এতে সঙ্গীত বিরোধীদের খণ্ডন করেছেন। আরও অনেকে বিরোধীদের উক্তিসমূহ খণ্ডন করে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি খিযির (আঃ)-কে দেখে আরজ করলাম, সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের আলেমগণ মতভেদ করেন, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এটা নির্মল ও স্বচ্ছ। আলেমগণের পদ ব্যতীত এতে অন্য অন্য কারো পদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। মমশাদ দিনূরী বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, সঙ্গীতকে আপনি খারাপ মনে করেন কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি একে খারাপ মনে করি না, কিন্তু তাদেরকে বলে দিয়ো তারা যেন এর আগে কোরআন পাঠ করে এবং কোরআন পাঠ করেই খতম করে। তাহের ইবনে বেলাল হামদানী ওয়াররাক আলেমগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি জেদ্দার জামে মসজিদে এ'তেকাফরত ছিলাম। একদিন একদল লোককে মসজিদের এক কোণে কিছু গাইতে দেখে মনে মনে খারাপ ভাবলাম এবং বিস্মিত হয়ে বললাম– আল্লাহ্‌র গৃহে কবিতা পাঠ করা হচ্ছে! সেদিনই রাত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি মসজিদের সেই কোণে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর বরাবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আছেন, যিনি কিছু কবিতা পাঠ করছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কবিতা শ্রবণ করে ওজদের অবস্থায় আপন বুকে হাত রাখছেন। আমি

মনে মনে বললাম– যারা কবিতা শ্রবণ করছিল, তাদেরকে খারাপ মনে করা ঠিক হয়নি। এখানে তো স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) শ্রবণ করছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনাচ্ছেন। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এটা নিশ্চিত সত্য অথবা তিনি বললেন ঃ এটা অন্যতম সত্য। ঠিক কোন্ বাক্যটি বলেছিলেন তা আমার সঠিকভাবে স্মরণ নেই। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ দরবেশগণের প্রতি তিন জায়গায় রহমত অবতীর্ণ হয়– খাওয়ার সময়, কেননা উপবাস না করে তারা খায় না; পরস্পরে আলোচনা করার সময়, কেননা সিদ্দীকগণের মকাম ছাড়া তারা অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করে না এবং সঙ্গীত শ্রবণ করার সময়; কারণ তারা উন্মত্ততা সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করে এবং হকের সম্মুখে থাকে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করার অনুমতি দিতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ কেয়ামতের দিন সঙ্গীত আপনার নেকীর পাল্লায় থাকবে, না বদীর পাল্লায়? তিনি বললেন ঃ কোন পাল্লায়ই থাকবে না। এটা সেই لَغْوٌ তথা বাজে বিষয়ের অনুরূপ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ বাজে বিষয়ের কসম খাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরপাকড় করবেন না।

মোট কথা, সঙ্গীত সম্পর্কে উপরোক্তরূপ উক্তিসমূহ বর্ণিত আছে। অনুসরণের ক্ষেত্রে সত্যান্বেষী ব্যক্তি এসব উক্তিকে পরস্পর বিরোধী পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে কিংবা যেদিকে মনের ঝোঁক দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এটা ঠিক নয়; বরং সত্যকে সত্যরূপে অন্বেষণ করা উচিত; অর্থাৎ, এতে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ অথবা বৈধ জানা যায়, সেগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার, যাতে পরিণামে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। আমরা নিম্নে তাই করছি।

সঙ্গীত বৈধ হওয়ার প্রমাণ ঃ জানা উচিত, সঙ্গীত হারাম বলার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এ কারণে শাস্তি দেবেন। এটা নিছক বিবেকবুদ্ধি দিয়ে জানার বিষয় নয়; বরং এর জন্যে কোরআন-হাদীসের প্রমাণ আবশ্যক। বলাবাহুল্য, শরীয়তের বিষয়সমূহ জানা দু'টি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ– এক, নস্ এবং দুই, কিয়াস, যা নস সম্পর্কিত বিষয়ের উপর করা হয়। নস্ সেই বিষয়কে বলা হয়, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন উক্তি অথবা কর্ম দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং কিয়াস সেই বিষয়কে বলা হয়, যা তাঁর ভাষা ও কর্মদৃষ্টে বুঝা যায়। সুতরাং যদি কোন বিষয়ে নস্ না থাকে এবং কিয়াসও কল্পনা না করা যায়, তবে সে বিষয়কে হারাম বলা বাতিল।

বরং সে বিষয়টি অন্যান্য বৈধ বিষয়ের মত গণ্য হবে। সঙ্গীতের বেলায় আমরা তাই দেখি। এর নিষিদ্ধতার পক্ষে না আছে কোন নস্, না আছে কোন কিয়াস; বরং নস্ ও কিয়াস উভয়টি সঙ্গীত বৈধ হওয়ার কথা জ্ঞাপন করে। কিয়াস এভাবে জ্ঞাপন করে যে, সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি বিষয় একত্রিত আছে। প্রথমে এসব বিষয় আলাদা আলাদা দেখে অবশেষে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

সুতরাং প্রথমে দেখা দরকার সঙ্গীত কি? বলাবাহুল্য, সঙ্গীত হচ্ছে এমন সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বর শ্রবণ করা, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। এ সংজ্ঞায় ব্যাপক বিষয় হচ্ছে সুললিত স্বর। এটাও দু'প্রকার– ভারসাম্যপূর্ণ স্বর এবং ভারসাম্যপূর্ণ নয়, এমন স্বর। ভারসাম্যপূর্ণ স্বরও দু'প্রকার– এক, যার অর্থ বুঝা যায়; যেমন কবিতা এবং দুই, যার অর্থ বুঝা যায় না; যেমন জীবজন্তুর স্বর। সুললিত স্বর শ্রবণ করা শ্রুতিমধুর হওয়ার কারণে এমন বিষয় নয় যে, হারাম হবে। বরং এটা নস্ ও কিয়াসদৃষ্টে হালাল। কিয়াস হচ্ছে, এর পরিণতি হল শ্রবণেন্দ্রিয় একটি বিশেষ বস্তু দ্বারা পুলক অনুভব করে। মানুষের একটি বিবেক শক্তি ও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একটি উপলব্ধি আছে। যেসকল বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, তন্মধ্যে কতক ইন্দ্রিয়ের কাছে ভাল লাগে এবং কতক খারাপ লাগে। উদাহরণতঃ দৃষ্টিশক্তি সবুজ বনানী, প্রবাহিত পানি, সুশ্রী মুখমণ্ডল সকল সুন্দর রং দেখে আনন্দ অনুভব করে এবং ময়লাযুক্ত রং, কুশ্রী চেহারা ইত্যাদি খারাপ মনে করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সকল প্রকার সুগন্ধি ভালবাসে এবং দুর্গন্ধকে ঘৃণা করে। আস্বাদন ইন্দ্রিয় সুস্বাদু ও চর্বিযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে এবং তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তু অপছন্দ করে। বিবেক শক্তি জ্ঞান ও মারেফত দ্বারা আনন্দিত হয় এবং মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা ব্যথিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যেসকল বস্তু উপলব্ধ হয়, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। কতক শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে ভাল লাগে; যেমন কোকিলের কুহু কুহু স্বর, উত্তম বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায ইত্যাদি এবং কতক খারাপ লাগে; যেমন গাধার চেঁচামেচি। এই ইন্দ্রিয়ের আনন্দানুভূতিকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দাভূতির উপর কিয়াস করে বৈধ বলা অযৌক্তিক নয়। অনুরূপভাবে নস্ দ্বারাও জানা যায় যে, সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রদত্ত মধুর কণ্ঠস্বর তাঁর একটি অনুগ্রহরূপে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন ঃ وَيَزِيدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ –তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে, এর অর্থ সুমধুর কণ্ঠস্বর।

হাদীসে আছে–

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ –আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে– যেব্যক্তি সুললিত স্বরে কোরআন পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার তেলাওয়াত সেই প্রভুর তুলনায় অধিক শ্রবণ করেন, যে তার বাঁদীর সঙ্গীত শ্রবণ করে। এক হাদীসে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর প্রশংসায় এরশাদ হয়েছে– তিনি সুললিত স্বরে যবুর তেলাওয়াত করতেন। এমনকি, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে মানুষ, জ্বিন, বন্য পশু এবং পক্ষীকুল পর্যন্ত সমবেত হয়ে যেত। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীর প্রশংসায় বলেন ঃ

لَقَدْ اُعْطِىَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ –আবু মূসাকে দাঊদ বংশের এক সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন–

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ –সর্বাধিক শ্রুতিকটু শব্দ হচ্ছে গাধার শব্দ।

এ উক্তি সুললিত স্বরের প্রশংসা জ্ঞাপন করে। যদি কেউ বলে যে, সুললিত স্বর এই শর্তে বৈধ যে, তা কোরআন তেলাওয়াতে হবে, তবে তাকে একথাও অবশ্যই বলতে হবে, বুলবুলির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম। কেননা, এটাও কোরআন তেলাওয়াত নয়। বুলবুলির কণ্ঠস্বর শুনা যদি দুরস্ত হয়, তবে যে কণ্ঠস্বরে প্রজ্ঞা ও বিশুদ্ধ অর্থ পাওয়া যায়, তা শ্রবণ করা নাজায়েয হবে কেন? বলাবাহুল্য, কতক কবিতা আদ্যোপান্ত প্রজ্ঞা হয়ে থাকে। সুললিত স্বর সম্পর্কে এই আলোচনা করা হল। এখন সুললিত স্বরের সাথে ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা, ভারসাম্য এক বিষয় এবং সুললিত হওয়া ভিন্ন বিষয়। প্রায়ই স্বর ভাল হয়, কিন্তু ভারসাম্য থাকে না। কখনও ভারসাম্য থাকে, কিন্তু স্বর ভাল হয় না। উৎপত্তিস্থলের দিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ স্বর তিন প্রকার। এক, যা জড় পদার্থ থেকে নির্গত হয়; যেমন বাঁশীর স্বর, তারের ঝংকার, কাষ্ঠের সুরতান এবং ঢোলকের শব্দ। দুই, যা মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়। তিন, যা প্রাণীকুলের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়; যেমন বুলবুলি, ঘুঘু ও অন্যান্য সুকণ্ঠী পক্ষীর আওয়ায। এই প্রকার আওয়ায যেমন সুললিত হয়, তেমনি ভারসাম্যপূর্ণও হয়। এর সূচনা ও পরিণতিতে তালমিল থাকে। ফলে শুনতে ভাল লাগে। সারকথা, সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে

এসব স্বর শ্রবণ করা হারাম হতে পারে না। কেননা, কারও মাযহাব এরূপ নয় যে, বুলবুলির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম। এটা হতে পারে না, এক পাখীর কণ্ঠস্বর হারাম হবে এবং অন্যটির হবে না। জড় পদার্থ এবং প্রাণীর মধ্যেও এরূপ কোন তফাৎ নেই যে, প্রাণীর স্বর দুরস্ত হবে এবং জড় পদার্থের স্বর দুরস্ত হবে না। অতএব, যে স্বর মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় অথবা কাষ্ঠ থেকে বের করা হয় অথবা ঢোলক কিংবা দফ বাজানোর ফলে সৃষ্ট হয়, সবগুলো বুলবুলির কণ্ঠস্বরের সাথে কিয়াস করে দুরস্ত হওয়া উচিত। তবে শরীয়ত যেগুলো নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো এর ব্যতিক্রম; যেমন ক্রীড়াকৌতুকের সাজসরঞ্জাম এবং তারের বাদ্য। এগুলো হারাম হওয়ার কারণ আনন্দ পাওয়া নয়। কেননা, আনন্দ পাওয়ার কারণে এগুলো হারাম হলে আনন্দ পাওয়ার সকল বস্তুই মানুষের জন্যে হারাম হয়ে যেত। বরং এগুলো হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষের মদ্যপানের আসক্তি অত্যন্ত বেশী ছিল। তাই একে কঠোরভাবে হারাম করা হয় এবং শুরুতে মদের মটকা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ করা হয়। এর সাথে সাথে যেসকল বস্তু মদ্যপায়ীদের অপরিহার্য নিদর্শন ছিল; যেমন বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি, সেগুলোও হারাম করা হয়। কেননা, এগুলো মদ্যপানের অনুগামী বস্তু। উদাহরণতঃ বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া হারাম। কারণ, এটা ব্যভিচারের ভূমিকা। অথবা অল্প মদ নেশার কারণ না হলেও তা হারাম। কেননা, অল্প পানের অভ্যাস শেষ পর্যন্ত বেশী পানে বাধ্য করবে। মোট কথা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি হারাম হয়েছে মদের অনুগামী হওয়ার কারণে। কেননা, প্রথমতঃ এসব বস্তু মদ্যপানের দিকে আহ্বান করে। যে আনন্দ এগুলো দ্বারা অর্জিত হয়, তা মদ দ্বারাই ষোলকলায় পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যেব্যক্তি অল্প দিন হয় মদ ত্যাগ করেছে, এসব বাদ্যযন্ত্র দেখলে তার পূর্বের মদের মজলিস স্মরণ হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলো স্মরণ হওয়ার কারণ হয়। স্মরণ হলে আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আগ্রহ অধিক হলে তা মদ্যপানের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই মদ নিষিদ্ধ করার শুরুতে আরবে প্রচলিত চার প্রকারের বিশেষ মদ্যপাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এগুলো দেখলেই মদ স্মরণ হয়ে যেত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি মদ্যপান সহকারে সঙ্গীত শ্রবণে অভ্যস্ত হয় এবং সঙ্গীত শুনলেই মদ মনে পড়ে যায়, তবে তাকে এ কারণেই সঙ্গীত শুনতে মানা করা হবে। তৃতীয়তঃ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমাবেশ করা পাপাচারী ফাসেকদেরই অভ্যাস। এ মিলের কারণে এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা, যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হয়। এ

কারণেই আমরা বলি, যদি কোন সুন্নতকে বেদআতীরা তাদের পরিচয় চিহ্ন করে নেয়, তবে তাদের সাথে মিলের আশংকায় সেই সুন্নতটি বর্জন করা জায়েয। অনুরূপভাবে ডুগডুগি বাজানো হারাম। কেননা, এটা বানরওয়ালা বাজায়। মোট কথা, উপরোক্ত তিনটি কারণে তারের বাদ্যযন্ত্র যেমন– বীণা, বেহালা, সারঙ্গী ইত্যাদি হারাম হয়েছে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢাকঢোল ইত্যাদি বৈধ। এগুলোকে পাখীদের আওয়াযের উপর কিয়াস করে বৈধ করা হয়েছে। কারণ, মদের সাথে এগুলোর সম্পর্ক নেই। মদ্যপায়ীরা এগুলো বাজায় না এবং এতে মদের মজলিস স্মরণ হয় না। এতে মদ্যপায়ীদের সাথে মিলও প্রকাশ পায় না।

ভারসাম্যপূর্ণ স্বরের এক প্রকার ছিল, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়; যেমন কবিতা। এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, কবিতা মানুষের কণ্ঠ থেকেই নির্গত হয়। তাই নিশ্চিতরূপে বৈধ। হাঁ, এক্ষেত্রে দেখতে হবে, কবিতার বিষয়বস্তু কিরূপ? যদি বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ ধরনের হয়, তবে এর গদ্য ও পদ্য উভয়ই হারাম এবং একে মুখে আবৃত্তি করাও হারাম, সঙ্গীত সহকারে আবৃত্তি হোক বা সঙ্গীত ব্যতিরেকে হোক। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ কবিতা এক প্রকার কালাম; ভাল হলে ভাল এবং খারাপ হলে খারাপ। কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন ঃ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً –কতক কবিতা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা। তিনি কবি হাসসান ইবনে সাবেতের জন্যে মসজিদে একটি মিম্বর স্থাপন করাতেন, যাতে তিনি তার উপর দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কীর্তিগাথা বর্ণনা করেন এবং কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের জওয়াব দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে হাসসানকে শক্তি যোগান যে পর্যন্ত সে কাফেরদের জওয়াব দেয় এবং রসূলের গৌরবগাথা বর্ণনা করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কবিতা পাঠ করতেন এবং তিনি মুচকি হাসতেন। ওমর ইবনে শরীদের পিতা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে উমাইয়া ইবনে আবুস্‌সলতের একশ' পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করলাম। তিনি প্রত্যেকবার বলতেন ঃ আরও আবৃত্তি কর। কবিতার মধ্যে মনে হয় সে যেন মুসলমান। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, সফরে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য 'হুদী' পাঠ করা হত। উটের পিছনে হুদী পাঠ করার প্রথা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের যমানায় সব সময় চালু ছিল। হুদী এক প্রকার কবিতাই, যা সুললিত স্বরে ও ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীত সহকারে পাঠ করা হত। এতে উটের গতিবেগ বেড়ে যেত। সাহাবীগণের মধ্যে

কেউ এটা অপছন্দ করেছেন বলে বর্ণিত নেই; বরং মাঝে মাঝে তারা এটা করার অনুরোধ করতেন।

সঙ্গীত মনকে আন্দোলিত করে এবং মনের প্রবল ভাবকে উত্তোলিত করে। তাই আমরা বলি, আত্মার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীতের সম্পর্ক রাখার বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলার একটি ভেদ। ফলে সঙ্গীত আত্মার মধ্যে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণতঃ কতক সঙ্গীত দ্বারা প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয় এবং কতক সঙ্গীত দ্বারা বিষাদ ফুটে উঠে। কোন কোন সঙ্গীতে হাসির উদ্রেক হয়। কতক সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষের হাত, পা, মস্তক ইত্যাদি অঙ্গ আন্দোলিত হতে থাকে। এখানে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, এটা বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার কারণে হয়, তারের ঝংকারেও এরূপ হয়ে থাকে। কচি শিশুর মধ্যেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। যখনই তাকে সুললিত স্বরে ঘুম পাড়ানী গান শুনানো হয়, তখনই সে কান্না ছেড়ে চুপ হয়ে যায় এবং স্বরধ্বনি শুনতে থাকে। অথচ সে কোন অর্থ বুঝে না। অনুরূপভাবে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন উটও হুদী গানের এমন প্রভাব গ্রহণ করে যে, ভারী ভারী বোঝাও সে এর কারণে হালকা মনে করতে থাকে। স্ফূর্তির আতিশয্যে সে দূরবর্তী পথকে নিকটবর্তী মনে করে। বড় বড় বিজন প্রান্তরে উট যখন বোঝা ও হাওদার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনও হুদীর আওয়াজ শুনে মাথা তুলে তাকায় এবং হুদী গানে কান লাগিয়ে দ্রুতবেগে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে অধিক বোঝা ও দ্রুত চলার কারণে উট মরেও যায়, কিন্তু তখন হুদীর আনন্দে সে কিছুই টের পায় না।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ দীনূরী বর্ণনা করেন, একবার জঙ্গলে আরবের একটি গোত্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল– তাদের এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত করে তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুতে প্রবেশ করে আমি দেখলাম, এক গোলাম হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দরজার সামনে কয়েকটি উট মরে পড়ে আছে। আর একটি মরেনি', কিন্তু মৃতপ্রায় গোলাম আমাকে বলল ঃ আপনি মেহমান। আপনার কর্তব্য আমার প্রভুর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করা। আমার প্রভু অত্যন্ত অতিথিবৎসল। তিনি এতটুকু বিষয়ের জন্যে আপনার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করবেন না। সম্ভবতঃ তিনি আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেবেন। অতঃপর মেযবান যখন আমার সামনে খাদ্য উপস্থিত করল, তখন আমি খেতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম ঃ যে পর্যন্ত আপনি এই গোলামের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল না করেন, আমি খাদ্য গ্রহণ করব না। মেযবান বলল ঃ এই গোলাম আমাকে ফতুর করে দিয়েছে এবং আমার সর্বস্ব বিনষ্ট

করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে কি করেছে? মেযবান জওয়াব দিল ঃ এ কয়েকটি উটের ভাড়ার উপর আমার জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সে এগুলোর পিঠে অতিমাত্রায় বোঝা চাপিয়েছে। তার কণ্ঠস্বর সুমধুর। সে যখন হুদীতে টান দিল, তখন উটগুলো তিন দিনের পথ একদিনে অতিক্রম করল। এর পর বোঝা নামানোর সাথে সাথে সবগুলো উট মারা গেল। কেবল একটি উট এখনও জীবিত আছে, যা সত্বরই মারা যাবে বলে মনে হয়, কিন্তু আপনি আমার মেহমান। মেহমানের খাতিরে এই গোলাম আপনাকে দান করলাম। এর পর গোলামের কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে আমার ঔৎসুক্যের অন্ত রইল না। সকালে আমার মেযবান গোলামকে বলল ঃ হুদী পাঠ কর। তখন সে একটি কূপ থেকে পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিল। হুদী গানে টান দিতেই সেই উট এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল এবং রশি ছিঁড়ে ফেলল। আমিও উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। আমার মনে পড়ে না, জীবনে কখনও এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনেছি।

এ থেকে জানা গেল, সঙ্গীতের প্রভাব অন্তরে অনুভূত হয়। সঙ্গীত যার অন্তরকে নাড়া দেয় না, সে অসম্পূর্ণ, সমতাবিচ্যুত, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত এবং মনের দিক দিয়ে উট, পশুপক্ষী এমনকি সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে অধিকতর স্থূল। কেননা, ভারসাম্যপূর্ণ সঙ্গীত সকলকেই কমবেশী দোলা দেয়। এ কারণেই হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনার জন্যে পক্ষীকুল শূন্যমণ্ডলে স্থির হয়ে যেত। অন্তরে এই প্রভাব বিস্তারের দিকে লক্ষ্য করলে সঙ্গীতকে সর্বাবস্থায় বৈধ অথবা সর্বাবস্থায় হারাম বলা ঠিক হয় না; এটা অবস্থা, ব্যক্তি এবং সঙ্গীতের ধরনভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্তরের ভিতরকার ভাবের যে বিধান, সঙ্গীতের বিধানও তাই। আবু সোলায়মান বলেন ঃ সঙ্গীত অন্তরে সেই ভাব সৃষ্টি করে না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং মনের ভিতরে যে ভাব লুক্কায়িত থাকে, সঙ্গীত তাকেই আন্দোলিত করে থাকে। মোট কথা, বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সাত জায়গায় ভারসাম্যপূর্ণ ও ছন্দপূর্ণ বাক্যাবলী গাওয়ার নিয়ম আছে। প্রথম জায়গা হাজীদের গাওয়া। তারা কবিতায় ঢাকঢোল বাজায় এবং সঙ্গীত গেয়ে ফিরে। এটা বৈধ। কেননা, এসব কবিতায় কাবার প্রশংসা করা হয় এবং মকামে ইবরাহীম, যমযম, হাতীম ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের উল্লেখ করা হয়। এর প্রভাব হচ্ছে, পূর্ব থেকে হজ্জের আগ্রহ থাকলে এসব কবিতা শুনে আগ্রহ আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। নতুবা আগ্রহ তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হজ্জ পুণ্য কাজ বিধায় তার আগ্রহ ভাল। অতএব আগ্রহ সৃষ্টি করা তা যে-কোন উপায়ে হোক, ভালই হবে।

দ্বিতীয় জায়গা গাজীদের গান। তারাও মানুষকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ছন্দময় কবিতা গায়। এটাও বৈধই; কিন্তু গাজীদের কবিতা এবং গাওয়ার নিয়ম হাজীদের থেকে ভিন্ন হওয়া দরকার। কেননা, জেহাদের আগ্রহ ও বীরত্বগাথা বর্ণনা, কাফেরদের প্রতি রোষ সৃষ্টি, জান ও মালকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বীরত্বের কবিতা পাঠ দ্বারাই হয়ে থাকে। জেহাদ বৈধ হলে এটা বৈধ এবং জেহাদ মোস্তাহাব হলে এটাও মোস্তাহাব, কিন্তু তাদের জন্যেই যাদের জেহাদে যাওয়া জায়েয।

তৃতীয় জায়গা মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় বীরদের গান। এই কাব্যগানের উদ্দেশ্য নিজেকে বীরত্ব প্রদর্শনে এবং সাহসিকতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ায়, উদ্বুদ্ধ করা। এসব কাব্যে বাহাদুরী ও বিজয় ঘোষণা করা হয়। ভাষা উচ্চাঙ্গের এবং কণ্ঠস্বর ভাল হলে এর প্রভাব অধিক হয়ে থাকে। মল্লযুদ্ধে এ ধরনের কবিতা গাওয়া বৈধ এবং মোস্তাহাব। মল্লযুদ্ধে মোস্তাহাব, কিন্তু মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নিষিদ্ধ। হযরত আলী ইবনে আবী তালেব, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ সায়ফুল্লাহ প্রমুখ বীর সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই কবিতা পাঠ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ জায়গা কারও মৃত্যুর কারণে বিলাপ ও শোকগাথা গাওয়া। এর প্রভাব হচ্ছে বিষাদ ও উদাসভাব সৃষ্টি করা। বিষাদ দু'প্রকার ঃ একটি প্রশংসনীয় ও অপরটি নিন্দনীয়। কোন কিছু খোয়া যাওয়ার কারণে যে বিষাদ হয়, তা নিন্দনীয়। এ কারণে বিষাদ করতে আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে-

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ -যাতে তোমরা দুঃখ না কর তার জন্যে, যা ফওত হয়ে গেছে। মৃতের জন্যে দুঃখ করাও এর মধ্যে দাখিল। এতে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তে যেন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের বিষাদ নিন্দনীয় বিধায় শোকগাথা দ্বারা একে উত্তোলিত করাও নিন্দনীয়। এ কারণেই বিলাপ ও শোকগাথা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রশংসনীয় বিষাদ হচ্ছে ধর্মকর্মে অক্ষমতা এবং পাপরাশি স্মরণ করে বিষাদ করা। এ জন্যে কান্নাকাটি করা এবং কান্নাকাটির ভান করা উত্তম। হযরত আদম (আঃ) এ জন্যেই কান্নাকাটি করতেন। এ বিষাদে ক্ষতিপূরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয় বিধায় হযরত দাউদ (আঃ)-এর শোকগাথা প্রশংসনীয় ছিল। কেননা, অধিক কান্নাকাটি ও বিষাদ গোনাহের কারণে ছিল। সেমতে তিনি নিজে বিষণ্ন হতেন এবং অপরকেও বিষণ্ন করতেন, নিজে কাঁদতেন এবং অপরকেও কাঁদাতেন। তাঁর শোকগাথার মজলিস

থেকে জানাযা বের হত। তিনি এই বিলাপ ভাষা ও সুর সহকারে করতেন।

পঞ্চম জায়গা আনন্দোৎসব ও উল্লাস প্রকাশের জন্যে গাওয়া। যেমন ঈদের দিনে, বিবাহ মজলিসে, অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমনে, ওলীমা, আকীকা, পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণে এবং খতনা ও হিফযে কোরআনে আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশে গাওয়া জায়েয। কেননা, কতক স্বরভঙ্গি দ্বারা আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তোলিত হয়। অতএব যেসব ক্ষেত্রে আনন্দ-উল্লাস করা জায়েয, সেখানে আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তোলন করাও জায়েয। যখন রসূলে আকরাম (সাঃ) মদীনা তাইয়েবাকে শুভ পদার্পণ দ্বারা গৌরবান্বিত করেন, তখন মহিলারা ছাদের উপর দফ বাজিয়ে গীত গাচ্ছিল–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ (ছানিয়াতুল বিদা গিরিপথ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদিত হয়েছে।) এটা তাঁর শুভাগমনের উল্লাস ছিল বিধায় এতে সুর, লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গি করাও প্রশংসনীয় ছিল। বর্ণিত আছে, কতক সাহাবী যখন উল্লসিত হতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে এক পায়ে ভর দিয়ে নাচানাচি করতেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশার গৃহে গমন করলেন। তখন সেখানে মিনা দিবস উপলক্ষে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল ও নৃত্য করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করে শায়িত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলে তিনি মুখমণ্ডলের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন ঃ আবু বকর, ছাড়, এদেরকে কিছু বলো না। জান না, এটা ঈদের দিন। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন আর আমি মসজিদে হাবশীদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) এসে আমাকে শাসালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে বনী আরকাদা, তোমরা নির্বিঘ্নে খেলা প্রদর্শন কর। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সখীরাও এতে যোগ দিত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখলে লজ্জায় কক্ষে চলে যেত। তিনি আমার সাথে খেলার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন। এক হাদীসে আছে– নবী করীম (সাঃ) একদিন হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কি? তিনি বললেন ঃ আমার পুতুল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলোর মাঝখানে এটা কি? তিনি আরজ করলেন ঃ ঘোড়া। তিনি বললেন ঃ এই ঘোড়ার দুপাশে এগুলো কি? তিনি আরজ করলেন ঃ পাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা হয় নাকি? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ আপনি শুনেননি, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়ার পাখা ছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে রসূলে করীম (সাঃ) এত হাসলেন যে, তাঁর উভয় দন্তপাটি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আমাদের মতে পুতুলের হাদীসটি বালিকাদের অভ্যাস ধরতে হবে। তারা পূর্ণ অবয়ব ছাড়াই মাটি অথবা কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরী করে নেয়। কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সেই ঘোড়ার দু'টি পাখা কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

ষষ্ঠ জায়গা প্রেমিকদের রাগ। এর উদ্দেশ্য আগ্রহকে নাড়া দেয়া, এশক বৃদ্ধি পাওয়া এবং মনের স্থিরতা লাভ হয়ে থাকে। প্রেমাস্পদের সম্মুখে হলে এতে আনন্দ অধিক হয়। আর বিরহের স্থলে হলে উদ্দেশ্য আগ্রহকে উত্তোলিত করা হয়। এ ধরনের রাগও হালাল, যদি প্রেমাস্পদ এমন হয় যার মিলন বৈধ। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি তার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেলে সে আনন্দ লাভের উদ্দেশে স্ত্রীর রাগ শ্রবণ করতে পারে।

সপ্তম জায়গা এমন লোকদের সঙ্গীত শ্রবণ করা, যারা আল্লাহ তাআলার এশকে বিভোর এবং তাঁর দীদারে আগ্রহী, তারা যেদিকে তাকায়, কেবল তাঁর নূর দেখতে পায় এবং যে স্বর শুনে, তা তাঁর কাছ থেকেই মনে করে। সেমা এরূপ লোকদের আগ্রহ উত্তোলিত করে এবং এশক ও মহব্বত পাকাপোক্ত করে। সেমা তাদের অন্তরে চকমকি পাথরের কাজ করে এবং এমন কাশফ লতীফা প্রকাশ প্রকাশ করে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে এর স্বাদ গ্রহণ করে সে-ই বুঝে। যার অনুভূতি এর স্বাদ গ্রহণে অক্ষম, সে এর মর্ম জানে না। সুফীগণের পরিভাষায় এ অবস্থার নাম "ওজুদ", যা "ওজদ" (পাওয়া) ধাতু থেকে নির্গত। অর্থাৎ, তারা মনের মধ্যে এমন অবস্থা পায়, যা সঙ্গীতের পূর্বে জানা থাকে না। এসব অবস্থার কারণে পরে এগুলোর অনুগামী এমন এমন বিষয় সৃষ্টি হয়, যা অন্তরকে আপন অনলে দগ্ধ করে এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে এমন পরিষ্কার করে দেয়, যেমন আগুনে পুড়ে সোনা রূপা পরিষ্কার ও নির্মল হয়ে যায়। এর পর মোশাহাদা ও মোকাশাফা হয়, যা সকল খোদাপ্রেমিকের পরম ও চরম লক্ষ্য এবং যাবতীয় এবাদতের ফল।

সঙ্গীত হারাম হওয়ার কারণ ঃ পাঁচটি কারণে রাগ তথা সঙ্গীত হারাম হয়ে থাকে। প্রথম, গায়িকা এমন নারী হলে, যাকে দেখা হালাল নয় এবং যার গানে ফেতনার আশংকা থাকে। শ্মশ্রুবিহীন বালকের

বিধানও তাই। কারণ, তার গানেও ফেতনার আশংকা থাকে। দ্বিতীয়, এমন বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত করলে, যা রাখা মদ্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য; যেমন সেতার, বেহালা ইত্যাদি তারের বাদ্যযন্ত্র। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যন্ত্র বৈধ; যেমন– দফ, কাষ্ঠনির্মিত বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। তৃতীয়, সঙ্গীতের বাণীতে ত্রুটি থাকলে; অর্থাৎ, অশ্লীল, বাজে, বিদ্রূপাত্মক এবং আল্লাহ্, রসূল ও সাহাবায়ে কেরামের শানে অসত্য বিষয়বস্তু সম্বলিত হলে সেই সঙ্গীত বৈধ নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের শানে এ ধরনের সঙ্গীত কবিতা রচনা করে থাকে। এ ধরনের কবিতা গীতরূপে এবং গীত ছাড়াও শ্রবণ করা হারাম। অনুরূপভাবে সেই কবিতাও হারাম, যাতে কোন বিশেষ মহিলার রূপলাবণ্য বর্ণনা করা হয়। কেননা, কোন নির্দিষ্ট মহিলার এমন আলোচনা পুরুষদের সামনে জায়েয নয়, যদ্দ্বারা তার দৈহিক অবস্থা ফুটে উঠে। তবে সাধারণভাবে নারী অঙ্গের চিত্র ও সৌন্দর্য কবিতায় বর্ণনা করা এবং তা গাওয়া হারাম নয়। শ্রোতার উচিত এ বর্ণনাকে কোন নির্দিষ্ট সুন্দরী নারীর জন্যে কল্পনা না করা। হাঁ, আপন বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে কল্পনা করায় দোষ নেই। কাফের ও বেদআতীদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা গাওয়া জায়েয। সেমতে কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করে কবিতা আবৃত্তি করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে এর অনুমতি দান করেছিলেন। চতুর্থ, শ্রোতার মধ্যে অনিষ্ট থাকার কারণে সঙ্গীত হারাম হয়; যেমন কামভাব প্রবল থাকা এবং ভরা যৌবনে থাকা। এরূপ ব্যক্তির জন্যে সঙ্গীত শ্রবণ করা হারাম। তার অন্তরে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মহব্বত প্রবল হোক বা না হোক। কেননা, সে যখনই কেশগুচ্ছ, গাল এবং বিরহ ও মিলনের বর্ণনা শুনবে, তখনই তার কামভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং কল্পনায় কোন নির্দিষ্ট সুন্দরী নারী ভেসে উঠবে। ফলে তার কামানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য, অন্তরে শয়তান বাহিনী (অর্থাৎ, কামভাব) এবং আল্লাহ্র বাহিনী (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির নূর)– এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে। তবে যার মধ্যে এক বাহিনী বিজয়ী হয়ে যায় এবং অপর বাহিনী সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তার ভিতরকার যুদ্ধ মওকুফ হয়ে যায়। আজকাল অধিকাংশ অন্তরকে শয়তান বাহিনী জিতে নিয়েছে। এমতাবস্থায় নতুনভাবে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন; যাতে অন্তর থেকে শয়তানের পা উপড়ে যায়। শয়তানের অস্ত্র বাড়ানো কিছুতেই উচিত নয়। এ ধরনের লোকের জন্যে সঙ্গীত শয়তান বাহিনীর অস্ত্র শাণিত করার শামিল। এরূপ ব্যক্তির সেমা'র মজলিস থেকে চলে যাওয়া

উচিত। নতুবা সঙ্গীত দ্বারা তার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে। সঙ্গীত হারাম হওয়ার পঞ্চম কারণ, শ্রোতার সাধারণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল নয় যে, সেমা তার কাছে ভাল মনে হবে এবং তার মধ্যে কামভাবও প্রবল নয় যে, সঙ্গীত তার জন্যে নিষিদ্ধ হবে। এরূপ লোকের জন্যে সেমা' অন্যান্য বৈধ আনন্দের মতই, কিন্তু সে যদি সেমাকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয় এবং অধিকাংশ সময় এতেই ব্যয় করে, তবে সে নির্বোধ, যার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। কেননা, ক্রীড়াকৌতুক সব সময় করা গোনাহ্। সগীরা গোনাহ্ সব সময় করলে যেমন কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায়, তেমনি বৈধ কাজ সব সময় করলে গোনাহ্ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ হাবশীদের পেছনে সব সময় পড়ে থাকা এবং তাদের খেলাধুলা দেখা নিষিদ্ধ, যদিও তা আসলে নিষিদ্ধ নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা দেখেছেন। এটা গালে তিল থাকার মত। তিল যদিও কাল, কিন্তু গালে একটি দু'টি থাকলে ভালই দেখায় আর অনেকগুলো থাকলে বিশ্রী হয়ে যায়। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে, কোন বস্তু বৈধ হলে তার অধিক মাত্রাও বৈধ হবে এবং কোন কোন বস্তু আধিক্যের কারণে হারাম হয়ে যায়। অতএব, সেমাও মাঝে-মধ্যে হলে বৈধ এবং নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হলে অবৈধ।

যারা হারাম বলে, তাদের দলীল ও জওয়াব ঃ প্রথম দলীল- আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ কতক লোক ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ), হাসান বসরী ও মখফী (রঃ) বলেন ঃ "ক্রীড়ার কথাবার্তা" মানে সঙ্গীত। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন গায়িকা বাঁদীকে, তার ক্রয় বিক্রয়, তার মজুরি এবং তার শিক্ষাকে। এর জওয়াব হল, এই হাদীসে সেই বাঁদীকে বুঝানো হয়েছে, যে মদের মজলিসে পুরুষদের সামনে গান গায়। এটা যে হারাম, তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আরবরা গায়িকা বাঁদী দ্বারা নিষিদ্ধ গান গাওয়াত। যদি কেবল প্রভু নিজের সামনে গাওয়ায়, তবে এ হাদীস দ্বারা তার নিষিদ্ধতা বুঝা যায় না। আয়াতে যে ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরে এ কথাও বলা হয়েছে, যাতে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়। এটা বাস্তবে হারাম। কিন্তু সকল গানই আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে নয়। আয়াতে এমন সঙ্গীতই উদ্দেশ্য, যা বিচ্যুত করার নিয়তেই হয়। এটা কেবল সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কেউ যদি মানুষ পথভ্রষ্ট

হোক– এ নিয়তে কোরআনও পাঠ করে, তবে তাও হারাম হবে। সেমতে বর্ণিত আছে, জনৈক মোনাফেক নামাযে ইমামতি করত এবং সূরা আবাসা ছাড়া অন্য কোন সূরা তেলাওয়াত করত না। কারণ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শাসানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এ কাজ হারাম মনে করে মোনাফেককে হত্যা করতে চাইলেন। কেননা, তার উদ্দেশ্য ছিল পথভ্রষ্ট করা। সুতরাং কবিতা ও গানের উদ্দেশ্য পথভ্রষ্ট করা হলে তা নিঃসন্দেহে হারাম হবে। দ্বিতীয় দলীল– আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ـ

তোমরা কি এই বাণী দেখে বিস্মিত হও, হাস্য কর, ক্রন্দন কর না এবং খেলা তামাশা কর?

কথিত আছে, হেমইয়ারী ভাষায় "সমূদ" সঙ্গীতকে বলা হয়। এ থেকেই "সামিদূন" উদ্ভূত হয়েছে। এ আয়াতের জওয়াব হল, যদি আয়াতে উল্লিখিত হলেই হারাম হয়ে যায়, তবে হাস্য করা এবং ক্রন্দন করাও হারাম হওয়া দরকার। কেননা, এগুলোও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যদি বলা হয়, এখানে হাসির অর্থ বিশেষ হাসি; অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার কারণে মুসলমানের প্রতি বিদ্রূপের হাসি, তবে আমরাও বলব, সঙ্গীত দ্বারা বিশেষ সঙ্গীত উদ্দেশ্য, যা মুসলমানদের প্রতি উপহাস সম্পর্কিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ (পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে।) এখানে কাফের কবি উদ্দেশ্য। এই অর্থ নয় যে, পদ্য রচনা করাই হারাম।

তৃতীয় দলীল– হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম শয়তানই বিলাপ করেছে এবং সে-ই প্রথমে গান গেয়েছে। এতে সঙ্গীত ও বিলাপ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জওয়াব হচ্ছে, বিলাপ হলেই তা হারাম হয় না; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিলাপ এর ব্যতিক্রম ছিল এবং গোনাহের কারণে গোনাহগারের বিলাপও এর ব্যতিক্রম। এমনিভাবে যে সঙ্গীত দ্বারা বৈধ বিষয়ের প্রতি আনন্দ, বিষাদ ও আগ্রহ আন্দোলিত হয়, তাও ব্যতিক্রমভুক্ত; যেমন ঈদের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে বালিকাদের গান গাওয়া এবং মদীনায় শুভাগমনের দিন মহিলাদের গীত গাওয়া।

চতুর্থ দলীল– হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি সঙ্গীতে কণ্ঠ দেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা

শয়তানকে তার স্কন্ধে প্রেরণ করেন। সে তার উভয় গোড়ালি দিয়ে গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত গায়কের বুকে আঘাত করতে থাকে। এর জওয়াব হচ্ছে, এই হাদীসে সঙ্গীতের কতক প্রকার বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, যে সঙ্গীত দ্বারা শয়তানের অভীষ্ট তথা কামভাব ও মানুষের প্রতি এশক উত্তেজিত হয়, কিন্তু যে সঙ্গীত দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঔৎসুক্য অথবা ঈদের আনন্দ অথবা কোন মহান ব্যক্তির আগমনের উল্লাস বৃদ্ধি পায়, তা শয়তানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বিধায় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পঞ্চম দলীল হচ্ছে, ওকবা ইবনে আমেরের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ খেলাধুলার সকল বস্তু বাতিল, কিন্তু আপন ঘোড়াকে ঘুরানো-ফেরানো, তীর নিক্ষেপ করা এবং স্ত্রীর সাথে আনন্দ গীত গাওয়া— এগুলো বাতিল নয়। এর জওয়াব হচ্ছে, বাতিল বললেই হারাম বলা হয় না; বরং বাতিলের অর্থ অনর্থক স্বীকার করে নিলেও হাবশীদের খেলাধুলা দেখা এই তিনের মধ্যে দাখিল থেকে হারাম হবে না। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلٰثٍ —তিনটি কারণের মধ্য থেকে যেকোন একটি কারণ ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়) এখানে সীমিতের মধ্যে অসীমকে কেয়াস করে চতুর্থ এবং পঞ্চম কারণকেও সংযুক্ত করে নেয়া হয়।

ষষ্ঠ দলীল— হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন ঃ যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বয়াত হয়েছি, কখনও গীত গাইনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিনি। এর জওয়াব হচ্ছে, এ উক্তি হারাম হওয়ার দলীল হলে ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাও হারাম হওয়া দরকার। এছাড়া এটা কোত্থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান কেবল হারাম বস্তুই বর্জন করতেন?

সপ্তম দলীল— হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ সঙ্গীত অন্তরে নেফাক তথা কপটতার জন্ম দেয়; যেমন পানি শাকসব্জি উৎপন্ন করে। কেউ কেউ এ উক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও বর্ণনা করেছেন। অথচ এটা সহীহ্ নয়। আরও বলা হয়, কিছু লোক হযরত ইবনে ওমরের সম্মুখ দিয়ে এহরাম বাঁধা অবস্থায় গমন করল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি গান গাচ্ছিল। তিনি দু'বার বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল না করুন। নাফে' বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমরের সঙ্গে পথিমধ্যে ছিলাম। তিনি এক রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনে কানে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে

দিলেন এবং এ পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলেন। তিনি কেবল আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন– তুমি বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ কি না? অবশেষে যখন আমি বললাম ঃ না, আর শুনা যায় না, তখন তিনি কান থেকে অঙ্গুলি বের করে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি। ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সঙ্গীত অপকর্মের দূত। ইয়াযিদে ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ সঙ্গীত থেকে দূরে থাক। কারণ, এটা কামভাব বৃদ্ধি করে, মনুষ্যত্ব ধূলিসাৎ করে, মদের বিকল্প এবং নেশার মত প্রভাব বিস্তার করে। যদি তুমি শুনই, তবে নারীদের সঙ্গীত শুনো না। কেননা, এটা ব্যভিচার দাবী করে।

এখন এ সমস্ত উক্তির জওয়াব লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন– সঙ্গীত কপটতা সৃষ্টি করে- এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গায়কের মধ্যে এই প্রভাব ফেলে। কেননা, তার লক্ষ্যই থাকে নিজেকে অন্যদের সামনে পেশ করা এবং আপন কণ্ঠস্বর তাদেরকে শুনানো। এটা কপটতা, কিন্তু এ থেকে সঙ্গীত হারাম বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করলেও অন্তরে কপটতা ও রিয়া সৃষ্টি হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করা হারাম নয়। হযরত ইবনে ওমরের উক্তি– আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল না করুন– এ থেকেও সঙ্গীত হারাম বলে প্রমাণিত হয় না। বরং তারা এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিল বিধায় নারীদের আলোচনা তাদের জন্যে সমীচীন ছিল না। তাদের ভাবসাব দেখে তিনি বুঝে নেন যে, তাদের সঙ্গীত বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের আগ্রহ-প্রসূত নয়; বরং নিছক ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে। তাই তিনি এটা অপছন্দ করলেন। তাঁর কানে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়া দ্বারাও হারাম হওয়া প্রণাণিত হয় না। কেননা, এতে আছে, তিনি নাফে'কে কানে অঙ্গুলি ঢুকাতে বলেননি এবং শুনতে নিষেধ করেননি। তবে তাঁর নিজের এ কাজ করার কারণ হচ্ছে, তিনি নিজের মনকে এই আওয়াজ শুনা থেকে পবিত্র রেখেছেন, যাতে যে ধ্যানে তিনি ছিলেন, তা ব্যাহত অথবা যিকির বাধাপ্রাপ্ত না হয়। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এ কারণেই তা করেছিলেন। তিনিও হযরত ইবনে ওমরকে বাঁশীর আওয়াজ শুনতে নিষেধ করেননি। সুতরাং বুঝা যায়, হারাম হওয়ার কারণে তিনি এরূপ করেননি; বরং এটা উত্তম ছিল। আমাদের মতে অধিকাংশ অবস্থায় এটা বর্জন করা উত্তম; বরং দুনিয়ার অধিকাংশ বৈধ বস্তু বর্জন করা ভাল, যদি অন্তরে তার প্রভাব পড়ার ধারণা প্রবল হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে আবু জাহমের প্রেরিত পোশাক খুলে

ফেলেছিলেন। কারণ, তাতে চিত্র অংকিত ছিল। ফলে তাঁর অন্তর তাতে মশগুল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয় যে, কাপড়ে চিত্র অংকন করা হারাম? ফোযায়লের উক্তি– সঙ্গীত ব্যভিচারের মন্ত্র এবং এর কাছাকাছি অন্যান্য উক্তির জওয়াব হচ্ছে, এটা পাপাচারী, যুবক ও কামপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ্গীতের অবস্থা। সকল সঙ্গীতের এ অবস্থা হলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর গৃহে দু'বালিকার সঙ্গীত শ্রবণ করা হত না।

এটা অনস্বীকার্য যে, সঙ্গীত খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দুনিয়া সবটুকুই খেলাধুলা। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) আপন পত্নীকে বলেছিলেন ঃ তুমি গৃহের কোণে একটি খেলনা মাত্র। অনুরূপভাবে রং তামাশা অশ্লীল না হলে বৈধ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এছাড়া আমরা বলি, খেলাধুলা মনকে স্বস্তি দান করে এবং চিন্তার বোঝা লাঘব করে। উদাহরণতঃ যারা লেখাপড়া করে, তাদের জুমার দিন ছুটি ভোগ করা উচিত। কেননা, একদিনের ছুটি অন্যান্য দিনের কাজে স্ফূর্তি আনয়নে সহায়ক হয়। মোট কথা, ছুটি কাজে সহায়তা করে এবং খেলাধুলা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সাহায্য করে। খেলাধুলা মানসিক ক্লান্তির প্রতিকার বিধায় এটা বৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু এর আধিক্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন ওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন না করা বাঞ্ছনীয়। এ নিয়তে খেলাধুলা করলে তাতে সওয়াবও হবে। আনন্দ ও স্বস্তি ছাড়া সঙ্গীত যার মধ্যে অন্য কোন কুপ্রভাব ফেলে না, তার জন্যে সঙ্গীত মোস্তাহাব হওয়া উচিত, যাতে এর মাধ্যমে সে মনযিলে মক্সুদে পৌঁছতে পারে। হাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এটা কামেলের মর্তবার নীচে। কামেল সে ব্যক্তিই, যে নিজের মনকে স্বস্তি দেয়ার ব্যাপারে সত্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কথায় বলে– সৎকর্মপরায়ণদের পুণ্য কাজ নৈকট্যশীলদের জন্যে উপকারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেমার প্রভাব ও আদব

উল্লেখ্য, সেমার প্রথম স্তর হচ্ছে শ্রুত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়া, দ্বিতীয় স্তর হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পর ওজদ হওয়া এবং তৃতীয় স্তর ওজদের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলন হওয়া। নিম্নে এ তিনটি স্তরই আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

সেমা হৃদয়ঙ্গম হওয়া ঃ এটা শ্রোতার অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। শ্রোতার অবস্থা চারটি ঃ প্রথম– স্বাভাবিকভাবে শ্রবণ করা; অর্থাৎ, সুর ও তালের আনন্দ ছাড়া সেমার অন্য কোন প্রভাব গ্রহণ না করা। এরূপ শ্রবণ বৈধ এবং সেমার স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর। কেননা, এ স্তরে উট এবং চতুষ্পদ জন্তুও শ্রোতার অংশীদার। বরং এ রুচির জন্যে কেবল প্রাণ থাকা দরকার। প্রত্যেক প্রাণী সুললিত স্বর দ্বারা এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে থাকে। দ্বিতীয়– অবস্থা বুঝে সুঝে শ্রবণ করা এবং বিষয়বস্তুকে কোন নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কল্পনা করতে থাকা। যুবক ও কামপ্রবণরা এরূপ শ্রবণ করে। এটা খারাপ ও নিষিদ্ধ– একথা বলাই যথেষ্ট। এর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় অবস্থা শ্রুত বিষয়কে নিজের অবস্থার মধ্যে কল্পনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে শ্রোতা যেসকল অবস্থার সম্মুখীন হয়– কখনও সমর্থ হয় এবং কখনও অক্ষমতা দেখা দেয়– এগুলো করে যাওয়া। মুরীদ বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরের মুরীদরা এভাবে শ্রবণ করে থাকে। সঙ্গীতের বিষয়বস্তু নিজের অবস্থার মধ্যে কল্পনা করার কয়েকটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

জনৈক সুফী এক ব্যক্তিকে কবিতা গাইতে শুনল যার মর্মার্থ নিম্নরূপ–

–দূত আমাকে বলল ঃ কাল তুমি সাক্ষাৎ করবে। আমি বললাম ঃ কি বলছ, কিছু খবরও রাখ?

উল্লিখিত মর্ম সম্বলিত কবিতা শুনে সূফী এতটুকু উত্তেজিত হল যে, বারবার পড়তে লাগল এবং "তুমি"র জায়গায় "আমি" বলতে লাগল। এর পর আনন্দের আতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর তাকে এই ওজদের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই এরশাদ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল– জান্নাতীরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করবে।

ইবনে দাররাজ বর্ণনা করেন– আমি ও ইবনে কূতী বসরা ও আয়লার মধ্যস্থলে দজলার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি সুরম্য প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হল। প্রাসাদের বারান্দায় এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। তার সামনে এক বাঁদী কবিতা আবৃত্তি করছিল যার মর্ম নিম্নরূপ–

–প্রত্যহ তোমার অবস্থার মধ্যে নব নব পরিবর্তন হচ্ছে। এ ছাড়াও তো আরও কিছু করা তোমার জন্যে শোভনীয়।

ঘটনাক্রমে তখন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত জনৈক ফকীরবেশী যুবক বারান্দার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর শুনে সে বাঁদীকে বলল ঃ তোমাকে আল্লাহ্র কসম এবং তোমার প্রভুর হায়াতের কসম, তুমি চরণটি পুনরায় আবৃত্তি কর। বাঁদী পুনরায় তা আবৃত্তি করলে যুবক বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমার অবস্থার পরিবর্তনও তাই। অতঃপর সে একটি মর্মভেদী চীৎকার করে প্রাণত্যাগ করল। ইবনে দাররাজ বলেন ঃ অতঃপর আমি আমার সঙ্গীকে বললাম– এখন তো আমরা একটি ফরয কাজের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি। এ লোকটির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। গৃহস্বামী বাঁদীকে বলল ঃ তুই আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুক্ত। এর পর বসরার লোকজন বেরিয়ে এল এবং যুবকের জানাযায় শরীক হল। দাফন শেষে গৃহস্বামী তাদেরকে বলল ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি– এ প্রাসাদসহ আমার যত ধনসম্পদ আছে, সমস্তই ওয়াকফ করলাম। আমার সকল বাঁদী মুক্ত। অতঃপর সে তার পোশাক খুলে ফেলল এবং একটি লুঙ্গি পরিধান করে ও অপরটি কাঁধে ফেলে অজানার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। লোকজন তার বিরহে কান্নাকাটি করছিল। সে কোথায় গেল, কি করল, পরে আর তা জানা গেল না। যুবকটি আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিজের অবস্থায় সব সময় ডুবে থাকত এবং এ কাজে যথার্থ আদবের ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম মনে করত। অন্তরের দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার কারণে খুব দুঃখ করত। তার অবস্থার সাথে খাপ খায় এমন কবিতার আওয়াজ যখন তার কানে পড়ল, তখন সে কল্পনা করল– আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হচ্ছে, প্রত্যহ তুমি নতুন রং পরিবর্তন করছ। এরূপ না করাই তোমার জন্যে শ্রেয়।

চতুর্থ অবস্থা– শ্রোতার এমন হওয়া যে, সে সকল হাল ও মকাম অতিক্রম করে এখন আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছু বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এমনকি, সে নিজেকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে সাক্ষাত খোদায়ী উপস্থিতির দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা সেই মহিলাদের অনুরূপ, যারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মুখশ্রী দেখার সময় আপন

আপন অঙ্গুলি কেটে ফেলেছিল এবং এমন অচেতন হয়ে পড়েছিল যে, অঙ্গুলি কর্তনের কোন খবরই তাদের ছিল না। এ ধরনের অবস্থাকে "ফানা ফিন্নফস" বলা হয়; অর্থাৎ, অহংকেও বিস্মৃত হয়ে যাওয়া। বলাবাহুল্য, যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে, সে অন্য সব কিছুকে আরও বেশী বিস্মৃত হয়ে যাবে। সে যেন একমাত্র আল্লাহ্র সত্তা (যার কাছে সে উপস্থিত) ছাড়া অন্য সব বস্তু থেকে ফানা হয়ে যায়। এমনকি, মোশাহাদা (প্রত্যক্ষ করা) থেকেও ফানা হয়ে যায়। কেননা, অন্তর যদি মোশাহাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে এবং নিজের দিকে ধ্যান দেয় যে, সে মোশাহাদা করছে, তবে আল্লাহ্ থেকে গাফেল হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ যখন কেউ দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু দেখার মধ্যে বেশী মাত্রায় নিমজ্জিত হয়, তখন দেখার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ থাকে না এবং যে চোখ দিয়ে দেখে, সেই চোখের প্রতিও খেয়াল থাকে না। যে অন্তর দ্বারা আনন্দ অনুভব করে, সেই অন্তরও কল্পনায় থাকে না। অনুরূপভাবে কোন বস্তুকে জানা এক বিষয় এবং সেই জানাকে জানা ভিন্ন বিষয়। যেব্যক্তি কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, যখন তার ধ্যানে সেই জ্ঞাত হওয়ার জ্ঞান হবে, তখন সে সেই বস্তু সম্পর্কে গাফেল সাব্যস্ত হবে। ফানার এ অবস্থা অধিকাংশ সময় বিদ্যুতের চমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়- দীর্ঘস্থায়ী হলে তা সহ্য করার শক্তি মানুষের নেই; বরং মাঝে মাঝে এই বোঝার নীচে মানুষ ছট্‌ফট্ করে মৃত্যুবরণ করে। সেমতে বর্ণিত আছে, আবুল হাসান নূরী (রঃ) এক সেমার মজলিসে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা শুনতে পান ঃ-

-আমি সর্বদা তোমার মহব্বতে এমন মজলিসে পৌঁছি, যেখানে পৌঁছার সময় জ্ঞানবুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে যায়।

উদ্ধৃত বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতা শুনামাত্রই তার মধ্যে ওজদ্ দেখা দেয় এবং তিনি একদিকে রওয়ানা হয়ে যান। ঘটনাক্রমে তিনি এক জঙ্গলে পৌঁছলেন, সেখান থেকে সদ্য বাঁশ কেটে নেয়া হয়েছিল এবং বাঁশের শিকড়গুলো ধারালো অবস্থায় খাড়া ছিল। তিনি এগুলোর মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত সেই কবিতা আওড়াতে থাকেন। তাঁর পদযুগল রক্তাপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল। এর পর তিনি কয়েকদিন জীবিত থাকেন এবং পরম প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে চলে যান। এ ধরনের বোধশক্তি ও ওজ্দ সিদ্দীকগণের হয়ে থাকে। সেমার সকল স্তরের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ স্তর।

সেমা ও ওজদ ঃ আত্মার সাথে সেমার মিল সম্পর্কে সুফী ও দার্শনিক বুযুর্গগণ বক্তব্য পেশ করে থাকেন। ওজদের স্বরূপ সম্পর্কে

তাঁদের পক্ষ থেকে অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে আমরা তাঁদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করব। এর পর যে উক্তিটি সুচিন্তিত, তা বর্ণনা করব। সুফীকুল শিরোমণি হযরত যুন্নুন মিসরী (রঃ) বলেন ঃ সেমা সত্যের আগন্তুক। অন্তরকে সত্যের দিকে আন্দোলিত করার জন্যে এর আগমন হয়ে থাকে। অতএব যে সত্যান্বেষায় এটা শুনবে, সে "মুহাক্কিক" তথা সত্যান্বেষী। আর যে প্রবৃত্তির তাড়নায় শুনবে, সে "যিন্দীক" তথা অবিশ্বাসী। তাঁর মতে সেমার মধ্যে ওজদ হচ্ছে সত্যের প্রতি অন্তরের ঝোঁক। অর্থাৎ, যখন সেমার আগন্তুক আসবে, তখন সত্য মওজুদ পাবে। কারণ, তার নামই সত্যের আগন্তুক। আবুল হুমায়ুন দাররাজ সেমার মধ্যে ওজদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– ওজদ সেই অবস্থাকে বলে, যা সেমার সময় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ সেমা আমাকে সৌন্দর্যের মাঠে দৌড়িয়ে নিয়ে যায়, ওজদে ফেলে দেয় এবং অকৃত্রিমতার পানপাত্র পান করায়। আমি এর মাধ্যমে খোদায়ী সন্তুষ্টির স্তরসমূহ অর্জন করেছি এবং পবিত্রতার বাগিচায় ও পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করেছি। শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ সেমার বাহ্যিক রূপ ফেতনা এবং আভ্যন্তরীণ রূপ সতর্কীকরণ। যেব্যক্তি ইশারা বুঝে, তার জন্যে সতর্কীকরণের অবস্থা শ্রবণ করা হালাল। আর যে বুঝে না, সে ফেতনা ও বিপদে পড়তে চায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যারা মারেফতের অধিকারী, তাদের জন্যে সেমা আত্মার খোরাক। আমর ইবনে ওসমান মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ ওজদ সত্যের দিকে মুকাশাফার নাম। আবু সায়ীদ ইবনে আরাবী বলেন ঃ ওজদ হচ্ছে যবনিকা দূর হওয়া, বন্ধুকে প্রত্যক্ষ করা, বিবেক মওজুদ হওয়া, অদৃশ্যকে দেখা, অন্তরের সাথে কথা বলা এবং অহংকার দূর করতে অভ্যস্ত হওয়া। তিনি আরও বলেন ঃ ওজদ বিশেষত্বের প্রথম স্তর এবং অদৃশ্য বিষয়সমূহ সত্যায়ন করার কারণ। সাধক যখন ওজদের স্বাদ আস্বাদন করে এবং তার অন্তরে এর নূর চমকে, তখন তার মনে কোন সন্দেহ সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। এক্ষণে আমরা ওজদ কাকে বলা উচিত, সে সম্পর্কে যা সত্য তাই লিপিবদ্ধ করছি। প্রকাশ থাকে যে, সেমার ফলস্বরূপ যে অবস্থা প্রকাশ পায়, তার নাম ওজদ। অর্থাৎ, শ্রোতা সঙ্গীত শ্রবণ করার পর নিজের মধ্যে একটি নতুন অবস্থা পায়। এ অবস্থার পরিণতি মুশাহাদা ও মুকাশাফা হবে অথবা আগ্রহ, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অস্থিরতা, আনন্দ, পরিতাপ, বিমোচন, সংকোচন ইত্যাদি হবে। সেমা এমন হালকে প্রস্ফুটিত করে অথবা শক্তিশালী করে। সুতরাং সেমা যদি এমন দুর্বল হয় যে, শ্রোতার বাহ্যিক দেহ আন্দোলিত করে না, তবে এরূপ অবস্থাকে ওজদ বলা হবে না। বাহ্যিক দেহে অবস্থার

পরিবর্তন জানা গেলেই কেবল তাকে ওজদ বলা হবে। এটা দুর্বল ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। যার ওজদ হয়, সে হাত পা যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তার বাহ্যিক অবস্থা সেই পরিমাণে পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকে। ফলে প্রায়ই এমন হয় যে, ওজদ অন্তরে শক্তিশালী থাকে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থায় পরিবর্তন আসে না। এক্ষেত্রে যার ওজদ হয়, সে শক্তিশালী হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওজদ দুর্বল হওয়ার কারণে বাইরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর কালাম কোরআন মজীদ শ্রবণ করে সুফীগণের ওজদ হয় না এবং কবিদের কালাম সঙ্গীত শ্রবণ করে ওজদ হয়ে যায়। যদি ওজদ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দানই হত, সত্য হত এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা ও বাতিল না হত, তবে সঙ্গীতের তুলনায় কোরআন দ্বারা অধিকতর ওজদ হওয়া উচিত ছিল। এর জওয়াব হচ্ছে, যে ওজদ সত্য, তা আল্লাহ তাআলার মহব্বতের আতিশয্য এবং তাঁর দীদারের আগ্রহ থেকে উৎপন্ন হয়। এ ধরনের ওজদ কোরআন মজীদ শ্রবণ করলেও স্ফুটিত হয়। পক্ষান্তরে যে ওজদ সৃষ্ট বস্তুর মহব্বত ও এশক থেকে উৎপন্ন হয়, তা অবশ্য কোরআন মজীদ শুনলে স্ফুটিত হয় না। কোরআন মজীদ শুনল যে ওজদ হয়, তার সাক্ষী স্বয়ং কোরআন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

الا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –শুনে রাখা, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

আরও বলা হয়েছে–

مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

–বার বার পঠিত কোরআন। এর কারণে তাদের লোমকূপ শিউরে উঠে, যারা পালনকর্তাকে ভয় করে। এর পর তাদের লোমকূপ ও অন্তর আল্লাহর যিকিরে নরম হয়।

অতএব প্রশান্তি, দেহের লোমকূপ শিউরে উঠা, ভয় এবং অন্তরের নম্রতা– এগুলো ওজদ ছাড়া কিছু নয়। কেননা. ওজদ তাকেই বলা হয়, যা শ্রবণ করার কারণে শ্রবণের পরে নিজের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

–মুমিন তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আরও এরশাদ হয়েছে,–

لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله ـ

যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনত ও বিদীর্ণ হতে দেখতে।

এসব আয়াতে বর্ণিত ভীতি ও বিনয় হচ্ছে ওজদ। তবে এগুলো হাল জাতীয় ওজদ– মুকাশাফা জাতীয় নয়। তবে এগুলো কোন সময় মুকাশাফা ও হুশিয়ারীর কারণ হয়ে যায়। কোরআন শ্রবণ করার সময় খোদাপ্রেমিকগণের ওজদ হয়েছে– এমন কাহিনী বিস্তর। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ সূরা হুদ আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে। এটাও ওজদেরই খবর। কেননা, বার্ধক্য বিমর্ষতা ও ভীতির ফল। বিমর্ষতা ও ভীতি ওজদের মধ্যে দাখিল। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সূরা নেসা তেলাওয়াত করলেন এবং এই আয়াতে পৌঁছলেন–

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ـ

–তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা হাযির করব এবং (হে রসূল!) আপনাকে হাযির করব তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতারূপে!

এ আয়াতে পৌঁছতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ব্যস ব্যস। সাথে সাথে তাঁর নয়নদ্বয় থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলে করীম (সাঃ) নিজে পাঠ করলেন কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে এ আয়াত পাঠ করল–

ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما

–নিশ্চয় আমার কাছে বেড়ী, আগুনের স্তূপ, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

সাথে সাথে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করেন–

ان تعذبهم فانهم عبادك যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস।

তিনি রহমতের আয়াত পাঠ করলে দোয়া করতেন এবং সুসংবাদ প্রার্থনা করতেন। বলাবাহুল্য, সুসংবাদ প্রার্থনা করা ওজদ। কোরআন শ্রবণে যাদের ওজদ হয়, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۔

–তারা যখন শুনে রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে সত্যকে জানার কারণে।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর বক্ষে উনানের উপর ডেগচির ন্যায় স্ফুটনের শব্দ শুনা যেত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যেও অনেকে কোরআন শ্রবণ করে ওজদ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। তাঁদের কেউ কেউ ছিটকে পড়েছেন, কেউ কেউ ক্রন্দন করেছেন এবং কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে তদবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কথিত আছে, সুরারা ইবনে আবি আওফা রিকাকায় লোকজনকে নামায পড়াতেন। একবার এক রাকআতে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ –যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন।

এটা পাঠ করতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং মেহরাবের মধ্যেই প্রাণত্যগ করলেন। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন ঃ

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার আযাব সংঘটিত হবে। তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

আয়াতটি শুনে তিনি চীৎকার করে উঠলেন এবং বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এর পর তিনি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। আবু জরীর তাবেয়ীর সামনে সালেহ মুররী কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করলে তিনি চীৎকার করে মারা যান। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জনৈক কারীকে পাঠ করতে শুনলেন–

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

এটা এমন দিন যে, তারা কথা বলতে পারবে না এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

এতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এমনিভাবে আরও অনেকের কাছ থেকে অনেক গল্প বর্ণিত আছে। সুফী বুযুর্গগণের অবস্থাও তাই বর্ণিত হয়েছে। শিবলী (রহঃ) রমযানের রাতে এক ইমামের পেছনে আপন মসজিদে নামায পড়তেন। ইমাম এই আয়াত পাঠ করল–

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِى اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

–আমি ইচ্ছা করলে আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারি।

এটা শুনে হযরত শিবলী (রঃ) এমন জোরে চীৎকার করলেন যে, লোকেরা মনে করল তাঁর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে। তিনি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন এবং তাঁর কাঁধ অবিরাম কাঁপতে লাগল। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রাঃ) হযরত সিররী সকতীর দরবারে গিয়ে দেখেন, সেখানে এক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হযরত সিররী বললেন ঃ লোকটি কোরআন পাকের এক আয়াত শুনে বেহুশ হয়ে গেছে। হযরত জুনায়দ বললেন ঃ তার কানের কাছে সেই আয়াত পুনরায় পাঠ করুন। আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এল। হযরত সিররী জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ প্রতিকারটি তুমি কোথায় পেলে? জুনায়দ বললেন– হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর অন্ধত্ব সৃষ্ট জীবের কারণে (অর্থাৎ, পুত্র ইউসুফের বিরহে) ছিল। এর পর সৃষ্ট জীব দ্বারাই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। যদি তাঁর অন্ধত্ব আল্লাহর কারণে হত, তা হলে সৃষ্ট জীব দ্বারা (অর্থাৎ, ইউসুফের মিলন দ্বারা) তিনি চক্ষুষ্মান হতে পারতেন না। হযরত সিররী এই জওয়াব শুনে খুবই প্রীত হলেন। জনৈক সুফী এক কারীকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন ঃ

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ـ

হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

তিনি আয়াতটি পুনরায় পাঠ করিয়ে বললেন ঃ চিত্তকে কত ফিরে আসতে বলি, কিন্তু সে ফিরে আসে না। এর পর মত্ত অবস্থায় এমন চীৎকার দিলেন যে, প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হয়, যদি কোরআন শ্রবণ ওজদ সৃষ্টি করতে পারে, তবে সুফীগণ কাওয়ালদের সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্যে কেন একত্রিত হন? ক্বারীদের কাছে সমবেত হয়ে কোরআন শ্রবণ করেন কেন? সুতরাং কোন দাওয়াতে একত্রিত হওয়ার সময় কোন কারীকে ডেকে আনা উচিত–

কাওয়ালকে নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কালাম সঙ্গীতের চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এর জওয়াব হচ্ছে, কোরআন শ্রবণ ওজদের কারণ বটে, কিন্তু এর তুলনায় ওজদের উদ্দীপনা সেমা দ্বারা বেশী হয় কয়েকটি কারণে। প্রথমত কোরআন পাকের সবগুলো আয়াত শ্রোতার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। উদাহরণতঃ যেব্যক্তির মধ্যে বিষাদ, আগ্রহ অথবা অনুতাপের অবস্থা প্রবল, নিম্নোক্ত আয়াত কিরূপে তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে? يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আদেশ করছেন যে, এক পুত্র দু'কন্যার সমান অংশ পাবে। এতে উত্তাধিকারের বিধান বর্ণিত হয়েছে। অপরপক্ষে কবিরা যেসকল কবিতা রচনা করে, সেগুলো মনের অবস্থাই ব্যক্ত করে। ফলে কবিতা দ্বারা মনের অবস্থা বুঝতে তেমন বেগ পেতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ কোরআনের আয়াতসমূহ অধিকাংশ লোকের স্মৃতিতে সংরক্ষিত এবং মনে প্রায়ই জাগরূক থাকে। আর যে কথা প্রথমবার শুনা হয়, তার প্রভাব অন্তরে বেশী হয়। দ্বিতীয়বার শুনলে প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তৃতীয়বারে তো প্রভাব থাকেই না বলা যায়। যার মধ্যে ওজদ প্রবল, তাকে যদি বলা হয়, সর্বদাই এক কবিতা আবৃত্তি করে দিনে একবার অথবা সপ্তাহে একবার ওজদ কর, তবে সে কিছুতেই পারবে না। তবে কবিতা বদলে দিলে অবশ্য তার মধ্যে নতুন ওজদ সৃষ্টি হবে, যদিও বিষয়বস্তু তাই থাকে এবং কেবল শব্দ বদলে দেয়া হয়। কারীর জন্যে সর্বক্ষণ নতুন কোরআন পাঠ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, কোরআন সীমিত। এর শব্দও বদলানো যায় না। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) গ্রামীণ লোকদেরকে কোরআন পাঠ শুনে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন, আমরাও এক সময় এরূপ ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, হযরত আবু বকরের অন্তর গ্রামীণ লোকদের চেয়েও অধিক শক্ত ছিল অথবা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর কালামের প্রতি তাঁর ততটুকু মহব্বত ছিল না, যতটুকু গ্রামীণ লোকদের ছিল। বরং মূল কথা ছিল, অন্তরে বার বার আসার কারণে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কাওয়াল অচেনা ও নতুন কবিতা সব সময় পড়তে পারে, কিন্তু কারী সব সময় নতুন আয়াত তেলাওয়াত করতে পারে না।

সেমার পঞ্চ আদব ও তার ভালমন্দ প্রভাব ঃ এ পর্যন্ত আমরা সেমা হৃদয়ঙ্গম করা ও ওজ্দ– এ দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছি। এক্ষণে তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ, ওজদের বাহ্যিক প্রভাব তথা চীৎকার করা, ক্রন্দন করা ও

বস্ত্র ছিন্ন করা সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমে সেমার পাঁচটি আদব বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আদব হচ্ছে, সেমার মধ্যে স্থান কাল ও সহচরবৃন্দের প্রতি দেখা উচিত। সেমতে হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ সেমার মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় সেমা শ্রবণ করা উচিত নয়। তিনটি বিষয় হচ্ছে, সময় কাল, স্থান ও মজলিসের সহচরবৃন্দ। কালের প্রতি লক্ষ্য রাখার মানে হচ্ছে, খানা হাযির হওয়ার সময়, ঝগড়া বিবাদের সময়, নামাযের সময় অথবা অন্য কোন অন্তরায় থাকার সময় সেমা না হওয়া দরকার। এসব সময়ে সেমা হলে তাতে মন বসবে না। ফলে কোন উপকার হবে না। স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চলন্ত পথে অথবা বিশ্রী গৃহে অথবা যে গৃহে ধ্যান আকর্ষণকারী কোন বস্তু থাকে, তাতে সেমা না হওয়া উচিত। সহচরবৃন্দের প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ হচ্ছে, এমন কোন ব্যক্তি যেন মজলিসে না থাকে, যে সমমনা নয় অথবা যে সেমা অস্বীকার করে অথবা যে অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে মুক্ত। কেননা, এরূপ ব্যক্তির উপস্থিতি অস্বস্তিকর হবে এবং অন্তর তার দিকে মশগুল থাকবে। এ কারণেই যদি কোন অহংকারী দুনিয়াদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, যে লোক দেখানোর জন্যে নৃত্য করে ও বস্ত্র ছিন্ন করে, তবে এরূপ লোকও অন্তরের অস্বস্তির কারণ হয়। তাদের থেকেও দূরে থাকা জরুরী। মোট কথা, এসব শর্তের অনুপস্থিতিতে সেমা শ্রবণ না করাই উত্তম।

দ্বিতীয় আদব হচ্ছে, যদি মুরীদদের জন্য সেমা ক্ষতিকর হয়, তবে তাদের সামনে শায়খের সেমা শ্রবণ না করা উচিত। কাজেই শায়খ পূর্বাহ্ণে মুরীদদের অবস্থা দেখে নেবেন। তিন প্রকার মুরীদের জন্যে সেমা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। (১) যে মুরীদ আত্মিক পথে বাহ্যিক আমল ছাড়া অন্য কিছু আয়ত্ত করেনি এবং সেমার কোন স্বাদই পায়নি। এরূপ মুরীদের সেমায় মশগুল হওয়া নিষ্ফল। তার উচিত যিকির অথবা অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া। সেমা তার জন্যে অযথা সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছু নয়। (২) যে মুরীদ সেমার রুচি রাখে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার মধ্যে জৈবিক বাসনা ও কামভাব বিদ্যমান আছে এবং এগুলোর বিপদাপদ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই মাঝে মাঝে সেমা তার মধ্যে ক্রীড়া ও কামভাব জাগ্রত করে দিতে পারে এবং সাধনার পথে বাধা হয়ে যেতে পারে। (৩) যে মুরীদ কামভাব ও তার বিপদাপদ থেকে মুক্ত এবং অন্তরে খোদায়ী মহব্বতও প্রবল, কিন্তু সে বাহ্যিক এলেম পূর্ণরূপে অর্জন করেনি, আল্লাহর

নামসমূহ এবং সিফাত সম্পর্কেও সম্যক অবগত হয়নি, আল্লাহর জন্যে কি বৈধ এবং কি অবৈধ, তাও জানেনি, এরূপ ব্যক্তির সামনে সেমার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলে সে যা কিছু শুনবে, তাই আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে কল্পনা করবে- বৈধ হোক বা না হোক। এমতাবস্থায় সঙ্গীত দ্বারা যে উপকার হত, তার তুলনায় ক্ষতি বেশী হবে। কেননা, আল্লাহর শানে বৈধ নয় এরূপ বিষয় আল্লাহর মধ্যে কল্পনা করলে কাফের হয়ে যাবে। সহল তশতরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ওজদের পক্ষে কোরআন ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় না, তা বাতিল। মোট কথা, সেমা পদস্খলনের জায়গা। দুর্বলদেরকে এ থেকে আলাদা রাখা ওয়াজেব। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে শয়তানকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুই আমাদের সহচরদেরকেও বশ করতে পারিস? সে বলল ঃ হাঁ, দু'সময়ে! সেমার সময় এবং দৃষ্টিপাত করার সময়। এই দু'সময়ে তাদের উপর আমার দখল হয়ে যায়। এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে জনৈক বুযুর্গ বললেন ঃ আমি শয়তানকে দেখলে বলতাম ঃ তোর মত নির্বোধ কেউ নেই। যে শুনার সময় আল্লাহর কাছ থেকেই শুনে এবং দেখার সময় আল্লাহকেই দেখে, তার উপর জয়ী হবি কিরূপে? জুনায়দ বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

তৃতীয় আদব হচ্ছে, কাওয়াল যা কিছু বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এদিক-ওদিক ভ্রূক্ষেপ কম করবে। শ্রোতাদের দিকে তাকাবে না। তাদের উপর ওজদ প্রকাশ পেলে তা দেখবে না; বরং নিজের দিকে ধ্যান দেবে এবং মনের দেখাশুনা করবে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহমতে তোমাকে কি দেন, সেদিকে দেখবে। নড়াচড়া করবে না। এতে জলসার সহচরেরা পেরেশান হবে। এমনভাবে বসবে যেন দেহ নড়াচড়া না করে। খাকরানো ও হাই তোলা থেকে বিরত থাকবে। তালি বাজানো, নৃত্য করা ইত্যাদি সকল কৃত্রিম ও লোক দেখানো কাণ্ড পরিহার করবে। সেমার সময় অনাবশ্যক কথা বলবে না। ওজদ প্রবল হয়ে গেলে তা তিরস্কারযোগ্য নয়, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করবে। লোক-নিন্দার ভয়ে পূর্বাবস্থায় কায়েম থাকবে না। জবরদস্তি ওজদ প্রকাশ করা অনুচিত। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে ওয়ায করলেন। এক ব্যক্তি ওয়ায শুনে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসার প্রতি ওহী পাঠালেন- তাকে বলে দাও, সে যেন আমার জন্যে অন্তরকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, বস্ত্রকে নয়। আবু আমর বললেন ঃ যে অবস্থা নিজের মধ্যে নেই, সঙ্গীত শুনে তা প্রকাশ করা ত্রিশ বছর গীবত করার চেয়েও খারাপ।

চতুর্থ আদব হচ্ছে, নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হলে দণ্ডায়মান হবে না এবং উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করবে না, কিন্তু যদি রিয়া ব্যতিরেকে নৃত্য করে এবং কান্নার আকৃতি ধারণ করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, কান্নার আকৃতি ধারণ করলে ভয় সৃষ্টি হয় এবং নৃত্য আনন্দ ও স্ফূর্তির কারণ হয়। মোবাহ আনন্দকে আন্দোলিত করা জায়েয। নৃত্য অবৈধ হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হাবশীদের নৃত্য পরিদর্শন করতেন না। আনন্দের আতিশয্যে কোন কোন সাহাবীও নৃত্য করেছেন বলে বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত আমীর হামযার শিশু কন্যার প্রতিপালন কে করবে– এ নিয়ে যখন হযরত আলী মুর্তযা, তাঁর ভ্রাতা জাফর এবং যায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর মধ্যে কলহ দেখা দেয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তুমি আমার এবং আমি তোমার। একথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জাফরকে বললেন, তুমি আমার আকৃতি ও চরিত্রের অনুরূপ হয়েছ। একথা শুনে তিনি হযরত আলীর চেয়েও অধিক নৃত্য করলেন। তিনি হযরত যায়দকে বললেন ঃ তুমি আমার ভাই ও মওলা। একথা শুনে তিনি নৃত্যে হযরত জাফরকেও হার মানিয়ে দিলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই শিশুকন্যা জাফরের কাছে লালিত-পালিত হবে। কেননা, তার খালা জাফরের স্ত্রী। খালা মায়ের সমান। মোট কথা, মানুষ আনন্দের আতিশয্যে নৃত্য করে। সুতরাং আনন্দ বৈধ হলে এবং নাচের মাধ্যমে উন্নত ও জোরদার হলে নাচ প্রশংসনীয় ও বৈধ হবে। পক্ষান্তরে আনন্দ অবৈধ হলে নৃত্যও অবৈধ হবে। এতদসত্ত্বেও নাচানাচি বুযুর্গ ও অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের জন্যে সমীচীন নয়। কেননা, এটা অধিকাংশ ক্রীড়া-কৌতুকের ছলে হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যে বিষয় ক্রীড়া-কৌতুকের শামিল, তা থেকে অনুসৃত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেঁচে থাকা উচিত, যাতে তারা সাধারণ দৃষ্টিতে হেয় না হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের অনুসরণ বর্জন না করে। ওজদের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করার অনুমতি নেই, কিন্তু যদি ওজদ এতদূর প্রবল হয় যে, মানুষ তার এখতিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে ভিন্ন কথা। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হবে, যার দ্বারা জবরদস্তি কোন কাজ করানো হয়।

পঞ্চম আদব হচ্ছে, যদি জলসার কোন ব্যক্তি সত্যিকার ওজদের কারণে দাঁড়িয়ে যায় অথবা ওজদ প্রকাশ করা ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় দাঁড়িয়ে যায় এবং তার খাতিরে সকলেই দণ্ডায়মান হয়, তবে তুমিও দণ্ডায়মান হবে। কেননা, জলসার শরীকদের সাথে মিল রাখা সংসর্গের অন্যতম

শিষ্টাচার। এক্ষেত্রে "যেমন দেশ তেমন বেশ" হওয়া উচিত। কেননা, সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধাচরণ আতংকের কারণ হয়ে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন- خالقوا الناس باخلاقهم অর্থাৎ, মানুষের সাথে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মেলামেশা কর। বিশেষত অভ্যাস যদি এমন হয়, যার সাথে মিল রাখলে সামাজিক শিষ্টাচার পালিত হয় এবং মানুষ খুশী হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে মিল রাখা জরুরী। সাহাবায়ে কেরামের আমলে এটা ছিল না বিধায় কেউ যদি একে বেদআত বলে, তবে এর জওয়াব হচ্ছে, যত মোবাহ্ কাজ রয়েছে, সবগুলো সাহাবায়ে কেরামের আমলে ছিল না। কাজেই প্রত্যেক বেদআত নিষিদ্ধ বেদআত নয়। বরং যে বেদআত কোন সুন্নতের বিরুদ্ধে যায়, তাই নিষিদ্ধ। আলোচ্য বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন আগন্তুকের জন্যে দাঁড়ানো আরবদের অভ্যাস ছিল না। এমনকি, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যেও কোন কোন অবস্থায় দাঁড়াতেন না। হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে এটা জানা যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নেই বিধায় যেসব এলাকায় আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে, সেখানে তা নিষিদ্ধ হবে না। কেননা, সম্মান প্রদর্শন করা ও মন খুশী করাই এর উদ্দেশ্য।

নবম অধ্যায়

সৎকাজে আদশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

প্রকাশ থাকে যে, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ করতে মানা করা ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। এর জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। যদি এ কাজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়, তবে নবুওয়ত নিরর্থক, ধর্মকর্ম অন্তর্হিত, শৈথিল্য ব্যাপক, পথভ্রষ্টতা চরম, মূর্খতা সর্বব্যাপী এবং ফেতনার বাজার গরম হয়ে যাবে। তবে যে বিষয়ের আশংকা ছিল, তা এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ, ধর্মের এই মূল স্তম্ভটি বর্তমানে সর্বত্র উপেক্ষিত। এর স্বরূপ ও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। মানুষ জৈবিক বাসনা ও কাম-প্রবৃত্তিতে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় স্বাধীন হয়ে গেছে। ভূপৃষ্ঠে এমন সত্যিকার ঈমানদার এখন দুর্লভ, যে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। এমতাবস্থায় যেব্যক্তি এই ত্রুটি দূর করতে এবং এই ছিদ্র বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে, সে সকল মানুষের মধ্যে সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করার কারণে সুখ্যাত হবে এবং এমন পুরস্কারে ভূষিত হবে, যার সমতুল্য কোন পুরস্কার নেই। আমরা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু চারটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদেশ ও নিষেধের ফযীলত এবং বর্জনের নিন্দা

এ সম্পর্কে কোরআন পাকের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় থাকা চাই, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। তারা সৎকাজ করার আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে, তারাই হবে সফলকাম।

এই আয়াতে প্রথম বিষয় হচ্ছে, এতে আদেশসূচক পদবাচ্য অর্থাৎ, وَلْتَكُنْ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যায়, এ কাজটি ওয়াজিব। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, সাফল্যকে বিশেষভাবে এর সাথেই জড়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে– তারাই হবে সফলকাম। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা একটি ফরযে কেফায়া– ফরযে আইন

নয়। যদি মুসলিম জাতির কিছু লোকও এ কাজটি সম্পাদন করে, তবে অবশিষ্টরা ফরয থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, এরূপ বলা হয়নি যে, তোমরা সকলেই এ কাজে ব্রতী হও। বরং বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায়ের এ কাজ সম্পাদন করা উচিত। এ কারণেই এক বা এ কাধিক ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদন করলে অন্যরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে, কিন্তু বিশেষ সফলতা তাদেরই প্রাপ্য হবে, যারা এ কাজ করবে। পক্ষান্তরে যদি সমগ্র জাতি এ কাজ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তবে শাস্তি সবাইকে ভোগ করতে হবে; বিশেষত যাদের এ কাজের ক্ষমতা আছ।

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

আহলে কিতাবের সকলেই সমান নয়। একদল সরল পথে রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, সেজদা করে, আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কাজে প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হয়। তারাই সৎকর্মপরায়ণ।

এ আয়াতে কেবল আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করাকেই সৎকর্মপরায়ণতা আখ্যা দেয়া হয়নি; বরং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ـ

ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষরা একে অপরের সাহায্যকারী। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং নামায কায়েম করে।

এ আয়াতে ঈমানদারের বিশেষণে বলা হয়েছে যে, তারা ভাল কাজের আদেশ করে। অতএব যারা এটা বর্জন করবে, তারা ঈমানদারদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسٰى

ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ـ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাঊদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের বাচনিক অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল পাপিষ্ঠ এবং সীমালংঘনকারী। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করত না, যা তারা করত, তা খুবই মন্দ!

এ আয়াতে তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ কঠোর ভাষায় এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মন্দ কাজে নিষেধ বর্জন করেছিল।

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ـ

–তোমরা সর্বশেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে।

এ আয়াত থেকে আদেশ ও নিষেধের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। কেননা বলা হয়েছে, এ ধরনের লোক সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ـ

অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম, যারা অসৎ কাজ করতে নিষেধ করত এবং যালেমদেরকে শোচনীয় শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

এতে মন্দ কাজে নিষেধকারীদের রক্ষা পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ـ

–যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে।

এ আয়াতে আদেশ নিষেধকে নামায ও যাকাতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, এটা ওয়াজিব।

تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان -

তোমরা সৎকাজে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।

এখানে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে, সৎকাজে উৎসাহ যোগাবে, কল্যাণের পথ সুগম করবে এবং যতদূর সম্ভব অনিষ্ট ও সীমালঙ্ঘনের পথ রুদ্ধ করে দেবে।

لو لا ينهيهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون -

পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা তাদেরকে পাপাচারের কথা বলতে এবং হারাম খেতে নিষেধ করল না কেন? তাদের ক্রিয়াকর্ম খুবই মন্দ।

এতে বলা হয়েছে, নিষেধ বর্জন করার কারণে তারা গোনাহগার হয়েছে।

فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد فى الارض -

তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন প্রভাবশালী লোক যদি না থাকত যারা পৃথিবীতে দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করত।

এতে বলা হয়েছে, যারা দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করত, তাদের ছাড়া আমি সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم اوالوالدين والاقربين -

মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্য দাও যদিও তা স্বীয় স্বার্থ, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।

অতএব পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এটাই হচ্ছে সৎকাজের আদেশ।

لاخير فى كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما -

তাদের অধিকাংশ কানাঘুষায় কল্যাণ নেই; কিন্তু যে দান-খয়রাতের, সৎকাজের এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের আদেশ করে যে এটা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত, তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করব।

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ـ

–যদি মুমিনদের দু'দল পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।

অবাধ্যতা করতে মানা করা এবং আনুগত্যে আনাই হচ্ছে সন্ধি স্থাপন। তারা এটা না মানলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْئَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ـ

যে দল অবাধ্য হয়, তোমরা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশের দিকে ফিরে না আসে।

এরই নাম অসৎ কাজে নিষেধ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ মুসলমানগণ, তোমরা কোরআন শরীফের একটি আয়াত পাঠ কর এবং তার বিপরীত তফসীর করে থাক। আয়াতটি এই–

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ـ

–মুমিনগণ, তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যদি হেদায়াত পাও, তবে কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কিছু আসে-যায় না।

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

مَا بَيْنَ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِىْ وَفِيْهِمْ مَنْ يَقْدِرُ اَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ اِلَّا يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ ـ

যে সম্প্রদায় গোনাহ্ করে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে, যে তাদেরকে নিষেধ করতে সক্ষম, যদি সে নিষেধ না করে, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতের সময়কাল এখন নয়। কেননা, এখন উপদেশ মানা হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে,

যখন সংকাজের আদেশ করা হলে নির্যাতন ভোগ করতে হবে এবং তুমি কিছু বললে কেউ তা শুনবে না। তখন তোমাকে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং শুধু নিজের চিন্তা করতে হবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর দুষ্ট লোকদেরকে চাপিয়ে দেবেন। তখন তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি দোয়া করলেও তা কবুল হবে না। অর্থাৎ, ভাল লোকদেরকে কেউ ভয় করবে না। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন- লোকসকল, আল্লাহ তা'আলার আদেশ হচ্ছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ সে দিন আসার পূর্বে, যখন তোমরা দোয়া করলে তা কবুল হবে না। এক হাদীসে আছে- আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, কিসে তোমাকে মন্দ কাজে নিষেধ করা থেকে বিরত রাখল? তখন যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে জওয়াব শিখিয়ে দেন, তবে সে আরজ করবে ঃ ইলাহী, আমি তোমার উপর ভরসা করেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম। অন্য হাদীসে এরশাদ হয়ছে- মানুষের সব কথাবার্তা ক্ষতিকর হয়ে থাকে- উপকারী হয় না; কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। এটা ক্ষতিকর হয় না। আরও বলা হয়েছে- আল্লাহ্ তা'আলা বিশিষ্ট লোকগণকে সাধারণ লোকদের গোনাহের কারণে শাস্তি দেন না, কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি কোন কুকর্ম করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিশিষ্ট লোকেরা বাধা না দেয়, তবে বিশিষ্ট লোকদের উপর আযাব নাযিল করা হয়।

আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের স্ত্রীরা অবাধ্য হয়ে যাবে, যুবকরা কুকর্ম শুরু করবে এবং তোমরা জেহাদ পরিত্যাগ করবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি অবশ্যই হবে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহর কব্জায় আমার প্রাণ, তার কসম, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এর চেয়ে গুরুতর ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি দশা হবে যখন তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে না এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে না? প্রশ্ন করা হল ঃ এটা কি হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, এর চেয়েও গুরুতর কাজ হবে। শ্রোতারা আরজ করল ঃ এর চেয়ে গুরুতর কাজ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা ভাল কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভাল মনে করবে? তারা আরজ করল ঃ ইয়া

রসূলাল্লাহ্! এটাও হবে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, এর চেয়েও কঠিন ব্যাপার হবে। প্রশ্ন হল, এর চেয়ে কঠিন ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমরা অসৎ কাজের আদেশ করবে এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করবে? শ্রোতারা আরজ করল ঃ এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হবে। আল্লাহ তা'আলা নিজের কসম খেয়ে বলেন ঃ আমি তাদের উপর এমন ফেতনা বসিয়ে দেব যে, বুদ্ধিমানরা বিপাকে পড়ে যাবে। ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন– যেব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার কাছে দাঁড়িয়ো না। কেননা, যে সেখানে উপস্থিত থাকে এবং এই বিপদ প্রতিরোধে সচেষ্ট হয় না, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়, তার কাছেও দাঁড়িয়ো না। কেননা, যে তার কাছে থেকে যুলুম প্রতিরোধ করে না, তার উপরও লা'নত বর্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যেব্যক্তি কোন স্থানে উপস্থিত থাকে, সত্য বলা থেকে বিরত থাকা তার জন্যে অনুচিত। কেননা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হবে না এবং যে রিযিক তার তকদীরে আছে, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে না। (এমতাবস্থায় সত্য কথা বলতে ভয় কিসের?) এ হাদীসটি এ কথা জ্ঞাপন করে যে, যালেম ও ফাসেকদের গৃহে যাওয়া দুরস্ত নয় এবং এমন স্থানেও যাওয়া জায়েয নয়, যেখানে মন্দ কাজ দেখতে হয় এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। কেননা, হাদীসে উপস্থিত ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। এ কারণেই কোন কোন পূর্ববর্তী বুযুর্গ নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন, হাটে-বাজারে, ঈদের ময়দানে এবং জনসমাবেশে সর্বত্রই কুকর্ম সংঘটিত হয় এবং তাঁরা তা দূর করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় মানুষের কাছ থেকে হিজরত অপরিহার্য। এ কারণেই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) বলেন ঃ পরিব্রাজকরা আপন ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্তুতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এর কারণ তাই, যা আমরা ভোগ করছি; অর্থাৎ, তারা দেখেছে, অনাচার প্রকট এবং সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন। উপদেশদাতার কথা কেউ মানে না এবং ফেতনা-ফাসাদে সবাই লিপ্ত। তারা আশংকা করেছে, কোথাও খোদায়ী আযাব তাদেরকে স্পর্শ করে না বসে। তাই তারা এমন লোকদের সাথে বসবাস করার চেয়ে হিংস্র প্রাণীর সাথে বসবাস এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করার চেয়ে

লতাপাতা খেয়ে জীবন নির্বাহ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এর পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর। আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী। এর পর তিনি বলেন ঃ কিছু লোক পলায়ন করেছে। যদি আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের মধ্যে কোন রহস্য না রাখতেন, তবে আমরা বলতাম, নবী তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কেননা, আমরা জেনেছি, ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও মোসাফাহা করে এবং হিংস্র প্রাণীরা তাদের দর্শন লাভ করে বাইরে চলে যায়। তাদের কেউ হিংস্র প্রাণীকে ডাক দিলে তারা সাড়া দেয়। আর যদি জিজ্ঞেস করে, কোন্ স্থানে যাওয়ার আদেশ পেয়েছ, তবে হিংস্র প্রাণীরা তাদেরকে তা বলে দেয়। অথচ তারা নবী নয়। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কোন গোনাহে উপস্থিত থাকে এবং তাকে খারাপ মনে করে, সে এমন যেন সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যে গোনাহে উপস্থিত থাকে না, কিন্তু তাকে ভাল মনে করে, সে এমন, যেন তাতে উপস্থিত রয়েছে। হাদীসের অর্থ হচ্ছে, কোন প্রয়োজনে গোনাহের জায়গায় উপস্থিত থাকে অথবা ঘটনাক্রমে তার সামনে গোনাহ হতে থাকে। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে গোনাহের জায়গায় যাওয়া নিষিদ্ধ।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন– আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবীর সহচর হয়েছে। তারা আপন আপন সম্প্রদায়ে থেকে আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা, তাঁর কিতাব ও আদেশ অনুসারে কাজ করতে থাকবে। অবশেষে যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে তুলে নেবেন, তখন সহচরেরা আল্লাহর কিতাব ও আদেশ অনুসারে এবং তাঁর নবীর সুন্নত অনুসারে আমল করতে থাকবে। যখন তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, তখন এক সম্প্রদায় হবে, যারা মিম্বরে চড়ে এমন এমন কথা বলবে, যা তারা জানে এবং কাজ এমন করবে, যা জানে না। এরূপ সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদারের উপর ওয়াজিব হবে। যদি হাতে জেহাদ করতে সক্ষম না হও, তবে মুখে জেহাদ করবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তবে অন্তর দ্বারা জেহাদ করবে। এর পর ইসলাম নেই। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক বস্তির লোকজন পাপাচারী ছিল। তাদের মধ্যে চার ব্যক্তি তাদের ক্রিয়াকর্ম খারাপ মনে করত। তাদের একজন এই অনাচারের বিরুদ্ধে তৎপর হল। সে লোকজনকে বলল, তোমাদের কুকর্ম

পরিত্যাগ কর, কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করল কুকর্ম পরিত্যাগ করল না। সে তাদেরকে মন্দ কথা বলল। জওয়াবে তারাও তাকে মন্দ বলল। অবশেষে সে তাদের সাথে যুদ্ধ করল, কিন্তু যুদ্ধে তারাই জয়ী হল। এর পর সে তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। তারা মানেনি। আমি তাদেরকে গালমন্দ করেছি, প্রত্যুত্তরে তারাও আমাকে গালমন্দ করেছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু তারাই জয়ী হয়েছে। এর পর সে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল। এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি অসৎ কাজে নিষেধ করতে তৎপর হল এবং প্রথম ব্যক্তির ন্যায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে আল্লাহর দরবারে নালিশ করে অন্যত্র চলে গেল। এমনিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তিও তাই করল।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এই চার জনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির মর্তবা সবচেয়ে কম ছিল, কিন্তু তোমাদের মধ্যে তার সমতুল্যও দুর্লভ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এমন জনপদও ধ্বংস হয় কি, যেখানে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ থাকে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। প্রশ্নকারী এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কেননা, সৎকর্মপরায়ণরা অলসতা করে এং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে চুপ থাকে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জনৈক ফেরেশতাকে আদেশ করলেন, অমুক শহরকে তার বাসিন্দাদের উপর উল্টিয়ে দাও। ফেরেশতা আরজ করল ঃ ইয়া রব, সেই শহরে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে এক মুহূর্তও আপনার নাফরমানী করেনি। আল্লাহ্ বললেন ঃ তার উপর এবং সকল অধিবাসীর উপর শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কেননা, বস্তিবাসীদের নাফরমানী দেখে এক মুহূর্তের জন্যেও তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করলেন, এক জনপদের অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হল। তাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল, যাদের আমল পয়গম্বরগণের আমলের মত ছিল। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা কিরূপে হল? তিনি বললেন ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে ক্রুদ্ধ হত না এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করত না। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আরও জেহাদ আছে

কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, পৃথিবীতে আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করে, তারা শহীদদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত এবং পৃথিবীতে চলাফেরা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন এবং জান্নাতকে তাদের জন্যে এমন সজ্জিত করেন, যেমন উম্মে সালামার জন্যে সজ্জিত হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্র খাতিরে শত্রুতা রাখে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তারা শহীদদের কক্ষের উপরে থাকবে। প্রত্যেক কক্ষে তিন লক্ষ দরজা হবে। কিছু দরজা ইয়াকুত ও সবুজ পান্না নির্মিত হবে এবং প্রত্যেক দরজায় নূর থাকবে। তাদের এক ব্যক্তির বিবাহ তিন লক্ষ আলোচনা হুরের সাথে হবে। যখন সে তাদের কোন একজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তখন সে বলবে– তোমার মনে আছে কি যে, অমুক দিন তুমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছিলে? আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, শহীদগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক মহৎ কে? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি, যে কোন যালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং এ কারণে নিহত হয়। যদি যালেম শাসনকর্তা তাকে হত্যা না করে, তবে সে যতদিন জীবিত থাকবে তার আমলনামায় গোনাহ্ লেখা হবে না।

এ সম্পর্কিত মহাজন উক্তি নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কর। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কোন অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপিয়ে দেবেন। সে তোমাদের বড়দের সম্মান করবে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে না। তোমাদের সৎলোকেরা তাকে বদদোয়া দিলে সেই বদদোয়া কবুল হবে না। তোমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়ে সাহায্য পাবে না। ক্ষমা প্রার্থনা করলে তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ জীবিতদের মধ্যে মৃত কে? তিনি বললেন ঃ যে মন্দ কাজ হতে দেখে হাত লাগিয়ে তা প্রতিহত করে না, মুখে মন্দ বলে না এবং অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে না। বেলাল ইবনে সা'দ বলেন ঃ নাফরমানী যখন গোপনে করা হয়, তখন তা কেবল যে নাফরমানী করে, তারই ক্ষতি করে, কিন্তু যখন প্রকাশ্যে করা হয় এবং কেউ নিষেধ করে না, তখন

সাধারণ মানুষের ক্ষতি সাধন করে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজেকে ছাড়া অন্য কারও উপর ক্ষমতা রাখে না, সে যদি নিজের বেলায় আদেশ ও নিষেধের কর্তব্য পালন করে এবং অন্যেরা মন্দ কাজ করলে তাকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে, তবে এতটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। ফোযায়লকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ কিছু লোক আদেশ ও নিষেধ করে কাফের হয়ে গেছে। কারণ, আদেশ ও নিষেধের প্রত্যুত্তরে তাদের উপর যে নির্যাতন করা হয়, তাতে তারা সবর করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদেশ নিষেধের রোকন ও শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, আদেশ নিষেধের গোটা ব্যাপারটি চার ভাগে বিভক্ত ঃ (১) আদেশ ও নিষেধকারী, (২) যাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়, (৩) যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয়; অর্থাৎ, সৎকাজ ও গোনাহ এবং (৪) স্বয়ং আদেশ ও নিষেধ। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা রোকন ও শর্ত আছে।

আদেশ ও নিষেধকারীর শর্ত ঃ আদেশ ও নিষেধকারী হওয়ার জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে "মুকাল্লাফ" (শরীয়তের বিধিবিধান পালনের যোগ্য) হওয়া; অর্থাৎ, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কেননা, যে মুকাল্লাফ নয়, তার জন্যে শরীয়তের কোন বিধান পালন করা জরুরী নয়। আমরা এখানে যেসকল শর্ত লিপিবদ্ধ করব, সেগুলো ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, জায়েয হওয়ার নয়। কাজেই যে বালক ভালমন্দের জ্ঞান রাখে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি, সে মুকাল্লাফ না হলেও ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা তার জন্যে জায়েয। উদাহরণতঃ সে শরাব মাটিতে ঢেলে দিতে এবং খেলাধুলার সামগ্রী ভেঙ্গে দিতে পারে। এটা করলে সে সওয়াব পাবে এবং তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই।

দ্বিতীয় শর্ত মুমিন মুসলমান হওয়া। কেননা, ধর্মকে সমুন্নত রাখার অপর নাম হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। অতএব যে ধর্ম অস্বীকার করে এবং ধর্মের শত্রু, সে এর যোগ্য হবে কিরূপে?

তৃতীয় শর্ত "আদেল" (অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত) হওয়া। এটা কারও কারও মতে শর্ত। তারা বলেন ঃ যে ফাসেক তথা পাপাচারী, তার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ দুরস্ত নয়। এ

সম্পর্কে তাদের প্রথম দলীল হচ্ছে, কোরআন মজীদে সেই লোকদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যারা যা বলে, তদনুযায়ী কাজ করে না।

আল্লাহ বলেন ঃ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? আরও বলা হয়েছে-

كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ـ

'তোমরা যা করবে না, তা বলবে– এটা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়।'

দ্বিতীয় দলীল– রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ মে'রাজের রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছেও গিয়েছি, যাদের ঠোঁট কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল ঃ আমরা ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজেরা তা করতাম। তৃতীয় দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, তুমি নিজেকে উপদেশ দাও। যখন সে উপদেশ মেনে নেয়, তখন অপরকে উপদেশ দাও। নতুবা আমার কাছে লজ্জা কর। চতুর্থ দলীল হচ্ছে, অপরকে পথ প্রদর্শন করা নিজে পথে থাকারই শাখা। এমনিভাবে অপরকে সোজা করা নিজে সোজা হওয়ার শাখা। সুতরাং যেব্যক্তি নিজে পথপ্রাপ্ত হবে না, সে অপরকে কিরূপে পথ দেখাবে?

তাদের এসব দলীল নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সত্য হচ্ছে, যে ফাসেক, তার জন্যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা জায়েয। এর প্রমাণ হচ্ছে, দেখতে হবে, আদেশ ও নিষেধকারীর জন্যে সকল গোনাহ থেকে মাসুম তথা পবিত্র হওয়া শর্ত কি না? যদি বলা হয় শর্ত, তবে এটা উম্মতের এজমার বিপরীত। এছাড়া এর মানে হবে আদেশ ও নিষেধের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়া। কেননা, নিষ্পাপ সাহাবীগণও ছিলেন না। অন্যদের তো কথাই নেই। এ কারণেই সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রহঃ) বলেন ঃ যদি আদেশ ও নিষেধ কেবল সেই ব্যক্তি করে, যার মধ্যে কোন গোনাহ নেই, তবে কেউ এ কর্তব্য পালন করতে পারবে না। ইমাম মালেক এ উক্তি পছন্দ করেছেন। যদি বলা হয়, সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়, ফলে রেশমী বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তির জন্যে জায়েয আছে, সে যিনা ও মদ্যপান থেকে নিষেধ করতে পারে; তা

হলে আমরা জিজ্ঞেস করব, মদ্যপায়ীর জন্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা জায়েয হবে কি? যদি বলা হয়, জায়েয নয়, তবে এটা এজমার খেলাফ। কেননা, মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীতে সর্বদাই সৎ, বীর মদ্যপায়ী, এতীমদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারকারী সর্বপ্রকার লোক থাকত। তাদেরকে জেহাদ করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে হয়নি এবং পরবর্তীকালেও নিষেধ করা হয়নি। যদি বলা হয়, মদ্যপায়ীর জন্যে জেহাদ করা জায়েয, তবে আমরা প্রশ্ন করব, তার জন্যে হত্যা করতে নিষেধ করাও জায়েয হবে কি না? জায়েয না হলে আমরা বলব, তা হলে মদ্যপায়ী ও রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীর মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত যে, রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীর জন্যে মদ্যপানে নিষেধ করা জায়েয। অথচ হত্যা, মদ্যপান এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান একই পর্যায়ের মন্দ কাজ। এগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যদি বলা হয়, মদ্যপায়ীর জন্যে হত্যা করতে নিষেধ করা জায়েয এবং এর কারণ হচ্ছে, যেব্যক্তি একটি গোনাহ করে, তার জন্যে এর মতই এবং এর চেয়ে নিম্নস্তরের গোনাহ থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়; বরং সে উপরের স্তরের গোনাহ থেকে নিষেধ করতে পারে। তবে এ দাবী জবরদস্তি এবং এর কোন দলীল নেই। কেননা, এটা অসম্ভব নয় যে, মদ্যপায়ী যিনা ও হত্যা থেকে নিষেধ করবে এবং যে যিনা করে, সে মদ্যপান থেকে নিষেধ করবে; বরং এটাও অসম্ভব নয় যে, একজন নিজে মদ্যপান করবে এবং তার গোলাম ও চাকরদেরকে মদ্যপান করতে নিষেধ করবে। সে বলবে, নিষেধ মান্য করা এবং অপরকে নিষেধ করা এ দু'টি বিষয়ই আমার উপর ওয়াজিব। এখন একটি বিষয়ে যদি আমি গোনাহ করি, তবে অপরটিতেও আল্লাহর নাফরমান হওয়া আমার জন্যে কিরূপে অপরিহার্য হবে? যদি কেউ বলে, এ বক্তব্যদৃষ্টে কেউ বলতে পারে, আমার উপর ওযু ও নামায দুটি বিষয়ই ওয়াজেব, কিন্তু আমি ওযু করব, নামায পড়ব না এবং সেহরী খাব, রোযা রাখব না; তবে এর জওয়াব হচ্ছে, এতদুভয়ের মধ্যে ওযু নামাযের জন্যে ওয়াজিব, এমনিতে ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে সেহরী খাওয়া রোযার জন্যে। রোযা না হলে সেহরী খাওয়া মোস্তাহাব হত না, কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তু এরূপ নয়। এখানে অপরের সংশোধন নিজের সংশোধনের জন্যে এবং নিজের সংশোধন অপরের সংশোধনের জন্যে উদ্দেশ্য হয় না। তবে ওযু ও নামাযের ক্ষেত্রে এতটুকু বিষয়ই জরুরী হয় যে, যেব্যক্তি ওযু করে কিন্তু নামায পড়ে না, তার শাস্তি সেই ব্যক্তির তুলনায় কম হবে, যে ওযু ও নামায উভয়টি বর্জন করে। এমনিভাবে যেব্যক্তি অপরকে নিষেধ করা

এবং নিজে বিরত থাকা উভয়টি বর্জন করবে, তার শাস্তি সেই ব্যক্তির তুলনায় বেশী হবে, যে অপরকে নিষেধ করে; কিন্তু নিজে নিষেধ মানে না।

এক্ষণে যারা কোরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, তাদের জওয়াব হচ্ছে, আয়াতে ভাল কাজ বর্জন করার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে– আদেশ করার নিন্দা করা হয়নি, কিন্তু আদেশ দ্বারা তাদের এলেমের জোর পাওয়া যায়। আর যে আলেম, সে সৎকাজ বর্জন করলে শাস্তি অধিক হয়। কারণ, এলেমের শক্তি থাকলে তার কোন ওযর থাকে না। এছাড়া لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ –আয়াতে মিথ্যা ওয়াদা বুঝানো হয়েছে। প্রথমে নিজেকে উপদেশ দাও– হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির মধ্যে মৌখিক আদেশ ও নিষেধ করার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এটা আমরাও স্বীকার করি, ফাসেকের মৌখিক উপদেশ তাদের জন্যে উপকারী নয় যারা তার পাপাচার সম্পর্কে অবগত আছে। এ উক্তির শেষে বলা হয়েছে– আমাকে লজ্জা কর, এ থেকেও অপরকে উপদেশ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায় না; বরং এর অর্থ হচ্ছে, অধিক জরুরী বিষয় ত্যাগ করে কম জরুরী বিষয়ের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ো না; যেমন কথায় বলে– প্রথমে পিতার সম্মান কর, এর পর প্রতিবেশীর। নতুবা লজ্জা কর।

কারও কারও মতে চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, আদেশ ও নিষেধের কাজ সম্পাদন করার জন্যে ইমাম তথা শাসনকর্তার পক্ষ থেক অনুমতি আবশ্যক। তারা সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তির আদেশ ও নিষেধের অধিকার প্রমাণ করেন না, কিন্তু আমাদের মতে এ শর্তটি ঠিক নয়, বরং অনিষ্টকর। কেননা, আমরা যেসকল আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, সেগুলো থেকে জানা যায়, যেব্যক্তি কুকর্ম হতে দেখে চুপ করে থাকবে, সে গোনাহগার হবে। কেননা, যেখানেই দেখুক, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা তার উপর ওয়াজিব। আশ্চর্যের বিষয়, রাফেযী সম্প্রদায় আরও বাড়াবাড়ি করে বলে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ জায়েযই নয় যে পর্যন্ত নিষ্পাপ ইমাম আত্মপ্রকাশ না করেন। তাদের মতে নিষ্পাপ ইমাম আত্মগোপন করে আছেন। এ সম্প্রদায় আলোচনা করারই যোগ্য নয়।

তবে আদেশ ও নিষেধের একটি বিশেষ স্তর আছে, যাতে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদর্শন অর্থাৎ মারপিট করা হয়। এতে উভয় পক্ষে

খুনাখুনির উপক্রম হতে পারে বিধায় এই স্তরে শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে আদেশ ও নিষেধ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা হবে।

কোন ফাসেককে মূর্খ, নির্বোধ, বদকার ইত্যাদি বলে সতর্ক করা সত্য কথা বলারই নামান্তর। সত্য কথার দাবী হচ্ছে, তা নির্দ্বিধায় বলতে হবে। বরং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যালেম শাসনকর্তার মুখের উপর সত্য কথা বলা সর্বোত্তম স্তর। অতএব যেখানে শাসনকর্তার সামনে সত্য বলার নির্দেশ রয়েছে, সেখানে শাসনকর্তার অনুমতির প্রয়োজন কিরূপে হবে? পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সর্বদাই যালেম শাসনকর্তার সামনে সত্য প্রকাশ করে গেছেন। এটাও এ বিষয়ের দলীল এবং অকাট্য এজমা যে, এক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নয়। সেমতে বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে হাকাম ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা পাঠ করলে এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ খোতবা তো নামাযের পরে হয়। মারওয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ আমি তোমাকে বুঝে নেব। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বললেন ঃ সে যে বিষয়ে আদিষ্ট ছিল, তা বলে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ যেব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তাকে মন্দ মনে করে। এটা দুর্বলতম ঈমান। সুতরাং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই আদেশ থেকে এটাই বুঝেছিলেন যে, শাসকবর্গও এতে দাখিল। এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি নেয়ার অর্থ কি? বর্ণিত আছে, খলীফা মহেদী মক্কা মোয়াযযমায় আগমন করে কিছুদিন অবস্থান করেন। এর পর যখন তিনি তওয়াফ করতে যান, তখন লোকজনকে কা'বা গৃহের আশপাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মরযুক লাফিয়ে উঠে তার জামার কলার ধরে ঝাঁকানি দিলেন এবং বললেন ঃ দেখ, তুমি কি করছ! তোমাকে এ গৃহের অধিক হকদার কে বানিয়েছে যে, দূর অথবা নিকট থেকে যে এ গৃহে আসবে, তুমি তাকে বাধা দেবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ سَوَاءً نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ –এ গৃহে স্থানীয় বহিরাগত সকলেই সমান।

খলীফা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এর পর তাঁকে গ্রেফতার করে বাগদাদে নিয়ে এলেন, কিন্তু এমন শাস্তি দেয়া ভাল মনে করলেন না, যাতে জনগণের মধ্যে তাঁর অবমাননা হয়। তাই তাঁকে ঘোড়ার আস্তাবলে বন্ধ করে দিলেন, যাতে তিনি ঘোড়ার পদাঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে যান। মানুষকে কামড় দেয়, এমন একটি ঘোড়া তাঁর নিকটে রেখে দেয়া হল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে তাঁর বশীভূত

করে দিলেন। ফলে তিনি কোন প্রকার কষ্ট পেলেন না। এর পর খলীফা থাকে একটি কক্ষে বন্ধ করে চাবি নিজের হাতে রেখে দিলেন। তিন দিন পর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন এবং লতাপাতা খেতে লাগলেন। খবর পেয়ে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে বের করেছে? তিনি বললেন ঃ যে আমাকে বন্ধ করেছিল। খলীফা শুধালেন ঃ কে বন্ধ করেছিল? তিনি বললেন ঃ যে আমাকে বের করেছে। খলীফা বিচলিত হয়ে ক্রোধে গর্জন করে বললেন ঃ তোমার কি ভয় নেই? আমি তোমাকে মেরে ফেলব। তিনি মাথা তুলে বললেন ঃ যদি মউত ও হায়াত তোমার করায়ত্ত হত, তবে অবশ্যই আমি ভয় করতাম। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ জেলে আটক রইলেন। মাহদীর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে মুক্ত করল। তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

হাব্বান ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ একবার ভ্রমণে বের হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বনী হাশেমের সোলায়মান ইবনে আবু জাফর। খলীফা বললেন ঃ তোমার একটি বাঁদী চমৎকার গান গাইত। তাকে ডেকে আন। বাঁদী এল এবং গান গাইল। কিন্তু খলীফার পছন্দ হল না। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ তোমার কি হয়েছে? গান জমছে না কেন? বাঁদী বলল ঃ এ বাদ্যযন্ত্রটি আমার নয়। খলীফা খাদেমকে তার বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। খাদেম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসছিল, ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ পথিমধ্যে খেজুরের আঁটি কুড়াচ্ছিল। খাদেম তাকে বলল ঃ বড় মিয়া, রাস্তা ছাড়। বৃদ্ধ মাথা তুলে তার হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখতে পেল। সে তৎক্ষণাৎ তা খাদেমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল। ফলে বাদ্যযন্ত্রটি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। খাদেম তাকে গ্রেফতার করে মহল্লার বিচারকের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ একে হাজতে আটকে রাখ। সে আমীরুল মুমেনীনের অপরাধী। বিচারক বলল ঃ বাগদাদে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন এবাদতকারী নেই। সে আমীরুল মুমেনীনের অপরাধী হল কিরূপে? খাদেম বলল ঃ আমি যা বলছি, তা মেনে নাও। তর্ক করো না। এর পর খাদেম খলীফার কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। খলীফা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সোলায়মান বলল ঃ এত রাগ করার প্রয়োজন কি? মহল্লার বিচারককে আদেশ দিন, সে বৃদ্ধকে হত্যা করে লাশ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করুক। খলীফা বললেন ঃ না, আমি তাকে ডেকে প্রথমে কথা বলব। সেমতে বৃদ্ধ উপস্থিত হলে খাদেম বলল ঃ তুমি তোমার বগলে বাঁধা খর্জূর আঁটির পুটলিটা ফেলে দাও; এর

পর খলীফার সামনে উপস্থিত হও। বৃদ্ধ বলল ঃ এটা আমার রাতের খাদ্য। খাদেম বলল ঃ রাতে আমরা খাইয়ে দেব। এজন্যে চিন্তা করো না। বৃদ্ধ বলল ঃ তোমাদের খাদ্য আমার দরকার নেই। তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে খলীফা বললেন ঃ এসব কথার প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধকে আমার কাছে আসতে দাও। অতঃপর বৃদ্ধ সালাম করে খলীফার কাছে বসে গেল। খলীফা বললেন ঃ বড় মিয়া, তুমি যে কাণ্ডটি করলে এর কারণ কি? বৃদ্ধ জওয়াব দিল ঃ আমি কি করেছি? তুমি আমার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিয়েছ– এ কথা সরাসরি বলতে খলীফা সংকোচ বোধ করলেন। কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পর বৃদ্ধ জওয়াব দিল ঃ আমি আপনার পিতৃপুরুষদেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করতে শুনতাম ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ -

নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার করার, অনুগ্রহ প্রদর্শন করার ও আত্মীয়দেরকে দান করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীল, অপছন্দনীয় ও বিদ্রোহমূলক কাজ করতে।

আমি একটি অপছন্দনীয় বস্তু দেখেছি এবং তা ভেঙ্গে দিয়েছি। খলীফা বললেন ঃ ভালই করেছ– ভেঙ্গে দিয়েছ। এ ছাড়া খলীফা তাকে আর কিছু বললেন না। বৃদ্ধ বাইরে চলে এলে খলীফা খাদেমকে একটি থলে দিয়ে বললেন ঃ তার পেছনে যাও এবং দেখ, সে লোকজনদের কাছে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলে কি না? যদি কিছু না বলে, তবে এই থলেটি তাকে দিয়ে দিও। অন্যথায় দিয়ো না। বৃদ্ধ বাইরে এসে দেখল তার পুঁটলি থেকে একটি আঁটি মাটিতে পড়ে গেছে। সে সেটি পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল এবং লোকজনের কাছে কিছুই বলল না। খাদেম তাকে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন তোমাকে এ থলেটি নিয়ে যেতে বলেছেন। বৃদ্ধ বলল ঃ খলীফাকে বলে দিয়ো এটি যেখান থেকে নিয়েছে, সেখানেই যেন ফেরত দিয়ে দেয়।

এসব গল্প থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্যে কোন শাসনকর্তার অনুমতি লাভ করার মোটেই প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম শর্ত হচ্ছে আদেশ ও নিষেধকারীর ক্ষমতাবান হওয়া। কেননা, অক্ষম ব্যক্তির উপর অন্তর দ্বারা আদেশ নিষেধ করা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব নয়। কারণ, যে আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখে, সে তাঁর

নাফরমানীকে খারাপ জ্ঞান করে এবং অন্তরে ঘৃণা করে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কাফেরদের সাথে জেহাদ কর হাত দ্বারা। যদি তা সম্ভব না হয় এবং কেবল তাদের সামনে নাক সিট্‌কাতে পার, তবে তাই কর। মনে রাখা দরকার, অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে কার্যত অনিষ্ট হওয়া এবং কষ্ট পাওয়া জরুরী নয়; বরং যেক্ষেত্রে অনিষ্ট হওয়া ও কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে অক্ষমতা আছে বলতে হবে। এই অক্ষমতার কারণেও আদেশ নিষেধ করা ওয়াজিব থাকবে না। যদি জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে না এবং নিষেধ করলে কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে, তবে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়; বরং কতক ক্ষেত্রে আশ্চর্য নয় যে, হারাম হবে। এ ধরনের স্থানে না যাওয়া এবং গৃহে বসে থাকা অপরিহার্য। যদি জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে না; কিন্তু কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব। যদি অবস্থা এর বিপরীত হয়; অর্থাৎ, জানা যায় যে, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে; কিন্তু কষ্ট ভোগ করতে হবে, তবে এ অবস্থায়ও নিষেধ করা মোস্তাহাব। নিষেধ করা ওয়াজিব হওয়ার একটি মাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে, যেখানে জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে এবং কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই। এ অবস্থাকেই বলা হয় "সর্বাবস্থায় সক্ষমতা।"

যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয় তার শর্ত ঃ এর জন্যে চারটি শর্ত। প্রথম শর্ত, সেই বস্তুটির মুনকার তথা অস্বীকার্য হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তে তা নিষিদ্ধ হওয়া। আমরা "অস্বীকার্য" শব্দটি ব্যবহার করেছি– গোনাহ বলিনি। কেননা, এটা গোনাহ থেকে ব্যাপকতর। উদাহরণতঃ যদি কেউ বালক অথবা উন্মাদকে শরাব পান করতে দেখে, তবে শরাব ফেলে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। অথচ বালক ও উন্মাদের জন্যে শরাব পান করা গোনাহ নয়। কিন্তু অস্বীকার্য অবশ্যই। সুতরাং অস্বীকার্য শব্দের মধ্যে গোনাহসহ সকল প্রকার কুকর্ম দাখিল রয়েছে। এটি সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ হতেও ব্যাপক। কেননা, নিষেধ কেবল কবীরা গোনাহের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া, বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি সগীরা গোনাহ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় শর্ত, অস্বীকার্য বিষয়টি আপাত বিদ্যমান হওয়া। কেননা, যেব্যক্তি শরাব পান সমাপ্ত করে নেয় অথবা যে ভবিষ্যতে শরাব পান করবে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়।

তৃতীয় শর্ত, অস্বীকার্য বিষয়টি কোনরূপ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিষেধকারীর সামনে প্রকাশ হওয়া। এমতাবস্থায় যদি কেউ গহে লকিয়ে

গোনাহ্ করে এবং গৃহের দরজা বন্ধ করে নেয়, তবে গুপ্তচরবৃত্তি করে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক গৃহের প্রাচীরে আরোহণ করে গৃহকর্তাকে দেখতে পান এবং নিষেধ করেন। গৃহকর্তা আরজ করল ঃ আমীরুল-মুমেনীন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী একভাবে করেছি। আর আপনি তিনভাবে করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? গৃহকর্তা বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– وَلَا تَجَسَّسُوْا –তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না। আপনি গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। আপনি প্রাচীর টপকিয়ে গৃহে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ

তোমরা আপন গৃহ ছাড়া কারও গৃহে কথাবার্তা না বলে এবং গৃহের লোকদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। আপনি সালাম করেননি।

হযরত ওমর অগত্যা নিরুত্তর হয়ে গৃহকর্তাকে ছেড়ে দিলেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করেন ঃ যদি আমি স্বচক্ষে কোন কুকর্ম সংঘটিত হতে দেখি, তবে কোন সাক্ষ্য ছাড়াই অপরাধীর উপর "হদ" (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) জারি করতে পারব কি না? হযরত আলী (রাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ হদের ব্যাপারটি কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সাথে জড়িত। এতে একজন যথেষ্ট হবে না। প্রশ্ন হয়, অস্বীকার্য বিষয় প্রকাশ্যে হওয়া এবং গোপনে হওয়ার সংজ্ঞা কি? জওয়াব হচ্ছে, যেব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে নেয় এবং প্রাচীরের আড়ালে চলে যায়, তার কাছে কেবল অস্বীকার্য বিষয় জানার জন্যে যাওয়ার অনুমতি নেই। হাঁ, যদি গৃহের বাইরে থেকে জানা যায়, এ গৃহে খারাপ কাজ হচ্ছে, তবে তাও প্রকাশ্য। উদাহরণতঃ বাইরে থেকে বাঁশী অথবা বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনা গেলে যে শুনবে, সে গৃহে প্রবেশ করে বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিতে পারে।

চতুর্থ শর্ত, ইজতিহাদ ছাড়াই জানা যে, এটা অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং যেসকল বিষয় ইজতিহাদী, সেগুলোতে নিষেধ করা যাবে না। উদাহরণতঃ কোন হানাফী মতাবলম্বীর জন্যে জায়েয নয় যে, সে কোন

শাফেয়ী মতালম্বীকে এমন যবেহ করা জন্তুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করবে, যাতে বিসমিল্লাহ্ বলা হয়নি। অনুরূপভাবে কোন শাফেয়ী মতাবলম্বীর জন্যে জায়েয নয় যে, সে হানাফী মতাবলম্বীকে "নবীয" (যাতে নেশা নেই) পান করতে নিষেধ করবে। কেননা, এগুলো ইজতিহাদী বিষয়।

যাকে নিষেধ করা হবে তার শর্ত ঃ এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এটা বলাই যথেষ্ট যে, তার মানুষ হওয়া শর্ত– মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধি-বিধানের যোগ্য) হওয়া শর্ত নয়। সেমতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বালক মদ্যপান করলে তাকেও নিষেধ করতে হবে, যদিও সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। এমনিভাবে উন্মাদ ব্যক্তি যিনা করলে তাকেও নিষেধ করতে হবে। তবে কিছু কাজ উন্মাদের জন্যে অস্বীকার্য নয়, যেমন নামায না পড়া, রোযা না রাখা ইত্যাদি।

স্বয়ং আদেশ ও নিষেধের স্বরূপ ঃ এর কয়েকটি স্তর ও আদব আছে। প্রথম স্তর, অস্বীকার্য বিষয়টি খোঁজাখুঁজি করা। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটা গুপ্তচরবৃত্তি বিধায় নিষিদ্ধ। অতএব অন্যের গৃহে কান পেতে বাদ্যের আওয়াজ শ্রবণ করা যাবে না। দ্বিতীয় স্তর, অস্বীকার্য বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যে, এটা নিষিদ্ধ। কেননা, মাঝে মাঝে অজ্ঞতার কারণেও মানুষ এটা করে থাকে এবং জ্ঞাত হওয়ার পর তা বর্জন করে। উদাহরণতঃ গ্রামীণ মানুষ নামায পড়ে; কিন্তু রুকু-সেজদা উত্তমরূপে করে না। এ ক্ষেত্রে এটাই মনে করা হয় যে, সে জানে না, এভাবে নামায পড়লে নামায হয় না। যদি সে নামায না হওয়াতেই সম্মত থাকত, তবে নামাযই পড়ত না। অতএব তাকে নম্রতা সহকারে জ্ঞাত করে দেয়া ওয়াজিব। নম্রতা সহকারে এ জন্যে যে, জ্ঞাত করা প্রসঙ্গে অপরকে প্রকারান্তরে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এতে অপরের মনে কষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিশেষত শরীয়তের বিষয়াদি সম্পর্কে মূর্খ কথিত হতে সম্মত হয়– এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতএব জ্ঞাত করা যখন মূর্খতা দোষ প্রকাশ করার নামান্তর, তখন এর পরিণতি অপরের মনে কষ্ট দেয়া। তাই এ কষ্ট দূর করার উপায় হচ্ছে নম্র ভাষায় জ্ঞাত করা। উদাহরণতঃ উপরোক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলা হবে– ভাই, মানুষ শিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমিও নামাযের মাসআলা– মাসায়েল সম্পর্কে মূর্খ ছিলাম। কিন্তু আলেমগণ শিখিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় তোমার গ্রামে কোন আলেম নেই। আলেমগণ আমাকে শিখিয়েছেন যে, নামাযে এভাবে স্থিরতা সহকারে রুকু-সেজদা করতে হবে। নইলে নামায ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।

অতএব তুমিও এ বিষয়টি মনে রেখো এবং তদনুযায়ী নামায পড়ো। তৃতীয় স্তর, উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে নিষেধ করা। এটা তাদের জন্যে যারা অস্বীকার্য বিষয়কে অস্বীকার্য জেনেও তা করে; যেমন কোন ব্যক্তি অব্যহতভাবে মদ্যপান করে, যুলুম করে অথবা মুসলমানের গীবত করে। তাকে উপদেশ দেয়া এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা উচিত। তাকে এমন হাদীস শুনানো উচিত, যাতে এসব কাজের জন্য শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস ও পরহেযগারদের কাহিনী শুনানো উচিত। এক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিপদ থেকেও আত্মরক্ষা করা উচিত। তা হচ্ছে, আপন জ্ঞান-গরিমার আস্ফালন ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার নিয়তে উপদেশ দান করা আশ্চর্য নয়। এরূপ নিয়তে উপদেশ দিলে তা যে অনিষ্ট দূর করার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়, তার চেয়ে বড় অনিষ্টের বিষয় হবে। এটা এমন হবে, যেমন কেউ নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে অগ্নি থেকে রক্ষা করে। এটা চরম মূর্খতা, ভয়াবহ আপদ এবং শয়তানের অভিনব জাল। এতেই মানুষের পদস্খলন ঘটে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করে দেন এবং হেদায়াতের নূর দ্বারা যার অন্তশ্চক্ষু উন্মোচিত করে দেন, সে-ই এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। চতুর্থ স্তর গালমন্দ ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করে নিষেধ করা। এর প্রয়োজন তখন, যখন নম্রতায় কার্যোদ্ধার হয় না। নম্রতায় কাজ হলে কঠোর ভাষার প্রয়োজন নেই। মোট কথা, উপদেশ নসীহত ফলদায়ক না হলেই কেবল কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে নিষেধ করতে হবে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের উপাস্যদের জন্যে! তোমাদের কি ঘটে কিছু নেই?

কঠোর ভাষা বলে আমাদের উদ্দেশ্য অশ্লীল বকাবকি এবং মিথ্যা বলা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন ভাষা বলা, যা অশ্লীল গণ্য হয় না; যেমন হে মূর্খ, হে নির্বোধ, হে পাপিষ্ঠ, তোর কি আল্লাহর ভয় নেই, ইত্যাদি বলা। কেননা, যে মন্দ কাজ করে, সে নির্বোধ। নির্বোধ না হলে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী কেন করত? সে-ই বুদ্ধিমান, যার বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য রসূলে করীম (সাঃ) দেন। এরশাদ হয়েছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ ـ

হুশিয়ার সে-ই, যার নফস অনুগত এবং যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যে কাজ করে। আর নির্বোধ সে-ই, যে নফ্‌সের খেয়ালখুশীতে তার আনুগত্য করে এবং আল্লাহর কাছে মিথ্যা বাসনা করে।

যদি জানা যায়, কঠোর ভাষা বললেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না, তবে কিছু বলাই উচিত নয়; বরং বাহ্যিক অসন্তোষ প্রকাশ এবং তাকে হেয় জ্ঞান করেই ক্ষান্ত থাকবে। পঞ্চম স্তর, বল প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দ কাজের সরঞ্জামাদি নষ্ট করে দেয়া। উদাহরণতঃ ক্রীড়া-কৌতুকের সাজ-সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেলা, মদ মাটিতে ঢেলে দেয়া, রেশমী পোশাক দেহ দেখে খুলে ফেলা, নাপাক অবস্থায় মসজিদে বসে থাকলে কান ধরে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি, কিন্তু এই স্তরকে তখনই কার্যকর করা যাবে, যখন পূর্বোক্ত স্তরগুলো বিকল হয়ে যায়। এ স্তরটি কতক গোনাহে সম্ভবপর এবং কতক গোনাহে সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ মুখ ও অন্তরের গোনাহ্ বল প্রয়োগে নষ্ট করা যায় না। ষষ্ঠ স্তর, ধমক দেয়া এবং ভীতি প্রদর্শন করা। উদাহরণতঃ এ কথা বলা যে, এ কাজ পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। এতে আদব, যে কাজ করতে পারবে না, তা বলবে না; যেমন বলবে না যে, তোমার বাড়ী লুটে নেব। সপ্তম স্তর, হাতে, পায়ে প্রহার করা এবং অস্ত্র বের না করা। প্রয়োজনবোধে এটা সর্বসাধারণও করতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ, মন্দ কাজটি দফা হয়ে গেলে হাত-পা গুটিয়ে নিতে হবে।

আদেশ ও নিষেধকারীর আদব ঃ প্রকাশ থাকে যে, যেব্যক্তি অপরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান, পরহেযগারী ও সচ্চরিত্রতা। জ্ঞানের প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে আদেশ ও নিষেধের সীমা জানা থাকে এবং কোন্ স্থলে আদেশ ও নিষেধ করতে হবে, তা বুঝতে পারে। পরহেযগারীর প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে আদেশ ও নিষেধকারীর উপদেশ নসীহত জনপ্রিয় হয়। কেননা, ফাসেক ব্যক্তির মুখে সদুপদেশ শুনলে মানুষ হাসে। আর যার মধ্যে সচ্চরিত্রতা গুণ থাকে, সে কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে নম্র হয়। আদেশ ও নিষেধের জন্যে এটা মূলকথা। জ্ঞান ও পরহেযগারী এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কেননা, যখন ক্রোধ উদ্বেলিত হয়, তখন তার মূলোৎপাটনের জন্যে জ্ঞান ও পরহেযগারী যথেষ্ট হয় না। পরহেযগারীও পূর্ণাঙ্গ তখনই হয়, যখন তার সাথে সচ্চরিত্রতা ও ক্রোধ দমনের ক্ষমতা এসে মিলিত হয়। উপরোক্ত তিনটি গুণের কারণেই

আদেশ ও নিষেধ সওয়াবের কাজ হয় এবং তা দ্বারা অস্বীকার্য বিষয়টিও দূরীভূত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি এরশাদও এসব আদবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সে করবে, যে নম্রতা করে আদেশ করায়, নম্রতা করে নিষেধ করায়, সহনশীল হয় নিষেধ করায় এবং সমঝদার হয় নিষেধ করায়। এ থেকে বুঝা গেল, আদেশ ও নিষেধের কাজে সমঝদার হওয়া শর্ত।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ফাসেক হওয়ার কারণে সৎ কাজের আদেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, বরং উদ্দেশ্য, ফাসেকের কথার প্রভাব মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হয় না। নতুবা সৎকাজের আদেশ করার জন্যে সকল গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী নয়। কেননা, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– আমরা কি সৎ কাজের আদেশ করব না, যে পর্যন্ত সেই সৎকাজ নিজেরা না করে নেই এবং আমরা কি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করব না যে পর্যন্ত সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা না করি? তিনি বললেন ঃ না; বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, যদিও সকল সৎ কাজ নিজেরা না কর এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ কর, যদিও সকল অসৎ কাজ থেকে নিজেরা বেঁচে থাক না। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ তাঁর পুত্রগণকে ওসিয়ত করেন, যখন তোমাদের কেউ সৎ কাজের আদেশ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন আপন মনে সবর করতে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং আল্লাহ তাআলার সওয়াবের উপর ভরসা করে। কেননা, যে সওয়াবের উপর ভরসা করে, সে নির্যাতনের কষ্ট অনুভব করে না। এ থেকে বুঝা গেল, আদেশ ও নিষেধের অন্যতম আদব হচ্ছে সবর করা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজের আদেশের কাছেই সবর উল্লেখ করেছেন। সেমতে হযরত লোকমানের উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে–

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ـ

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং যে কষ্টের সম্মুখীন হও, তাতে সবর কর।

আর একটি আদব হচ্ছে পার্থিব সম্পর্ক হ্রাস করা, যাতে ভয় এবং মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা না থাকে। জনৈক বুযুর্গের একটি বিড়াল ছিল। তিনি এর জন্যে প্রতিবেশী কসাইয়ের কাছ থেকে প্রত্যহ মাংসখণ্ড গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি কসাইকে কোন অসৎ কাজে লিপ্ত

দেখে প্রথমে বিড়ালটিকে গৃহ থেকে বের করে দিলেন। এর পর কসাইকে সেই অসৎ কাজ করতে নিষেধ করলেন। কসাই বিরক্ত হয়ে বলল ঃ ভবিষ্যতে আপনার বিড়ালের জন্যে কিছুই দেব না। বুযুর্গ বললেন ঃ বিড়াল তাড়িয়ে দিয়েই আমি তোমাকে নিষেধ করতে এসেছি। এখন তোমার কাছে আমি কিছু আশা করি না। সত্য বলতে কি, বুযুর্গের এ উক্তি যথার্থ। কেননা, যেব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আশা ছিন্ন করবে না, সে আদেশ ও নিষেধ করতে সক্ষম হবে না। যে আশা করে তার দিক থেকে মানুষের মন ভাল থাকুক এবং মানুষ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক, সে কিরূপে আদেশ ও নিষেধ করার সাহস করবে? হযরত কা'ব আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে তোমার মান-মর্যাদা কিরূপ? তিনি বললেন ঃ ভাল। কা'ব বললেন ঃ তওরাত তো বলে, মানুষ যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, তখন স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তার মান-মর্যাদা ভাল থাকে না। আবু মুসলিম জওয়াব দিলেন ঃ তওরাতের কথা সত্য। জনৈক ওয়ায়েয খলীফা মামূনকে কঠোর ভাষায় সদুপদেশ দিলে খলীফা বললেন ঃ মিয়া সাব, নম্র ভাষায় কথা বল। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে যিনি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন– ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন– যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁকে নম্রতা করার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

'তাকে নরম কথা বল; সম্ভবত সে চিন্তা করবে অথবা ভয় করবে।'

আদেশ ও নিষেধকারীর উচিত এক্ষেত্রে পয়গম্বরগণের অনুসরণ করা। হযরত আবু উমামা বর্ণনা করেন– একবার জনৈক যুবক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে যিনার অনুমতি দিন। এতে উপস্থিত লোকজন তার প্রতি ভীষণ চটে গেল এবং বের করে দিতে চাইল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে থাকতে দাও। এর পর যুবককে বললেন ঃ আমার কাছে এস। সে কাছে এসে সম্মুখে বসে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, তোমার মা যিনা করুক– এটা তুমি পছন্দ করবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ বীর পুরুষদের কাজই এটা যে, তারা মায়ের যিনা সহ্য করতে পারে না। আচ্ছা বল তো, তুমি তোমার কন্যার জন্যে যিনা পছন্দ করবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ হাঁ, বীর পুরুষেরা তাদের কন্যার জন্যেও যিনা পছন্দ করে না। এর পর তিনি ফুফু ও খালাকে নিয়েও এমনি প্রশ্ন

করলেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াবে যুবকটি কেবল 'না'-ই বলে গেল। এর পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত যুবকটির বুকের উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী, এর অন্তর পরিষ্কার করে দিন, তার গোনাহ্ মাফ করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন। আবু উমামা বলেন ঃ এর পর এই যুবকটির কাছে যিনার চেয়ে জঘন্য পাপাচার অন্য কিছু ছিল না। হযরত ফোযায়ল ইবনে আয়াযকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বাদশাহের দান গ্রহণ করেন। এটা কেমন? তিনি বললেন ঃ তিনি আপন পাওনার চেয়ে কমই নেন। এর পর তিনি সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাকে একান্তে নিয়ে যান এবং বলেন ঃ হে আলেম সম্প্রদায়, আপনারা শহরের প্রদীপ ছিলেন। আপনাদের কাছ থেকে মানুষ আলো লাভ করত। এখন আপনারা অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। আপনারা পথহারাদের জন্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। আপনাদের দেখে দেখে মানুষ পথ চলত। এখন আপনারা দিকভ্রমের কারণ হয়ে গেছেন। এই শাসকবর্গের অর্থ গ্রহণ করতে আপনারা লজ্জা করেন না। এই অর্থ কোথা থেকে আসে, তা আপনাদের জানা আছে কি? এ কাজ করার পরও আপনারা বালিশে হেলান দিয়ে বলেন– অমুক অমুকের কাছ থেকে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে সুফিয়ান মাথা তুলে কয়েকবার আহ, আহ্ বললেন, এর পর আরজ করলেন ঃ আল্লাহর কসম, হে আবু আলী, আমি নেকবখত নই; কিন্তু নেকবখতগণের প্রতি মহব্বত অবশ্যই রাখি। হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন ঃ ছেলা ইবনে আশইয়াম (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার পাজামা গিঁঠের নীচে ছিল। মুরীদরা তার সাথে কঠোর ব্যবহার করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ এ কাজটি আমাকে করতে দাও। আমি তোমাদেরকে এই উৎকণ্ঠা থেকে বাঁচিয়ে দেব। অতঃপর তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ ভাতিজা, তোমার সাথে একটি কথা আছে। লোকটি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ চাচাজান, সেটি কি? তিনি বললেন ঃ আমি চাই তুমি তোমার পাজামা নিজেই গিঁঠের উপরে তুলে নাও। সে "ভাল কথা" বলে অমনি পাজামা উপরে তুলে নিল। এর পর তিনি মুরীদগণকে বললেন ঃ যদি তোমরা তার সাথে রূঢ় আচরণ করতে, তবে সে অস্বীকার করে বসত এবং তোমাদেরকে মন্দ বলত। মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া বলেন ঃ আমি এক রাত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের কাছে গেলাম। তিনি মাগরিবের নামায পড়ে গৃহে আগমন করছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন, জনৈক মদমত্ত কোরায়শী তরুণ একজন মহিলাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলার

ফরিয়াদ শুনে লোকজন একত্রিত হয়ে যুবককে মারতে উদ্যত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি লোকজনকে বললেন ঃ আমার ভাতিজাকে ছেড়ে দাও। এর পর তিনি তরুণকে কাছে ডাকলেন। সে লজ্জিত অবস্থায় কাছে এলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ আমার সাথে চল। তিনি তাকে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং খাদেমকে বললেন ঃ একে তোমার কাছে রাখ। এর নেশা কেটে গেলে সে কি কাণ্ড করেছে তা তাকে বলবে এবং আমার সাথে দেখা না করে যেতে দেবে না। সেমতে নেশা কেটে যাওয়ার পর খাদেমের মুখে ঘটনা শুনে তরুণ খুব লজ্জিত হল এবং কান্নাকাটি করল। এর পর তাকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ তুমি আপন আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে যে কাণ্ড করলে তাতে তোমার লজ্জা করা উচিত ছিল। তুমি কি জান না তুমি কার সন্তান? আল্লাহকে ভয় কর এবং তওবা কর। তরুণ মাথানত করে কাঁদতে লাগল। অতঃপর মাথা তুলে বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করলাম, জীবনে আর কোন দিন নবীয পান করব না এবং মন্দ কাজের ধারে-কাছে যাব না। আমি তওবা করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকে কাছে টেনে মস্তকে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ শাবাশ বেটা, এমনি চাই। এর পর থেকে সে তাঁর কাছেই থাকত এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করত। বলাবাহুল্য, নম্রতার বদৌলতেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফাতাহ্ ইবনে মানজরফ বলেন ঃ জনৈক সুঠাম সবল ব্যক্তি এক মহিলাকে ধরে ফেলে। তার হাতে ছিল ছোরা। কেউ তার কাছে গেলে সে ছোরা দিয়ে তাকে আক্রমণ করত। কেউ তার কাছে যাওয়ার সাহস করত না। মহিলাটি তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য আর্তনাদ করছিল। এমন সময় প্রখ্যাত সূফী বিশর ইবনে হারেস সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি আপন কাঁধ দিয়ে লোকটির কাঁধে ঘর্ষণ করলেন। অমনি সে ধরাশায়ী হল। হযরত বিশর সেখান থেকে চলে গেলেন। মহিলাটিও অক্ষত অবস্থায় সেখান থেকে প্রস্থান করল। লোকেরা দুর্বৃত্তটির কাছে গিয়ে তাকে ঘর্মাক্ত কলেবর দেখতে পেল। জিজ্ঞাসার জওয়াবে সে বলল ঃ আমি কিছুই জানি না। তবে একজন বৃদ্ধ লোক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোর কাজ-কর্ম এবং তোকে দেখছেন। এ কথা শুনামাত্রই আমার পা যুবগল অবশ হয়ে গেল। আমি জানি না, লোকটি কে ছিল। লোকেরা বলল ঃ তিনি বিশর ইবনে হারেস। সে বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ, এখন তিনি আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন! সে সেদিনই জ্বরে আক্রান্ত হল এবং সপ্তম দিনে মারা গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাপক অস্বীকার্য বিষয়

অস্বীকার্য বিষয়সমূহ দু'প্রকার– মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। মাকরূহ বিষয় থেকে নিষেধ করা মোস্তাহাব এবং চুপ থাকা মাকরূহ– হারাম নয়। আর নিষিদ্ধ বিষয়ে শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়া এবং চুপ থাকা হারাম। এ ধরনের অস্বীকার্য বিষয়সমূহ মসজিদে, বাজারে, পথিমধ্যে ও অন্যান্য স্থানে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আমরা এগুলো আলাদা আলাদাভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

মসজিদ ও তেলাওয়াত সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ প্রথম, নামাযের রুকু ও সেজদা 'ইতমিনান' সহকারে তথা ধীরস্থিরভাবে না করে নামায নষ্ট করা। এই ইতমিনান না করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে নিষেধ করা ওয়াজিব। (হানাফী মাযহাবে ইতমিনান বর্জন নামায শুদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী নয়।)

দ্বিতীয়, কোরআন মজীদ ভুল তেলাওয়াত করা। এটা করতে নিষেধ করা এবং শুদ্ধরূপে তেলাওয়াত শিখিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেব্যক্তি কোরআন পাঠে বেশী ভুল করে, সে যদি শুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তবে শুদ্ধ করা পর্যন্ত তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ভুল তেলাওয়াত করলে গোনাহ্‌গার হবে। যদি জিহ্বার জড়তার কারণে শুদ্ধ পাঠের ক্ষমতা না থাকে, তবে তেলাওয়াত বর্জন করে কেবল আলহামদু সূরা শিখতে ও তা শুদ্ধ করতে সচেষ্ট হবে।

তৃতীয়, আযানে মুয়াযযিনদের স্বর অধিক দীর্ঘ করা, হাইয়া আলাস্‌সালাহ্‌ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্‌ বলার সময় বক্ষ কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে নেয়া– এগুলো মাকরূহ অস্বীকার্য বিষয়। মুয়াযযিনদেরকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করা ওয়াজিব। যদি তারা জ্ঞাতসারে এরূপ করে, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব।

চতুর্থ, খতীবের এমন কালো পোশাক পরিধান করা, যাতে রেশমী সূতা অধিক, অথবা তার হাতে সোনালী তরবারি থাকা– এগুলো ফেস্‌ক বিধায় নিষেধ করা ওয়াজিব।

পঞ্চম, যে ওয়ায়েয তার ওয়াযে বেদআত মিশ্রিত করে অথবা মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করে, সে ফাসেক। তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। বেদআতী

ওয়ায়েযের ওয়াযে যোগদান করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আদেশ করেন–

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ -

আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট না হয়।

ষষ্ঠ, জুমুআর দিনে ওষুধ, খাদ্য, তাবিয ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া, ভিক্ষুকদের দণ্ডায়মান হওয়া এবং কবিতা ও কোরআন পাঠ করা, যাতে মুসল্লীরা শুনে কিছু দান করে, ইত্যাদি অস্বীকার্য বিষয়। মসজিদের বাইরে হলে অবশ্য মোবাহ্; যেমন ওষুধ, খাদ্য ও কিতাব বিক্রয় করা। এগুলো মসজিদের ভিতরেও জায়েয; কিন্তু না করা উত্তম, কিন্তু সদা-সর্বদার জন্য মসজিদকে দোকান বানিয়ে নেয়া হারাম এবং এটা নিষেধ করতে হবে।

সপ্তম, উন্মাদ, বালক ও মাতালদের মসজিদে আসা অস্বীকার্য বিষয়। বালকরা মসজিদে অধিক খেলাধুলা না করলে তাদের প্রবেশে দোষ নেই। তারা মসজিদে সদা-সর্বদা খেলা করলে নিষেধ করা ওয়াজিব। যে উন্মাদ মসজিদে চুপচাপ থাকে, অশ্লীল বকাবকি করে না এবং উলঙ্গ হয় না, তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া ওয়াজিব নয়।

রাস্তা ও বাজার সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ বাজারসমূহে যেসকল অসৎ কাজ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পণ্যদ্রব্য মুনাফায় বিক্রি করার ব্যাপারে মিথ্যা বলা হয়। অতএব যেব্যক্তি বলে, আমি এটি এত টাকায় কিনেছি এবং এত টাকায় বিক্রি করব, সে যদি এতে মিথ্যা বলে, তবে সে ফাসেক। আর যেব্যক্তি এ অবস্থা জানে, ক্রেতাকে এই মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত করা তার উপর ওয়াজিব। যদি সে বিক্রেতার খাতিরে চুপ থাকে, তবে গোনাহগার হবে এবং খেয়ানতে বিক্রেতার অংশীদার হবে। দ্বিতীয়, পণ্যদ্রব্যের দোষ ক্রেতার কাছে গোপন রাখা। যেব্যক্তি দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত, ক্রেতাকে বলে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। নতুবা এর অর্থ হবে, সে মুসলমান ভাইয়ের আর্থিক ক্ষতিতে রাজি আছে। এটা হারাম। তৃতীয়, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অবৈধ শর্ত করা, যার অভ্যাস মানুষের আছে। এটা নিষেধ করা ওয়াজিব। কেননা, এতে লেনদেন ফাসেদ হয়ে যায়। চতুর্থ, ঈদের দিনে শিশুদের জন্যে খেলনা এবং প্রাণীর ছবি বিক্রয় করা উচিত নয়। এগুলো ভেঙ্গে দেয়া এবং বিক্রয় করতে নিষেধ করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার পাত্র এবং রেশমী বস্ত্র বিক্রয় করাও তেমনি

নিষিদ্ধ। রাস্তার অস্বীকার্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে গৃহ সংলগ্ন স্থানে খুঁটি গেড়ে চত্বর নির্মাণ করা, বৃক্ষ রোপণ করা, রাস্তায় বারান্দা, গ্যালারী ও ছাদ নির্মাণ করা, কাষ্ঠ পুঁতে রাখা এবং বোঝা ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রাখা। এতে যদি রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, অথবা পথিকদের পায়ে টক্কর লাগে, তবে এগুলো সব গর্হিত কাজ। যদি রাস্তা এত প্রশস্ত হয় যে, এতে কারও কোন ক্ষতি হয় না, তবে নিষেধ করা উচিত নয়। এমনিভাবে গবাদিপশু রাস্তায় এমনভাবে বাঁধা যাবে না, যাতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পথিকদের গায়ে প্রস্রাব-পায়খানার ছিটা পড়ে। কসাই যদি তার দোকানের সামনে গবাদিপশু যবেহ করে এবং এতে রাস্তা রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবে তাকে নিষেধ করা হবে। রাস্তায় আবর্জনা নিক্ষেপ করা, খরবুযা, তরমুজ ও কলার ছাল ফেলে রাখা অথবা পানি ঢেলে চলার পথ পিচ্ছিল করে দেয়া অপছন্দনীয় কাজ। এগুলো করতে নিষেধ করতে হবে। যে কুকুর মানুষকে কামড় দেয়, সেটি দরজায় বসিয়ে রাখতে নিষেধ করা ওয়াজেব।

দাওয়াত সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরুষ মেহমানদের জন্যে রেশমী ফরশ বিছানো, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা, জীব-জন্তুর চিত্র সম্বলিত পর্দা ঝুলানো, গান-বাজনার ব্যবস্থা করা, পুরুষ অতিথিদের দেখার জন্যে মহিলাদের ছাদের উপর সমবেত হওয়া– এসব বিষয় নিষিদ্ধ ও অস্বীকার্য। এগুলো দূর করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দূর করতে অক্ষম, তার সেখানে বসা নাজায়েয। রৌপ্য নির্মিত ক্ষুদ্র সুরমাদানীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রৌপ্য নির্মিত সুরমাদানী দেখে ভোজসভা থেকে বাইরে চলে যান। দাওয়াতের মজলিসে কোন ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কিংবা স্বর্ণের আংটি পরিহিত থাকলে তার কাছে বসা জায়েয নয়। দাওয়াতে খাদ্যে অপব্যয় করাও একটি গর্হিত কাজ। অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করাই শুধু অপব্যয় নয়; বৈধ কাজে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করাকেও অপব্যয় বলা হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান মানুষের অবস্থাদৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন অবস্থায় নিষেধ করা ওয়াজিব হবে। উদাহরণতঃ জনৈক ছা-পোষা ব্যক্তির কাছে এক হাজার টাকা আছে। এ টাকা ছাড়া তার অন্য কোন আমদানী নেই। সে যদি এই টাকা সম্পূর্ণ ওলিমা অনুষ্ঠানে ব্যয় করে দেয়, তবে তাকে এই অপব্যয় থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا "তুমি আপন হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করো না, অর্থাৎ,

যথাসর্বস্ব ব্যয় করে দিয়ো না; যদি কর, তবে তিরস্কৃত ও অনুতপ্ত হয়ে বসে থাকবে।'

এ আয়াতটি মদীনার এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ বন্টন করে দিয়েছিল। পরে যখন তার পরিজনরা তার কাছে খরচ চাইল, তখন সে কিছুই দিতে পারল না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيٰطِينِ -

অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অযথা ব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই।

অতএব যেব্যক্তি এরূপ অপব্যয় করে, তাকে নিষেধ করা উচিত। হাঁ, যেব্যক্তি একা পরিবার-পরিজন বলতে কেউ নেই এবং সে তাওয়াক্কুল করারও বদ্ধমূল ক্ষমতা রাখে, তার জন্যে সমস্ত ধন-সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দেয়া জায়েয, কিন্তু ছাপোষা ও তাওয়াক্কুলে অক্ষম ব্যক্তির জন্যে এটা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে প্রাচীর গাত্রে নকশা অংকনে সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করাও হারাম অপব্যয়, কিন্তু যার কাছে অগাধ ধন-সম্পদ আছে, তার জন্যে হারাম নয়। কেননা, সাজসজ্জাও একটি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য। চিরকালই মসজিদের ছাদে এবং প্রাচীরে কারুকার্য হয়ে এসেছে। অথচ সৌন্দর্যবর্ধন ছাড়া এসব কারুকার্যের অন্য কোন উপকারিতা নেই। পোশাক ও খাদ্যের শোভাবর্ধনের বিধানও তাই; অর্থাৎ, এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মোবাহ্, কিন্তু যার ধন-সম্পদ কম, তার জন্যে অপব্যয় এবং বিত্তশালীদের জন্যে জায়েয।

যেসকল অস্বীকার্য বিষয়ে সাধারণ মানুষ লিপ্ত ঃ আজকাল যারা গৃহে বসে থাকে, তারাও মানুষকে ধর্মের কথা বলা, শিক্ষা দেয়া ও সৎকাজের উৎসাহ দেয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। এখন শহরেও অধিকাংশ লোক নামাযের শর্তসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। গ্রামে তো হবেই। শহরের প্রতিটি মহল্লায় ও মসজিদে একজন আলেম থাকা আবশ্যক, যিনি মানুষকে ধর্মের কথাবার্তা শিক্ষা দেবেন। এমনিভাবে প্রত্যেক গ্রামে এ কাজের জন্যে একজন আলেম থাকা দরকার। যে আলেম তার 'ফরযে আইন' সমাপ্ত করেছে এবং 'ফরযে কেফায়া' পালন করার অবসর আছে, তার উচিত তার শহরের আশেপাশে যারা বাস করে, তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে শরীয়তের বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া। সে নিজের পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং তা থেকেই খাবে– অজ্ঞদের খাদ্য খাবে না। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্য সন্দেহযুক্ত। যদি একজন আলেমও এ কাজে ব্রতী

হয়, তবে অবশিষ্ট সকল আলেম এ দায়িত্ব থেকে খালাস পেয়ে যাবে। নতুবা সকলেই অপরাধী হবে। আলেমরা এ জন্যে অপরাধী হবে যে, তারা শহরের বাইরে গিয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং অজ্ঞরা এজন্যে অপরাধী হবে যে, তারা শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটি করেছে। যে সাধারণ ব্যক্তি নামাযের শর্তসমূহ জানে, অপরকে শিক্ষা দেয়া তার উপর ওয়াজিব। নতুবা গোনাহে সে-ও শরীক থাকবে। এটা জানা কথা যে, কোন ব্যক্তি মায়ের পেট থেকে শরীয়তের আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং আলেমদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। অতএব যেব্যক্তি একটি মাসআলাও জানবে– তাকেও সে বিষয়ের আলেম বলা হবে। এতেও সন্দেহ নেই যে, আলেমদের গোনাহ্ বেশী হবে। কারণ, তাদের শিক্ষা দেয়া ও বলে দেয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা আছে। তাদের শান ও পেশাই হচ্ছে, যা কিছু রসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে তাদের কাছে পৌঁছে তা অন্যের কাছে পৌছে দেয়া। আলেমরাই পয়গম্বরগণের ওয়ারিস এবং এই অর্থেই ওয়ারিস। লোকেরা ভালরূপে নামায পড়ে না– এ ওযর দেখিয়ে কারও গৃহে বসে থাকা এবং মসজিদে না আসা জায়েয নয়। বরং এ অবস্থা জানা গেলে শিক্ষা দেয়া ও নিষেধ করার জন্যে বাইরে আসা তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যে জানে, বাজারে একটি অস্বীকার্য কাজ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়, সে যদি তা দূর করতে সক্ষম হয়, তবে গৃহে বসে থাকা এবং তা দূর না করা তার জন্যে জায়েয নয়। যদি সে অস্বীকার্য কাজটি দেখা থেকে গা বাঁচাতে চায়, তবু বের হওয়া তার জন্যে জরুরী। কেননা, যখন এ কারণে বের হবে যে, যতটুকু কুকর্ম দূর করতে সক্ষম হবে, ততটুকু দূর করবে, তখন সেই অস্বীকার্য কাজটি দেখায় তার কোন ক্ষতি হবে না। বলাবাহুল্য, কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ছাড়া দেখলে সেই দেখাই ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

মোট কথা, প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, ফরযসমূহ অব্যাহতভাবে পালন এবং হারাম বিষয়াদি পরিত্যাগ করে প্রথমে আত্মসংশোধন করা। নিজের সংশোধনের পর গৃহের লোকজনকে এসব বিষয় শিক্ষা দেবে, এর পর পড়শীদেরকে, এর পর মহল্লাবাসীকে, এর পর শহরবাসীকে, এর পর শহরের আশেপাশের লোকদেরকে, অবশেষে গ্রামবাসীদেরকে শিক্ষা দেবে। যে এলাকায় এক ব্যক্তিও কোন ধর্মীয় ফরয সম্পর্কে জাহেল থাকবে এবং কোন আলেমের নিজে গিয়ে অথবা অন্যের মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষমতা থাকে, সেই পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। যারা ধর্মের চিন্তা রাখে, তাদের জন্যে এ কাজটি নেহায়েত জরুরী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শাসক শ্রেণীকে আদেশ ও নিষেধ করা

ইতিপূর্বে আমরা আদেশ ও নিষেধের কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছি। এগুলোর মধ্যে শাসকবর্গের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর জায়েয; অর্থাৎ, জ্ঞাত করা ও উপদেশ দেয়া। চতুর্থ স্তর অর্থাৎ, জোরে জবরে শাসিতদের জন্যে শাসকদের নিষেধ করা জায়েয নয়। কারণ, এতে অনর্থ ও গোলযোগ সংঘটিত হবে। ফলে নেকী বরবাদ এবং গোনাহ অবশ্যম্ভাবী হবে। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ, কঠোর ভাষায় নিষেধ করা; যেমন শাসককে "হে যালেম", "হে খোদাদ্রোহী" ইত্যাদি বলা– এতে যদি ব্যাপক অনিষ্টের আশংকা থাকে এবং বক্তা ছাড়া অন্যদেরও ক্ষতি হয়, তবে এরূপ বলা জায়েয নয়। আর যদি কেবল বক্তারই ক্ষতি এমনকি, প্রাণনাশের আশংকা হয়, তবে জায়েয; বরং মোস্তাহাব। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি ছিল, তাঁরা শাসকবর্গকে আদেশ ও নিষেধ করার ব্যাপারে প্রাণনাশের আশংকাকে তুচ্ছ মনে করতেন এবং নানাবিধ বিপদাপদ ও শাস্তি অম্লান বদনে বরণ করে নিতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন, আদেশ ও নিষেধ করার পরিণতিতে যদি মারা যান, তবে শহীদ হবেন। যেমন নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন,

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فِي ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَتَلَهُ ـ

সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, এর পর সে ব্যক্তি, যে কোন শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আদেশ ও নিষেধ করে। অতঃপর শাসক তাকে হত্যা করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ـ

শ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্যের বাণী উচ্চারণ করা।

শাসকবর্গকে উপদেশ দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সত্যিকার রীতিনীতি তাই, যা পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে। আমরা এ সম্পর্কিত কিছু গল্প ও কাহিনী হালাল হারাম

অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে এসেছি। এখানে কেবল সেসব গল্প উদ্ধৃত করতে চাই, যেগুলো দ্বারা উপদেশের আকার আকৃতি এবং শাসকবর্গের গর্হিত কর্মকাণ্ড অস্বীকার করার অবস্থা জানা যায়। এসব গল্পের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কোরায়শ সর্দারদেরকে নিষেধ করার গল্প। গল্পটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওরওয়া (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঘোর শত্রু কোরায়শ সর্দারেরা তাঁর উপর যে যে নির্যাতন চালিয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর নির্যাতন আপনি কোন্‌টি দেখেছেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ একদিন আমি কোরায়শদের কাছে গেলাম। তারা হাতীমে কা'বায় সমবেত ছিল। তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলল, আমরা তার ব্যাপারে অনেক সহ্য করেছি, যা অন্য কারও ব্যাপারে কখনও করিনি। সে আমাদের জ্ঞানীদেরকে বেওকুফ বলেছে, পূর্বপুরুষদেরকে গালি দিয়েছে, আমাদের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করেছে এবং আমাদের উপাস্যদের উদ্দেশে কটূক্তি করেছে, কিন্তু আমরা এসব গুরুতর বিষয়ে সবর করেছি। তারা এসব কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি 'হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার পর তওয়াফ করতে করতে তাদের কাছ দিয়ে গেলেন। কাছে আসার সাথে সাথে সমবেত কোরায়শরা তাঁর প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। এর পর তওয়াফের দ্বিতীয় চক্করে তিনি যখন আবার তাদের কাছে এলেন, তখন তারা আবার বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দিল। এমনিভাবে তৃতীয়বার যখন তারা এমনি আচরণ প্রদর্শন করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে কোরায়শ দল, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু আনয়ন করছি। (অর্থাৎ ইসলাম তোমাদের কাছে মৃত্যুর মত অসহনীয়।) একথা শুনে সকলেই মাথা নীচু করে নিল। তারা এমন চুপ হয়ে গেল যেন প্রত্যেকের মাথায় কোন পাখী বসে আছে। এ বাক্যটির প্রভাবে ইতিপূর্বে যেব্যক্তি তাঁকে যন্ত্রণাদানে অধিক উৎসাহী ছিল, সে-ও যে নম্র থেকে নম্র ভাষা পেল, তা দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তারা বলল ঃ হে আবুল কাসেম, আপনি নির্বিঘ্নে চলে যান। আপনি মূর্খ নন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অগত্যা চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন কোরায়শরা পুনরায় হাতীমে সমবেত হল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। তারা পরস্পরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়েই কথাবার্তা বলছিল। এমন সময় তিনি দৃষ্টিগোচর হলেন। তারা

একযোগে লাফিয়ে উঠল এবং চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে নিল। তারা প্রশ্ন করতে লাগল ঃ আপনিই এমন বলেন, আপনিই এমন বলেন? তারা সেসব কথা উল্লেখ করছিল, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের প্রতিমা ও ধর্ম সম্পর্কে বলতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ হাঁ, আমিই এসব কথা বলি। এর পর আমি দেখলাম, জনৈক কোরায়শী তাঁর চাদর ধরে হেঁচকা টান দিল এবং তাঁকে হেঁচড়াতে লাগল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা কি তাঁকে এজন্যে মেরে ফেলবে যে, তিনি বলেন আমার পালনকর্তা আল্লাহ্? এর পর কোরায়শরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। আমি দেখলাম, কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এর আগে কখনও এত যন্ত্রণা দেয়নি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় ছিলেন, এমন সময় ওকবা ইবনে আবু মুয়ীত সেখানে এসে তাঁর পবিত্র কাঁধে হাত রাখল। অতঃপর নিজের চাদর তাঁর গলায় রেখে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাইল। এমন সময় হযরত আবু (রাঃ) বকর দৌড়ে এসে ওকবাকে ঘাড় ধরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ

'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই অপরাধে হত্যা করতে চাও, যে সে আল্লাহকে নিজের পালনকর্তা বলে? অথচ সে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে।'

বর্ণিত আছে, হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মুসলমানদের ভাতা বন্ধ করে দেন। একদিন তিনি খোতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় আবু মুসলিম খাওলানী (রঃ) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে মোয়াবিয়া, যেসব অর্থসম্পদ তুমি আটকে রেখেছ, সেগুলো না তোমার পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার বাপের পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার মায়ের পরিশ্রমলব্ধ। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এতে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে সকলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন ঃ তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই বসে থাক। এক ঘন্টা পর তিনি গোসল করে বের হয়ে বললেন ঃ আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলল, যাতে আমার ভীষণ রাগ ধরে গেল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃজিত। অগ্নি পানি দ্বারাই নির্বাপিত হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে কারও ক্রোধ হলে সে যেন গোসল করে নেয়। আমিও তাই অন্দরে গিয়ে গোসল করে

এসেছি। এখন বলছি– আবু মুসলিম ঠিকই বলেছে। এই ধন-সম্পদ আমার পিতা এবং মাতা কারও উপার্জিত নয়। অতএব মুসলমানগণ এস, আপন আপন ভাতা নিয়ে যাও।

যাব্বা ইবনে মুহসিন আন্তরী বলেন ঃ বসরায় আমাদের গভর্নর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তাঁর রীতি ছিল, যখন খোতবা দিতেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার হামদ পাঠ করতেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করতেন এবং খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া করতেন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্যই করতেন না। আমার কাছে এটা খারাপ মনে হল। একদিন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম ঃ আপনি প্রথম খলীফার প্রতি লক্ষ্য করেন না। আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? তিনি কয়েক জুমায় তাই করলেন। এর পর তিনি হযরত ওমরের খেদমতে অভিযোগ লেখে পাঠালেন, যাব্বা ইবনে মুহসিন আমার খোতবার মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করে। খলীফা জওয়াবে লেখলেন, যাব্বাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেমতে হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে খলীফার কাছে প্রেরণ করলেন। মদীনায় পৌঁছে আমি খলীফার দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি বাইরে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ আমি যাব্বা ইবনে মুহসিন, যাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ 'মারহাবা'-ও নয় এবং 'আহলান'-ও নয়। আমি আরজ করলাম ঃ মারহাবা তো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, আর 'আহলান'-এর আস্থা, আমি পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই রাখি না। এখন বলুন, আপনি যে আমাকে আমার শহর থেকে বিনা অপরাধে ডেকে আনলেন, এটা কি কারণে জায়েয বিবেচিত হল? তিনি বললেন ঃ তোমার মধ্যে এবং আমার গভর্নরের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের জানতে চাই। আমি বললাম ঃ তাহলে শুনুন, তাঁর রীতি হচ্ছে, তিনি খোতবা পাঠ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার হামদ ও সানা পাঠ করে দরূদ পড়তেন, এর পর আপনার জন্যে দোয়া করতেন। তাঁর এ কাণ্ড দেখে আমি ক্ষুব্ধ হই। একদিন সামনে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি ধ্যান দেন না কেন? তিনি কয়েক জুমায় তাই করলেন, এর পর আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তুমি আমার গভর্নরের তুলনায় অধিক তওফীকপ্রাপ্ত এবং সুপথপ্রাপ্ত। তুমি আমার ত্রুটি মার্জনা কর। আল্লাহ্ তাআলা তোমার ত্রুটি

মার্জনা করবেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মাফ করুন হে আমীরুল মুমেনীন। অতঃপর তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আবু বকর সিদ্দীকের একটি দিন ও রাত ওমর এবং তার বংশধরের চেয়ে উত্তম। আমি কি তোমাকে সেই রাত ও দিনের কথা বলব না। আমি আরজ করলাম ঃ উত্তম, বলুন। তিনি বললেন ঃ আবু বকর সিদ্দীকের সে রাত হচ্ছে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুশরিকদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছায় রাতের বেলায় মক্কা থেকে বের হলেন, তখন আবুবকর তাঁর সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি কখনও তাঁর অগ্রে, কখনও পেছনে, কখনও ডানে এবং কখনও বামে চলতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে আবু বকর, ব্যাপার কি? আমি তো তোমাকে অন্য কোন সময় এরূপ করতে দেখিনি। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যখন আমি মনে করি, কেউ ওৎ পেতে বসে আছে কি না, তখন আপনার অগ্রে চলে যাই, আর যখন দৌড়ে আসার কথা চিন্তা করি, তখন পেছনে চলে যাই। ডানে বামেও আপনার হেফাযতের খাতিরে চলি। কারণ, আপনার ব্যাপারে আমি শংকিত।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সারারাত পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চললেন। ফলে পায়ের অঙ্গুলি ফুলে টন্ টন্ করতে লাগল। হযরত আবু বকর (রাঃ) অঙ্গুলির এই অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাঁধে বসিয়ে দৌড় দিলেন এবং সওর পাহাড়ের গুহায় পৌঁছে নামিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আপনি গুহায় যাবেন না যে পর্যন্ত আমি প্রথম তাতে প্রবেশ না করি। কেননা, গুহায় কোন ইতর প্রাণী থাকলে তাতে আমার ক্ষতি হোক– আপনার না হোক। এ কথা বলে হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহার অভ্যন্তরে গেলেন। যখন সেখানে কোন কিছু দেখলেন না, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গুহার মধ্যে কিছু ফাটল ছিল, যাতে সর্প ও বিচ্ছু বাস করত। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফাটলের মুখে নিজের পা রেখে দিলেন এই আশংকায় যে, কোথাও কোন কিছু বের হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দংশন না করে। ঘটনাক্রমে একটি সর্প হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করল। যন্ত্রণার চোটে অশ্রুতে তাঁর কপোল ভেসে যাচ্ছিল। রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে বলছিলেন ঃ হে আবু বকর, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا 'চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এর পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকরের জন্যে সান্ত্বনা নাযিল করলেন।

আর একটি ঘটনা শুন হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রথম ভাগে আরবের অনেক লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ বলে, আমরা নামায পড়ব, কিন্তু যাকাত দেব না। তিনি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ইচ্ছা করলেন। আমি তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার জন্যে তাঁর খেদমতে গেলাম। আমি বললাম ঃ হে নায়েবে রসূল! আপনি মানুষকে বুঝান এবং তাদের প্রতি নম্রতা প্রকাশ করুন। তিনি আমাকে বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, কুফরে তুমি এত শক্ত ছিলে আর ইসলামে এত ঢিলে হয়ে গেছ! আমি তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে বুঝাব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, যদি লোকেরা আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব। এর পর আমরা তাঁর সাথে থেকে জেহাদ করেছি এবং পরিষ্কাররূপে বুঝতে পেরেছি, তিনি সুপথপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর অভিমতই সঠিক। এটা হচ্ছে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দিনের অবস্থা। এর পর হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু মূসা আশআরীকে তিরস্কার করে লেখে পাঠালেন– তুমি এরূপ কর কেন? দোষ তোমারই।

আসমায়ী বলেন ঃ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার রাজত্বকালে হজ্জ পালন করতে এসে একদিন মক্কায় সিংহাসনে বসলেন। তার চারপাশে প্রত্যেক গোত্রের শীর্ষস্থানীয় সর্দাররা সমবেত ছিল। ঠিক এ সময় হযরত আতা ইবনে আবু রুবাহ্ খলীফার কাছে আগমন করলেন। খলীফা তাঁকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ালেন এবং সিংহাসনে নিজের পার্শ্বে বসালেন। অতঃপর খলীফা তাঁর সামনে বসে আরজ করলেন ঃ আপনি কেন কষ্ট করে আগমন করেছেন? আতা বললেন ঃ হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহ্ তাআলার হেরেম ও তাঁর রসূলের হেরেমের ব্যাপারে সব সময় আল্লাহ্কে ভয় করবেন। এসব স্থানের অধিবাসীদের খবরাখবর নেবেন। মুহাজির ও আনসারগণের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন। তাদের দৌলতেই আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবেন। সাধারণ মুসলমানদের কাজ-কারবারের প্রতি সুনজর রাখবেন। তাদের বিষয়ে বিশেষভাবে আপনিই জিজ্ঞাসিত হবেন। যারা আপনার দ্বারে আগন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ভয় রাখবেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হবেন না এবং তাদের সামনে আপন দ্বার রুদ্ধ করবেন না, যাতে আপনার কাছে আসতে না পারে। খলীফা আরজ

করলেন ঃ ভাল, আমি আপনার কথামতই কাজ করব। এর পর হযরত আতা প্রস্থানোদ্যত হলে খলীফা তাঁকে ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আবু মুহাম্মদ, এতক্ষণ আপনি অন্যদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তা পূর্ণ করব বলে ওয়াদা করেছি। এখন নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করুন। তিনি বললেন ঃ মানুষের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আবদুল মালেক বললেন ঃ আভিজাত্য ও মর্যাদা একেই বলে।

কথিত আছে, একদিন ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তার দারোয়ানকে বললেন ঃ দরজায় দাঁড়াও। কেউ এ পথে গেলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার কথাবার্তা শুনব। দারোয়ান দরজায় দাঁড়াল। এমন সময় আতা ইবনে আবু রুবাহ্ সেই পথে যাচ্ছিলেন। দারোয়ান তাঁকে চিনত না। সে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীনের কাছে চল। এটা তাঁর আদেশ। আতা খলীফার কাছে গেলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আতা ওলীদের নিকটে পৌঁছে বললেন ঃ আসসালামু আলাইকুম হে ওলীদ! খলীফা দারোয়ানের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ হতভাগা, আমি তোকে বলছিলাম এমন ব্যক্তিকে আনতে, যে আমাকে কিস্সা-কাহিনী শুনাবে। আর তুই কিনা এমন একজনকে এনেছিস, যে আমাকে সেই নামে ডাকা পছন্দ করে না, যা আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে মনোনীত করেছেন (অর্থাৎ, আমীরুল মুমেনীন)। দারোয়ান বলল ঃ এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ পথে আসেনি। এর পর খলীফা আতাকে বললেন ঃ বসুন। কথাবার্তার মধ্যে আতা খলীফার সামনে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করলেন— জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হাবাব। আল্লাহ্ তাআলা এটি সেই শাসনকর্তার জন্যে রেখেছেন, যে তার শাসনকার্যে যুলুম করে। এ কথা শুনে খলীফা ওলীদ ভীষণ আর্তচীৎকার করে দেওয়ানখানার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) আতা (রঃ)-কে বললেন ঃ আপনি আমীরুল মুমেনীনকে মেরে ফেলেছেন। আতা তাঁর হাত ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর, এটা বাস্তব অবস্থা। অতঃপর আতা সেখান থেকে চলে গেলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করতেন ঃ হাতে চাপ দেয়ার প্রভাবে কয়েক বছর পর্যন্ত আমার হাতে ব্যথা ছিল।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক ইবনে আবী শুমায়লা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে গেলেন। আবদুল মালেক তাঁকে বললেন ঃ কিছু

বলুন। তিনি বললেন ঃ কি বলব, আপনি তো জানেন, বক্তা যে কথা বলে, তা তার জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে, সেই কথা ছাড়া, যা আল্লাহর ওয়াস্তে বলা হয়। আবদুল মালেক কেঁদে উঠলেন; অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, মানুষ তো চিরকালই একে অপরকে উপদেশ দেয়। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, কেয়ামতে কোন মানুষই কথার তিক্ততা গলায় আটকে যাওয়া এবং ধ্বংস প্রত্যক্ষ করা থেকে মুক্তি পাবে না। তবে তারা মুক্তি পাবে, যারা নিজেকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে। আবদুল মালেক আবার কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ আমি এসব অমিয় বাণী আজীবন চিত্রের ন্যায় চোখের সামনে রাখব।

ইবনে আয়েশা বলেন ঃ একবার হাজ্জাজ বসরা ও কুফার আলেমগণকে ডেকে পাঠালে আমরা সকলেই গেলাম। হযরত হাসান বসরী (রঃ) সকলের পশ্চাতে গেলেন। হাজ্জাজ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে "মারহাবা" বলল এবং একটি চেয়ার আনিয়ে সিংহাসনের কাছে তাঁকে বসাল। অনেক কথাবার্তার পর হাজ্জাজ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর উদ্দেশে গালিগালাজ করতে লাগল। আমরাও তার কথার সাথে সায় দিচ্ছিলাম। ভয়ে আমরা তার কথা মেনে নেয়া ছাড়া আর কিছু বলছিলাম না। হযরত হাসান বসরী থুতনীর নীচে অঙ্গুলি চেপে চুপচাপ বসে ছিলেন। হাজ্জাজ তাঁকে বলল ঃ আপনি চুপ কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিছু বলতে পারি না। হাজ্জাজ বলল ঃ আপনি আলী সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। হাসান বসরী বললেন ঃ আমি শুনেছি, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

"যে কেবলার উপর আপনি এতদিন ছিলেন, তাকে আমি এ জন্যেই নির্দিষ্ট করেছিলাম, যাতে কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে করে না তা জেনে নেই। আল্লাহ্ যাদের হেদায়াত করেছেন, তাদের ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর ব্যাপার ছিল। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবার নন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল, দয়ালু।"

হযরত আলী মোর্তাযা (রাঃ) সেই ঈমানদার লোকদের একজন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়াত দান করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে, তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই, তাঁর জামাতা এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয়জন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ব থেকে লেখে দিয়েছিলেন, তা সমস্তই তাঁর অর্জিত। তোমার পক্ষে এবং অন্য কারও পক্ষে এটা সম্ভবপর নয় যে, তুমি তাঁর এসব শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত করে দেবে অথবা এগুলোর মধ্যে ও তাঁর মধ্যে অন্তরায় হয়ে যাবে। এটাও আমার অভিমত যে, যদি হযরত আলী মোর্তাযা (রাঃ) কোন মন্দ কাজ করেনও, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাছ থেকে হিসাব নেবেন। আমার মতে তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে উত্তম উক্তি নেই। এ কথা শুনে হাজ্জাজ নাক সিট্‌কিয়ে ক্রুদ্ধ অবস্থায় সিংহাসন থেকে নেমে পড়ল এবং পশ্চাতের একটি কক্ষে চলে গেল। আমরা সকলেই বেরিয়ে এলাম। সুপ্রসিদ্ধ আলেম আমের শা'বী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর হাত ধরে বললাম, হে আবু সায়ীদ, আপনি হাজ্জাজকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন এবং তার সিনা বিদ্বেষে ভরে দিয়েছেন। হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ হে আমের, আমার কাছ থেকে সরে যাও। লোকে বলে, আমের শা'বী কুফার আলেম, কিন্তু তুমি একজন শয়তান প্রকৃতির মানবরূপী শাসকের কাছে এসে তার মর্জি মোতাবেক কথা বল এবং তার মতামতকে সঠিক বল। ধিক তোমার প্রতি! তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তখন তুমি সত্য বলতে, না হয় চুপ থাকতে। তা হলে শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে। আমের জওয়াব দিলেন ঃ আমি তার কথায় সায় দিয়েছি ঠিক, কিন্তু আমি জানতাম, তার কথায় অনিষ্ট আছে। হাসান বসরী বললেন ঃ এটা তোমার বিরুদ্ধে গোনাহের আরও বড় প্রমাণ।

অন্য একদিনের ঘটনা। আমের বলেন ঃ হাজ্জাজ হযরত হাসান বসরীকে ডেকে পাঠাল। তিনি উপস্থিত হলে হাজ্জাজ বলল ঃ আপনিই কি বলেন যে, সেই শাসক নিপাত যাক, যে আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করেছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি বলি। সে বলল ঃ এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এর কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আলেমদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা কোন কিছু গোপন করবে না– মানুষের কাছে বর্ণনা করে দেবেন। এরশাদ হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ـ

'স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ কিতাবওয়ালাদের (অর্থাৎ আলেমদের) কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা এই কিতাব অবশ্যই মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।'

হাজ্জাজ বলল ঃ ব্যস, বেশী কথা বলবেন না। রসনা সংযত করুন। খবরদার, ভবিষ্যতে যেন এমন কথাবার্তা আর না শুনি, যা আমার কাছে খারাপ লাগে। নতুবা আপনার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।

কথিত আছে, হাতীত যাইয়াত হাজ্জাজের সম্মুখে নীত হলে হাজ্জাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ কি হে, তুমিই নাকি হাতীত যাইয়া!? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমিই হাতীত। তোমার মনে যা চায় জিজ্ঞেস কর। আমি মকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে তিনটি অঙ্গীকার করেছি– (১) আমাকে প্রশ্ন করা হলে আমি সত্য জওয়াব দেব, (২) বিপদ হলে সবর করব এবং (৩) নিরাপদ থাকলে শোকর করব। হাজ্জাজ বলল ঃ তুমি আমার সম্পর্কে কি বল? তিনি বললেন ঃ আমি বলি, তুমি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম দুশমন। তুমি মানুষের মানহানি কর এবং অপবাদ লাগিয়ে হত্যা কর। সে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ সে অপরাধে তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তুমিই তার সকল অপরাধের মধ্যে এক অপরাধ। হাজ্জাজ আদেশ দিল– একে শাস্তি দাও। সেমতে তাঁর শরীরে বাঁশের চোকলা লাগিয়ে তাঁকে মাটিতে হেঁচড়ানো হল। ফলে দেহের মাংস খসে গেল, কিন্তু তিনি উহ্ পর্যন্ত করলেন না। হাজ্জাজকে বলা হল, হাতীত এখন মরণোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে। এতে ইতর হাজ্জাজ বলল ঃ তাকে তুলে বাজারে নিক্ষেপ কর। জা'ফর বলেন ঃ আমি এবং তার একজন সঙ্গী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাতীত, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে পানি পান করাও। আমরা পানি এনে দিলাম। তিনি পানির সাথে সাথে মৃত্যুর পেয়ালাও পান করে নিলেন। তাঁর বয়স ছিল আঠার। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

কথিত আছে, গভর্নর আমর ইবনে হুবায়রা একবার বসরা, কুফা, মদীনা ও সিরিয়ার আলেমগণকে একত্রিত করে নানাবিধ প্রশ্ন করল এবং আমের শা'বীর সাথেও আলোচনা করল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল পেল। এর পর হাসান বসরীকেও পরখ করার পর বলল ঃ কুফা ও বসরার আলেম এঁরা দুজনই। অতঃপর সকলকে বিদায় দিয়ে শা'বী ও হাসান বসরীকে একান্তে নিয়ে গেল। সে আমের

শা'বীকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে আবু আমর, আমি আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্নর, তার বিশ্বাসভাজন এবং তার আনুগত্যে আদিষ্ট। প্রজাদের কাজ আমার হাতে সোপর্দ এবং তাদের হক আমার উপর অপরিহার্য। আমি চাই তারা সকল বিপদাপদ থেকে হেফাযতে থাকুক। আমি তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এর পর দেশবাসীর কাছ থেকে আমি এমন কথা শুনি, যাতে তাদের প্রতি আমার রাগ হয়। এতে আমি তাদের ভাতা মওকুফ করে বায়তুল মালে রেখে দেই। নিয়ত এই থাকে যে, পরে ফেরত দিয়ে দেব, কিন্তু ইতিমধ্যে আমীরুল মুমেনীন এজীদ জানতে পারেন এবং আমাকে লেখে পাঠান, এই অর্থ আর ফেরত দিয়ো না। এখন আমি খলীফার আদেশ অমান্যই করি কিভাবে এবং পালনই করি কিরূপে? অথচ আমি আনুগত্যেই আদিষ্ট। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের ব্যাপারে আমার গোনাহ হবে কি না? আমি আমার নিয়তের অবস্থা বলেই দিয়েছি। শা'বী জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে পুণ্য দান করুন। বাদশাহ্ পিতৃতুল্য। তিনি ভুল-নির্ভুল উভয় প্রকার কাজ করেন। এ জন্যে আপনাকে পাকড়াও করা হবে না। ইবনে হুবায়রা এ জওয়াব শুনে খুবই আনন্দিত হল এবং বলল ঃ আল্লাহর শোকর, আমাকে পাকড়াও করা হবে না। এর পর ইবনে হুবায়রা হাসান বসরীকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে আবু সায়ীদ, আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমি আপনার কথা শুনেছি, আপনি আমীরুল মুমিনীনের গভর্নর, তার বিশ্বস্ত এবং আনুগত্যে আদিষ্ট। প্রজাদের মঙ্গল সাধন আপনি অপরিহার্য মনে করেন। বাস্তবে প্রজাদের হক আপনার জন্যে অপরিহার্য এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা আপনার উপর ওয়াজিব। আমি আবদুর রহমান ইবনে সামরা কারশী সাহাবীর মুখে শুনেছি রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি প্রজাদের শাসক হয়ে শুভেচ্ছা সহকারে তাদের হেফাযত করে না, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। আপনি আরও বলেছেন, আপনি কখনও কখনও প্রজাদের ভাতা বাজেয়াপ্ত করে দেন এবং এতে তাদের হিতসাধন ও আনুগত্য নিয়ত থাকে। কিন্তু এজীদ তা জেনে ফেলে এবং সেই অর্থ ফেরত না দেয়ার আদেশ জারি করে। তখন তার আদেশ পালন করবেন, না প্রত্যাখ্যান করবেন, তা আপনি ভেবে পান না। আমি বলি, আপনার জন্যে এজীদের হকের তুলনায় আল্লাহ্ তাআলার হক অধিক অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করা একটি হক। তাঁর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং আপনি এজীদের লিখিত আদেশ কোরআনের সামনে পেশ করুন। যদি একে আল্লাহ

তাআলার আদেশের অনুকূলে পান, তবে বাস্তবায়ন করুন। আর বিরুদ্ধে পেলে পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করুন। হে ইবনে হুবায়রা, আল্লাহকে ভয় করুন। অচিরেই তাঁর দূত আপনার কাছে আসবে এবং আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে। এই সুপ্রশস্ত প্রাসাদ থেকে বের করে আপনাকে সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরে পৌঁছে দেবে। এই রাজত্ব ও পৃথিবীর সবকিছু আপনি পেছনে ফেলে যাবেন এবং আল্লাহ তাআলার সামনে যেমন কর্ম তেমন ফল পাবেন। হে ইবনে হুবায়রা, আল্লাহ আপনাকে এজীদের কবল থেকে রক্ষা করুন, কিন্তু এজীদের সাধ্য নেই, আপনাকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তাআলার আদেশ সকল আদেশের ঊর্ধ্বে। তাঁর নাফরমানী করে কারও আনুগত্য করার বিধান নেই। আমি আপনাকে আল্লাহর সেই আযাব থেকে সতর্ক করছি, যা পাপীদের থেকে প্রত্যাহার করা হয় না। ইবনে হুবায়রা বলল ঃ হে শায়খ, ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না। আমীরুল মুমেনীন তো শাসক, জ্ঞানী ও গুণী। আল্লাহ তাআলা তাকে উম্মতের শাসক নিযুক্ত করেছেন কিছু বুঝেই এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ত দেখেই। অতএব তার সমালোচনা করবেন না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ হে ইবনে হুবায়রা, হিসাব তোমার মাথার উপরে এবং বেত্রের বদলে বেত্র। আল্লাহ তাআলা ওৎ পেতে আছেন। জেনে রাখ, যেব্যক্তি তোমাকে উপদেশ দেয় এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে, সে তার চেয়ে উত্তম, যে তোমাকে বিভ্রান্ত করে এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইবনে। হুবায়রা এ কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। শা'বী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরীকে বললাম, আপনি ইবনে হুবায়রাকে উত্তেজিত করে দিয়েছেন। ফলে তার কাছ থেকে যে দান পাওয়ার আশা ছিল, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমের শা'বী, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। এমন সর্বনাশা কথা বলো না। শা'বী বলেন ঃ এর পর হযরত হাসান বসরীর জন্যে উপঢৌকন এল। তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেল, কিন্তু আমি কিছুই পেলাম না। বাস্তবে তাঁর সাথে যে ব্যবহার করা হল, তিনি তারই উপযুক্ত ছিলেন এবং আমার সাথে যা করা হল, আমি তারই যোগ্য ছিলাম। আমি যত আলেম দেখেছি, হাসান বসরীর মত কাউকে দেখিনি। যখনই কোন সমাবেশে আমরা একত্রিত হয়েছি, তিনি আমাদের সকলের উপর বিজয়ী হয়েছেন। কারণ, তিনি আল্লাহর জন্যে কথা বলেছেন, আর আমরা শাসকদের মন তুষ্ট করার জন্যে বলেছি। আমি সেদিন থেকে

প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন শাসকের কাছে তার পক্ষপাতিত্ব করার জন্যে যাব না।

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ আমার চাচা মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন– একবার আমি খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের দরবারে ছিলাম। সেখানে ইবনে আবী যীব এবং মদীনার গভর্নর হাসান ইবনে যায়দও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় গেফার গোত্রের লোকজন সেখানে আগমন করল। তারা খলীফার কাছে হাসান ইবনে যায়দের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করলে হাসান বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, ইবনে আবী যীবের কাছে জিজ্ঞেস করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আবী যীব বললেন ঃ এরা মানুষের মানহানি করে এবং মানুষকে খুব কষ্ট দেয়। খলীফা গেফারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা শুনলে তো তিনি কি বললেন? গেফারীরা বলল ঃ আপনি তার কাছে হাসান ইবনে যায়দের অবস্থাও জিজ্ঞেস করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি অন্যায় আদেশ দেন এবং স্বীয় খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন। খলীফা হাসানকে বললেন ঃ তুমি তো শুনলে তোমার সম্পর্কে কি রিপোর্ট হল। ইবনে আবী যীব সরল ও সাধু মানুষ। হাসান বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, তাঁকে আপনার নিজের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করেন? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। খলীফা বললেন ঃ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন ঃ আপনি কসম দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, যেন নিজের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। খলীফা পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি এই ধন-সম্পদ ন্যায়ভাবে গ্রহণ করেননি– অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এমন লোকদের জন্যে ব্যয় করেছেন, যারা এর যোগ্য ছিল না। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, যুলুম অবিচার আপনার দরজায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কথা শুনে খলীফা মনসুর আপন স্থান থেকে সরলেন এবং ইবনে আবী যীবের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন ঃ মনে রাখবেন, যদি আমি এখানে না বসতাম, তবে পারসিক, রোমীয় ও তুর্কীরা এ স্থান আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিত। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, হযরত ওমরও শাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং সমান বন্টন করেছেন। তারা পারস্য ও রোমের ঘাড়ে ধরে তাদের নাক মাটিতে ঘষে দিয়েছেন। মনসুর ইবনে আবী যীবের ঘাড় ছেড়ে দিলেন এবং এ কথা বলে বিদায় দিলেন– আপনি সত্য কথা বলেন,

এটা আমার জানা না থাকলে আমি অবশ্যই আপনাকে হত্যা করতাম। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আল্লাহর কসম হে আমীরুল মুমেনীন, আপনার পুত্র মাহ্দীর চেয়েও আমি আপনার অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী। ইবনে আবী যীব মনসুরের মজলিস থেকে বের হলে পর সুফিয়ান সওরীর সাথে সাক্ষাৎ হল। সুফিয়ান বললেন ঃ আপনি এই যালেমের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু কথাটি আমার কাছে খারাপ লেগেছে যে, আপনি তার পুত্রকে "মাহ্দী" (হেদায়াতপ্রাপ্ত) বলেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমি তাকে "হেদায়াতপ্রাপ্ত" অর্থে মাহদী বলিনি; বরং সকল মানুষ মাহদীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বিধায় মাহদী বলেছি।

আবদুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আমি সমুদ্রোপকূলে ছিলাম। খলীফা মনসুর লোক পাঠিয়ে আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এল। আমি দরবারে পৌঁছে খেলাফতের রীতি অনুযায়ী সালাম করলাম। খলীফা সালামের জওয়াব দিয়ে আমাকে বসতে বলল। আমি বসতেই সে বলল ঃ অনেক দিন হয় আপনি আমার কাছে আসেন না, এর কারণ কি? আমি বললাম ঃ আমার কাছে আপনার প্রয়োজন কি? সে বলল ঃ কিছু শিখতে চাই। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, তা হলে আমি যা বলব তা মনে রাখবেন– ভুলে যাবেন না। খলীফা বলল ঃ আমি নিজেই যখন জিজ্ঞেস করছি, তখন ভুলে যাব কেন? এ প্রয়োজনেই আমি আপনার কাছে লোক পাঠিয়েছি। আমি বললাম ঃ আমার আশংকা হয়, আপনি শুনবেন, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করবেন না। আমি একথা বলতেই রবী আমাকে হুশিয়ার করে দিল এবং তরবারির কবজায় হাত রাখল। খলীফা তাকে শাসিয়ে বলল ঃ এটা সওয়াবের মজলিস– শাস্তির মজলিস নয়। এতে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে গেল এবং কথা বলার জন্যে মনের কপাট খুলে গেল। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে এবং তিনি আতিয়্যা ইবনে বুসরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন– যে বান্দার কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ আসে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক নেয়ামত বৈ নয়। সে যদি সেটা কৃতজ্ঞতা সহকারে কবুল করে নেয়, তবে উত্তম। নতুবা সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে, যাতে এর কারণে তার গোনাহ্ বেশী হয় এবং আল্লাহ্ এর কারণে তার প্রতি বেশী নারাজ হন। আমীরুল মুমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে এবং তিনি আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন,

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– যে শাসক প্রজাদের অহিতকামী হয়ে মারা যাবে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আমীরুল মমেনীন, আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার সত্য। তিনি আপনার প্রজাদের অন্তর আপনার প্রতি নরম করে দিয়েছেন এবং আপনাকে শাসনক্ষমতা দান করেছেন। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে যিনি উম্মতের প্রতি অনুকম্পাশীল, দয়ালু, মনে প্রণে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আল্লাহ ও উম্মতের কাছে প্রসংসনীয় ছিলেন। অতএব আপনারও উচিত আল্লাহর ওয়াস্তে উম্মতের মধ্যে সত্য কায়েম করা, ন্যায়বিচার সহকারে থাকা, তাদের দোষ গোপন করা, ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শ্রবণ করা, তাদের জন্যে ফটক বন্ধ না করা, তাদের সুখে সুখী এবংর দুঃখে দুঃখী হওয়া। আমীরুল মুমেনীন, পূর্বে আপনার কেবল নিজের চিন্তা ছিল; এখন সকল মানুষের বোঝা আপনার কাঁধে। আরব ও আজম এবং কাফের ও মুসলিম আপনার করায়ত্ত। আপনার ন্যায়পরায়ণতায় তাদের প্রত্যেকের অংশ আছে। যখন তারা দলে দলে দাঁড়াবে এবং কেউ আপনার তরফ থেকে বিপদে ফেলার অভিযোগ করবে এবং কেউ কোন হক আত্মসাৎ করার অভিযোগ করবে, তখন আপনার কি অবস্থা হবে? হে আমীরুল মমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে শুনেছি তিনি ওরওয়া ইবনে রোয়ায়মের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে একটি খর্জুর শাখা ছিল, যদ্দারা তিনি মেসওয়াক করতেন এবং মোনাফেকদেরকে সতর্ক করতেন। তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল আগমন করে আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! এই শাখা কিসের? এর দ্বারা আপনি আপনার উম্মতের মন ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি উম্মতের পিঠের চামড়া তুলে দেয়, তাদের রক্ত প্রবাহিত করে, তাদের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং তাদেরকে দেশান্তরিত করে দেয়, তার কি দশা হবে? হে আমীরুল মুমেনীন আমি মকহুল থেকে তিনি সিয়াদা থেকে, তিনি হারেসা থেকে এবং হারেসা হাবীব ইবনে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নিজের কাছ থেকে "কেসাস" (প্রতিশোধ) নিতে বললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাত দিয়ে অজ্ঞাতসারে জনৈক বেদুঈনের গায়ে বেত লেগেছিল। তৎক্ষণাৎ জিব্রাঈল তাঁর কাছে এসে আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যালেম ও অহংকারীরূপে পেরণ করেননি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেদুঈনকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। বেদুঈন বলল ঃ আমি আপনাকে ক্ষমা করে

দিয়েছি। আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমি এমন নই। আপনি যদি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতেন, তবু আমি 'কেসাস' নিতাম না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করলেন। হে আমীরুল মুমেনীন, নিজের উপকারের জন্যে অধ্যবসায় করুন এবং পরওয়ারদেগারের কাছে শান্তি প্রার্থনা করুন। সেই জান্নাতে আগ্রহী হোন, যার প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান এবং যার শানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও জন্যে জান্নাত থেকে এক ধনুক পরিমাণে অর্জিত হওয়া পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম। হে আমীরুল মুমেনীন! যদি রাজত্ব আপনার পুর্ববর্তীদের জন্যে চিরস্থায়ী থাকত, তবে আপনি তা পেতেন না। এমনিভাবে আপনার কাছেও থাকবে না; যেমন অন্যদের কাছে থাকেনি। হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি জানেন, আপনার পিতামহ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ـ

এ কোরআনের কি হল, সগীরা-কবীরা কোন গোনাহ্ই গণনা না করে ছাড়ে না?

কোরআনের এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে সগীরা অর্থ মুচকি হাসা এবং কবীরা অর্থ হাসা। অতএব যখন মুচকি হাসা ও পূর্ণ হাসা সগীরা এবং কবীরা গোনাহ্ সাব্যস্ত হল, তখন হাতের কাজ ও মুখের উক্তিসমূহের কি অবস্থা হবে? হে আমীরুল মুমেনীন! আমি শুনেছি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছেন– যদি কোন ছাগল ছানা ফোরাতের কিনারে অনাহারে মারা যায়, তবে আমি আশংকা করি এ সম্পর্কে না আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়। এখন বলুন, যারা আপনার বিছানায়ই থাকে এবং আপনার ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত থাকে, তার হিসাব আপনাকে দিতে হবে না কি? হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি জানেন আপনার পিতামহ নিম্নোক্ত আয়াতের কি তফসীর করেছেন?

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাহলে খেয়াল-খুশী তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।

তিনি বলেন– আল্লাহ্ তাআলা যবুর কিতাবে এরশাদ করেছেন, যখন বাদী ও বিবাদী তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তোমার মনে তাদের

একজনের প্রতি ঝোঁক থাকে তখন কখনও একথা চিন্তা করো না যে, হক সে-ই লাভ করুক এবং বিজয়ী সে-ই হোক । যদি এরূপ চিন্তা কর, তবে আমি তোমার নাম নবুওয়তের দফতর থেকে কেটে দেব। এর পর তুমি আমার খলীফাও থাকবে না এবং কোন মাহাত্ম্যও পাবে না । হে দাউদ, আমি আমার রসূলগণকে উটের রাখালের মত করেছি। রাখালরা পথঘাট সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে এবং শাসন নরমভাবে করে। মোটা উটকে বেঁধে রাখে এবং দুর্বল ও কৃশ উটের সামনে ঘাস পানি দেয়। হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি এমন দায়িত্বের সাথে জড়িত আছেন, যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সামনে তা পেশ করা হত, তবে তারা ভয়ে তা বহন করতে অস্বীকার করত। দেখুন, আমার কাছে এযীদ ইবনে জাবের ও তাঁর কাছে আবদুর রহমান ইবনে ওমর আনসারী বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক আনসারীকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেন। কয়েকদিন পর তিনি দেখলেন, সে কাজে যোগদান করেনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি তোমার কর্মস্থলে গেলে না কেন? তুমি কি জান না, তুমি আল্লাহর পথে জেহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে? সে বলল ঃ কি করব, সাহস পাই না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন? আনসারী বলল ঃ আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যেব্যক্তি মুসলমানদের কোন্ কাজের কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে ঘাড়ে হাতবাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। একমাত্র ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু তার হাত খুলতে পারবে না। এর পর তাকে জাহান্নামের পুলের উপর খাড়া করা হবে। পুল তাকে এমনভাবে নাড়া দেবে যে, তার গ্রন্থিসমূহ আপন স্থান থেকে সরে যাবে। এর পর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে এবং হিসাবে-নিকাশ করা হবে। যদি সৎকর্মী হয় তবে সৎকর্মের কারণে বেঁচে যাবে। আর কুকর্মী হলে পুল সেই স্থান থেকে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নামে সত্তর বছর দূরত্বে নীচে পতিত হবে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই হাদীস কার কাছে শুনেছ? সে বলল ঃ হযরত আবু যর ও সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর কাছে। তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁদের উভয়কে ডেকে আনলেন এবং হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে এ হাদীসটি শুনেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হায়, হায়, শাসনকার্যে এত অনিষ্ট থাকলে এ কাজ কে করবে? হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন ঃ সে-ই করবে, যার নাক আল্লাহ তা'আলা কেটে দেন এবং গণ্ড মাটিতে মিশিয়ে দেন। আওযায়ী বলেন ঃ এ পর্যন্ত শুনে মনসুর

মুখে রুমাল দিয়ে এত কাঁদল যে, আমাকেও কাঁদিয়ে দিল । আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমেনীন, আপনার প্রপিতামহ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মক্কা, তায়েফ অথবা ইয়ামনের শাসনক্ষমতা চেয়েছিলেন। জওয়াবে তিনি এরশাদ করেছিলেন ঃ চাচাজান, যদি আপনি নিজেকে কষ্ট থেকে দূরে রাখেন, তবে এটা সেই রাজত্ব থেকে উত্তম যা আপনি বেষ্টন করতে পারবেন না। পিতৃব্যের হিতাকাঙ্ক্ষায়ই তিনি একথা বলছিলেন। হযরত আব্বাসকে তিনি আরও বলছিলেন– আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। যখন وَانْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আপনি আপনার নিকটআত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।) আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্বাস, সফিয়্যা ও ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। আমার কর্ম আমার জন্যে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে উপকারী হবে।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ বুদ্ধিদীপ্ত সৎকর্মী ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। তার কোন দোষ যাহির না হওয়া চাই; আত্মীয়-তোষণ করবে বলে আশংকা না থাকা চাই এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারেও প্রভাবিত না হওয়া চাই। তিনি আরও বলেন ঃ শাসক চার প্রকার। (১) যে নিজেও পরিশ্রম করে এবং কর্মচারীদের কাছ থেকেও পরিশ্রম নেয়। সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর মত। তার উপর আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। (২) যে কিছুটা দুর্বল। নিজে পরিশ্রম করে, কিন্তু কর্মচারীরা অলসতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা রহমত না করলে সে ধ্বংসের মুখোমুখি! (৩) যে কর্মচারীদের কাছ থেকে পরিশ্রম নেয়; কিন্তু নিজে অলসতা করে। এরূপ শাসক একাই ধ্বংস হয়ে যায়। (৪) যে নিজেও অলসতা করে এবং কর্মচারীরাও তাই করে। এখানে সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হে আমীরুল মুমেনীন! আমি শুনেছি, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ আমি যখন আপনার কাছে আগমন করেছি, তখন কেয়ামতে প্রজ্বলিত করার জন্য ইন্ধন দোযখের অগ্নির উপর রেখে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে দোযখের অবস্থা বর্ণনা করুন । জিবরাঈল বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা দোযখ প্রজ্বলিত করার আদেশ দিলে হাজার বছর পর্যন্ত তা প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে দোযখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। এর পর আরও

হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে তা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এর পর আরও হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এখন দোযখ ঘোর কাল ও অন্ধকারময়। ফলে তার পুল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং অগ্নিশিখাও নির্বাপিত হয় না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, যদি দোযখীদের একটি বস্ত্রও পৃথিবীবাসীদেরকে দেখানো হয়, তবে সকলেই মারা যাবে এবং যদি দোযখের এক বালতি পানি পৃথিবীর সব পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে যে কেউ সেই পানি পান করবে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। কোরআনে উল্লিখিত দোযখের শিকলসমূহের মধ্য থেকে যদি একটি শিকল পৃথিবীর সকল পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয়, তবে সকল পাহাড় গলে তরল হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তিকে দোযখে দাখিল করার পর বের করে দুনিয়াতে আনা হয়, তবে তার দুর্গন্ধে, ভয়ে ও কুৎসিত চেহারা দেখে সকল মানুষ মারা যাবে। এ অবস্থা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং জিবরাঈলও তাঁর সাথে ক্রন্দন করলেন। এর পর জিবরাঈল আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ, আপনার তো আগে পরের সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে গেছে, আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার কান্না কৃতজ্ঞতার কান্না, কিন্তু আপনি তো বিশ্বস্ত আত্মা এবং আল্লাহ্ তাআলার ওহীর আমানতদার ফেরেশতা, আপনি কাঁদলেন কেন? জিবরাঈল আরজ করলেন ঃ আমি আশংকা করি, আমার অবস্থা কোথাও হারুত মারুতের মত না হয়ে যায়। তাই আমি আমার মর্যাদার উপর ভরসা পাই না। মোট কথা, তাঁদের অবিরাম ক্রন্দনে আকাশ থেকে ঘোষণা করা হল, হে জিবরাঈল, হে মুহাম্মদ, আমি তোমাদের উভয়কে এ বিষয় থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি যে, তোমরা আমার নাফরমানী করবে এবং আমি তোমাদেরকে আযাব দেব। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সকল পয়গম্বরের উপর এমন, যেমন জিবরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব সকল ফেরেশতার উপর। আমীরুল মুমেনীন! আমি আরও শুনেছি, হযরত ওমর (রাঃ) দোয়া করেছিলেন– ইলাহী! বাদী বিবাদীর মধ্য থেকে যে অন্যায় করে, সে আমার নিকটাত্মীয় হোক বা না হোক, যদি তুমি জান আমি তার পক্ষপাতিত্ব করি, তবে আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিয়ো না। আমীরুল মুমেনীন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক মাহাত্ম্য হচ্ছে তাকওয়া। যেব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে ইযযত ও সম্মান কামনা করে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা উঁচু করেন এবং সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর

নাফরমানী করে সম্মান তলব করে, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ হচ্ছে আপনার প্রতি আমার উপদেশ, ওয়াসসালামু আলাইকুম। এর পর আমি প্রস্থানোদ্যত হলাম। মনসুর জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন অনুমতি দিলে দেশে বাল-বাচ্চাদের কাছে যাব ইনশাআল্লাহ্। মনসুর বলল ঃ আমি অনুমতি দিলাম। আমি আপনার উপদেশে ধন্য ও কৃতজ্ঞ। আমি এটা কবুল করলাম। আল্লাহ্ তাআলা তওফীক দিন ও সাহায্য করুন। আমি তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর উপরই ভরসা করি। আমি আশা করি আপনি আমাকে এরূপ নেক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার উক্তি মকবুল এবং উপদেশদানের সাথে আপনার কোন মতলব জড়িত থাকে না। আমি বললাম ঃ তাই করব ইনশাআল্লাহ্।

মুহাম্মদ ইবনে মুসইব বলেন ঃ মনসুর তাঁর জন্যে পাথেয় দেয়ার নির্দেশ দিল, কিন্তু আওযায়ী তাতে সম্মত হলেন না এবং বললেন ঃ এর প্রয়োজন নেই। আমি আমার উপদেশকে পার্থিব ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চাই না। এর পর মনসুর আর পীড়াপীড়ি করেনি।

ইবনে মুহাজির বলেন ঃ খলীফা মনসুর মক্কায় হজ্জ করতে এসে সরকারী বাসভবন থেকে শেষ রাত্রে তওয়াফ করতে বের হত এবং তওয়াফ ও নামায আদায় করত। কেউ তা জানতে পারত না। সকাল হলে সে বাসভবনে ফিরে আসত। তখন মুয়াযযিন এসে তাকে সালাম করত এবং সে মুসল্লীদের নামায পড়াত। এক রাতে সেহরীর সময় সে হরম শরীফে তওয়াফ করছিল, এমন সময় এক ব্যক্তিকে মুলতাযামের কাছে এ কথা বলতে শুনল ঃ ইলাহী, আমি তোমার দরবারে অভিযোগ করছি! পৃথিবীতে নাফরমানী ও ফাসাদ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যুলুম ও লালসা হক এবং হকদারদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে। মনসুর একথা শুনে কানখাড়া করে লোকটির মোনাজাত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করল। এর পর মসজিদের কাছে বসে লোকটিকে ডাকল। দূত যেয়ে বলল ঃ চল, আমীরুল মুমেনীন তোমাকে ডাকছে। লোকটি দু'রাকআত নামায পড়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে দূতের সাথে রওয়ানা হল। মনসুরকে সালাম করতেই সে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি যে বলেছ- পৃথিবীতে নাফরমানী ও ফাসাদ হচ্ছে এবং যুলুম ও লালসা হক এবং হকদারদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে- এর মানে কি? তোমার একথা শুনে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন! যদি আপনি আমাকে প্রাণের অভয় দেন, তবে আমি সব কথা

মূল শিকড়সহ আপনাকে বলে দেব। নতুবা আমি নিজের ধান্ধায়ই ব্যাপৃত থাকব। মনসুর বলল ঃ তোমাকে প্রাণের অভয় দিলাম। লোকটি বলল ঃ সত্য বলতে কি, যেব্যক্তির মধ্যে এতটুকু লালসা এসে গেছে যে, সে হক ও হকদারের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে এবং নাফরমানী ও ফাসাদ নিবারণে প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে, সে ব্যক্তি স্বয়ং আপনি। মনসুর বলল ঃ হতভাগা, আমার মধ্যে এত লালসা কেন আসবে, অর্থসম্পদ, সোনাদানা এবং ক্ষমতা সবই তো আমার করতলগত। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, যে পরিমাণ লালসা আপনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেই পরিমাণ অন্য কারও মধ্যে প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ। দেখুন তো, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মুসলমানদের শাসক করেছিলেন, যাতে আপনি তাদের কাজ-কারবার ও ধন-সম্পদের হেফাযত করেন, কিন্তু আপনি তাদের কাজ-কারবার থেকে গাফেল হয়ে তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। নিজের মধ্যে ও তাদের মধ্যে ইট, চুনার প্রাচীর, লৌহ-দরজা এবং সশস্ত্র দারোয়ান খাড়া করেছেন। আপনি নিজেকে প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়েছেন, যাতে সাধারণ মুসলমান আপনার কাছে যেতে না পারে। সরকারী কর্মচারীদেরকে ধন-সম্পদ একত্রিত করা এবং খেরাজ আদায় করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপন উজির ও সহকারী যালেমদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি ভুলে গেলে তারা স্মরণ করিয়ে দেয় না, আর আপনি ভাল কাজ করতে চাইলে তারা সহযোগিতা করে না। আপনি তাদেরকে অর্থ-সম্পদ, যানবাহন ও অস্ত্র দিয়ে যুলুমের কাজে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া, যাদের নাম আপনি উজিরদেরকে বলে দিয়েছেন– অন্য কেউ যেন আপনার কাছে না আসে। কোন মজলুম, দুর্দশাগ্রস্ত ভুখা-নাঙ্গা মানুষ আপনার কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ করুক, আপনি এর অনুমতি দেননি। অথচ তাদের প্রত্যেকেরই সরকারী ধন-সম্পদে হক আছে। আপনি যেসকল পারিষদকে খাস মোসাহেব নিযুক্ত করেছেন এবং সাধারণ প্রজাকুলের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তারা যখন দেখল, রাজকোষ থেকে কতক সম্পদ আপনি নিজ ভোগ-বিলাসের জন্যে নিয়ে যান এবং তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন না, তখন তারা মনে মনে বলল, খলীফা আল্লাহর হকে খেয়ানত করে, আমরা খেয়ানত করব না কেন? তাই তারা পরস্পরে ঐকমত্য করে নিল যে, যারা প্রজাদের গোপন তথ্যাবলী জানে, তারা যেন খলীফার কাছে পৌঁছাতে না পারে কিংবা যেসকল কর্মচারী সৎপথে থাকতে চায়, তারা

যেন আপন আপন পদে বহাল থাকতে না পারে। আপনার ও আপনার মোসাহেবদের এ সকল কীর্তিকলাপের কারণে সাধারণ মানুষ আপনার পারিষদবর্গকে ভয় করে। কর্মচারীরা তাদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করে তাদের সাথে ভাব করে নিয়েছে, যাতে তারা নির্বিচারে প্রজাদের উপর যুলুম করে যেতে পারে। এর পর অন্যান্য প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা আপনার পারিষদবর্গকে ঘুষ দিয়ে তাদের নিম্নস্তরের লোকদের উপর ইচ্ছামত যুলুম করার পারমিট হাসিল করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর শহরসমূহ অবাধ্যতা, যুলুম ও ফাসাদে পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার মোসাহেবরা আপনার অজ্ঞাতে ক্ষমতায় আপনার অংশীদার হয়ে গেছে। কোন বিচারপ্রার্থী বিচার লাভের আশায় আগমন করলে তারা তাকে আপনার কাছে যেতে দেয় না। আপনার সওয়ারী বের হওয়ার সময় তারা কোন আর্জি লেখে আপনার হাতে দিতে চাইলে তারা আপনার নিষেধাজ্ঞার কথা শুনতে পায়। আপনি এক ব্যক্তিকে মযলুমদের হক দেখাশুনা করার জন্যে নিযুক্ত করেছেন। মজলুমরা তার কাছে গেলে যদি মোসাহেবরা শুনতে পায়, তবে দেখাশুনাকারীকে বলে দেয় যে, তার আর্জি খলীফার কাছে পেশ করো না। ফলে দেখাশুনাকারী কর্মচারীটি মোসাহেবদের ভয়ে যা চায়, তা আপনার কাছে বলতে পারে না। মযলুম ব্যক্তি যখন চেষ্টা সত্ত্বেও যুলুমের প্রতিকার পায় না, তখন আপনার সওয়ারী বের হওয়ার সময় আপনার কাছে ফরিয়াদ পেশ করে। তখন তাকে এমন বেদম প্রহার করা হয় যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে থাকে না। আপনি তাকিয়ে থাকেন– না হাতে বাধা দেন, না মুখে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমানের কি করার থাকে? এর আগে উমাইয়া বংশের রাজত্ব ছিল। মজলুম তাদের মধ্যে পৌঁছলে অনতিবিলম্বে তার মোকদ্দমা পেশ করা হত এবং ইনসাফ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে শাহী দরজায় মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। চতুর্দিক থেকে তারা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি চাই! এর পর তারা তার মোকদ্দমা শাহী দরবারে পেশ করে ইনসাফ করিয়ে দিত। আমীরুল মুমেনীন, আমি এক সময় চীন দেশে সফর করতাম। একবার আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার রাজা বধির হয়ে গেছে। শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় সে অহরহ কান্নাকাটি করত। একদিন উযীররা তাকে এত কান্নাকাটি করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি বধির হয়ে গেছি। এতে আমার নিজের যে বিপদ হয়েছে, তার জন্যে আমি দুঃখ করি না। আমার দুঃখ এ জন্যে যে, মযলুমরা

আমার দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করবে, কিন্তু আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পাব না। এর পর রাজা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলল ঃ আমি শ্রবণশক্তি হারিয়েছি, তাতে কি হয়েছে? আমার চক্ষু তো বিদ্যমান আছে। আজ থেকে রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও- কেউ লাল পোশাক পরিধান করতে পারবে না। একমাত্র যে মযলুম, সে-ই লাল পোশাক পরিধান করবে। আমি পোশাক দেখে ধরে নেব সে মযলুম। এর পর তার যুলুমের প্রতিকার করব। এর পর রাজা হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে সকাল-বিকাল ঘোরাফেরা করত, যাতে কোন মযলুম দৃষ্টিগোচর হলে তাকে ইনসাফ দেয়া যায়। আমীরুল মুমেনীন, চিন্তার বিষয়, চীনের রাজা মুশরিক হয়েও মুশরিক প্রজাকুলের প্রতি এতটুকু সদয় হতে পারলে আপনি তো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান রাখেন এবং আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্যের সন্তান, মুসলমান প্রজাকুলের জন্যে আপনার কতটুকু মেহেরবান হওয়া দরকার! এসব উপদেশ শুনে মনসুর হো হো করে কাঁদতে লাগল। এর পর জিজ্ঞেস করল ঃ যে রাজত্ব আমি লাভ করেছি, তা কিভাবে পরিচালনা করব? সকল মানুষই তো বিশ্বাসঘাতক দৃষ্টিগোচর হয়। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আপনি উঁচুস্তরের ইমাম ও মুরশিদ আলেমগণকে সঙ্গে রাখুন। খলীফা বলল ঃ তারা তো আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। লোকটি বলল ঃ তাদের সরে থাকার কারণ হচ্ছে, তারা আশংকা করে কোথাও আপনি তাদের দিয়ে সেই কাজ না করান, যে কাজ কর্মচারীদের দিয়ে করিয়ে থাকেন। বরং আপনি দরজা উন্মুক্ত করুন, দারোয়ান হ্রাস করুন, মযলুমের শোধ যালেমের কাছ থেকে নিন, যালেমকে যুলুম থেকে বিরত রাখুন, হালাল ও পবিত্র উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করুন এবং ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে বন্টন করুন। এর পর আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যারা এখন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, তারা আপনার কাছে আসবে এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে আপনাকে সাহায্য করবে। মনসুর বলল ঃ ইলাহী, এই লোকের কথামত কাজ করার তওফীক আমাকে দান কর। এমন সময় হরম শরীফের মুয়াযযিন এসে মনসুরকে সালাম করল। নামায পড়ানোর পর মনসুর শাহী দরবারের রক্ষীকে আদেশ দিল ঃ সেই লোকটিকে আমার দরবারে হাযির কর। যদি হাযির করতে না পার, তবে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। রক্ষী অমনি তার খোঁজে বের হল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখল, ঠিক সে ব্যক্তি একটি উপত্যকায় নামায পড়ছে। রক্ষী অপেক্ষা করতে লাগল। নামায শেষে সে লোকটিকে বলল ঃ মিয়া সাব, আপনি আল্লাহকে ভয় করেন? লোকটি

বলল ঃ হাঁ। রক্ষী বলল ঃ তাহলে আপনি আমার সাথে খলীফার কাছে চলুন। খলীফা কসম খেয়েছেন— আমি আপনাকে সাথে না নিয়ে গেলে তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন। লোকটি বলল ঃ এখন তো যাওয়ার কোন উপায় নেই। রক্ষী বলল ঃ তাহলে মনসুর আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবেন। লোকটি বলল ঃ না, মারবে না। অতঃপর সে একটি লিখিত বস্তু বের করে রক্ষীর হাতে দিয়ে বলল ঃ এটি নাও এবং তোমার পকেটে রেখে দাও। এতে প্রশস্ততার দোয়া লিখিত আছে! রক্ষী বলল ঃ প্রশস্ততার দোয়া কি? সে বলল ঃ এই দোয়া শহীদগণ ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা অন্য কাউকে দান করেন না। রক্ষী বর্ণনা করে, আমি লোকটিকে বললাম ঃ আপনি যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তখন আর একটি অনুগ্রহ করুন, দোয়াটি আমাকে বলে দিন এবং এর গুণাগুণ সম্পর্কেও জ্ঞাত করুন। লোকটি বলল ঃ যেব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করবে, তার গোনাহ বিলুপ্ত হবে, দুশমনের বিরুদ্ধে স্থায়ী সাহায্য পাবে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে "সিদ্দীক" লিখিত হবে এবং শহীদ হওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে মারা যাবে না। দোয়াটি এই ঃ

اللّٰهُمَّ كَمَا لَطُفْتَ فِىْ عَظَمَتِكَ دُوْنَ اللُّطَفَاءِ وَعَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ اَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ وَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّدُوْرِ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ وَعَلَانِيَةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِىْ عِلْمِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَىْءٍ بِعَظَمَتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ ذِىْ سُلْطَانٍ سُلْطَانَكَ وَصَارَ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ كُلُّهُ بِيَدِكَ اِجْعَلْ لِّىْ مِنْ كُلِّ هَمٍّ اَمْسَيْتُ فِيْهِ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوْبِىْ وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيْئَتِىْ وَسَتْرَكَ عَلٰى قَبِيْحِ عَمَلِىْ اَطْمَعَنِىْ اَنْ اَسْئَلَكَ مَالَا اَسْتَوْجِبُهٗ لِمَا قَصَّرْتُ فِيْهِ اَدْعُوْكَ اٰمِنًا وَّاَسْئَلُكَ مُتَاَنِّسًا اِنَّكَ الْمُحْسِنُ لِىْ وَاَنَا الْمُسِىْءُ اِلٰى نَفْسِىْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ بِالنِّعَمِ وَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ بِالْمَعَاصِىْ وَلٰكِنَّ الثِّقَةَ بِكَ حَمَلَتْنِىْ عَلَى الْجَرَاةِ عَلَيْكَ فَعُدْ بِفَضْلِكَ وَاِحْسَانِكَ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

'ইলাহী! আপনি আপন মাহাত্ম্যে সকল পবিত্রের চেয়ে পবিত্র এবং

আপন মহত্ত্ব দ্বারা সকল মহানের উপর মহান। আপনি আপনার পৃথিবীর পাতালের বস্তু জানেন যেমন জানেন আপনার আরশের উপরকার বস্তু। অন্তরের গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ্য উক্তির ন্যায় এবং প্রকাশ্য ও গোপন কথা আপনার জানায় একই রূপ। আপনার মাহাত্ম্যের সামনে প্রত্যেক বস্তু অবনমিত এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী আপনার প্রতাপের সামনে হীন। দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারাদি সম্পূর্ণ আপনার করায়ত্ত। আমার জন্যে প্রশস্ততা ও নিষ্কৃতির পথ করে দিন প্রত্যেক শংকা থেকে, যাতে আমি লিপ্ত আছি। ইলাহী, আপনি আমার গোনাহ্ মাফ করেছেন, আমার ত্রুটি মার্জনা করেছেন এবং আমার মন্দ কাজ ঢেকে রেখেছেন– এগুলো আমাকে আশা দিয়েছে যে, আমি আপনার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা করি, যার যোগ্য আমি নই গোনাহের কারণে। আমি আপনার কাছে অবাধে দোয়া করি। নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আর আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায়কারী। অতএব আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে কি সম্পর্ক? আপনি নেয়ামত দিয়ে আমার বন্ধু হন, আর আমি গোনাহ্ করে আপনার শত্রু হই, কিন্তু আপনার উপর আমার ভরসা আমাকে সাহস প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছে। অতএব আপনি আমার প্রতি পূর্ববৎ কৃপা ও অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।'

রক্ষী বলে, আমি এই কাগজ পকেটে রেখে দিলাম। এর পর অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আমীরুল মুমেনীনের কাছে চলে এলাম। আমি সালাম করতেই তিনি মাথা তুলে আমার দিকে দেখলেন, অতঃপর মুচকি হেসে বললেন ঃ তুমি বোধ হয় খুব যাদু জান। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, যাদু কি, আমি জানি না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা কললাম ঃ খলীফা বললেন ঃ বুযুর্গ ব্যক্তি তোমাকে যে কাগজখণ্ড দিয়েছেন, তা আন। আমি কাগজটি তার হাতে দিলে তিনি তা দেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি বেঁচে গেলে। এর পর তিনি আমাকে দশ হাজার দেরহাম দেয়ার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ তুমি জান এই বুযুর্গ কে? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ইনি হযরত খিযির (আঃ)।

আবু এমরান জওফী বলেন ঃ হারুনুর রশীদ যখন খেলাফতের গদিতে বসলেন, তখন আলেমগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাকে মোবারকবাদ দেন। খলীফাও রাজকোষ উজাড় করে উপঢৌকন ও পুরস্কার দিতে শুরু করেন। হারুনুর রশীদ খেলাফত লাভের পূর্বে আলেম ও দরবেশগণের সাথে উঠাবসা করতেন এবং বাহ্যত সংসারের প্রতি

অনাসক্তি ও ভগ্নদশার অধিকারী ছিলেন। হযরত সুফিয়ান সওরীর সাথে তার দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। খলীফা হওয়ার পর হযরত সুফিয়ান তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করেন। তিনি তাকে মোবারকবাদ দিতে আসেননি। হারুনুর রশীদ তাঁর সাথে একান্তে কিছু কথাবার্তা বলতে আগ্রহী হলেন, কিন্তু হযরত সুফিয়ান এলেন না। তিনি হারুনুর রশীদের বর্তমান পদমর্যাদারও পরওয়া করলেন না। বিষয়টি খলীফার জন্য পীড়াদায়ক ছিল। তাই তিনি হযরত সুফিয়ান সওরীর খেদমতে এই মর্মে একটি পত্র লেখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা হারুনুর রশীদ আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে তার ভাই সুফিয়ান সওরীর নামে-

হামদ, নাত ও সালাম পর সমাচার, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন এবং একে নিজের জন্যে ও নিজের সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। আমি আপনার সাথে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি, তার সম্পর্ক ছিন্ন করিনি এবং আপনার বন্ধুত্ব ভঙ্গ করিনি; বরং এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে উত্তম মহব্বত ও পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত আছে। যদি আল্লাহ্ তাআলা খেলাফতের গুরুভার আমার স্কন্ধে অর্পণ না করতেন, তবে আমি হামাগুড়ি দিয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হতাম। কেননা, আমার অন্তর আপনার মহব্বতে পরিপূর্ণ। আমার ও আপনার বন্ধুদের মধ্যে এমন কেউ বাকী নেই, যে আমাকে মোবারকবাদ দিতে আসেনি। আমিও রাজকোষ উন্মুক্ত করে এত পুরস্কার বিতরণ করেছি যে, আমার চক্ষু শীতল ও অন্তর প্রফুল্ল হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি তশরীফ আনতে বিলম্ব করছেন এবং এখন পর্যন্ত শুভাগমন করেননি। তাই আমি এ পত্রখানা পরম আগ্রহ সহকারে আপনার খেদমতে প্রেরণ করলাম। হে আবু আবদুল্লাহ্, আপনি জানেন, ঈমানদারের সাথে সাক্ষাতের কি পরিমাণ সওয়াব বর্ণিত আছে। যখন এই আগ্রহভরা পত্রটি আপনার হাতে পৌঁছবে, তখন কালবিলম্ব না করে আপনি এখানে পদার্পণ করুন।

চিঠি লেখা সমাপ্ত করে হারুনুর রশীদ উপস্থিত সভাসদদের দিকে তাকালেন। উদ্দেশ্য, এ পত্রটি কে সুফিয়ান সওরীর কাছে নিয়ে যাবে? কিন্তু সকলেই হযরত সুফিয়ান সওরীর গরম মেযাজ সম্পর্কে অবগত ছিল। তাই কেউ সাহস করল না। খলীফা বললেন ঃ দারোয়ানদের মধ্য থেকে একজনকে ডাক। সেমতে ওব্বাদ তালেকানী নামীয় এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল। খলীফা বললেন ঃ ওব্বাদ, আমার পত্রটি নিয়ে কুফায়

যাও। বস্তিতে প্রবেশ করে বনী সওর গোত্রের কথা জিজ্ঞেস করবে। এর পর সুফিয়ান সওরী সম্পর্কে জেনে নেবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমার এ পত্রটি তাঁর হাতে দেবে। খবরদার, তাঁর যা অবস্থা দেখবে, শুনবে, তা মনে প্রাণে স্মরণ রাখবে– বিন্দুমাত্রও বিস্মৃত হবে না। এর পর হুবহু তা আমার কাছে এসে বর্ণনা করবে। ওব্বাদ পত্র নিয়ে গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হয়ে গেল। কুফায় পৌছে বনী সওরের কথা জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে দিল। এর পর সুফিয়ান সওরীর হাল জিজ্ঞেস করলে কেউ বলল ঃ তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন। ওব্বাদ বর্ণনা করেন ঃ আমি মসজিদের পথ ধরলাম। আমি তাঁকে দেখতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে জানাশুনা বিতাড়িত শয়তান থেকে। ইলাহী, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সেই আগন্তুক থেকে, যে আমার কাছে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনভাবে আসে। তাঁর এসব কথার প্রভাবে আমি সংকীর্ণ হয়ে গেলাম। তিনি যখন আমাকে মসজিদের গেইটে সওয়ারী থেকে নামতে দেখলেন, তখন নামায পড়তে লাগলেন। অথচ তখন কোন নামাযের সময় ছিল না। আমি ঘোড়া বাইরে বেঁধে রেখে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তাঁর সহচররা মাথা নত করে বসে ছিল– তাঁরা যেন চোর; বাদশাহের শাস্তির ভয়ে তটস্থ্। আমি সালাম করলে কেউ মাথা তুলে আমাকে দেখল না, অঙ্গুলির ইশারায় সালামের জওয়াব দিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ আমাকে বসতে বলল না। তাদের ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কম্পন দেখা দিল। আমি চিন্তা করলাম, ইনিই হবেন সুফিয়ান সওরী, যিনি নামায পড়ছেন। আমি পত্রটি তাঁর সম্মুখে নিক্ষেপ করলাম। তিনি পত্র দেখে কেঁপে উঠলেন এবং এমনভাবে আত্মরক্ষা করলেন, যেন সেজদার জায়গায় সর্প আবির্ভূত হয়েছে। অতঃপর তিনি নামায শেষ করে চোগার আস্তিনে হাত জড়িয়ে পত্রটি ধরলেন এবং পেছন দিকে সহচরদের কাছে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ এটি পড়ে নাও। আমি এমন বস্তুতে হাত লাগাতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই, যা যালেম স্পর্শ করেছে। এক ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে পত্রটি খুলল, যেন তাতে সর্প রয়েছে, যা দংশন করতে উদ্যত। সে পত্রটি আদ্যোপান্ত পাঠ করল। পত্র পাঠ সমাপ্ত হলে হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ যালেমের পত্রের অপর পৃষ্ঠায় জওয়াব লেখে দাও। সহচররা বলল ঃ হে আবু আবদুল্লাহ্, পত্র লেখক একজন খলীফা। তাই একটি পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট কাগজে জওয়াব লেখা সমীচীন। তিনি বললেন ঃ না, তার পত্রের অপর পিঠেই জওয়াব লেখ। সে এ কাগজটি হালাল উপায়ে অর্জন করে থাকলে এর সওয়াব পাবে, অন্যথায় শাস্তি ভোগ করবে। যালেম যে

কাগজ স্পর্শ করেছে, তা আমাদের কাছে থাকা উচিত নয়। থাকলে আমাদের ধর্ম বিনষ্ট করবে। সহচররা জিজ্ঞেস করল ঃ কি জওয়াব লেখব? তিনি বললেন ঃ লেখ,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বান্দা মুনীব সুফিয়ান ইবনে সায়ীদ সওরীর পক্ষ থেকে সেই বান্দার প্রতি, যে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত এবং ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত; অর্থাৎ, হারুনুর রশীদের প্রতি–

সালাম, হামদ ও নাতের পর সমাচার, আমি এ পত্র তোমাকে এ কথা জানানোর জন্যেই লেখছি যে, আমি তোমার মহব্বতের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি। এখন আমি তোমার দুশমন হয়ে গেছি। কেননা, তুমি নিজে স্বীকার করেছ, তুমি রাজকোষ উন্মুক্ত করে আমার মহব্বতে ব্যয় করে ফেলেছ। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী করেছ যে, তুমি মুসলমানদের ধন-সম্পদ অযথা ব্যয় করেছ। তুমি আপন কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকনি; বরং আমি দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে পত্র লেখেছ, যাতে তোমার বিরুদ্ধে আমি এবং আমার সহচররা, যারা এ পত্র পাঠ করেছে– সাক্ষী হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, আমরা কাল কেয়ামতে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে তোমার অন্যায় কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দেব। হে হারুন, তুমি মুসলমানদের রাজকোষ অযথা উজাড় করে দিয়েছ। অথচ এতে কোরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী সাত দল মানুষের হক ছিল। তোমার এ কাজে কোন্ দলটি সন্তুষ্ট হয়েছে? যাদের মন ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে দান করা হয়, তারা সন্তুষ্ট হয়েছে, না যাকাতের কর্মচারীরা, না আল্লাহর পথে জেহাদকারীরা, না মুসাফিররা, না কোরআন বাহক আলেম অথবা বিধবা মহিলা অথবা অনাথ শিশুরা সন্তুষ্ট হয়েছে? সুতরাং এখন জিজ্ঞাসাবাদের জওয়াব দেয়ার জন্যে তৎপর হও এবং নিজের বিপদ দূর করার চিন্তা কর। জেনে রেখ, তুমি অচিরেই ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং তোমাকে তোমার নিজের সম্পর্কে পাকড়াও করা হবে। কেননা, তুমি এলেম, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, কোরআন মজীদ ও পুণ্যবানদের কাছে বসার স্বাদ বিনষ্ট করে দিয়েছ এবং নিজের জন্যে যুলুম ও যালেমদের নেতা হওয়া পছন্দ করে নিয়েছ। হে হারুন, তুমি সিংহাসনে উপবেশন করেছ, রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছ এবং দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছ। এসব পর্দা দ্বারা তুমি বিশ্ব পালকের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছ। এর পর তোমার যালেম সিপাহীদেরকে দরজা ও পর্দার কাছে বসিয়ে দিয়েছ। তারা মানুষের উপর যুলুম করে– ইনসাফ করে না।

নিজেরা মদ্যপান করে এবং অন্য কেউ পান করলে তাকে বেদম প্রহার করে। নিজেরা যিনা করে এবং অন্য যিনাকারদের উপর "হদ" (যিনার শাস্তি) জারি করে। এমনিভাবে নিজেরা চুরি করে এবং অন্য চোরদের হস্ত কর্তন করে। শরীয়তের বিধি-বিধান যেন তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। হে হারুন, কাল কি হবে যখন একজন ঘোষক আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ একত্রিত কর যালেমদেরকে এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদেরকে। তোমাকে ঘাড়ের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার সামনে পেশ করা হবে। তোমার ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া অন্য কোন কিছু এই বন্ধন খুলতে না। অন্য যালেমরা তোমার চারপাশে থাকবে। তুমি সরদার ও নেতা হয়ে সকলকে দোযখে নিয়ে যাবে। হে হারুন, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে কেয়ামতে ঘাড়ে ধরে পেশ করার জায়গায় হাযির করা হয়েছে, আর তুমি তোমার পুণ্যসমূহ অপরের পাল্লায় দেখতে পাচ্ছ এবং নিজের গোনাহ্ ছাড়া অন্যদের গোনাহ্ও তোমার পাল্লায় দেখে যাচ্ছ। বিপদের পর বিপদ, অন্ধকারের উপর অন্ধকার। অতএব হে হারুন, আমার ওসিয়ত মনে রাখ। তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি তা পালন করে যাও। মনে রেখ, আমি তোমার শুভেচ্ছায় ও হিতোপদেশে কোন ত্রুটি বাকী রাখিনি। অতএব তুমি তোমার প্রজাকুলের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। উম্মতে মুহাম্মদীর ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের উপর খেলাফত উত্তমরূপে পরিচালনা কর। জেনে রাখ, যদি খেলাফত খলীফাদের কাছে স্থায়ী হত তবে তোমার কাছে পৌঁছত না। খেলাফত তোমার কাছ থেকেও চলে যাবে। এমনিভাবে দুনিয়া সকল মানুষকে একজন একজন করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ভাণ্ডার সংগ্রহ করে নেয়, যা তার জন্যে উপকারী এবং কেউ কেউ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার ধারণা, তুমিও তাদেরই একজন, যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত। খবরদার, এরপরে আমার কাছে কোন পত্র লেখবে না। আমিও কোন জওয়াব লেখব না। ওয়াস্সালাম।

ওব্বাদ বর্ণনা করে, এ পত্রটি লেখিয়ে ভাঁজ করা ও মোহর লাগানো ছাড়াই আমার দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। আমি পত্রটি নিয়ে কুফার বাজারে এলাম। হযরত সুফিয়ান সওরীর উপদেশ আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি বাজারে পৌঁছে উচ্চ স্বরে ডাক দিলাম ঃ হে কুফাবাসীগণ! উপস্থিত লোকেরা আমাকে বলল ঃ বলুন, কি বলতে চান।

আমি বললাম ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে পলাতক ছিল। এখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আপনারা কেউ তাকে ক্রয় করবেন কি? লোকেরা আমার কাছে আশরফী এনে হাযির করল। আমি বললাম ঃ আমার আশরফীর প্রয়োজন নেই; বরং আমি একটি মোটা সূতী কোর্তা ও একটি পশমী কম্বল চাই। লোকেরা আমাকে তাই এনে দিল। আমি সেগুলো পরিধান করে নিলাম এবং খলীফার সামনে যে পোশাক পরতাম, তা খুলে ফেললাম। আমার সঙ্গে যে অস্ত্র ছিল, তা ঘোড়ার পিঠে রেখে ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। অবশেষে যখন খলীফা হারুনুর রশীদের দরজায় পৌঁছলাম, তখন লোকেরা আমাকে খালি পায়ে, পদব্রজে, অদ্ভুত পোশাক পরিহিত দেখে খুব ঠাট্টা-পরিহাস করল। অতঃপর আমি যখন খলীফার সম্মুখে গেলাম এবং তিনি আমাকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন কয়েকবার উঠাবসা করলেন, এর পর দাঁড়িয়ে অনুতাপ প্রকাশ করে বললেন ঃ আফসোস, দূত উপকৃত হয়েছে এবং প্রেরক বঞ্চিত হয়েছে। সংসার দিয়ে কি হবে? রাজত্ব আমার কি উপকারে আসবে? অপসৃয়মাণ ছায়ার মত দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সওরী আমাকে যেমন খোলা চিঠি দিয়েছিলেন, আমি তেমনি তা খলীফার হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি পাঠ করছিলেন আর ক্রন্দন করছিলেন। তার কান্নার আওয়াজ ক্রমশ উঁচু হচ্ছিল। খলীফার জনৈক সভাসদ বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, সুফিয়ান সওরীর ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনি যদি তার হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে দরবারে হাযির করান, তবে অন্যরা শিক্ষা পেয়ে যাবে। হারুনুর রশীদ বললেন ঃ হে দুনিয়ার বান্দারা, আমাকে এ কাজ থেকে মাফ কর। যে তোমাদের বিভ্রান্তিতে পড়ে, সে অত্যন্ত হতভাগা। তোমরা জান না সুফিয়ান সওরী অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি। তাঁকে বাধা দিয়ো না। এর পর সুফিয়ান সওরীর পত্রটি সব সময় খলীফা হারুনুর রশীদের পার্শ্বে থাকত। তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক নামাযের পর পত্রটি পাঠ করতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে মহরান বলেন ঃ হারুনুর রশীদ হজ্জ করার পর কুফায় এসে অবস্থান করেন। এর পর তার প্রস্থানের ডংকা বাজানো হয়। লোকজন এসে জড়ো হতে থাকলে বাহলুল পাগলও সেখানে এসে বসে গেল। এমন সময় খলীফা উটের পিঠে চাঁদোয়াযুক্ত হাওদায় বসে বের হলেন। বাহলুল উচ্চস্বরে ডেকে বলল ঃ ইয়া আমীরুল মুমেনীন! খলীফা মুখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে বললেন ঃ লাব্বায়াকা ইয়া বাহলুল।

আতঃপর বাহলুল বলল ঃ আমি হাদীস শুনেছি আয়মন ইবনে তাবেল থেকে. তিসি কেদামত ইবনে আবদুল্লাহ আমেরী থেকে, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হজ্জে আরাফাত থেকে ফিরতে দেখেছি। তিনি উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। এ সময় না ছিল মারপিট, না ছিল ধাক্কাধাক্কি এবং না ছিল বাঁচো বাঁচো রব। আমীরুল মুমিনীন, এ সফরে আপনার জন্যে বিনয় প্রদর্শন করা উত্তম, অহংকার ও যুলুম করার তুলনায়। হারুন একথা শুনে ক্রন্দন করলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে বাহলুল, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আরও কিছু বল। বাহলুল বলল ঃ উত্তম হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ ও দৈহিক শ্রী দান করেন, অতঃপর সে ধনসম্পদ খয়রাত করে, দৈহিক সৌন্দর্যে সংযমী থাকে, তাকে আল্লাহর বিশেষ তালিকায় পুণ্যবানদের সাথে লেখে নেয়া হয়। খলীফা বললেন ঃ বাহলুল, তুমি চমৎকার বলেছ! অতঃপর তাকে কিছু পুরস্কার দিলেন। বাহলুল বলল ঃ এটা যার কাছ থেকে নিয়েছেন তাকে ফেরত দিন। আমার এর প্রয়োজন নেই। খলীফা বললেন ঃ তোমার কোন ঋণ থাকলে তা আমি শোধ করে দেই? বাহলুল বলল ঃ কুফার সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ করা ঠিক নয়। খলীফা বললেন ঃ আমি তোমার জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারণ করে দেই, যাতে তোমার অন্নচিন্তা না থাকে। বাহলুল আকাশের দিকে মাথা তুলে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আমি এবং আপনি উভয়ই আল্লাহ তাআলার পরিবার। এটা অসম্ভব যে, তিনি আপনাকে স্মরণে রাখবেন আর আমাকে ভুলে যাবেন। এর পর খলীফা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

আহমদ ইবনে ইবরাহীম মুকরী বলেন ঃ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আবুল হাসান সওরী (রঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোন অস্বীকার্য বিষয় থাকলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তা বিনষ্ট করে দিতেন। একদিন তিনি 'মাশারায়ে মাখামীন' নামক নদীতে অযু করছিলেন, এমন সময় একটি নৌকা দেখতে পেলেন, যার মধ্যে ত্রিশটি মট্‌কা রয়েছে। প্রত্যেকটি মটকার গায়ে 'লুত্‌ফ' শব্দটি লেখা ছিল। তিনি এর অর্থ বুঝতে পারলেন না। কেননা পণ্য ও পারিবারিক ব্যবহারের কোন বস্তুর নাম লুত্‌ফ ছিল বলে তাঁর জানা ছিল না। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এসব মটকার মধ্যে কি আছে? মাঝি বলল ঃ আপনার এতে প্রয়োজন কি? আপনি নিজের কাজ নিজে করে যান। একথা শুনে হযরত সওরীর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আমি চাই এগুলোতে কি আছে তা আমাকে বলে দাও।

মাঝি বলল ঃ আপনি তো সুফী মানুষ, একথা শুনে আপনার লাভ কি? এগুলো খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহর শরাব। তিনি বললেন ঃ শরাব! মাঝি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ ঐ যে মুদগরটি দেখা যাচ্ছে, এটি আমার হাতে দাও। এতে মাঝি রাগ করে তার গোলামকে বলল ঃ দাও দেখি মুদগরটি তার হাতে। দেখা যাক কি করে। মুদগর হাতে পেয়েই তিনি নৌকায় সওয়ার হয়ে একটি একটি করে মট্‌কা ভেঙ্গে চুরমার করতে লাগলেন। অবশেষে একটি ম্‌টকা রেখে তিনি সবগুলো ভেঙ্গে দিলেন। মাঝির ফরিয়াদে তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসক ইউনুস ইবনে আফলাহ্ তাড়াতাড়ি এসে সওরীকে গ্রেফতার করে খলীফা মুতাযিদের দরবারে পাঠিয়ে দিল। খলীফা মুতাযিদের তরবারি প্রথমে চলত, মুখ পরে ফুটত। তাই সকলেরই বিশ্বাস ছিল, খলীফা তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। আবুল হাসান সওরী বলেন ঃ আমাকে যখন খলীফার সামনে নেয়া হয়, তখন সে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল এবং তার হাতে ছিল একটি বেত্রদন্ড। আমাকে দেখেই সে বলল ঃ তুমি কে? আমি বললাম ঃ আমি একজন সৎ এবং অসৎ কাজে আদেশ ও নিষেধকারী। সে বলল ঃ তোমাকে এ পদ কে দান করল? আমি বললাম ঃ যে আপনাকে খেলাফতের পদ দান করেছে। খলীফা কিছুক্ষণ মাথা নত করে রাখল, এর পর মাথা তুলে বলল ঃ তুমি এ কান্ড করলে কেন? আমি বললাম ঃ আমি আপনার অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ভাবলাম, আপনার যে অনিষ্ট আমি দূর করতে পারি, তা দূর করতে ক্রটি করব কেন? এর পর খলীফা মাথা নত করে আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে লাগল। এর পর মাথা উঁচু করে বলল ঃ সকল মটকার মধ্য থেকে একটি মটকা কিরূপে বেঁচে গেল? আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন অনুমতি দিলে আমি এর কারণ বর্ণনা করব! খলীফা বলল ঃ বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন! আমি যখন মটকার দিকে ধাবিত হই, তখন আমার অন্তর আল্লাহ তাআলার প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল এবং আল্লাহর দাবীর ভয়ে মন আচ্ছন্ন ছিল। তাই আমি এগুলো ভেঙ্গে দেয়ার দুঃসাহস করতে পেরেছি। মানুষের ভয়ভীতি আমার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না। সবগুলো মটকা ভাঙ্গার সময় আমার মধ্যে এ অবস্থাটি ছিল, কিন্তু শেষ মটকাটির কাছে পৌঁছার সময় আমার মধ্যে খলীফার মটকাসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার একটি অহংকার আস্ফালন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তখনই আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। যদি এ সময়ও আমার মধ্যে পূর্ববৎ উদ্দীপনা অব্যাহত থাকত, তবে এ মটকা কেন, সমগ্র পৃথিবী মটকায় পরিপূর্ণ থাকলেও আমি একের

পর এক ভেঙ্গে চলে যেতাম– কোন কিছুরই পরওয়া করতাম না। খলীফা বলল ঃ যাও, আমি তোমাকে অবাধ ক্ষমতা দিলাম, যে কোন অস্বীকার্য বিষয় ইচ্ছা কর বিনষ্ট করে দাও। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন! এখন আপনার আদেশ শুনে বিনষ্ট করা আমি ভাল মনে করি না। কেননা, পূর্বে আমি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিনষ্ট করতাম। এখন আপনার আদেশের অধীনে বিনষ্ট করা হবে। খলীফা বলল ঃ তোমার মতলব কি? আমীরুল মুমেনীন! আমি চাই আপনি আমাকে সহীহ-সালামতে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ করুন। সেমতে খলীফা তাই করল। এর পর শায়খ আবুল হাসান সওরী বসরায় চলে এলেন। আবার কোন কারণে খলীফার সামনে যেতে হয়– এই ভয়ে তিনি অধিকাংশ সময় বসরাতেই অতিবাহিত করেন। মুতাযিদের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে যান।

সারকথা, আলেমগণ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে শাসকবর্গের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের পরওয়া কমই করতেন। বরং তারা আল্লাহ্ তাআলার কৃপার উপর ভরসা করতেন। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে শাহাদত দান করতেন, তবে তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যেহেতু তারা খাঁটি ও অকৃত্রিম নিয়তে এ কর্তব্য সম্পাদন করতেন, তাই তাদের বাণীর প্রভাবে কঠোরতর অন্তরও মোমের মত গলে নরম হয়ে যেত। এখন তো লোভ-লালসা আলেমদের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এখন তারা কিছুই বলে না। যদি বা বলে, তাতে কোন উপকার হয় না। কেননা, মুখের কথা তাঁদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয় না। তারা সাচ্চা হলে অবশ্যই সফলকাম হত! কেননা, প্রজাকুল খারাপ হওয়ার মূলে রয়েছে শাসকবর্গ খারাপ হওয়া। আর শাসকবর্গের দোষত্রুটির মূলে রয়েছে আলেমদের দোষত্রুটি। অর্থ ও খ্যাতির মহব্বত আলেমদেরকে পথভ্রান্ত করে দিয়েছে। যেব্যক্তির মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হবে, সে নীচ হীন লোকদেরকেও আদেশ-নিষেধ করতে সক্ষম হবে না– শাসক ও বড়লোকদেরকে তো দূরের কথা। আল্লাহ্ তাআলা সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী।

দশম অধ্যায়

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্ত, যাঁর মহিমা অনুধাবনে হৃদয় ও মন হতবুদ্ধি এবং নূরের কিঞ্চিৎ দ্যুতির কারণে চক্ষু ও দৃষ্টি কিংকতর্ব্যবিমূঢ়। তিনি গোপন রহস্যাবলী এবং অন্তরে লুক্কায়িত ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাঁর রাজত্ব পরিচালনায় উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। দোষ গোপন করা এবং হৃদয় পরিবর্তন করা তাঁর কাজ এবং 'গাফফারুয্ যুনুব' (গোনাহ্ মার্জনাকারী) ও 'সাত্তারুল উয়ুব' (দোষ গোপনকারী) তাঁর নাম। দুরূদ ও সালাম হযরত শাফীউল মুয্‌নিবীন সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি, যিনি ধর্মের শৃঙ্খলা বিধান করেছেন এবং ধর্মদ্রোহীদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছেন। তাঁর পবিত্র বংশধর ও পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অসংখ্য সালাম।

প্রকাশ থাকে যে, যে মর্যাদা ও উৎকর্ষের কারণে মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা বলে পরিচিত, তা হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের মারেফেতের যোগ্যতা। এ মারেফতই ইহকালে মানুষের সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা এবং পরকালে তার সম্পদ ও সরঞ্জাম। মারেফতের যে যোগ্যতা অন্তরকে দান করা হয়েছে, তা অন্য কোন অঙ্গকে দান করা হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করা, তাঁকে চেনা, তাঁর জন্যে কাজ করা এবং তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া– এগুলো অন্তরেরই কাজ। হাযিরযোগ্য বস্তুসমূহের কাশ্‌ফও অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর হাতিয়ার, অনুগামী ও খেদমতগার মাত্র। অন্তর এগুলোকে এমনভাবে কাজে লাগায়, যেমন মালিক গোলামকে এবং শাসক শাসিতকে কাজে লাগায়। মোট কথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত থাকলে অন্তরই আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে অন্যের প্রতি অধিক নিবিষ্ট হলে এ অন্তর আল্লাহ্ তাআলা থেকে আড়াল হয়ে যায়। অন্তরের সাথেই হিসাব-নিকাশের সম্পর্ক এবং অন্তরকে সম্বোধন করেই আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছতা ও আত্মশুদ্ধি নসীব হয়ে গেলে অন্তর সাফল্য লাভ করে এবং অপবিত্রতা ময়লার মধ্যে পড়ে থাকলে অন্তর দুর্ভাগ্য ও নৈরাশ্যের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সারকথা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য অন্তরই করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেবল এবাদতের কারণে নূর ছড়িয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে গোনাহ এবং অবাধ্যতাও অন্তরেরই কাজ। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাপ কর্মের চিহ্ন ফুটে উঠে। অন্তরের আলো ও তমসা থেকেই বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং অপকৃষ্টতা প্রকাশ পায়। কেননা, পাত্র থেকে তাই টপকে পড়ে, যা তার মধ্যে থাকে। মানুষ যখন তার অন্তরকে জেনে নেয়, তখন সে নিজের সম্পর্কে জ্ঞানী হয়ে যায়। নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপরই আল্লাহ তাআলার মারেফত ভিত্তিশীল। অন্তর সম্পর্কে অজ্ঞান হলে মানুষ নিজের সম্পর্কে অজ্ঞান থেকে যায়। ফলে, সে আল্লাহ তাআলাকেও চিনতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ তাদের অন্তর সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহ তাদের ও তাদের অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে আড়াল হয়ে যান। আল্লাহ তাআলার আড়াল হওয়ার অর্থ, তিনি অন্তরকে "মুশাহাদা" (প্রত্যক্ষকরণ) "মুরাকাবা" (ধ্যানমগ্নতা) ও অন্তর্গত গুণাবলী অনুধাবন করতে দেন না। তিনি এটা জানতে দেন না যে, অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যে কিভাবে ঘুরাফেরা করে, কিভাবে সে মাঝে মাঝে সর্বনিম্ন স্তরের দিকে ঝুঁকে পড়ে শয়তান হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে ধাবমান হয়ে নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণের স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। যেব্যক্তি ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী অর্জনের আশায় আপন অন্তরের অবস্থা জানার চেষ্টা করে না, সে তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই পাপাচারী।'

অতত্রব বুঝা গেল, অন্তরকে চেনা এবং তার গুণাবলীর স্বরূপ উদঘাটন করা আসল ধর্ম এবং আধ্যাত্ম পথের বুনিয়াদ। আমরা এ গ্রন্থের প্রথমার্ধে বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কিত এবাদত ও লেনদেনের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছি, যাকে "এলমে যাহের" বলা হয়। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তর ধ্বংসকারী ও উদ্ধারকারী অবস্থাসমূহ বর্ণনা করার ওয়াদা করেছিলাম। অন্তরের এ সকল অবস্থা জানার নাম "এলমে বাতেন।" উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষণে এলমে বাতেন শুরু করার পূর্বে দুটি পরিচ্ছেদ লেখা জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে অন্তরের আশ্চর্যজনক গুণাবলী ও চরিত্র বর্ণিত হবে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা ও তার চরিত্র শুদ্ধির উপায় বিবৃত হবে। এখন আমরা অন্তরের রহস্যাবলী চলতি বর্ণনাভঙ্গিতে উল্লেখ করছি, যাতে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা অন্তরের উর্ধ্বজগত সম্পর্কিত আশ্চর্য অবস্থাসমূহ প্রায়শ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরের রহস্যাবলী

প্রকাশ থাকে যে, নফস, রূহ, কলব ও আকল- ধ্বংসকারী ও উদ্ধারকারী বিষয়সমূহের আলোচনায় ব্যবহৃত এই শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থের বিভিন্নতা ও এদের প্রতীক সম্পর্কে কম আলেমই অবগত আছেন। এদের অর্থ না জানা এবং বিভিন্ন ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবস্থা না জানার কারণেই অধিকাংশ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই আমরা এসব শব্দের সেই অর্থ বর্ণনা করব, যার সাথে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত।

প্রথম শব্দ 'কলব', এর অর্থ দু'টি। এক, বক্ষস্থলের বাম দিকে অবস্থিত লম্বা ত্রিকোণ মাংসপিন্ড। এর মাঝখানে শূন্যগর্ভতা আছে, যাতে কাল রক্ত থাকে। এটাই রূহের উৎস ও আকর, কিন্তু এর আকার-আকৃতি বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এটা ডাক্তারদের কাজ। এ ধরনের কলব তথা হৃদয় চতুষ্পদ জন্তু এমনকি মৃতদের মধ্যেও থাকে। কলবের দ্বিতীয় অর্থ, এটি একটি আধ্যাত্মিক লতীফা (সূক্ষ্ম বিষয়), উপরোক্ত শারীরিক কলবের সাথে এই লতীফার সম্পর্ক আছে। এ লতীফাটিই মানুষের স্বরূপ, বোধশক্তির আওতাভুক্ত, আলেম, সম্বোধিত ও তিরস্কৃত। হিসাব-নিকাশের সম্পর্কও এর সাথেই। শারীরিক কলবের সাথে এই লতীফার যে সম্পর্ক, তা অনুধাবন করতে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ঘুরপাক খেয়ে যায়। কেননা, শারীরিক কলবের সাথে এর সম্পর্ক গুণীর সাথে গুণাবলীর সম্পর্কের মত, অথবা যন্ত্রপাতির সাথে কারিগরের সম্পর্কের মত, অথবা গৃহের সাথে গৃহবাসীর সম্পর্কের মত। আমরা দু'কারণে এই লতীফার স্বরূপ বর্ণনা করছি না। প্রথম, এ বিষয়টি "উলুমে মুকাশাফা" তথা অদৃশ্য রহস্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা আমাদের এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়, এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান রূহের ভেদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। অথচ এ ভেদ সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) কিছুই বলেননি। সুতরাং অন্যদেরও এসম্পর্কে মুখ খোলা অনুচিত। এ গ্রন্থে আমরা কেবল এ লতীফার গুণাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করব। কেননা, এলমে মোয়ামালা এর উপরই ভিত্তিশীল। এতে স্বরূপ বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শব্দ রূহেরও দু' অর্থ। প্রথম, রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহ, যার উৎস শারীরিক কলবের শূন্যগর্ভ। এই শূন্যগর্ভ থেকে এটা রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে এই রূহের ছড়িয়ে পড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জীবন ও পঞ্চইন্দ্রিয় দান করা এমন, যেমন কোন গ্রহে একটি প্রদীপ রেখে দেয়া হলে তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানেই এই আলো পৌঁছে, সে স্থানই উজালা হয়ে যায়। সুতরাং রূহ প্রদীপসদৃশ এবং জীবন আলোসদৃশ। রূহের এই অর্থ হচ্ছে চিকিৎসাবিদগণের পরিভাষা। এ অর্থ বর্ণনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। রূহের দ্বিতীয় অর্থ, রূহ মানুষের মধ্যে একটি বোধশক্তিসম্পন্ন লতীফা। কলবের দ্বিতীয় অর্থে আমরা যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি, এখানেও সেই ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত আয়াতে রূহের এই অর্থই বুঝানো হয়েছে ঃ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي –বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

রূহের এই দ্বিতীয় অর্থই অত্র গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় শব্দ হচ্ছে নফ্স। এটি একাধিক অর্থে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দু'টি অর্থ আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে। প্রথম, মানুষের নফ্স এমন একটি বস্তু, যা ক্রোধশক্তি ও কামশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুফীগণের মধ্যে এই অর্থ অধিক প্রচলিত। তাদের মতে নফসের মধ্যেই মানুষের নিন্দনীয় গুণাবলী একত্রিত আছে। এ কারণেই তারা বলেন, নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা এবং নফ্সকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া উচিত। হাদীসে এই নফস সম্পর্কেই বলা হয়েছে– সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তোমার নফ্স, যা তোমার পার্শ্বে রয়েছে। নফসের দ্বিতীয় অর্থ, নফ্স একটি খোদায়ী লতীফা, যা অবস্থাভেদে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়। বাস্তবে এটাই মানুষ। মানুষ যখন কামনাকে প্রতিরোধ করে, তখন এই নফসের চাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং আনুগত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন একে "নফ্সে মুতমায়িন্নাহ্" (প্রশান্ত চিত্ত) বলা হয়। যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ـ

–হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

কেননা, নফসের প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তার আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে আসা কল্পনা করা যায় না। বরং সে আল্লাহ তাআলার কাছ

থেকে দূরে চলে যায় এবং শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যায়। আর যদি আনুগত্যের উপর নফসের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ না হয়, কিন্তু কামনা-বাসনা প্রতিরোধ করতে থাকে, তবে তাকে বলা হয় "নফ্সে লাওয়ামা" (তিরস্কারকারী নফস)। কেননা, সে তার মালিককে আল্লাহর এবাদতে ত্রুটি করতে দেখে তিরস্কার করে। কোরআন পাকে এ নফসেরও উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ঃ

لَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ –কসম তিরস্কারকারী নফসের।

আর যদি নফস কামনা-বাসনার প্রতিরোধ না করে; বরং কামপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয়, "নফ্সে আম্মারা বিস্সূ" অর্থাৎ, জোরেজবরে কুকর্মের আদেশকারী নফস। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইউসুফ (আঃ) অথবা আযীযে মিসরের পত্নীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ –আমি আমার নফসকে নির্দোষ বলি না। কেননা, নফ্স জোরেশোরে কুকর্মের আদেশ করে।

চতুর্থ শব্দ "আকল"। এটাও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দুটি অর্থের সাথে আমাদের উদ্দেশ্য জড়িত। প্রথম, কখনও এর অর্থ নেয়া হবে একটি শিক্ষামূলক গুণ, যার স্থান কলব। দ্বিতীয় অর্থ, কখনও আকলের অর্থ নেয়া হয় শিক্ষার বোধশক্তি। এমতাবস্থায় আকলও উল্লিখিত লতীফা হবে।

সুতরাং আকল বলে কখনও শিক্ষাগুণ এবং কখনও শিক্ষাগুণের পাত্র বুঝানো হয়। নিম্নোক্ত হাদীসে দ্বিতীয় অর্থই বুঝানো হয়েছে ঃ اول ما خلق الله العقل –আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন। কেননা, শিক্ষাগুণ তো আপনা-আপনি বিদ্যমান হতে পারে না। তার বিদ্যমান হওয়ার জন্যে পাত্র দরকার। সুতরাং এই পাত্র তার পূর্বে অথবা তার সাথে সাথে সৃষ্ট হওয়া জরুরী। নতুবা তাকে সম্বোধন করা হবে না। এ হাদীসেই আছে, আল্লাহ্ তাআলা আকলকে বললেন ঃ সামনে এসো। সে সামনে এলো। আবার বললেন ঃ পিঠ ফিরিয়ে নাও। সে পিঠ ফিরিয়ে নিল।

এখন জানা উচিত, ১। কলব, ২। নফস, ৩। রূহ্ ও ৪। আকল –এই চারটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, শারীরিক কলব, শারীরিক রূহ, কাম-নফস ও জ্ঞান। একটি পঞ্চম অর্থ আছে, যা

এই চারটি শব্দেরই অভিন্ন অর্থ; অর্থাৎ মানবীয় বোধশক্তির লতীফা। সুতরাং শব্দ হল চারটি এবং অর্থ পাঁচটি। পঞ্চম অর্থটি প্রত্যেক শব্দের অভিন্ন অর্থ বিধায় প্রত্যেক শব্দের অর্থ দু'টি। কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে ব্যবহৃত কলবের অর্থ সেই লতীফা, যদ্দ্বারা মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ অবগত হয়। রূপকভাবে এর দ্বারা মানুষের বক্ষস্থিত কলবও বুঝানো হয়। কেননা, এই লতীফা ও শারীরিক কলবের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। শারীরিক কলবের মধ্যস্থতায়ই এই কলব মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে নিয়োজিত করে। শারীরিক কলব যেন এই লতীফার পাত্র ও বাহন। এ কারণেই সহল তস্তরী বলেন ঃ কলব হচ্ছে আরশ এবং বক্ষ কুরসী। অর্থাৎ শারীরিক কলব ও বক্ষ হচ্ছে লতীফার রাজধানী, যেখান থেকে লতীফার কার্যক্রম শুরু হয়।

কলব তথা অন্তরের লশকর

প্রকাশ থাকে যে, অন্তর, রূহ ও অন্যান্য জগতে আল্লাহ্ তাআলার লশকর এত বেশী যে, এগুলোর স্বরূপ ও গণনা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ –আপনার পালনকর্তার লশকর তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

এখন আমরা অন্তরস্ত আল্লাহ্ তাআলার কয়েকটি লশকর সম্পর্কে বর্ণনা করছি। কেননা, আমাদের আলোচনা অন্তর সম্পর্কেই।

অন্তরের দুটি লশকর। এক, যা চর্মচক্ষে দেখা যায় এবং দুই, যা অন্তশ্চক্ষে অনুধাবন করা যায়। এই উভয় প্রকার লশকর অন্তরের জন্যে খাদেম ও সাহায্যকারী। যে লশকর চোখে দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে হাত, পা, জিহ্বা, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা এবং অন্যান্য সকল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অন্তর এগুলোকে যেভাবে চায় কাজে লাগায়। অন্তরের আনুগত্য করার জন্যেই এগুলো সৃজিত হয়েছে। অন্তরের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা এদের নেই এবং এরা অন্তরের বৈরীও হতে পারে না। উদাহরণত, অন্তর যখন চক্ষুকে খোলার আদেশ দেয়, তখন সে খুলে যায়। থাকে চলার আদেশ করলে সে চলতে থাকে। জিহ্বাকে বলার আদেশ করলে সে বলতে থাকে। অন্য সকল অঙ্গের অবস্থাও তথৈবচ। অন্তরের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের আনুগত্য এমন, যেমন আল্লাহ্ তাআলার জন্যে ফেরেশতাদের আনুগত্য। কারণ, ফেরেশতাগণও আনুগত্যের জন্যেই সৃজিত। তারা আনুগত্যের খেলাফ করার ক্ষমতা রাখে না। কোরআনের ভাষায় তাদের অবস্থা এই ঃ

لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون –তারা আল্লাহ্র আদেশের নাফরমানী করে না এবং তাই করে, যা করার আদেশ হয়।

তবে পার্থক্য হচ্ছে, ফেরেশতারা আপন আনুগত্য ও খোদায়ী আদেশ পালনের বিষয় অবগত থাকে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্য দূরের কথা, আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবগত নয়। বলাবাহুল্য, অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি সফরের জন্যে। সেই সফর হচ্ছে খোদায়ী মারেফত এবং খোদায়ী দীদারের মনযিল অতিক্রম করার সফর।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ –আমি জ্বিন ও মানবকে কেবল আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।

অন্তরের এই সফরের জন্যে সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। তাই অন্তরকে সওয়ারী, পাথেয় ইত্যাদি দান করা হয়েছে। দেহ হচ্ছে অন্তরের সওয়ারী এবং পাথেয় জ্ঞান ও শিক্ষা। দুনিয়াতে বসবাস করা ছাড়া আল্লাহ্র পথে চলা বান্দার জন্যে সম্ভবপর নয়। কেননা, বড় মনযিলে পৌঁছার জন্যে ছোট মনযিল অতিক্রম করা জরুরী। তাই দুনিয়াকে পরকালের শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে। অন্তরকে ইহজগতে অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। দেহরূপী সওয়ারীর সাহায্যে সে ইহজগতে পৌঁছে যায়। সুতরাং দেহের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক। হেফাযত হচ্ছে দেহকে অনুকূল খাদ্য সরবরাহ করা এবং ধ্বংসের কারণাদি দূর করা। এদিক দিয়ে খাদ্য হাসিল করার জন্যে দুটি খাদেমের প্রয়োজন দেখা দিল। একটি বাতেনী, যার নাম ক্ষুধা ও মনের স্পৃহা এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, হাত ইত্যাদি, যদ্দ্বরা খাদ্য অর্জিত হয়। এছাড়া ধ্বংসের কারণ থেকে বাঁচার জন্যে দুটি লশকরের প্রয়োজন দেখা দিল। একটি বতেনী, যাকে ক্রোধ বলা হয়। যার কারণে শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হয় এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, হাত, পা ইত্যাদি। দেহে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন হাতিয়ারের মত কাজ করে। এখন যেব্যক্তি খাদ্যের মুখাপেক্ষী, সে যদি খাদ্যের অবস্থা না জানে, তবে কেবল খাদ্যের স্পৃহা ও ক্ষুধায় কাজ হবে না। তাই খাদ্যের অবস্থা জানার জন্যে অন্তরকে দু'টি খেদমতগার দেয়া হয়েছে। একটি বাতেনী অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক স্থান তথা কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা ইত্যাদি।

সারকথা, অন্তরের খাদেম তিন প্রকার। প্রথম প্রকার, যা অন্তরকে কোন বস্তুর প্রতি উৎসাহিত করে– উপকার লাভের প্রতি, যেমন ক্ষুধা;

অথবা ক্ষতি দূর করার প্রতি, যেমন ক্রোধ। এই প্রকার খাদেমকে এরাদা তথা ইচ্ছাও বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার, যা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গতিশীল করে। একে বলা হয় ক্ষমতা ও শক্তি। এটা সমস্ত অঙ্গে বিশেষত শিরা-উপশিরার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে দেখা, ঘ্রাণ লওয়া, শ্রবণ করা, আস্বাদন করা ও স্পর্শ করার শক্তি, যা নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রকারের নাম উপলব্ধি জ্ঞান। এসব বাতেনী লশকরের মধ্য থেকে প্রত্যেকটির জন্যে যাহেরী লশকরও রয়েছে। অর্থাৎ, রক্ত, মাংস, চর্বি, অস্থি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উদাহরণতঃ স্পর্শ শক্তির সম্পর্ক অঙ্গুলির সাথে এবং দর্শন শক্তির সম্পর্ক চোখের সাথে। আমরা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করব না। কেননা, এগুলো বাহ্যজগত। আমরা বরং অন্তরের সেসব লশকর সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ, তৃতীয় প্রকার উপলব্ধি শক্তি সম্পর্কে। এই শক্তি দু'প্রকার। প্রথম প্রকার সেসব শক্তি, যাদের ঠিকানা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; অর্থাৎ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয় প্রকার সেসব শক্তি, যাদের বাসস্থান বাতেনী মনযিলসমূহের মধ্যে নিহিত; অর্থাৎ, মস্তিষ্কের কোটরসমূহের মধ্যে। এই দ্বিতীয় প্রকারও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কেননা, মানুষ কোন বস্তুকে দেখে যখন চক্ষু বন্ধ করে নেয় তখন সে সেই বস্তুর চিত্র মনের মধ্যে পায়। একে বলা হয় "খেয়াল" তথা কল্পনা। এর পর এই চিত্র কতক বিষয় মনে রাখার মাধ্যমে মানুষের সাথে থাকে। একে বলা হয় স্মরণশক্তি। এর পর সে এই স্মরণ করা বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং কতককে কতকের সাথে মিলায়। ফলে যা ভুলে গিয়ে থাকে তা স্মরণ হয়ে যায়। কতক চিত্র হুবহু মনের মধ্যে থেকে যায়। এর পর সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয় অভিন্ন চেতনার মাধ্যমে আপন কল্পনায় একত্রিত করে নেয়। এ থেকে জানা গেল, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে অভিন্ন চেতনা, কল্পনা, চিন্তা, জল্পনা ও স্মরণ রাখা। আল্লাহ তাআলা এসব শক্তি সৃষ্টি না করলে মস্তিষ্ক এগুলো থেকে খালি থাকত। যেমন– হাত, পা এগুলো থেকে খালি রয়েছে।

অন্তরের আভ্যন্তরীণ খাদেম

জানা উচিত, ক্রোধ ও কামনা –অন্তরের এ দুটি খাদেম কখনও পুরা মাত্রায় অন্তরের আনুগত্য করে। তখন অন্তর অধ্যাত্ম পথে চলার ব্যাপারে এগুলো থেকে সাহায্য পায়। বরং আল্লাহর দিকে সফরে এ দুটিকে উত্তম সঙ্গী মনে করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এ দুটি খাদেম অন্তরের অবাধ্য ও

বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। তখন তারা অন্তরের বরবাদ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। ফলে অন্তর চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের সফর থেকে বিরত থাকে, কিন্তু অন্তরের আরও সাহায্যকারী রয়েছে; যেগুলোকে শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও চিন্তা-ভাবনা বলা হয়। এহেন সংকট মুহূর্তে ক্রোধ ও বাসনার মোকাবিলা করার জন্যে এগুলোর সাহায্য নেয়া উচিত। কেননা, ক্রোধ ও কামনা কখনও শয়তানের দলে ভিড়ে অন্তরের উপর অনন্তর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যদি অন্তর উপরোক্ত খাদেমদের সাহায্য না নেয় এবং ক্রোধ ও কামনার অনুগত হয়ে যায়, তাহলেও ধ্বংস ও প্রকাশ্য ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। অধিকাংশ লোককে দেখা যায়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে অনেক কৌশল খুঁজে ফিরে। অথচ বুদ্ধির প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে কামনার অনুগত থাকা সমীচীন। এখন আমরা তিনটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি।

প্রথম দৃষ্টান্ত, মনে করুন মানুষের নফস অর্থাৎ, পূর্ববর্ণিত লতীফা বাদশাহ্, দেহ তার রাজধানী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কর্মী ও আমলা, বিবেকশক্তি তার হিতাকাঙ্ক্ষী উযীর, ক্রোধ তার রাজধানীর প্রধান পুলিশ কর্মচারী এবং কামনা– বাসনা তার দুশ্চরিত্র গোলাম, যে এই রাজধানী শহরে খাদ্যশস্য ইত্যাদি আনয়ন করে। সে এত ধূর্ত, মিথ্যুক ও নোংরা যে, শুভাকাঙ্ক্ষারূপে আগমন করে, কিন্তু তার শুভাকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদি-অন্ত ষড়যন্ত্র ও মারাত্মক বিষ নিহিত থাকে। বিচক্ষণ উযীরের সাথে কথায় কথায় বিবাদ করা তার অভ্যাস। এমনকি, কোন মুহূর্ত তার কথা কাটাকাটি থেকে খালি থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ্ তার রাজত্ব পরিচালনায় উযীরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এবং এই দুশ্চরিত্র গোলামের কথাবার্তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে নিঃসন্দেহে রাজকার্য সঠিকভাবে ও ইনসাফ সহকারে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে বাদশাহ্‌কে বুঝে নিতে হবে, গোলামের বিরুদ্ধাচণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। উযীরের মন রক্ষার্থে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তাকেও উপদেশ দিতে হবে এবং উযীরের পক্ষে থেকে তাকে এই দুশ্চরিত্র গোলাম ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর মোতায়েন করতে হবে, যাতে গোলাম সীমালঙ্ঘন করতে না পারে এবং পরাভূত ও শাসিত থেকে যায়! অনুরূপভাবে যদি নফস বুদ্ধির সাহায্য নেয়, ক্রোধকে কামনার উপর চাপিয়ে রাখে এবং কখনও ক্রোধকে দমন করার জন্যে কামনার সাহায্য নেয়, তবে নফসের সকল শক্তি সমতার উপর কায়েম থাকবে এবং চরিত্র উন্নত হবে। যেব্যক্তি এ পন্থা বর্জন

করবে, সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم

–তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশীকে আপন মাবুদ করে নিয়েছে। আল্লাহ্ জেনে-শুনেই তাকে পথভ্রান্ত করেছেন।

অথবা এরশাদ হয়েছেঃ

واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

–এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত। তার উপর বোঝা চাপালে সে হাঁপায় এবং বোঝা না চাপিয়ে ছেড়ে দিলেও হাঁপায়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার নফসকে কামনা থেকে ফিরিয়ে রাখে, তার সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى

–আর যে তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আপন নফসকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, মনে করুন, দেহ একটি শহর এবং এর বিচক্ষণ প্রশাসক হচ্ছে বুদ্ধি। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়সমূহ এই শহরের লশকর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রজা এবং কামনা ও ক্রোধ এই শহরের দুশমন। তারা এই শহরে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রজাদেরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক। এখন দেহকে একটি পরিখা মনে করা উচিত, যার মধ্যে বাদশাহ স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে। সে যদি যুদ্ধ করে দুশমনকে বিতাড়িত অথবা পরাভূত করে দেয়, তবে তার এ কাজ আল্লাহ্র দরবারে পছন্দনীয় হবে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

فضل الله المجهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة

–যারা ধন ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের উপর অধিক মর্যাদা দান করেন।

পক্ষান্তরে বাদশাহ যদি পরিখা বিনষ্ট ও প্রজাদেরকে বিপন্ন করে দেয়, তবে সে সর্বোচ্চ দরবারে নিন্দার পাত্র হবে এবং তাকে এর শাস্তি দেয়া হবে। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে -এরূপ ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন বলা হবে, হে দুষ্টমতি রক্ষক, তুমি গোশত খেয়েছ এবং দুধ পান করেছ, কিন্তু হারানো উদ্ধার করনি এবং ভগ্নাবস্থাকে ঠিক করনি। আজ আমি তোমার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করব। এই জেহাদের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

–আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, বুদ্ধিকে একজন আরোহী মনে করা উচিত, যার ইচ্ছা শিকার করার। কামনাকে তার ঘোড়া এবং ক্রোধকে তার কুকুর খেয়াল করা দরকার। এখন যদি আরোহী পারদর্শী হয় এবং ঘোড়া ও কুকুর প্রশিক্ষাণপ্রাপ্ত হয়, তবে অবশ্যই অভীষ্ট অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আরোহী স্বয়ং আরোহণ বিদ্যায় মূর্খ হয় এবং ঘোড়া অবাধ্য ও কুকুর উন্মাদ হয়, তবে না ঘোড়া তার কথামত কাজ করবে এবং না কুকুর তার ইশারায় শিকারের দিকে ধাবিত হবে। এরূপ ব্যক্তির জন্যে শিকার করা দূরের কথা, প্রাণ রক্ষা করাই কঠিন হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্তে আরোহীর অনভিজ্ঞতা মানে মানুষের মূর্খতা ও জ্ঞানশক্তির অভাব, ঘোড়ার অবাধ্যতা মানে কামনার প্রাবল্য, বিশেষত উদরের কামনা ও যৌন কামনার প্রাবল্য এবং কুকুরের উন্মত্ততার মানে ক্রোধের প্রাবল্য। আল্লাহ্ তাআলা আপন কৃপায় মানুষকে এগুলো থেকে রক্ষা করুন।

মানব অন্তরের বৈশিষ্ট্য

প্রকাশ থাকে যে, আমরা যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, সেগুলো আল্লাহ্ তাআলা সকল জন্তু-জানোয়ারকেও দান করেছেন। উদাহরণতঃ কাম-ক্রোধ এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সকল প্রাণীরই অর্জিত আছে। সেমতে ছাগল যখন ব্যাঘ্রকে দেখে ফেলে, তখন তার শত্রুতা মনে মনে আঁচ করে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। এ থেকে জানা যায়, পশুর মধ্যেও অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি বিদ্যমান আছে।

এখন আমরা এমন বিষয় বর্ণনা করব, যা একান্তভাবে মানুষের মধ্যে

পাওয়া যায়, যার কারণে সে সৃষ্টির সেরা এবং খোদায়ী নৈকট্য লাভের যোগ্য হয়েছে। এরূপ বিষয় দুটি । একটি জ্ঞান ও অপরটি ইচ্ছা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির জ্ঞান না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের গণ্ডির মধ্যে দাখিল, না জন্তু-জানোয়ার এতে মানুষের সাথে শরীক। বরং সামগ্রিক জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহের জ্ঞানও মানুষের বৈশিষ্ট্য। উদাহরণতঃ মানুষ এই জ্ঞান রাখে যে, এক ব্যক্তির একই সময়ে একই অবস্থায় দু'স্থানে বিদ্যমান হওয়া অসম্ভব। ইচ্ছার মানে, মানুষ যখন জ্ঞান দ্বারা কোন কাজের পরিণতি চিন্তা করে এবং তাতে কল্যাণ দেখে, তখন তার মনে সেই কল্যাণ হাসিল করার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয়েছে ইচ্ছা। এটা কামনার ইচ্ছার বিপরীত। উদাহরণতঃ কামনা ইনজেকশনের প্রতি অনীহা পোষণ করে, কিন্তু জ্ঞান তার ইচ্ছা করে এবং এর জন্যে টাকা-পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করে। যদি আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞান সৃষ্টি করতেন এবং ইচ্ছাকে সৃষ্টি না করতেন, তবে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিষ্ফল হয়ে যেত।

মোটকথা, মানুষের অন্তরস্থিত জ্ঞান ও ইচ্ছা পশুকুলের মধ্যে নেই; বরং প্রথমে শিশুদের মধ্যেও থাকে না। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের মধ্যে ইচ্ছার উদ্ভব হয়, কিন্তু কাম, ক্রোধ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সমস্তই তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। হাঁ, শিশুর মধ্যে এসব জ্ঞান অর্জিত হওয়ার দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হচ্ছে তার অন্তরে জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহের জ্ঞান এসে যাওয়া। এই স্তরে প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়সমূহের জ্ঞান তার মধ্যে অর্জিত হবে না, কিন্তু সে তা অর্জিত হওয়ার কাছাকাছি চলে যাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে কর্ম, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হওয়া। জ্ঞানের স্তরটি মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখর, কিন্তু এতে অসংখ্য ও অশেষ ধাপ রয়েছে এবং জ্ঞানের আধিক্য ও স্বল্পতার দিক দিয়ে মানুষে মানুষে অনেক তফাৎ হয়। এছাড়া জ্ঞান অর্জনের পন্থার মধ্যেও তফাৎ হয়। কতক অন্তর প্রথম ধাপেই মুকাশাফা ও ইলহাম দ্বারা এ জ্ঞান অর্জন করে নেয়। কতক অন্তর অধ্যবসায় ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করে। এতেও অনেকে মেধাবী এবং কতক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে নবী, আলেম, ওলী ও বিজ্ঞজনের স্তর বিভিন্নরূপ এবং উন্নতির কোন শেষ সীমা নেই। কেননা, জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এতে সেই পয়গম্বরের মর্যাদা সর্বোচ্চ, যার সামনে সকল স্বরূপ কেবল মুকাশাফা ও ইলহামের মাধ্যমে উদঘাটিত হয়ে যায়। এই সৌভাগ্যের বদৌলতই বান্দা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করে এবং এসব স্তরে

উন্নতি করাই সাধকদের মনযিল। এসব মনযিলের কোন শেষ নেই; বরং প্রত্যেক সাধক যে মনযিলে উপনীত হয়, তার সেই মনযিল ও নীচের মনযিলের অবস্থা জানা থাকে, কিন্তু সম্মুখের মনযিল সম্পর্কে তার কিছুই জানা থাকে না। তবে মাঝে মাঝে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসস্বরূপ সেসব মনযিলকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; যেমন আমরা নবুওয়ত ও নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁদের অস্তিত্বকে সত্য বলে জানি; কিন্তু নবুওয়তের স্বরূপ নবী ব্যতীত কেউ জানে না।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত সকলের জন্যে ব্যাপক। এতে কারও সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃপণতা নেই, কিন্তু এই রহমত সেসব অন্তরে প্রকাশ পায়, যারা রহমতের অপেক্ষায় থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের জীবনের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের অনেক প্রবাহ আসে। অতএব তোমরা এর অপেক্ষায় থাক। রহমতের অপেক্ষায় থাকার মানে, অন্তরকে পাক সাফ রাখবে এবং দুশ্চরিত্রতা ও মালিন্য থেকে বেঁচে থাকবে। এই দুশ্চরিত্রতা ও মলিনতার কারণেই কতক অন্তরে খোদায়ী নূর অনুপস্থিত থাকে। নতুবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কার্পণ্য ও বাধা থাকে না। কেননা, অন্তরের অবস্থা পাত্রের মত। পাত্রে যতক্ষণ পানি ভর্তি থাকে, তাতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে যখন অন্তর গায়রুল্লাহ্র সাথে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাতে খোদায়ী মারেফত প্রবেশ করে না! নিম্নোক্ত হাদীসে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

لو لا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا الى ملكوت السماء

–যদি শয়তান আদম সন্তানদের অন্তরের চারপাশে ঘুরাফেরা না করত, তবে তারা আকাশের ফেরেশতা ও স্বর্গলোক দেখতে পেত। সার কথা, মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও কর্মের জ্ঞান। এতেই মানুষের পূর্ণতা এবং এই পূর্ণতার কারণে সৌভাগ্য ও খোদায়ী দরবারে উপস্থিতি অর্জিত হয়। সুতরাং যেব্যক্তি তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে কাজে নিয়োজিত করে, যদ্দ্বারা তার জ্ঞানার্জনে সহায়তা হয়, সে ফেরেশতাদের অনুরূপ এবং তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য। যে সকল মহিলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে এসেছিল, আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

–সে তো মানুষ নয়! সে তো একজন সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা!

পক্ষান্তরে যেব্যক্তি তার সমস্ত সাহসিকতা দৈহিক আরাম-আয়েশে ব্যয় করে এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মত খেয়ে যায়, সে পশুর স্তরে দাখিল হয়ে নিছক আনাড়ি বলদ হবে, না হয় শূকরের ন্যায় লোভী হবে। অথবা কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউকারী হবে। অথবা উটের ন্যায় বিদ্বেষকারী হবে। অথবা চিতাবাঘের ন্যায় দাম্ভিক হবে। অথবা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত হবে। এই সবগুলো বিষয় কোন একজনের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে হবে পুরাপুরি বিতাড়িত শয়তান। মানুষের সৌভাগ্য পূর্ণরূপে এ বিষয়ের মধ্যেই নিহিত যে, সে আল্লাহ্র দীদারকে নিজের লক্ষ্য স্থির করবে, পরকালকে আবাসস্থল মনে করবে, দুনিয়াকে মনযিল, দেহকে যানবাহন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খাদেম জ্ঞান করবে এবং বোধশক্তিকে বাদশাহ সাব্যস্ত করবে, যার রাজধানী হচ্ছে অন্তর মস্তিষ্কের অগ্রভাগে অবস্থিত কল্পনাশক্তি হচ্ছে সেই বাদশাহের দূত। কেননা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সংবাদ তার কাছে একত্রিত হয়। মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে অবস্থিত স্মরণশক্তি হচ্ছে তার কোষাধ্যক্ষ, জিহ্বা ভাষ্যকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লেখক এবং পঞ্চইন্দ্রিয় তার গুপ্তচর। পঞ্চইন্দ্রিয় নিজ নিজ এলাকার সংবাদ একত্রিত করে কল্পনাশক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। সে এগুলো কোষাধ্যক্ষ অর্থাৎ, স্মরণশক্তির কাছে সোপর্দ করে। এর পর কোষাধ্যক্ষ বাদশাহ্ অর্থাৎ, বোধশক্তির দরবারে পেশ করে। বাদশাহ রাজত্ব পরিচালনার জন্যে যে সকল সংবাদ জরুরী, সেগুলো গ্রহণ করে নেয়। যে মানুষ নিজেকে এভাবে সক্রিয় রাখে, সে ভাগ্যবান, সফলকাম এবং খোদায়ী নেয়ামতের শোকরকারী হয়। পক্ষান্তরে যে এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, সে হতভাগা, লাঞ্ছিত ও অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হয়ে পরিণামে আযাব, শাস্তি ও পরকালীন দুর্ভোগের পাত্র হয়ে যায় (নাঊযু বিল্লাহ)। আমাদের বর্ণিত এ দৃষ্টান্তের প্রতি হযরত কাব ইবনে আহবার ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলাম, মানুষের মধ্যে চক্ষু পথপ্রদর্শক, কান রক্ষক, জিহ্বা ভাষ্যকার, হাত লশকরের দু'বাহু, পা দূত এবং অন্তর বাদশাহ। সুতরাং বাদশাহ ভাল হলে তার অনুচরবর্গ ভাল হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি। হযরত আলী (রাঃ) অন্তরের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন ঃ পৃথিবীতে আল্লাহর পাত্র হচ্ছে অন্তর। সেই অন্তর আল্লাহর অধিক প্রিয়, যে নরম, স্বচ্ছ ও শক্ত। অতএব তোমরা মুসলমান ভাইদের সাথে নরম, বিশ্বাসে স্বচ্ছ এবং ধর্মের ব্যাপারে কঠোর

হবে। এতে এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

-তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে সংবেদনশীল।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব-

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

-আয়াতের তফসীরে বলেন, এটা মুমিনের নূর ও তার অন্তরের দৃষ্টান্ত। তিনি- أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

-আয়াতের তফসীরে বলেন, এটা মোনাফেকের অন্তরের দৃষ্টান্ত। যায়েদ ইবনে আসলাম কোরআনে উল্লিখিত "লওহে মাহফুয" (সংরক্ষিত ফলক) সম্পর্কে বলেন, এটা মুমিনের অন্তর। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ অন্তর ও বক্ষের উপমা হচ্ছে আরশ ও কুরসী।

অন্তরের গুণাবলী ও উদাহরণ ঃ জানা উচিত, মানব সৃষ্টি ও গঠনে চারটি মিশ্রণ আছে, যে কারণে তার মধ্যে হিংস্র, শয়তানী, পৈশাচিক ও স্বর্গীয় -এই চার প্রকার গুণের সমাবেশ ঘটেছে। মানুষের গঠনে ক্রোধ আছে বিধায় সে হিংস্র প্রাণীসুলভ কাজ-কর্ম করে এবং শত্রুতা, বিদ্বেষ, হাতাহাতি ও গালিগালাজ করে। কামভাবের মিশ্রণ থাকার কারণে সে পশুসুলভ কর্ম অর্থাৎ, লোভ, লালসা, হিংসা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। মানুষ স্বয়ং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে খোদায়ী আদেশ; যেমন আল্লাহ বলেন ঃ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى -বলুন, রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অংশ। এ কারণে সে প্রভুত্ব দাবী করে। এছাড়া সে স্বাতন্ত্র্য, প্রভুত্ব, উপাস্যতা ও নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বিষয় পছন্দ করে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তাকে জ্ঞানী বলা হলে সে পুলকিত হয় এবং মূর্খ বলা হলে নাখোশ হয়। বলাবাহুল্য, সকল বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া এবং সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা পালনকর্তার অন্যতম গুণাবলী। মানুষের মধ্যে শয়তানী গুণাবলীও রয়েছে, যদ্দরুন সে দুষ্ট বলে কথিত হয়। সে নিজের মতলব ছলচাতুরী, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে হাসিল করে এবং উপকারের প্রতিদানে অপকার করে। এগুলো শয়তানের স্বভাব।

মানুষের উপরোক্ত চারটি মিশ্রণ তার অন্তরে সমাবেশিত আছে। সুতরাং তার মজ্জার মধ্যে যেন শূকর, কুকুর, শয়তান ও প্রজ্ঞাশীল সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। শূকর হচ্ছে তার কামস্বভাব। কেননা, শূকর তার বর্ণ ও

আকৃতির কারণে নিন্দনীয় নয়; বরং অতিরিক্ত লোভ ও অধিক আহারের কারণে সে নিন্দার পাত্র। কুকুর হচ্ছে মানুষের ক্রোধ। কেননা, কুকুর যে দংশন করে, তা তার আকার-আকৃতির কারণে নয়; বরং তার মধ্যে হিংস্রতা ও শত্রুতা নিহিত থাকার কারণে। এমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরেও হিংস্র প্রাণীর মত কষ্ট প্রদান ও ক্রোধ এবং শূকরের মত লোভ-লালসা মওজুদ রয়েছে। সুতরাং শূকর তার লোভ-লালসার কারণে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আহ্বান করে এবং হিংস্র প্রাণী ক্রোধের কারণে যুলুম ও নিপীড়নের দিকে আহ্বান করে। অপর দিকে শয়তান তাদের লোভ ও ক্রোধকে উত্তেজিত করতে থাকে। সে তাদের মূর্খতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করতে থাকে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যা প্রজ্ঞাবান সত্তার মত, তাকে শয়তানের কলাকৌশল প্রতিহত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে যদি তাই করে, তবে পরিস্থিতি অনেকটা ঠিক থাকবে। দেহের রাজত্বে ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে এবং সবকিছু সঠিক পথে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রজ্ঞাবান সত্তা অর্থাৎ, জ্ঞান-বুদ্ধি এদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম না হয়, তবে এরা তাকে দাবিয়ে রাখে এবং তার কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করে। তখন তাকে কুকুরকে সন্তুষ্ট রাখার এবং শূকরের পেট ভরার কৌশল খুঁজতে হয়। সে সর্বক্ষণ কুকুর ও শূকরের গোলাম থেকে যায়। অধিকাংশ লোকের অবস্থা তাই। তাদের বেশীরভাগ চেষ্টা পেট ও কামনা-বাসনার সেবায় ব্যয়িত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, তারা মূর্তিপূজারীদেরকে ঘৃণা করে এবং মূর্তিপূজার নিন্দায় সোচ্চার থাকে, কিন্তু যদি স্বয়ং তাদের অবস্থার উপর থেকে যবনিকা সরিয়ে দেয়া এবং কাশ্ফওয়ালাদের ন্যায় তাদের অবস্থাকে মূর্ত করে জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে দেখানো হয়, তবে দেখা যাবে, তারা কখনও শূকরের সামনে সেজদা করেছে এবং কখনও তার আদেশ ও ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করেছে। অথবা দেখা যাবে, তারা এক ক্ষেপা কুকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার এবাদত ও পূজা-অর্চনা করছে। এতে করে তারা আপন শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট থাকে। কেননা, শয়তান শূকর ও কুকুরকে মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। ফলে তারা আসলে শূকর ও কুকুরের পূজা করে না; বরং শয়তানের আরাধনা করে। মোট কথা, মানুষ যদি তার চলাফেরা, নিশ্চলতা, কথাবার্তা, চুপ থাকা এবং উঠাবসার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখা যাবে, সমস্ত দিন সে কেবল এসব বস্তুরই এবাদতে সচেষ্ট থাকে। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায়। কেননা, এর ফলে সে মালিককে চাকর,

প্রভুকে দাস এবং প্রবলকে দুর্বল সাব্যস্ত করে। মালিক ও প্রভু হওয়ার যোগ্য ছিল জ্ঞানবুদ্ধি, যাকে মানুষ কামনারূপী শূকর, ক্রোধরূপী কুকুর ও শয়তানের অনুগত সেবাদাসে পরিণত করে দেয়। এই আনুগত্যের ফল দাঁড়ায়, তার অন্তরে বিভিন্ন মন্দ স্বভাবের মরিচা পড়তে থাকে এবং পরিণামে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কামনারূপী শূকরের আনুগত্যের ফলে যে সকল মন্দ স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো হচ্ছে নির্লজ্জতা, দুশ্চরিত্রতা, ব্যয়বহুলতা, কৃপণতা, লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি। আর ক্রোধরূপী কুকুরের আনুগত্য থেকে উদ্ভূত মন্দ স্বভাবগুলো হচ্ছে আত্মপ্রশংসা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, বিদ্রূপ, অপরকে হেয় জ্ঞান করা, অনিষ্ট সাধন করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ক্রোধ ও কামনাপ্রীতির ফলে শয়তানের আনুগত্য থেকে উদ্ভূত মন্দ স্বভাবগুলো হচ্ছে, প্রতারণা, ধূর্তামি, ছলচাতুরী, প্রবঞ্চনা, আত্মসাৎকরণ, অশ্লীল কথন ইত্যাদি। অপরপক্ষে যদি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি প্রবল হয় এবং কামনারূপী শূকরকে প্রতিহত করা হয়, তবে অন্তরে অনেক সদগুণ জন্মলাভ করে। যেমন– জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস, বস্তুনিচয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত মারেফত, জ্ঞান-গরিমায় সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। এছাড়া এমতাবস্থায় কামনা ও ক্রোধের পূজা করতে হয় না। কামনারূপী শূকরকে প্রতিহত করলে আরও যেসকল সৎস্বভাব উৎপন্ন হয়, সেগুলো হচ্ছে, সাধুতা, অল্পে তুষ্টি, স্থিরতা, সংসারনির্লিপ্ততা, খোদাভীতি, প্রফুল্লতা, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ক্রোধশক্তিকে নত ও পরাভূত রাখলে এবং প্রয়োজনীয় সীমায় আনয়ন করলে বীরত্ব, দয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, স্থৈর্য, ধৈর্য, ক্ষমা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি সৎস্বভাবের বিকাশ ঘটে। সুতরাং অন্তরকে আয়না মনে করা উচিত, যার মধ্যে এসব বিষয়ের প্রভাব একের পর এক প্রতিফলিত হতে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত সৎস্বভাবসমূহের প্রভাবে অন্তররূপী আয়নার চমক ও জ্যোতি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তাতে আল্লাহ্র দ্যুতি বিকশিত হয় এবং প্রার্থিত ধর্মীয় বিষয়াদির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। এই প্রকার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهٗ وَاعِظًا مِّنْ قَلْبِهٖ –যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তার জন্যে একটি উপদেশদাতা অন্তর নির্দিষ্ট করে দেন।

এরূপ অন্তরেই আল্লাহ্ তাআলার যিকির অবস্থান গ্রহণ করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

الا بذكر الله تطمئن القلوب –শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

পক্ষান্তরে যে সকল নিন্দনীয় প্রভাব অন্তরের উপর ছায়াপাত করে, সেগুলো কাল ধোঁয়ার মত হয়ে থাকে। এগুলোর কারণে অন্তররূপী আয়না ক্রমশ কালবর্ণ ধারণ করতে থাকে, অবশেষে আল্লাহ্ থেকে আড়াল হয়ে যায়। কোরআন মজীদে এ অবস্থাকেই طبع ও رين অর্থাৎ, 'মোহর মারা ও 'মরিচা পড়া' বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে–

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون –বরং তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে।

অন্য আয়াতে আছে–

ان لو نشاء اصبنهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون –আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করব এবং তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দেব, ফলে তারা শ্রবণ করবে না।

মোটকথা, অধিক গোনাহের কারণে যখন অন্তরের উপর মোহর লেগে যায়, তখন অন্তর সত্যোপলব্ধির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায়। সে আখেরাতের বিষয়াদি হালকা ও দুনিয়ার কাজ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এতেই সর্বশক্তি ব্যয় করে। সে যখন আখেরাতের অবস্থা শ্রবণ করে, তখন এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এই উপদেশ তার মধ্যে স্থান করে না এবং তওবার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করে না। এরূপ ব্যক্তিদের অবস্থা হচ্ছে–

قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحب القبور

–'তারা আখেরাত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরবাসীদের বিষয়ে কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।'

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্তর কাল হওয়ার অর্থও তাই। মায়মুন ইবনে মহরান বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। তওবা করলে এ দাগ মিটে যায়। এর পর পুনরায় গোনাহ্ করলে এই দাগ আরও বেড়ে যায় এবং বাড়তে বাড়তে অবশেষে সমগ্র অন্তর কাল হয়ে যায়। এরই অপর নাম মরিচা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

قلب المؤمن اجرد وفيه سراج يزهر وقلب الكافر اسود منكوس

–'মুমিনের অন্তর পরিষ্কার। তাতে প্রদীপ জ্বলে। আর কাফেরের অন্তর কাল ও অধোমুখী।"

এ থেকে জানা গেল, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও কামপ্রবৃত্তির বিরোধিতা অন্তরকে ঔজ্জ্বল্য দান করে এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কারণে অন্তর কাল হয়ে যায়। সুতরাং যে গোনাহ করে, তার অন্তর কাল হয়ে যায়। যদি কেউ গোনাহের পরে সৎকাজ করে পূর্বের প্রভাব মিটিয়ে দিতে চায়, তবে কাল দাগ মিটে গেলেও নূরের মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে যায়। যেমন– আয়নায় ফুঁ মেরে পরিষ্কার করার পর আবার ফুঁ মেরে পরিষ্কার করলে কিছু না কিছু পঙ্কিলতা থেকেই যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ অন্তর চার প্রকার। (১) পরিষ্কার অন্তর। তাতে প্রদীপ জ্বলে। এটা মুমিনের অন্তর। (২) কাল অধোমুখী অন্তর। এটা কাফেরের অন্তর। (৩) গেলাফে আবৃত মুখ বাঁধা অন্তর। এটা মোনাফেকের অন্তর। (৪) এমন অন্তর, যাতে ঈমান ও নেফাক উভয়টি রয়েছে। এতে ঈমানের প্রভাব এমন, যেমন সবুজ ঘাসকে পবিত্র পানি আরও সতেজ করে তোলে। আর নেফাকের প্রভাব এমন, যেমন পুঁজ ক্ষতস্থানকে আরও বিস্তৃত করে দেয়। অতএব ঈমান ও নেফাকের মধ্যে যেটি প্রবল হবে, অন্তরের অবস্থা তদনুরূপ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذاهم

مبصرون –নিশ্চয় যারা খোদাভীরু, শয়তানের কল্পনা স্পর্শ করতেই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়।

এ আয়াত ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারা অন্তরের ঔজ্জ্বল্য অর্জিত হয়। আর যারা খোদাভীরু, তারাই আল্লাহকে স্মরণ করে। অতএব জানা গেল, খোদাভীতি স্মরণ তথা যিকিরের ফটক, যিকির কাশফের দরজা এবং কাশফ হচ্ছে বৃহৎ নূর অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার দীদারের দ্বার।

জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে অন্তরের দৃষ্টান্ত

প্রকাশ থাকে যে, জ্ঞানের পাত্র হচ্ছে অন্তর। অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম বস্তু সমগ্র দেহের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমগ্র দেহ যার আনুগত্য ও সেবা করে। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের জন্যে এই অন্তর এমন, যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বস্তুসমূহের জন্যে আয়না। অর্থাৎ, বস্তুসমূহের চিত্র যেমন আয়নার মধ্যে চিত্রিত হয়ে বিদ্যমান থাকে, তেমনি প্রত্যেক জানা বিষয়ের চিত্র অন্তর আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে স্পষ্টরূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে আয়না, বস্তুর চিত্র এবং আয়নায় তা প্রতিফলিত হওয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, তেমনি অন্তরের মধ্যেও তিনটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন। এক, অন্তর; দুই, বস্তুসমূহের স্বরূপ এবং তিন, স্বরূপসমূহের চিত্র জানা, যা অন্তরে উপস্থিত হয়। এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ধরার জন্যে তিনটি বিষয় জরুরী। ধারণকারী, যেমন হাত; যাকে ধারণ করা হয়, যেমন তরবারি এবং হাত ও তরবারির মিলন, যাকে ধরা বলা হয়। এমনিভাবে জানা বিষয়ের চিত্র অন্তরে পৌঁছলে তাকে এলেম তথা জ্ঞান বলা হয়। মাঝে মাঝে বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকে এবং অন্তরও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু জ্ঞান হয় না। কেননা, জ্ঞান বলা হয় বস্তুর স্বরূপ অন্তরে পৌঁছে যাওয়াকে। উদাহরণতঃ তরবারিও বিদ্যমান এবং হাতও উপস্থিত, কিন্তু তরবারি হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত 'ধরা' বলা হবে না। পার্থক্য হচ্ছে, ধরার মধ্যে হুবহু তরবারি হাতে পৌঁছে যায়, কিন্তু জানা বস্তু হুবহু অন্তরে চলে যায় না; বরং তার স্বরূপ চলে যায়। উদাহরণতঃ কেউ অগ্নিকে জেনে নিলে স্বয়ং অগ্নি তার মধ্যে যাবে না; বরং বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে অগ্নির যে স্বরূপ, তা অন্তরে যায়। এদিক দিয়ে অন্তরকে আয়নার সাথে তুলনা করাই উত্তম। কেননা, আয়নার মধ্যেও স্বয়ং বস্তু চলে যায় না; বরং বস্তুর অনুরূপ একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়।

অন্তরকে আয়নার সাথে তুলনা করার একটি বড় কারণ হল, আয়নার মধ্যে পাঁচটি কারণে চিত্র জানা যায় না। প্রথম, আয়নাই ভাল না হওয়া এবং তার মধ্যে ক্রুটি থাকা। দ্বিতীয়, আয়নার মধ্যে অন্য কোন কারণে ময়লা জমে থাকা। তৃতীয়, যে বস্তু আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হবে, তা সম্মুখে না থাকা কিংবা উদাহরণতঃ পেছনে থাকা। চতুর্থ, বস্তু ও আয়নার মাঝখানে আড়াল থাকা। পঞ্চম, যে বস্তুর চিত্র আয়নায় দেখতে হবে, তার সঠিক দিক জানা না থাকা। ফলে আয়না ঠিক জায়গায় রাখা যায় না। অনুরূপভাবে অন্তর আয়নার মধ্যেও সকল ক্ষেত্রে সত্য বিষয়টি উদ্ভাসিত হতে পারে, কিন্তু অন্তরে কতক জ্ঞান না আসার কারণ সেই পাঁচটি, যার কিঞ্চিত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম কারণ, স্বয়ং অন্তর ক্রুটিপূর্ণ হওয়া; যেমন শিশুদের অন্তর। এতে ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উদ্ভাসিত হয় না।

দ্বিতীয় কারণ, গোনাহ ও নাফরমানীর ময়লা, যা অধিক কামলিপ্সার

কারণে অন্তরের উপর এসে জমা হয় এবং তার ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা বিনষ্ট করে দেয়। এই কালিমার কারণে অন্তরে সত্য বিষয়টি ফুটে উঠতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, বিবেক-বুদ্ধি তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং কখনও তার কাছে ফিরে আসে না। অর্থাৎ, তার অন্তরে এমন কালিমা পড়ে যায়, যার প্রভাব কখনও দূরীভূত হয় না। কেননা, গোনাহের পরে পুণ্য কাজ করলেও তার কারণে সেই প্রভাব দূর হবে না, কিন্তু সে যদি গোনাহ্ না করত এবং পুণ্য কাজই করত, তবে নিঃসন্দেহে অন্তরে নূর বৃদ্ধি পেত। প্রথমে গোনাহ্ করার কারণে পুণ্য কাজের তেমন উপকার হয়নি। বরং গোনাহের পূর্বে অন্তর যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল– নূর বৃদ্ধি পেল না। বাস্তবে এটা এমন ভয়ংকর ক্ষতি, যার কোন প্রতিকার নেই। দেখ, যে আয়নায় একবার মরিচা পড়ে যায়, এর পর তা ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়, তা সেই আয়নার সমান হয় না, যা মরিচা ছাড়াই পরিষ্কার রাখা হয়। মোট কথা, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের দিকে ধাবিত হওয়া এবং কামলিপ্সা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আন্তরিক স্বচ্ছতার কারণ হয়ে থাকে।

এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –'যারা আমাকে পাওয়ার জন্যে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব।'

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –'যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ে আমল করে, আল্লাহ্ তাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন।'

তৃতীয় কারণ, প্রার্থিত স্বরূপের প্রতি বিমুখ হওয়া। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি আনুগত্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ, কিন্তু তার অন্তর সত্যান্বেষী নয়। বরং অধিকাংশ শারীরিক এবাদত কিংবা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে আপন প্রচেষ্টা ব্যাপৃত রাখে। এরূপ ব্যক্তির অন্তর যদিও স্বচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে সত্যের দ্যুতি বিদ্যমান থাকে না। এতে সেই বিষয়ই উদঘাটিত হয়, যার কল্পনায় সে মগ্ন থাকে। অতএব যেব্যক্তি আপন প্রচেষ্টাকে জাগতিক কামলিপ্সা ও তার আনন্দে ব্যাপৃত রাখে, তার সামনে সত্য বিষয় কিরূপে উদঘাটিত হতে পারে?

চতুর্থ কারণ "হিজাব" তথা আড়াল থাকা। উদাহরণতঃ কোন আনুগত্যশীল ব্যক্তি তার কামলিপ্সা দাবিয়ে রেখেছে। সে কোন সত্য উদঘাটনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করলে মাঝে মাঝে তার সামনে সত্য উদঘাটিত হয় না। কেননা, সে পৈতৃক অনুকরণ কিংবা সুধারণার কারণে কোন একটি বিশ্বাস মনে পোষণ করে নেয়। এ বিশ্বাসটিই সত্য বিষয়ের মধ্যে ও তার অন্তরের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। সে শৈশবকাল থেকে যে বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়, সেই বিশ্বাস অন্তরে কোন বিপরীত বিশ্বাস উদঘাটিত হওয়ার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি বড় অন্তরায়, যার কারণে অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ও বিভিন্ন মতের বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সত্যের আড়ালে রয়ে গেছেন। বরং অধিকাংশ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যাদের চিন্তা-ভাবনা যমীন ও আকাশের রাজ্যে বিচরণ করে, তারাও এই বালায় গ্রেফতার আছেন।

পঞ্চম কারণ, প্রার্থিত সত্যের দিক সম্পর্কে অজ্ঞতা। উদাহরণতঃ কোন বিদ্যার্থী যদি কোন অজানাকে জানতে চায়, তবে যে পর্যন্ত জানা তথ্যসমূহকে জ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে বিন্যস্ত না করবে, সেই পর্যন্ত প্রার্থিত ফল অর্জিত হবে না। কেননা, যেসকল জ্ঞান মজ্জাগত নয়, সেগুলো অন্যান্য জানা তথ্যসমূহের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত হতে পারে না। যেমন– নর ও মাদী ব্যতীত বাচ্চা আসতে পারে না। কেউ যদি ঘোটক শাবক লাভ করতে চায়, তবে তা উট ও গাধা থেকে অর্জিত হবে না; বরং এর জন্যে ঘোটক-ঘোটকী দরকার। অনুরূপভাবে প্রত্যেক জ্ঞানের জন্যে দু'টি বিশেষ মূল ও একটি বিন্যাস পদ্ধতি প্রয়োজন। এতে প্রার্থিত জ্ঞান অর্জিত হবে। সুতরাং এসব মূল বিষয় ও বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে থাকে; যেমন আয়নায় সঠিক দিক না জানার কারণে চিত্র প্রতিফলিত হয় না। এ বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল, কোন ব্যক্তি যদি আয়নায় তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে চায়, তবে আয়না মুখের সামনে রাখলে পৃষ্ঠদেশ দেখা যাবে না। কেননা, আয়না পিঠের বিপরীতে নয়। আয়না পিঠের বিপরীতে রাখলেও পিঠ দৃষ্টিগোচর হবে না; বরং স্বয়ং আয়নাও দেখা যাবে না। কেননা, আয়না তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পিঠ দেখতে হলে আরও একটি আয়নার প্রয়োজন হবে। একটি পিঠের বিপরীতে রাখবে এবং অপরটি চোখের সামনে এমনভাবে রাখবে যে, উভয় আয়না একটি অপরটির বিপরীতে থাকে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পারে। কেননা, তার পিঠের প্রতিচ্ছবি পেছনের আয়নায় পড়বে

এবং তার প্রতিচ্ছবি সামনে রক্ষিত অপর আয়নায় পড়বে। এমনিভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তের চেয়েও অধিক বিচিত্র ধরনের কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার এসব কর্মকাণ্ড আপনা আপনি জানা হয়ে যায়। এটাই অন্তরের জন্যে সত্যোপলব্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক অন্তরেরই মজ্জাগতভাবে সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা নেই। কেননা, এ যোগ্যতা একটি খোদায়ী বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই অন্তরাত্মা সকল সৃষ্টি থেকে ভিন্ন ও সেরা। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে এ বিষয়টিই এরশাদ করেছেন—

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

—'আমি আমানতটি পেশ করেছি আকাশমণ্ডলীর সামনে, পৃথিবীর সামনে এবং পর্বতমালার সামনে। অতঃপর কেউ তা বহন করতে স্বীকৃত হল না। তারা ভীত হয়ে গেল, কিন্তু মানুষ তা বহন করেছে।'

অর্থাৎ, মানুষ একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালা থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করছে এবং খোদায়ী আমানত বহন করার যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। এই আমানত হচ্ছে অধ্যাত্ম জ্ঞান তথা মারেফত ও তাওহীদ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর এই আমানত বহন করার যোগ্য, কিন্তু আমরা যেসকল কারণ বর্ণনা করেছি সেগুলোর ফলস্বরূপ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এ জন্যেই নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন-

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

—প্রত্যেক নবজাত শিশু 'ফিতরত" তথা মূল ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এর পর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী এবং খৃস্টান বানিয়ে দেয়।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لَوْ لَا اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِىْ اٰدَمَ لَنَظَرُوْا اِلٰى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ —'যদি আদম সন্তানের অন্তরের চারপাশে শয়তানরা ঘুরাফেরা না করত, তবে সে আকাশের ফেরেশতা ও রহস্যাবলী অবলোকন করত।' এতে কতক কারণ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অন্তর ও ঊর্ধ্ব জগতের মধ্যে আড়াল হয়ে থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তির মধ্যেও এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কোথায় আছেন— পৃথিবীতে, না

আকাশে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ঈমানদার বান্দাদের অন্তরে আছেন। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে– পৃথিবীতে আমার সংকুলান হয় না– আকাশেও না। আমার সংকুলান আমার মুমিন বান্দার অন্তরে হয়, যে অন্তর নরম ও স্থির। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমার অন্তর আল্লাহকে যখন দেখেছে, তখনই তাকওয়ার কারণে নূর আড়াল হয়ে গেছে। যার সামনে থেকে আড়াল দূর হয়ে যায়, তার অন্তরে ঊর্ধ্ব জগতের চিত্র ফুটে উঠে। সকল এবাদত ও দৈহিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া। আর স্বচ্ছতার লক্ষ্য হচ্ছে অন্তরে খোদায়ী মারেফতের দ্যুতি এসে যাওয়া। মারেফতের এই দ্যুতিই নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে ঃ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ –আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের জন্যে যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে একটি নূরের উপর থাকে। বলাবাহুল্য, এই দ্যুতি ও ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর সর্বসাধারণের ঈমান। নিছক অনুকরণের উপর এর ভিত্তি। দ্বিতীয় স্তর দার্শনিকদের ঈমান। এতে কিছু যুক্তি প্রমাণও থাকে, কিন্তু এটাও সর্বসাধারণের ঈমানের কাছাকাছি। তৃতীয় স্তর আরেফ তথা বিভুজ্ঞানীদের ঈমান, যা একীনের নূর থেকে অর্জিত হয়। আমরা এ তিনটি স্তরকে একটি উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করছি। উদাহরণতঃ যায়েদ গৃহে আছে– এ কথা তিনভাবে জানা যায়। প্রথমতঃ কোন সত্যবাদী ব্যক্তির বর্ণনা, যার সত্যবাদিতা বার বার পরীক্ষিত হয়েছে এবং যার কথায় মিথ্যার অবকাশ নেই। এরূপ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করা যাবে যে, যায়েদ নিঃসন্দেহে গৃহে আছে। এটা নিছক অনুকরণমূলক ঈমানের দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষের অবস্থা তাই। তারা জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে পৌঁছে পিতামাতার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান, কুদরত, ইচ্ছা ইত্যাদি সকল সেফাত, পয়গম্বরগণের আগমন এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধান সত্য হওয়ার কথা শুনে এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর আজীবন এর উপরই কায়েম থাকে। এর বিরুদ্ধে অন্তরে কোন কল্পনা আসে না। কেননা, পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি তারা সুধারণা পোষণ করে। এ ধরনের ঈমান পারলৌকিক মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। এরূপ মুমিন ব্যক্তি কোরআনে বর্ণিত "আসহাবে ইয়ামীনের" সর্বনিম্ন স্তর। সে "মোকাররাব" তথা নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, নৈকট্যশীল হওয়ার জন্যে কাশ্ফ এবং বক্ষ একীনের আলোকে আলোকিত হওয়া জরুরী, যা এ ধরনের ঈমানে অনুপস্থিত। এছাড়া এ'তেকাদ তথা

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কতক লোক কিংবা অনেক লোকের বর্ণিত খবরে ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা থাকে। ইহুদী ও খৃস্টানদের অন্তরও তাদের পিতামাতার কথায় প্রশান্ত হয়, কিন্তু তারা যেসব আকীদা পোষণ করে, সেগুলো ভ্রান্ত। কেননা, তাদের অন্তরে ভ্রান্তিই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আকীদা সত্য।'

দ্বিতীয়, প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে গৃহের ভিতর থেকে যায়েদের শব্দ শ্রবণ করা। এর মাধ্যমেও জানা যায় যে, যায়েদ গৃহে আছে। অপরের কাছে শুনে যে পরিমাণ বিশ্বাস হয়, নিজ কানে শব্দ শুনে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস হবে। কেননা, আওয়াজ শুনলে যার আওয়াজ, তার সমস্ত আকার-আকৃতি চিন্তায় উপস্থিত হয়ে যায় এবং অন্তরে বদ্ধমূল হয়, এই আওয়াজ অমুকের। এটা দ্বিতীয় প্রকার ঈমানের দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে কিছু প্রমাণেরও মিশ্রণ আছে, কিন্তু ভ্রান্তির সম্ভাবনা এর মধ্যেও রয়েছে। কেননা, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের সাথে মিলেও যেতে পারে। কেউ কেউ আবার অন্যের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করতে পারে।

তৃতীয়, তুমি নিজে গৃহের ভিতরে গিয়ে যায়েদকে দেখে নেবে যে, সে গৃহে উপস্থিত আছে। এটা বিভুজ্ঞানী নৈকট্যশীল ও সিদ্দীকগণের ঈমান। একেই মারেফত ও মুশাহাদা বলা হয়। কারণ, তাদের ঈমান মুশাহাদা তথা প্রত্যক্ষকরণের পরে হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে সর্বসাধারণ ও দার্শনিকের ঈমানও শামিল এবং তাতে কেবল প্রত্যক্ষকরণের স্তরটি অতিরিক্ত, সে কারণে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। হাঁ, এর মধ্যে কাশফ ও জ্ঞানের পরিমাণে তফাৎ হয়। জ্ঞানের পরিমাণে তফাৎ এমন, যেন কোন ব্যক্তি গৃহের আঙ্গিনায় গিয়ে যায়েদকে খুব আলোর মধ্যে দেখে এবং অন্য ব্যক্তি কোন কক্ষে অথবা রাতের বেলায় দেখে। এখানে প্রথম ব্যক্তির দেখা অধিক কামেল হবে। এমনিভাবে প্রত্যক্ষকরণের ক্ষেত্রে কেউ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও দেখে জেনে নেয় এবং কেউ এ থেকে বঞ্চিত থাকে। জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে এ হচ্ছে অন্তরের অবস্থা।

যৌক্তিক, ধর্মীয়, জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে অন্তরের অবস্থা

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অন্তর স্বভাবগতভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি গ্রহণে তৎপর। এখন বলা হচ্ছে, যেসব জ্ঞান অন্তরে আসে, সেগুলো দু'প্রকার– যুক্তিগত ও শরীয়তগত। যুক্তিগত জ্ঞানও দু'প্রকার– এক, যা শিক্ষালব্ধ

নয় এবং দুই, যা শিক্ষালব্ধ। যে জ্ঞান শিক্ষালব্ধ তাও দু'প্রকার- জাগতিক ও পারলৌকিক। যুক্তিগত জ্ঞান বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন জ্ঞান, যার কারণ নিছক যুক্তি- অনুকরণ ও শ্রবণ নয়। এর মধ্যে সেই জ্ঞান শিক্ষালব্ধ নয়, যাতে জানা যায় না যে, এই জ্ঞান কোথা থেকে এবং কিভাবে অর্জিত হয়েছে? উদাহরণতঃ এটা জানা যে, এক ব্যক্তি একই সময় দুটি গৃহে থাকতে পারে না এবং একই বস্তু নশ্বর, অবিনশ্বর কিংবা উপস্থিত ও অনুপস্থিত একই সাথে হতে পারে না। এ জ্ঞান মানুষ শৈশবকাল থেকে অর্জন করে, কিন্তু সে জানে না, দু'গৃহে থাকা এটা কখন এবং কিভাবে অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ, এর কোন বাহ্যিক ও নিকটবর্তী কারণ জানে না। নতুবা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে এসেছে, এটা জানে। আর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান হচ্ছে, যাতে শিক্ষা ও প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকারকে 'আকল' বলা হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আকল দু'প্রকার- স্বভাবগত ও শ্রবণগত। স্বভাবগত আকল ব্যতীত শ্রবণগত আকলের কোন ফায়দা নেই; যেমন সূর্যকিরণ দ্বারা অন্ধের কোন উপকার হয় না।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

ما خلق الله خلقا اكرم عليه من العقل -আল্লাহ তাআলা আকল অপেক্ষা অধিক মহৎ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি।

এখানে প্রথম প্রকার আকল বুঝানো হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اذا تقرب الناس الى الله تعالى بانواع البر فتقرب انت بعقلك -'যখন মানুষ নানা প্রকার পুণ্য কাজ দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে, তখন তুমি আপন আকল দ্বারা নৈকট্য লাভ কর।'

এখানে দ্বিতীয় প্রকার আকল বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দরকার। মোট কথা, অন্তরকে মনে করতে হবে চক্ষু এবং স্বভাবগত আকলকে বুঝতে হবে দৃষ্টিশক্তিরূপে। দৃষ্টিশক্তি অন্ধের মধ্যে থাকে না, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে থাকে, যদিও সে তার চক্ষু বন্ধ করে নেয় অথবা অন্ধকার রাত্রে থাকে। যে কলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার জানা বিষয় অন্তরে মুদ্রিত করে, তাকে সূর্যের গোল পরিমণ্ডল মনে করা উচিত। শৈশবে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কারণ এটাই যে, তখন পর্যন্ত মানসপটে জ্ঞান চিত্রিত করার যোগ্যতা থাকে না। "কলম" বলে আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সৃজিত এমন একটি বস্তু, যদ্দ্বারা

অন্তরে জ্ঞানের চিত্র আঁকা হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন ঃ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।

আল্লাহ তাআলার কলম আমাদের কলমের মত নয়। যেমন– তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মোট কথা, অন্তশ্চক্ষু ও চর্মচক্ষুর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহে মিল আছে, কিন্তু সম্মান ও মর্যাদায় কোন মিল নেই। এ মিলের কারণেই আল্লাহ তাআলা অন্তরের উপলব্ধিকে দেখা বলে ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى –অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি।

আরও বলা হয়েছে ঃ

كَذَالِكَ نُوْرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখাতে থাকি।

এ আয়াতে আত্মোপলব্ধিকে দেখা বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এমনিভাবে নিম্নের আয়াতসমূহে উপলব্ধির বিপরীত বিষয়কে অন্ধত্ব বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ– –নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। তবে বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়। مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى –যে এ জগতে অন্ধ থাকে, সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। এ পর্যন্ত যৌক্তিক জ্ঞানের কথা বর্ণিত হল। এক্ষণে ধর্মীয় জ্ঞানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

ধর্মীয় জ্ঞান পয়গম্বরগণের অনুসরণ তথা আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস শিক্ষা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর মাধ্যমেই অন্তরগত গুণাবলী পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে এবং অন্তরগত রোগ-ব্যাধি ও ব্যথার উপশম ঘটে। যৌক্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও সেটা অন্তরের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের বিষয়সমূহ আপনা আপনি আকল তথা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু শ্রবণের পর যথাযথ বুঝার জন্যে আকলের প্রয়োজন হয়। এ থেকে প্রমাণিত হল, শ্রবণ ছাড়া আকলের উপায় নেই এবং আকল থেকে শ্রবণের পলায়নের পথ নেই। যেব্যক্তি কেবল তাকলীদ তথা

অনুসরণই করে যায় এবং আকলকে শিকায় তুলে রাখে, সে মূর্খ। অনুরূপভাবে যে কেবল আকলকেই যথেষ্ট মনে করে এবং কোরআন ও হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, সে উদ্ধত। অতএব উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা উচিত। কেননা, যৌক্তিক জ্ঞান খাদ্যের মত এবং শরীয়তের জ্ঞান ওষুধের অনুরূপ। রুগ্ন ব্যক্তি যদি ওষুধ না খায়, তবে কেবল খাদ্য খেয়ে তার রোগ দূর হবে না। এমনিভাবে অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা সেসব ভেষজ দ্বারা হতে পারে, যা শরীয়তের হাসপাতালে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ওযীফা, এবাদত ও সৎকর্ম। সুতরাং যেব্যক্তি তার রোগাক্রান্ত অন্তরের চিকিৎসা এবাদত দ্বারা করবে না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন– সেই রুগীর ক্ষতি হয়, যে ওষুধ না খেয়ে কেবল খাদ্য খেতে থাকে।

যারা বলে, যৌক্তিক জ্ঞান শরীয়তের জ্ঞানের বিপরীত, কাজেই উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়, তারা অজ্ঞতার কারণে এ কথা বলে। তারা অন্তশ্চক্ষুর নূর থেকে বঞ্চিত। বরং তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তের কতক জ্ঞানও পরস্পর বিরোধী প্রতিভাত হয়ে থাকে। তারা এগুলোর সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়ে ধারণা করতে থাকে যে, শরীয়তই ত্রুটিপূর্ণ। অথচ এরূপ মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের নিজেদের অক্ষমতা। উদাহরণতঃ জনৈক অন্ধ ব্যক্তি কারও গৃহে প্রবেশ করার পর ঘটনাক্রমে বাসনকোসনের উপর তার পা পড়ে গেল। এতে সে বলতে লাগল ঃ এ গৃহের লোকেরা কেমন যে, পথের মধ্যে বাসনকোসন রেখে দেয়। এগুলো যথাস্থানে রাখল না কেন? জওয়াবে গৃহের লোকেরা বলল ঃ মিয়া সাহেব, বাসনকোসন তো যথাস্থানেই রাখা আছে, কিন্তু অন্ধত্বের কারণে আপনিই পথের দিশা পাননি। আশ্চর্যের বিষয়, আপনি নিজের ত্রুটি দেখলেন না, অপরের দোষ ধরতে শুরু করেছেন!

হাঁ, যৌক্তিক জ্ঞান ও শরীয়তের জ্ঞান এদিক দিয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেউ এগুলোর কোন একটিতে সর্বপ্রযত্নে মনোনিবেশ করলে অপরটি থেকে সে প্রায়শ গাফেল থেকে যায়। এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতের তিনটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক উক্তিতে তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাত নিক্তির দু'পাল্লার মত। দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে, উভয়টি পূর্ব ও পশ্চিমের মত। তৃতীয় উক্তিতে বলেছেন– এরা দু'সতীনের মত। একটি রাজি হলে অপরটি নারাজ হয়ে যায়। এ কারণেই দেখা যায়, যারা দুনিয়ার বিষয়াদিতে খুব চালাক-চতুর হয়, তারা আখেরাতের ব্যাপারাদিতে মূর্খ থেকে যায়। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে পারদর্শী হয়, তারা প্রায়ই দুনিয়ার জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়। কেননা, অধিকাংশ লোকের আকল-শক্তি উভয়

বিষয় অর্জনে সক্ষম হয় না। একটি শিখলে অপরটিতে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে— অধিকাংশ জান্নাতী আত্মভোলা। অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে অচেতন। হযরত হাসান বসরী এক ওয়াযে বলেন ঃ আমি এমন লোকদের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যাদেরকে তোমরা দেখলে পাগল বলতে এবং তারা তোমাদেরকে দেখলে শয়তান বলত। অতএব, কোন অভিনব ধর্মীয় বিষয়কে যদি যাহেরী আলেমগণ অস্বীকার করে, তবে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ করা উচিত নয়; বরং বুঝা দরকার যে, কেউ পূর্ব দিকে গমন করে যেমন পশ্চিমের বস্তু পেতে পারে না, তাদের অস্বীকারও তেমনি। দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ও এই পর্যায়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غَافِلُونَ -

–নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং তা দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে গাফেল।

আরও বলা হয়েছে–

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ -

–তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে এবং তারা আখেরাতের খবর রাখে না।

অন্য এক আয়াতে আছে–

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ -

–অতএব সেই ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার যিকিরের প্রতি বিমুখ হয়ে পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের বিদ্যার দৌড় এ পর্যন্তই।

মোট কথা, আল্লাহ তাআলা আপন কৃপায় যাদেরকে উভয় জাহানের জ্ঞান দান করেন, তারাই কেবল দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন এবং তারা হলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তাদের অন্তরে সকল বিষয়ের সংকুলান হয়ে থাকে।

এলহামের ক্ষেত্র সুফী ও আলেমের পার্থক্য

জানা উচিত, যে জ্ঞান শিক্ষালব্ধ নয়; বরং কখনও কখনও অন্তরে জাগরিত হয়ে যায়, তাকে এলহাম বলা হয়। এই জ্ঞান কয়েক প্রকারে অন্তরে জাগরিত হয়। কখনও মনে হয়, কেউ অজ্ঞাতে অন্তরে ঢেলে দিয়েছে এবং কখনও শিক্ষার পদ্ধতিতে অর্জিত হয়। প্রথম প্রকারকে 'নফখ ফিল কলব' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'এতেবার' ও 'এস্তেবসার' আখ্যা দেয়া হয়। এলহাম কখনও এমনভাবে হয় যে, বান্দা বুঝতেও পারে না, এই জ্ঞান কোথা থেকে কিভাবে অর্জিত হল। এটা আলেম ও সুফীগণের জন্যে হয়। আবার কখনও জ্ঞান লাভের পন্থা পদ্ধতি বান্দার জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ফেরেশতা অন্তরে জ্ঞান ঢেলে দেয়, সে বান্দার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এই প্রকার এলহামকে ওহী বলা হয়। এটা পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য। যে জ্ঞান উপার্জন ও প্রমাণের মাধ্যমে হাসিল হয়, তা আলেমগণের জ্ঞান।

সত্য হচ্ছে, সকল বিষয়ের মধ্যে সত্যকে জেনে নেয়ার যোগ্যতা অন্তরের রয়েছে, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি কারণই এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পাঁচটি কারণ যেন অন্তররূপী আয়না ও লওহে মাহফুযের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। লওহে মাহফুয এমন একটি সংরক্ষিত ফলক, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয় চিত্রিত আছে। এই ফলক থেকে অন্তরের উপর জ্ঞান প্রতিফলিত হওয়া এমন, যেমন এক আয়নার প্রতিচ্ছবি অন্য আয়নায় দৃষ্টিগোচর হয়। উভয় আয়নার মধ্যবর্তী আড়াল যেমন কখনও হাতে সরিয়ে দেয়া হয় এবং কখনও আপনা-আপনি বাতাসের চাপে সরে যায়, তেমনি মাঝে মাঝে খোদায়ী কৃপার সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং অন্তশ্চক্ষুর সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। ফলে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ কতক বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। এটা কখনও স্বপ্নে হয়। এতে ভবিষ্যতের অবস্থা জানা হয়ে যায়। সম্পূর্ণ পর্দা সরে যাওয়া মৃত্যুর পরই সম্ভবপর। মাঝে মাঝে জাগ্রত অবস্থায়ও পর্দা সরে যায় এবং সাথে সাথে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে বিস্ময়কর জ্ঞানের বিষয়াদি অন্তরে উন্মোচিত হয়ে যায়। এই উন্মোচন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে এবং এর স্থায়িত্ব খুবই বিরল। সারকথা, অন্তরে জ্ঞান এলহাম হওয়া ও জ্ঞানার্জন করা— এতদুভয়ের মধ্যে কেবল পর্দা সরে যাওয়ার পার্থক্য আছে। এছাড়া পাত্র ও কারণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পর্দা সরে যাওয়াটা বান্দার এখতিয়ারে নেই। এমনিভাবে ওহী ও এলহামের মধ্যে এছাড়া কোন তফাৎ নেই যে,

ওহীর মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যম অর্থাৎ, ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এলহামে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু অর্জিত হয় ফেরেশতার মাধ্যমেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

অর্থাৎ, কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক প্রেরণের মাধ্যমে, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান পেঁছে দেবে।

এখন জানা উচিত, সুফী সম্প্রদায় এলহামী জ্ঞানের প্রতি উৎসাহী হয়ে থাকেন– শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রতি নয়। এ কারণেই তারা গ্রন্থকারদের লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন না এবং উক্তি ও প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা করেন না। তারা বলেন ঃ প্রথমে খুব সাধনা করা উচিত এবং কুস্বভাব ও যাবতীয় সাংসারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কায়মনোবাক্যে সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। এটা অর্জিত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বান্দার অন্তরের কার্যনির্বাহী ও যিম্মাদার হয়ে যাবেন। তিনি যিম্মাদার হয়ে গেলে বান্দার প্রতি রহমত ছায়াপাত করবে এবং অন্তরে নূর চমকাতে থাকবে। ফলে ঊর্ধ্ব জগতের রহস্য তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। অন্তরের সামনে থেকে আড়াল দূর হয়ে যাবে এবং খোদায়ী বিষয়াদির সত্যাসত্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। এ বক্তব্য অনুযায়ী বান্দার কাজ এতটুকু যে, সে কেবল আত্মশুদ্ধি করবে এবং খাঁটি ইচ্ছা সহকারে খোদায়ী রহমতে জ্ঞানোন্মেষের জন্যে অপেক্ষমাণ ও পিপাসার্ত থাকবে। এভাবে পয়গম্বর ও ওলীগণের সামনে সত্য উদঘাটিত হয়ে অন্তর নূরানী হয়ে যায়। এটা লেখাপড়া ও গ্রন্থ পাঠ দ্বারা হয় না। কারণ, যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।

যাহেরী আলেমগণ জ্ঞানলাভের উপরোক্ত পদ্ধতি অস্বীকার করেন না। তারা স্বীকার করেন যে, বিরল হলেও এভাবে মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কেননা, অধিকাংশ নবী ও ওলীর অবস্থা তাই হয়, কিন্তু তাঁরা বলেন, এ পদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন এবং এর ফলাফল বিলম্বে পাওয়া যায়। এর জন্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো অর্জন করাও খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, যাবতীয় সম্পর্ক এমনভাবে ছিন্ন করা এক রকম অসম্ভব। যদি ছিন্ন হয়েও যায়, তবে তা অব্যাহত থাকা আরও বেশী কঠিন। কেননা, সামান্য কুমন্ত্রণা ও শংকার কারণে অন্তর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَشَدُّ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ فِىْ غَلَيَانِهَا .

–মুমিনের অন্তর ফুটন্ত পানির চেয়েও অধিক স্ফুটিত হতে থাকে।

এছাড়া এই সাধনায় কখনও মেযাজ বিগড়ে যায়, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। পূর্ব থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মনকে সুসংযত করে না নিলে অন্তরে নানাবিধ ক্ষতিকর চিন্তা এসে ভিড় জমায়। এগুলো দূর না করা পর্যন্ত মন এগুলোতেই লিপ্ত থাকে, অথচ সারা জীবনেও এগুলোর সমাধান হয় না। এ পথে চলেছেন, এমন অনেক সুফী একই চিন্তায় বিশ বছর পর্যন্ত জড়িয়ে রয়েছেন। পূর্ব থেকে জ্ঞানার্জন করে নিলে এ ধরনের চিন্তার সমাধান তাঁরা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যেতেন। এ থেকে জানা যায়, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হওয়ার পদ্ধতিই নির্ভরযোগ্য এবং উদ্দেশ্যের অধিক অনুকূল। আলেমগণ বলেন, সুফী সম্প্রদায় এমন, যেমন কোন ব্যক্তি ফেকাহ শেখে না এবং বলে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফেকাহ শেখেননি। তিনি ওহী ও এলহামের মাধ্যমে ফকীহ হয়েছিলেন। সুতরাং আমিও সদা সর্বদা সাধনা করে করে ফকীহ হয়ে যাব। যে কেউ এরূপ চিন্তা করে, সে নিজের উপর যুলুম করে এবং মূল্যবান জীবন বিনষ্ট করে। অতএব প্রথমে জ্ঞানার্জন ও আলেমগণের বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এর পর প্রতীক্ষায় থাকবে যে, যা অন্য আলেমগণের জানা নেই, তা যেন সে জেনে নেয়। সম্ভবত সাধনার পরে এটি অর্জিত হয়ে যাবে।

সুফী সম্প্রদায়ের শিক্ষা পদ্ধতি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

জানা উচিত, যার অন্তরে সামান্য বিষয়ও এলহামের পথে উন্মোচিত হয়, তাকেই 'আরেফ' (বিভুজ্ঞানী) বলা হবে। আর যার অন্তর কখনও এরূপ অনুভব করে না, তারও এ বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত। কেননা, মারেফত তথা বিভুজ্ঞান মানুষের একটি মজ্জাগত ব্যাপার। এর পক্ষে শরীয়তসম্মত প্রমাণ অভিজ্ঞতা ও কাহিনী বিদ্যমান আছে। প্রমাণ এই–

আল্লাহ তা'আলা [illegible] ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ [illegible]

–যারা আমার পথে সাধনা ও অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি।

অর্থাৎ কাশফ ও এলহামের পদ্ধতিতে তাদের অন্তর থেকে প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق لعمل حتى يستوجب النار .

–যে ব্যক্তি তার এলেম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই বিষয়ের এলেম দান করেন, যা সে জানে না। তাকে আমল করার তওফীক দেন। ফলে সে জান্নাতের হকদার হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তার এলেম অনুযায়ী আমল করে না, সে জানা বিষয়ে হয়রান হয় এবং আমল করার তওফীক পায় না। ফলে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب

–যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌঁছান।

অর্থাৎ আপত্তি ও সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন, জ্ঞান ও মেধা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াই দান করেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ

يايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا .

–মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বিষয় দান করবেন।

এখানে 'ফোরকান' মানে নূর, যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ার মধ্যে প্রায়ই এই নূর প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ঃ

اللهم اعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي بصري نورا .

–হে আল্লাহ, আমাকে নূর দান করুন, আমার নূর বৃদ্ধি করুন, আমার অন্তরে নূর দিন এবং আমার কবরে ও আমার নয়নে নূর দিন।

এমনকি, তিনি আরও বলতেন ঃ আমার কেশ ও রক্ত-মাংসে এবং অস্থির মধ্যে নূর দান করুন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه .

–আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে একটি নূরের উপর থাকে।

এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এরশাদ করেন ঃ এর অর্থ বক্ষের প্রশস্ততা। অর্থাৎ অন্তরে যখন নূর ঢেলে দেয়া হয়, তখন তার জন্যে বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যায়। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের জন্যে এই দোয়া করেন–

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل

–হে আল্লাহ, তাকে ধর্মীয় বোধশক্তি দান করুন এবং ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন।

হযরত আলী রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কথা গোপনে বলেননি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন কোন বান্দাকে কিতাবুল্লাহর জ্ঞান দান করেন। এটা শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। يؤتى الحكمة من يشاء –আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 'হেকমত' দান করেন– এই আয়াতে কেউ কেউ হেকমতের অর্থ করেছেন আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান। ففهمنها سليمن –আমি সোলায়মানকে তা বুঝিয়ে দিলাম। এখানে কাশফের মাধ্যমে সোলায়মান (আঃ) যা বুঝেছিলেন, তাকেই 'বুঝিয়ে দিলাম' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার দৃষ্টিতে আল্লাহর নূর দ্বারা পর্দার অন্তরালের বস্তু ভেসে উঠে। তিনি কসম খেয়ে বলেন ঃ নির্ঘাত সত্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সত্য বিষয় মুমিনদের অন্তরে ঢেলে দেন এবং মুখে উচ্চারিত করে দেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى

মুমিনের দূরদর্শিতাকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

العلم علمان فعلم باطن فى القلب فذلك هو العلم النافع -

এলেম দু'প্রকার। এক এলেম অন্তরে লুক্কায়িত। এটাই উপকারী এলেম। জনৈক আলেমকে অন্তরে লুক্কায়িত এলেমের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ তা'আলার রহস্যাবলীর অন্যতম, যা

তিনি আপন ওলীদের অন্তরে ঢেলে দেন। কোন ফেরেশতা কিংবা মানুষ তা অবগত নয়। কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাকওয়া হেদায়াত ও কাশফের চাবি। এই হেদায়াত ও কাশফকেই শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান বলা হয়। এরশাদ হয়েছে-

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين

-এটা মানুষের জন্যে বর্ণনা এবং তাকওয়া বিশিষ্টদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশ।

এখানে হেদায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাকওয়া বিশিষ্টদের উল্লেখ করা হয়েছে। আবু ইয়াযীদ বলতেন ঃ আলেম সেই ব্যক্তির নাম নয়, যে কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করে নেয়, এর পর যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন মূর্খ কথিত হয়। বরং আলেম তাকে বলা হয়, যে পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে যখন ইচ্ছা পাঠ ও মুখস্থ করা ছাড়া বস্তুনিচয়ের জ্ঞান অর্জন করে নেয়। এরূপ জ্ঞানকেই এলমে রব্বানী বলা হয়। واتينه من لدنا علما (আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে এলম দিয়েছি।) আয়াতে এই এলেমের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা সকল এলেমই তাঁর তরফ থেকে। তফাৎ হচ্ছে, কতক জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে হয়, তাকে 'এলেমে লাদুন্নী' বলা হয় না। বরং যে এলেম বাইরের কোন অভ্যস্ত কারণ ছাড়াই অন্তরে উপস্থিত হয়, তাকেই এলমে লাদুন্নী বলা হয়। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের মধ্য থেকে এখানে কিঞ্চিত উল্লেখ করা হল।

এখন এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বুযুর্গগণের হয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কন্যা আয়েশাকে বললেন ঃ তোমরা দু'ভাই ও দুবোন। অথচ তাঁর পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন এবং পরে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। এখানে তিনি জন্মের পূর্বেই জেনে নেন যে, কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর খোতবার মাঝখানে বলে উঠেন يا سارية الجبل -অর্থাৎ তিনি কাশফের মাধ্যমে জানলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীকে শত্রু সৈন্যরা ধাওয়া করছে। তখনই তিনি মুসলিম বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে সরে যেতে আহ্বান করলেন। তাঁর এই কণ্ঠস্বর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কানে পৌঁছে যাওয়া একটি বড় কারামাত। আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত

ওসমান (রাঃ)-এর খেদমতে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে জনৈকা মহিলাকে পেয়ে আমি তার দিকে তাকালাম এবং তার রূপ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এর পর হযরত ওসমানের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছে আগমন করে এমতাবস্থায় যে, তার চোখে-মুখে যিনার চিহ্ন থাকে। তোমার কি জানা নেই যে, কুদৃষ্টি করা হচ্ছে চোখের যিনা? তুমি তওবা কর। নতুবা তোমাকে সাজা দেব। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরেও ওহী আগমন করে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে জানা যায়। আবু সাঈদ খেরাম বর্ণনা করেন, একবার আমি হেরেম শরীফে গেলাম। সেখানে খেরকা পরিহিত এক ফকীরকে দেখে মনে মনে বললাম ঃ এ ধরনের মানুষই সমাজের উপর বোঝা হয়ে থাকে। ফকীর তৎক্ষণাৎ আমাকে কাছে ডাকল এবং বলল ঃ الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه ঃ

–আল্লাহ তোমাদের মনের কথা জানেন। অতএব সাবধান হয়ে যাও।

এতে আমি মনে মনে এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করলাম। এর পর ফকীর সজোরে বলল ঃ هو الذى يقبل التوبة عن عباده

–তিনি (আল্লাহ) বান্দার তওবা কবুল করেন।

একথা বলে ফকীর আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। যাকারিয়া ইবনে দাউদ রেওয়ায়েত করেন, একবার আবুল আব্বাস ইবনে মসরূক অসুস্থ আবুল ফযল হাশেমীকে দেখতে যান। আবুল ফযল ছিলেন ছাপোষা নিঃস্ব ব্যক্তি। জীবন যাপনের জন্যে বাহ্যিক কোন উপকরণ তার ছিল না। আবুল আব্বাস যখন প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন মনে মনে চিন্তা করলেন, ইয়া আল্লাহ! এ লোকটি কোত্থেকে খাবার সংগ্রহ করে? তৎক্ষণাৎ আবুল ফযল তাকে ডেকে বললেন ঃ খবরদার! কখনও এরূপ অনর্থক কথা চিন্তা করো না। আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য কৃপা অনেক।

আহমদ নকীব বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত শিবলীর খেদমতে গেলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আহমদ, আল্লাহ তাআলা সকলকে পরিচয়ের জন্যে মস্তিষ্ক দান করেছেন। আমি বললাম ঃ হযরত, ব্যাপার কি, একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি এই মুহূর্তে যখন বসা ছিলাম, তখন আমার মনে ধারণা সৃষ্টি হল যে, তুমি কৃপণ। আহমদ বললেন ঃ হযরত, আমি তো কৃপণ নই। এর পর তিনি

চিন্তা করে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তুমি কৃপণ। অতঃপর আমি মনে মনে সংকল্প করলাম- আজ যা কিছু পাব, তা প্রথমে যে ফকীরের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকে দান করে দেব। এমনি সময় এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে পঞ্চাশটি আশরফী দিয়ে গেল। আমি এগুলো নিয়ে সংকল্প অনুযায়ী রাস্তায় বের হলাম। এক জায়গায় দেখলাম, জনৈক অন্ধ ফকীর নাপিতের কাছে মাথা মুণ্ডাচ্ছে। আমি তার কাছে যেয়ে আশরফীগুলো দিতে চাইলে সে বলল ঃ নাপিতকে দিয়ে দাও। আমি নাপিতকে দিতে গেলে বলল ঃ এই ফকীর মাথা মুণ্ডাতে বসেছে অবধি আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন মজুরি গ্রহণ করব না। অগত্যা আমি আশরফীগুলো নদীতে নিক্ষেপ করে বললাম ঃ যে কেউ তোদের ইযযত করে, আল্লাহ্ তাকেই লাঞ্ছিত করেন।

হামযা ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত আবুল খায়রের গৃহে রওয়ানা হলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, তার গৃহে কিছু খাব না। যখন আমি গৃহ থেকে বের হলাম, তখন দেখলাম, তিনি খাদ্যের একটি খাঞ্চা নিয়ে আমার গৃহে আসছেন। তিনি বললেন ঃ নাও, এখন খাও। এটা তো আমার গৃহ নয়। এই বুযুর্গের অনেক প্রসিদ্ধ কারামত আছে। সেমতে ইবরাহীম রকী রেওয়ায়েত করেন, আমি একবার তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন, কিন্তু সূরা ফাতেহাও ভালরূপে পড়তে পারলেন না। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তার কাছে আসা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়েছে। নামাযের পর আমি এস্তেঞ্জার জন্যে বাইরে গেলাম। একটি সিংহ আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি আবুল খায়রের কাছে ফিরে এসে ঘটনা বিবৃত করলে তিনি সেখান থেকেই সিংহকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ কি হে, আমি কি বলিনি, আমার মেহমানদের কোন অসুবিধা করবে না? একথা শুনেই সিংহ সরে গেল। প্রয়োজন সেরে যখন আমি ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার বাহ্যিক দিকটাকে সোজা করেছ। তাই সিংহকে দেখে ভয় পেয়েছ, কিন্তু আমি আমার বাতেন (অভ্যন্তর) ঠিক করেছি। তাই সিংহ আমাকে ভয় করে। এমনি ধরনের আরও অসংখ্য কাহিনী থেকে মাশায়েখের অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের মনের কথা জানা এবং তাদের অন্তরের বিশ্বাস বলে দেয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। হাঁ, যে অস্বীকার করে, তার জন্যে এসব কাহিনী যথেষ্ট নয়, কিন্তু দু'টি অকাট্য দলীল আছে, যেগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অভূতপূর্ব সত্য স্বপ্ন, যদ্দারা অবস্থা উন্মোচিত হয়। কেননা, স্বপ্নে যখন অদৃশ্য জগতের অবস্থা ফুটে উঠা সম্ভবপর হয়, তখন জাগ্রত অবস্থায়

এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, স্বপ্নে ইন্দ্রিয় অচল হয়ে থাকে এবং বাহ্যিক অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে লিপ্ত হয় না। এটা প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায়ও সংঘটিত হয়। যেমন কেউ যখন কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকে, তখন না শুনে কোন আওয়ায এবং না দেখে কোন বস্তু।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে অদৃশ্য জগত ও ভবিষ্যত বিষয়াদি সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংবাদ প্রদান করা। কোরআন ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। এটা যখন নবীর জন্যে প্রমাণিত হল, তখন নবী নয় –এমন ব্যক্তির জন্যেও প্রমাণিত হতে পারে। কেননা, নবী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়সমূহের স্বরূপ জেনে নেন এবং সংস্কার কাজে মশগুল থাকেন। অতএব এরূপ কোন ব্যক্তি থাকাও সম্ভব, যিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়সমূহের স্বরূপ জানবেন; কিন্তু সংস্কার কাজে মশগুল থাকবেন না। এরূপ ব্যক্তিকে নবী না বলে ওলী বলা হবে। এখন যে ব্যক্তি নবীগণকে মানবে এবং সত্য স্বপ্নের সত্যায়ন করবে, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, অন্তরের দু'টি দরজা রয়েছে– একটি বহির্জগত অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দিকে এবং অপরটি ঊর্ধ্বজগতের দিকে, একেই বলা হয় এলহাম ও ওহী। এ দু'টি দরজা স্বীকার করে নিলে কেউ একথা বলতে পারবে না যে, এলেম কেবল শিক্ষা ও অভ্যস্ত কারণসমূহের মধ্যেই সীমিত।

কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অন্তরের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার

মানুষের অন্তরে একের পর এক যে সকল প্রভাব আসে, ফলে অন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে, সেগুলোকে 'খাওয়াতির' বলা হয়। খাওয়াতির থেকে প্রবণতা এবং প্রবণতা থেকে সংকল্প, ইচ্ছা ও নিয়ত গতিশীল হয়। খাওয়াতির দু'প্রকার– শুভ ও অশুভ। অশুভ খাওয়াতিরের পরিণতি ক্ষতিকর হয় এবং শুভ খাওয়াতির দ্বারা আখেরাতে উপকার পাওয়া যায়। শুভ খাওয়াতিরকে এলহাম এবং অশুভ খাওয়াতিরকে ওয়াস্ওয়াসা তথা সন্দেহ, শংকা ও কুমন্ত্রণা বলা হয়। শুভ খাওয়াতিরের মূল কারণ ফেরেশতা এবং অশুভ খাওয়াতিরের মূল উদগাতা শয়তান। ফেরেশতা এমন এক মখলুককে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও জ্ঞান পৌঁছানো, সত্য কাশফ, মঙ্গলের ওয়াদা এবং সৎকাজের আদেশ করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে শয়তান এমন এক মখলুক, যার কাজ

এর বিপরীত; অর্থাৎ অনিষ্টের ওয়াদা, অশ্লীল কাজের আদেশ এবং দান খয়রাতের সময় দারিদ্র্যের ভয় দেখানো ইত্যাদি। এ থেকে জানা গেল, কুমন্ত্রণার বিপরীত হচ্ছে এলহাম এবং শয়তানের বিপরীত ফেরেশতা। মানুষের অন্তর সদা-সর্বদা এই শয়তান ও ফেরেশতার টানাহেঁচড়ার মধ্যে অবস্থান করে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

فی القلب لمتان لمة من الملك ایعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم انه من الله سبحانه ولیحمد لله ولمة من العدو ایعاد بالشر وتكذیب بالحق ونهی من الخیر ۔

অন্তরে দু'ধরনের উঠানামা হয়। একটি ফেরেশতার তরফ থেকে। তার কাজ হল মঙ্গলের ওয়াদা প্রদান এবং সত্য বিষয়কে সত্য জানা। যে এটা অনুভব করে, তার জানা উচিত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অপর উঠানামা শত্রু অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে। তার কাজ হল অনিষ্টের ওয়াদা দেয়া এবং সত্যকে মিথ্যা মনে করা। যে এটা অনুভব করে, সে যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে।

এর পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ الشیطن یعدكم الفقر ویامر بالفحشاء শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ ইচ্ছা অন্তরের চারপাশে ঘুরাফেরা করে। এক প্রকার ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এক প্রকার শত্রুর পক্ষ থেকে। অতএব আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে ইচ্ছা করার সময় বিরাম দেয়। যদি ইচ্ছাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানে, তবে তা কার্যকর করে। আর যদি শত্রুর পক্ষ থেকে জানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করে। অন্তরের এই টানাহেঁচড়ার প্রতি নিম্নোক্ত হাদীসে ইশারা করা হয়েছে– قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দু'অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থান করে।

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র যে, তাঁর অস্থি ও রক্তমাংসে গঠিত অঙ্গুলি হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যেমন অঙ্গুলি দ্বারা দ্রুত কাজ করে এবং অপরের দ্রুততাকে অঙ্গুলি হেলিয়ে ব্যক্ত করে, তেমনি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ও শয়তানকে কাজে লাগান।

এরা উভয়ই অন্তর পরিবর্তনে মানুষের অঙ্গুলির মতই।

জন্মগতভাবেই অন্তরের মধ্যে ফেরেশতার প্রভাব ও শয়তানের প্রভাব কবুল করার যোগ্যতা সমান সমান। একটির অগ্রাধিকার অপরটির উপর নেই। হাঁ, কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিরোধিতার মাধ্যমে একটি অপরটির উপর প্রবল হয়ে যায়। অর্থাৎ, মানুষ যদি কাম ও ক্রোধের দাবী অনুযায়ী কাজ করে, তবে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে যায়। তখন তার অন্তর শয়তানের আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা হয়ে যায়। কেননা, কামপ্রবৃত্তিই শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যদি কেউ কামপ্রবৃত্তিকে পরাভূত করে ফেরেশতাসুলভ চরিত্র অবলম্বন করে, তবে তার অন্তর ফেরেশতাদের মনযিল ও বাসস্থান হয়ে যায়। যেহেতু মানুষের অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সকল প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, তাই প্রত্যেক অন্তরে শয়তানেরও কুমন্ত্রণা দেয়ার অবকাশ আছে। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

ما منكم من احد الا وله شيطانة قالوا وانت يا رسول الله
قال وانا الا ان الله عافنى عليه فاسلم ولايامر الا بخير .

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেরই একটি শয়তান আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনারও হে আল্লাহর রসূল? উত্তর হল ঃ আমারও, কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে ভাল ছাড়া মন্দ আদেশ দেয় না।

বলাবাহুল্য, কামপ্রবৃত্তির মাধ্যমেই শয়তান অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। অতএব আল্লাহ তাআলা যার প্রতি কৃপা করেন কামপ্রবৃত্তিকে তার এমন অনুগত করে দেন যে, উপযুক্ত সীমা ছাড়া তা প্রকাশ পায় না, তার কামপ্রবৃত্তি তাকে অনিষ্টের দিকে আহ্বান করে না, বরং শয়তান তাকে মঙ্গলের কথা ছাড়া কিছু বলে না। অন্তর যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তখন শয়তান সুযোগ পায় না এবং চলে যায়। এ সময় ফেরেশতা তার কাজ করে। অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তানের লশকরদের দ্বন্দ্ব সব সময় লেগেই থাকে, যে পর্যন্ত অন্তর এক লশকরের অনুগত না হয়ে যায়। যে লশকর বিজয়ী হয়, অন্তর তারই আবাসস্থল হয়ে যায়। অপর লশকরের আগমন হলেও তা সংঘর্ষের আকারে হয়ে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ অন্তরের অবস্থা হচ্ছে, শয়তানের লশকর তাদেরকে বিজিত ও বশীভূত করে নিয়েছে এবং তাদের মালিক হয়ে বসেছে। এরূপ

অন্তর কুমন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। তারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছে। শয়তানের জোর কম না হওয়া পর্যন্ত এসব অন্তর ফেরেশতার বশীভূত হবে না। শয়তানের জোর কম করার উপায় হচ্ছে, কামপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী থেকে অন্তরকে খালি করা এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা তা পূর্ণ করা। এভাবেই ফেরেশতার প্রভাব অন্তরে নেমে আসে। জাবের ইবনে ওবায়দা আদভী বলেন ঃ আমি আলা ইবনে যিয়াদকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এটা ঠিক এমন, যেমন এক গৃহে চোর প্রবেশ করল। যদি গৃহে কিছু থাকে, তবে চোর মরিয়া হয়ে তা নিয়ে যাবে। আর যদি কিছু না থাকে, তবে খালি হাতেই চলে যাবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অন্তর কামপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী থেকে খালি থাকে, তাতে শয়তান প্রবেশ করে না, করলেও খালি হাতে ফিরে যায়। এ কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ

ان عبادی لیس لك علیهم سلطن -

অর্থাৎ, (হে শয়তান!) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে যেন আল্লাহ্র বান্দা নয়। তাকে খেয়ালখুশীর বান্দা বলা দরকার। সেমতে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– افرأيت من اتخذ الهه هواه দেখ তো, যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশীকে উপাস্য করে নিয়েছে।

এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, খেয়ালখুশীর অনুসরণকারী খেয়ালখুশীর বান্দা। এরূপ ব্যক্তির উপরই আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিজয়ী করে দেন। শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ হাদীসে আল্লাহর যিকিরই উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবনুল আস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! শয়তান আমার মধ্যে ও আমার নামাযের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। অর্থাৎ নামায ও কেরাআতের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا -

অর্থাৎ, এই শয়তানকে খানযাব বলা হয়। তুমি যখন একে অনুভব কর, তখন 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর।

আমর ইবনে আস বলেন ঃ আমি এই এরশাদ অনুযায়ী আমল করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেলাম। অনুরূপভাবে এক হাদীসে বলা হয়েছে–

ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعذ بالله منه ـ

অর্থাৎ, ওযুর মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্যে ওলহান নামক এক শয়তান আছে, এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শয়তান বিদূরিত হওয়ার একটি চমৎকার কারণ আছে, তা হচ্ছে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অন্তর থেকে তখনই দূর হবে, যখন এই কুমন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় অন্তরে উপস্থিত থাকে। কেননা, যিকির যখন অন্তরে স্থান লাভ করবে, তখন এর পূর্বে অন্তরে যা ছিল, তা তাতে থাকবে না। সুতরাং মনকে অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত করলে শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হতে পারে। তবে অন্য বিষয়েও কুমন্ত্রণা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, কিন্তু আল্লাহ্র যিকির ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থিতিতে শয়তানের সাধ্য নেই যে, অন্তরের ধারে-কাছে আসে, কিন্তু শয়তানকে দূর করার ক্ষমতা তাদেরই আছে, যারা মুত্তাকী এবং প্রায়ই যিকিরে মশগুল থাকে। এরূপ লোকদের কাছে অসতর্ক মুহূর্তে শয়তান এলেও গোপনে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذا هم مبصرون ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা শয়তানের স্পর্শ পেয়েই সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। من شر الوسواس الخناس আয়াতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ শয়তান অন্তরে ছড়িয়ে থাকে। যখন অন্তর আল্লাহর যিকির করে, তখন সে কষ্টে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর পর অন্তর গাফেল হয়ে গেলে শয়তান আবার ছড়িয়ে পড়ে। যিকির ও কুমন্ত্রণা আলো ও অন্ধকারের মত একটি অপরটির বিপরীত। এই বৈপরীত্যের কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ استحوذ عليهم الشيطن فانسهم ذكر الله শয়তান তাদের কাবু করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن ادم فان هو ذكر

الله اختس وان نسى الله تعالى التقم قلبه ـ

অর্থাৎ, শয়তান তার শুঁড় মানুষের অন্তরের উপর স্থাপন করে । যদি মানুষ আল্লাহর যিকির করে, তবে সে সরে যায়। আর যদি আল্লাহকে ভুলে যায়, তবে শয়তান তার অন্তর গ্রাস করে নেয়।

ইবনে আওযা রেওয়ায়েত করেন, মানুষ যখন চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেও তওবা করে না, তখন শয়তান খুশী হয়ে তার মুখে হাত বুলিয়ে বলে ঃ এ চেহারাটি সাফল্য লাভ করবে না।

মোট কথা, কামপ্রবৃত্তির মানুষের রক্ত-মাংসে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। ফলে শয়তানের রাজত্বও তার রক্ত-মাংসের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং অন্তরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে–

ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا المجارى بالجوع ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্ত চলার পথে চলাচল করে। অতএব তোমরা ক্ষুধার সাহায্যে তার চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দাও।

এরূপ বলার কারণ হচ্ছে, ক্ষুধার কারণে কামপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে শয়তানের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। অন্তর যে চতুর্দিক থেকে কামপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত–

لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ـ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তোমার সরল পথে বসে থাকব, এর পর তাদের কাছে আসব সামনে থেকে, পশ্চাৎ থেকে এবং ডান ও বাম দিক থেকে।

নিম্নোক্ত হাদীসেও এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে–

ان الشيطان قعد لابن ادم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقال اتسلم ونترك دين ابائك فعصاه اسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال اتترك ارضك وسماءك فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد للمجاهد فقال هو تلف النفس والمال تقاتل

فتقتل فتنكح نساءك وتقسم مالك فعصاه وجاهد -

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের কয়েকটি পথে বসে। সে ইসলামের পথে বসে এবং বলে ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করে পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেবে? মানুষ তার কথা না মেনে মুসলমান হয়ে যায়। এর পর শয়তান হিজরতের পথে বসে এবং বলে ঃ তুমি কি হিজরত করে মাতৃভূমি ত্যাগ করবে? মানুষ একথা মানে না এবং হিজরত করে। এর পর শয়তান জেহাদের পথে বসে এবং বলে ঃ যুদ্ধ করার মানে তো জান ও মাল বিনষ্ট করা । তুমি যুদ্ধ করলে নিহত হবে। মানুষ তাও মানে না এবং জেহাদ করে।

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে শয়তানের কথা অমান্য করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুমন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ কুমন্ত্রণা মনের এমন কিছু কল্পনা, যেমন জেহাদকারী ভাবতে থাকে, আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী অপরের বিবাহিত হয়ে যাবে। এ ধরনের কল্পনার আসল কারণ শয়তান। এই শয়তান থেকে মানুষের পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার আদেশ অমান্য করাই উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শয়তান কি বস্তু, সূক্ষ্ম শরীরী কিনা? শরীরী হয়ে মানবদেহে কিরূপে প্রবেশ করে? এ ধরনের প্রশ্ন ঠিক এমন, যেমন কারও কাপড়-চোপড়ে সাপ ঢুকে গেলে সে সাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপায় চিন্তা করে না; বরং প্রশ্ন করতে থাকে, সাপের রঙ ও আকৃতি কিরূপ এবং দৈর্ঘ প্রস্থ কি? এরূপ প্রশ্ন নিছক মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দুশমন তথা শয়তানের অস্তিত্ব তো নিশ্চিতরূপেই জানা গেল। এখন চেষ্টা করা উচিত যাতে এই দুশমন ক্ষতি সাধন করতে না পারে। এ উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা কেরআন পাকে অধিকাংশ স্থানে এরশাদ করেছেন, মানুষ শয়তানকে বিশ্বাস করে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করুক। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ان الشيطن لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحب السعير -

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তাকে দুশমনরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যাতে তারা জাহান্নামী হয়ে যায়।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

الم اعهد اليكم يبنى ادم ان لاتعبدوا الشيطن انه لكم عدو مبين -

অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের আরাধনা করো না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অতএব, এ দুশমন থেকে বেঁচে থাকাই মানুষের কর্তব্য। এটা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তার বংশ কি এবং বাসস্থান কোথায়? হাঁ, জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে, এই দুশমনের হাতিয়ার কি কি? উপরে বর্ণিত হয়েছে, শয়তানের হাতিয়ার হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি। আলেমদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট, কিন্তু তার সত্তাকে চেনা এবং ফেরেশতাদের স্বরূপ জানা- এটা আরেফ তথা বিভুজ্ঞানীদের বিষয়, যারা কাশফে ডুবে থাকে।

এখানে জানা দরকার, অন্তরে যে সকল খেয়াল জাগে, সেগুলো তিন প্রকার। এক, যে খেয়াল নিশ্চিতরূপেই কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। এগুলো যে এলহাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই, যে খেয়াল নিশ্চিতরূপেই অনিষ্টের দিকে আহ্বান করে। এগুলো যে কুমন্ত্রণা, তাতে কারও দ্বিমত নেই। তিন, যে খেয়াল মাঝামাঝি। এগুলো ফেরেশতার পক্ষ থেকে, না শয়তানের পক্ষ থেকে, তা জানা যায় না। এতে খুব ধোকা হয় এবং পার্থক্য করা খুব কঠিন। কেননা, কিছু সৎকর্মপরায়ণ লোককে শয়তান প্রকাশ্যভাবে অনিষ্টের দিকে আহ্বান করতে পারে না; বরং অনিষ্টকে কল্যাণের আকৃতি দিয়ে তাদের সামনে পেশ করে। এতে অধিকাংশ লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ শয়তান আলেমকে উপদেশের ভঙ্গিতে বলে ঃ সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখ। সকলেই মূর্খতায় গ্রেফতার, গাফলতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং দোযখের কিনারায় দণ্ডায়মান। তাদের প্রতি রহম করে তাদেরকে সর্বনাশ থেকে বাঁচানো উচিত এবং ওয়ায-নসীহত করা দরকার। আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এলেমের নেয়ামত, উজ্জ্বল মন-মস্তিষ্ক, চিত্তাকর্ষক বাগ্মিতা এবং সুললিত কণ্ঠস্বর দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। এমতাবস্থায় তুমি আল্লাহর নাশোকরী কিরূপে করতে পার এবং জ্ঞান প্রচারে বিরত হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হবে কিরূপে? ওয়ায নসীহত করে মানুষকে সৎপথে আনা দরকার। শয়তান এমনিভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে কৌশলে আলেম ব্যক্তিকে ওয়ায করতে সম্মত করে। এর পর তার মনে এই ধারণ সৃষ্টি করে দেয় যে,

উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে মিষ্ট ভাষায় ওয়ায না করলে তোমার কথাবার্তা মনে প্রভাব বিস্তার করবে না এবং কেউ সৎপথ পাবে না। সে আলেম ব্যক্তির সামনে হরহামেশা এমনি ধরনের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। অথচ এতে তার মূল উদ্দেশ্য থাকে এই আলেমকে রিয়াতে লিপ্ত করে দেয়া, যাতে তার মধ্যে সম্মানপ্রাপ্তি, খাদেমের আধিক্য, জ্ঞান ও যশের অহংকার এবং অপরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস গড়ে উঠে। সে প্রকাশ্যে শুভেচ্ছার কথা বলে; কিন্তু বাস্তবে আলেম বেচারার সর্বনাশের ফিকির করে। এরূপ আলেমের প্রতি ইশারা করে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان الله ليويد هذا الدين بقوم لاخلاق لهم - وان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই ধর্মকে এমন লোকদের দ্বারা শক্তিশালী করবেন, যারা বেশী দ্বীনদার হবে না। আল্লাহ্ পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারা এই ধর্মকে জোরদার করবেন।

একবার বিতাড়িত শয়তান হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামনে এসে আরজ করল ঃ বল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ এই কালেমা সঠিক, কিন্তু তোর কথায় আমি এটা উচ্চারণ করব না। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শয়তান শুভেচ্ছার ভিতর দিয়েও প্রতারণা করে। শয়তানের এ ধরনের শঠতা গণনাতীত। এসব প্রতারণার কারণে তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, যারা কেবল বাহ্যিক অনিষ্টকেই অনিষ্ট মনে করে এবং শুধু প্রকাশ্য গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। এ খণ্ডের শেষভাগে আমরা শয়তানের কিছু প্রতারণা লিপিবদ্ধ করব। সময় পেলে সম্ভবত এই বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কে একটি কিতাবই লেখে তার নাম রাখব 'তালবীসে ইবলীস' (ইবলীসের বিভ্রান্তি)। কেননা, আজকাল শয়তানের প্রতারণা মানুষের মধ্যে বিশেষত মাযহাব ও আকীদাসমূহের মধ্যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ, মানুষ শয়তানের ধোকাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়।

অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, অন্তরে যে ইচ্ছা আসে তাতে বিরতি ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জেনে নেবে যে, এটা ফেরেশতার পক্ষ থেকে, না শয়তানের পক্ষ থেকে? এটা তাকওয়ার নূর, পর্যাপ্ত এলেম ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া জানা যায় না। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذان

هم مبصرون -

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকওয়ার অধিকারীরা শয়তানের স্পর্শ পাওয়ার সময় এলেমের নূর কাজে লাগায়। ফলে তাদের খটকা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাকওয়ার অধিকারী নয়, কামপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে সে শয়তানের ধোকায় বিশ্বাস করে নেয় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় প্রকাশ পেল, যা তারা ধারণাও করত না। অর্থাৎ, তারা তাদের যে সকল আমলকে পুণ্য কাজ মনে করত, সবগুলো পাপকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এলমে মুয়ামালায় সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিষয় হচ্ছে নফ্‌স ও শয়তানের প্রতারণাকে জানা। এটা প্রত্যেক বান্দার উপর ফরযে আইন, কিন্তু মানুষ এ থেকে গাফেল হয়ে এমন এলেমের মধ্যে মশগুল হয়েছে, যদ্দ্বারা কুমন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এবং শয়তান প্রবল হয়।

অধিক কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে অন্তরে প্রবণতা আসার দরজা বন্ধ করে দেয়া। এই দরজা হচ্ছে বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরীণ কামপ্রবৃত্তি ও সাংসারিক সম্পর্ক। অন্ধকার গৃহে বসে থাকলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বন্ধ হয়ে যায়। আর পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ থেকে আলাদা হয়ে অভ্যন্তরীণ কুমন্ত্রণা বন্ধ হয় গেলে। এ পর্যায়ে কেবল তখল্লী তথা নির্জনতার পথ খোলা থাকবে, যা সর্বদা অন্তরে অব্যাহত থাকে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকির ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু শয়তান অন্তরকে সেখানেও ছাড়ে না এবং আল্লাহর যিকির বিস্মৃত করতে থাকে। এমতাবস্থায় মোজাহাদা তথা সাধনা করা উচিত। মৃত্যু দ্বারা এই সাধনা চূড়ান্ত হয়। কেননা, মানুষ যে পর্যন্ত জীবন্ত থাকে, শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তবে সাধনার বলে শয়তানের আনুগত্য থেকে মুক্ত এবং তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু দেহে রক্ত থাকা পর্যন্ত এই সাধনা জরুরী। কেননা, শয়তানের দ্বার সারা জীবন মানুষের সামনে খোলা থাকে, কখনও বন্ধ হয় না। এই দ্বার হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। দ্বার যখন উন্মুক্ত এবং শত্রুও সজাগ, তখন সাধনা ছাড়া কাজ হবে না।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ হে আবু সাঈদ! শয়তান নিদ্রামগ্ন হয় কি? তিনি বললেন ঃ যদি সে নিদ্রামগ্ন হত, তবে আমরা শান্তি পেতাম। সারকথা, মুমিন বান্দা শয়তান থেকে মুক্তি পায় না।

তবে তার জোর হ্রাস করতে পারে। হাদীসে আছে ঃ

ان المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى احدكم بعيره فى سفره -

অর্থাৎ, তোমরা যেমন উটকে সফরে শীর্ণ করে দাও, তেমনি ঈমানদার ব্যক্তি শয়তানকে শীর্ণ করতে পারে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনের শয়তান ক্ষীণ হয়ে থাকে। কায়েস ইবনে হাজ্জাজ বলেন, আমার শয়তান একদিন আমাকে বলতে লাগল ঃ আমি তোমার কাছে উটের মত সবল ও শক্তিশালী এসেছিলাম। এখন তালপাতার সেপাই হয়ে গেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কিরূপে? সে বলল ঃ তুমি আল্লাহর যিকির দ্বারা আমাকে শীর্ণ করে দিচ্ছ।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, যারা তাকওয়ার অধিকারী, তাদের সামনে বাহ্যিক শয়তানী দরজা বন্ধ হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু শয়তানী চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে তাদেরও পদস্খলন ঘটে যায়। কেননা, এসব চক্রান্ত দ্রুত জানা যায় না। যেমন আমরা আলেমদের সাথে চক্রান্তের একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করেছি। ব্যাপারটি আরও কঠিন এজন্যে যে, অন্তরের সামনে শয়তানের যেসব দরজা খোলা রয়েছে, সেগুলো অনেক। আর ফেরেশতাদের দরজা মাত্র একটি। এই একটি মাত্র দরজা সবগুলো দরজার মধ্যে সন্দিগ্ধ হয়ে গেছে। এসব দরজার মধ্যে বান্দার অবস্থা এমন, যেমন কোন মুসাফির অন্ধকার রাতে কোন জঙ্গলে দণ্ডায়মান। সেই জঙ্গলে অনেকগুলো দুর্গম পথ রয়েছে। এমতাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি দুই উপায়ে সঠিক পথ জানতে পারে— অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান দ্বারা অথবা সূর্যের আলো দ্বারা। অতএব এসব দরজা জানার ব্যাপারে মুত্তাকীর অন্তর দিব্যদৃষ্টি ও জ্ঞানের স্থলে রয়েছে এবং কোরআন ও সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞান হচ্ছে সূর্যালোকের মত। এ দু'উপায়ে অবশ্যই সঠিক পথ জানা যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে মাটির একটি রেখা টানলেন, এর পর বললেন ঃ এটা আল্লাহর পথ। অতঃপর এই রেখার ডানে ও বামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ঃ এগুলো শয়তানের পথ। প্রত্যেক পথে একটি শয়তান দাঁড়িয়ে মানুষকে তার দিকে ডাকছে। এর পর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ـ

অর্থাৎ, এটা হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অনেক পথে চলো না।

তিনি ডান ও বাম দিকের রেখাগুলোকেই 'অনেক পথ' বললেন। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়তানের পথ যে অনেক একথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা তার একটি সূক্ষ্ম পথের দৃষ্টান্তও লিপিবদ্ধ করেছি, যে পথে সে আলেম ও আবেদদেরকে পরিচালনা করে। অথচ এরা তাদের কামপ্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম এবং প্রকাশ্য গোনাহেও লিপ্ত হয় না। এখন আমরা একটি সুস্পষ্ট পথের উল্লেখ করতে চাই। মানুষ কারণে অকারণে এ পথে চলতে শুরু করে।

ঘটনাটি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে জনৈক সংসারত্যাগী দরবেশ ছিল। তাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শয়তান এক কৌশল অবলম্বন করে। সে এক বালিকার গলা টিপে দেয় এবং তার পরিবারের লোকজনের মনে একথা জাগ্রত করে দেয় যে, এর চিকিৎসা অমুক দরবেশের কাছে আছে। সেমতে তারা বালিকাকে দরবেশের কাছে নিয় গেল। দরবেশ প্রথমে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করল, কিন্তু তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে সম্মত হল। তারা বালিকাকে দরবেশের কাছে রেখে গেল। এর পর শয়তান এসে দরবেশকে বালিকার সাথে অপকর্ম করতে প্রলুব্ধ করল। দরবেশ আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত শয়তানের প্রতারণার সামনে টিকে থাকতে পারল না। সে অপকর্ম করে বসল। ফলে বালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। তখন শয়তান এসে তার মনে একথা সৃষ্টি করল যে, এখন তো তোর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। পরিবারের লোকজন আসবে। সে তাদেরকে মুখ দেখাবে কি করে? সুতরাং তাকে হত্যা করে দাফন করে দেয়াই উত্তম। কেউ জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দেবে, অসুখে মারা গেছে। দরবেশ তাই করল। এর পর শয়তান বালিকার আত্মীয়দের কাছে যেয়ে তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, দরবেশ বালিকার সাথে এমন এমন করেছে এবং হত্যা করে দাফন করে দিয়েছে। আত্মীয়রা দরবেশের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। দরবেশ সন্তোষজনক জওয়াব দিতে না পারায় তারা তাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার জন্যে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তখন শয়তান দরবেশের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলল ঃ এগুলো সব আমার কাজ। এখন যদি আমার কথা মেনে নাও, তবে খুন থেকে রক্ষা পেতে পার। দরবেশ শুধাল ঃ কি

করব, বল। প্রাণ তো বাঁচাতে হবে। শয়তান বলল ঃ আমাকে দুটি সেজদা করলেই তুমি বেঁচে যাবে। দরবেশ অগত্যা দু'টি সেজদা করে নিল। সেজদা করার পর শয়তান বলল ঃ আমি কিছুই করতে পারব না। তুমি কে, তাও আমি জানি না। এ ব্যক্তির অবস্থাই আল্লাহ তাআলা কোরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ

كمثل الشيطن اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك -

অর্থাৎ, শয়তানের উক্তির মত, যখন সে মানুষকে বলল ঃ কুফর কর। যখন মানুষ কুফর করল, তখন শয়তান বলল ঃ আমি তোমা থেকে মুক্ত।

চিন্তা করা উচিত, শয়তান কত বড় প্রতারক! সে দরবেশকে কিভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত করে দিল! দরবেশ তো শুধু চিকিৎসার ব্যাপারে তার কুমন্ত্রণা মেনে নিয়েছিল। এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। শুরুতে দরবেশ এটাই ভেবেছিল যে, চিকিৎসা করা খুবই ভাল কাজ। এ থেকে জানা গেল, শয়তান প্রথমে মনে এমন বিষয় জাগ্রত করে দেয় যে, মানুষ ভাল কাজে উৎসাহী হওয়ার কারণে তাকে ভাল মনে করে, কিন্তু শেষ পরিণতি তার করায়ত্ত থাকে না। এক বিষয় থেকে আরেক বিষয় এমন সৃষ্টি হয়ে যায়, যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভবপর হয় না। হাদীসে আছে ঃ

من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ স্থানের আশেপাশে ঘুরাফেরা করে, সে যে কোন সময় নিষিদ্ধ স্থানের অভ্যন্তরে চলে যেতে পারে।

শয়তানী পথসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ

জানা দরকার, মানুষের অন্তর একটি দুর্গ সদৃশ। দুশমন শয়তান এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একে করতলগত করতে চায়। এখন যদি দুর্গের দ্বারসমূহের হেফাযত করা হয় এবং শয়তানের প্রবেশপথে পাহারা বসানো হয়, তবে অন্তর বিপদ মুক্ত থাকবে, কিন্তু যে ব্যক্তি এর দ্বার সম্পর্কেই অজ্ঞ, সে হেফাযত করতেও অক্ষম। অন্তরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমান বালেগ বান্দার উপর ফরযে আইন। যে কাজ ফরযে আইন আদায় করার উপায় হয়, তাও ওয়াজিব। এ থেকে জানা গেল, শয়তানী পথ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ওয়াজিব। বলাবাহুল্য, এসব পথ হচ্ছে বান্দার অন্তহীন স্বভাব ও অভ্যাস, কিন্তু

আমরা এখানে কয়েকটি বড় বড় পথের পরিচয় তুলে ধরব। যেগুলোতে শয়তানী লশকরসমূহের অধিক ভিড় থাকে।

শয়তানের প্রথম প্রবেশপথ হচ্ছে কাম ও ক্রোধ। কেননা, ক্রোধের কারণে জ্ঞানবুদ্ধি রহিত হয়। জ্ঞানবুদ্ধি স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে শয়তানের হামলা শুরু হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন শয়তান তাকে নিয়ে এমন খেলা করে, যেমন শিশুরা বল নিয়ে খেলা করে। বর্ণিত আছে, ইবলীস হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করল ঃ আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা রসূল করেছেন এবং বাক্যালাপের গৌরব দান করেছেন। আমিও তাঁরই সৃজিত। আমা দ্বারা একটি পাপ হয়ে গেছে। এখন আমি তওবা করতে চাই। তওবা কবুল হওয়ার জন্যে আপনি আল্লাহর কাছে আমার পক্ষ থেকে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) তার প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি যখন তূর পর্বতে গমন করে আল্লাহর সাথে কথা বলার পর প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন রাব্বুল ইযযত এরশাদ করলেন ঃ হে মূসা! অঙ্গীকার পূর্ণ কর। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ইবলীস চায়, তার তওবা কবুল হোক। এরশাদ হল ঃ ইবলীস আদমের কবর সেজদা করলে তার তওবা কবুল হবে। হযরত মূসা (আঃ) ফিরে এসে ইবলীসকে বললেন ঃ তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার আমি পূর্ণ করেছি। আদেশ হয়েছে, আদমের কবর সেজদা করলে তোমার তওবা কবুল হবে। অভিশপ্ত শয়তান একথা শুনে ক্রুদ্ধ হল এবং অহংকার সহকারে বলতে লাগল ঃ আমি জীবদ্দশায় যাকে সেজদা করিনি, মৃত্যুর পর কেন তার কবর সেজদা করতে যাব? কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করেছেন, তাই আমার কাছে আপনার হক আছে। আমি একটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তিনটি ক্ষেত্রে আপনি আমাকে স্মরণ করবেন। এতে আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারব না। এক ঃ ক্রোধের অবস্থায়; কেননা, আমার আত্মা আপনার অন্তরে এবং আমার চোখ আপনার চোখে রয়েছে। দেহের যে যে অংশে রক্ত চলাচল করে, আমি সেখানে চলাচল করি। কাজেই ক্রোধের অবস্থায় আমাকে অবশ্যই স্মরণ করবেন। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন আমি তার নাকে ফুঁ দিয়ে দেই। এর পর আমি কি করি, না করি, সে কিছুই টের পায় না। দুই ঃ যুদ্ধের সারিতে আমাকে স্মরণ করবেন। কেননা, যুদ্ধের সারিতে আমি যোদ্ধাকে তার বাড়ী-ঘর, স্ত্রী ও সন্তানদের কথা স্মরণ করিয়ে দেই; যাতে সে পলায়ন করে। তিন ঃ আরও স্মরণ রাখবেন, বেগানা নারীর কাছে তার মাহরামের অনুপস্থিতিতে কখনও বসবেন না।

কারণ, তখন আমি আপনার ও তার মধ্যে পয়গামবাহক হয়ে যাই, যাতে উভয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়। মোট কথা, ইবলীস এতে কামপ্রবৃত্তি, ক্রোধ ও লোভের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কেননা, আদমকে মৃত্যুর পর সেজদা না করার কারণ ছিল প্রতিহিংসা এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার কারণ হয় দুনিয়ার লোভ। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বড় বড় প্রবেশপথ।

অনুরূপভাবে জনৈক ওলী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইবলীসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মানুষের মনের উপর তুমি কখন প্রবল হও? ইবলীস জওয়াব দিল ঃ ক্রোধ ও খাহেশের সময় আমি তাকে চেপে ধরি। কথিত আছে, শয়তান বলে– মানুষ আমার উপর কোনরূপেই প্রবল হতে পারে না। কেননা, সে যখন হাস্যরত ও আনন্দিত থাকে, তখন আমি তার অন্তরে থাকি আর যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন উড়ে তার মাথায় পৌঁছে যাই।

শয়তানের দ্বিতীয় বড় প্রবেশপথ হচ্ছে হিংসা ও মোহ। এই মোহ মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। হাদীসে আছে ঃ حبك الشئ يعمى ويصم বস্তুর মহব্বত ও মোহ তোমাকে অন্ধ এবং বধির করে দেয়। হিংসা ও মোহের কারণে যখন জ্ঞানের আলো বিদূরিত হয়ে যায়, তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখনই শয়তান সুযোগ পায় এবং মোহের বস্তুকে তার দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশ্রী করে দেখায়, যদিও তা বাস্তবে কুশ্রী হয়। হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকায় সওয়ার হন, তখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর একটি করে জোড়া তাতে তুলে নেন। নৌকার মধ্যে তিনি জনৈক অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নৌকায় সওয়ার হলে কেন? সে আরজ করল ঃ আপনার সঙ্গীদের অন্তর নিতে এসেছি। তাদের দেহ আপনার সাথে থাকবে আর অন্তর আমার সাথে। হযরত নূহ (আঃ) বললেন ঃ তুমি তো আল্লাহর দুশমন বিতাড়িত শয়তান। বের হয়ে যাও এখান থেকে। সে আরজ করল ঃ পাঁচটি বিষয় দ্বারা আমি মানুষের সর্বনাশ করব। তন্মধ্যে তিনটি আপনাকে বলে দেব– দু'টি বলব না। ইতিমধ্যে ওহী এল, যে তিনটি বিষয় সে আপনাকে বলতে চায়, সেগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। সে দুটি বিষয় জিজ্ঞেস করুন, যেগুলো সে গোপন করতে চায়। তিনি দুটি বিষয় জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল ঃ দু'টি বিষয় হচ্ছে হিংসা ও লোভ। এ দুটি বিষয় কখনও আমাকে ধোকা দেয় না এবং মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ভুল করে না। হিংসা তো এমন বিষয়, যদ্দারা আমি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান হয়েছি। আর লোভ এমন জিনিস যে, আদমের জন্যে একটি বৃক্ষ ছাড়া গোটা

জান্নাত বৈধ হয়েছিল; কিন্তু আমি লোভের সাহায্যেই কার্য সিদ্ধ করেছি এবং আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছি।

শয়তানের প্রধান প্রধান প্রবেশপথসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে উদরপূর্তি করে আহার করা– যদিও তা হালাল এবং পবিত্র আহার্য বস্তু দ্বারা হয়। কেননা, উদরপূর্তির কারণে কামভাব সতেজ হয়। কামভাব শয়তানের হাতিয়ার। বর্ণিত আছে, ইবলীস অনেকগুলো ফাঁদ হাতে নিয়ে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ফাঁদ কেন? সে আরজ করল ঃ এগুলো হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি, যদ্দ্বারা আমি মানুষকে কাবু করি। হযরত ইয়াহইয়া শুধালেন ঃ এতে আমার জন্যেও কোন ফাঁদ আছে কি? ইবলীস জওয়াব দিল ঃ হাঁ, আপনি যখন উদরপূর্তি করে আহার করেন, তখন আমি আপনার জন্যে নামায ও যিকির ভারী করে দেই। তিনি আবার শুধালেন ঃ এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি? ইবলীস বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ আমিও শপথ করে বলছি, কখনও উদরপূর্তি করে আহার করব না। শয়তান বলল, ঃ আমিও শপথ করছি, মুসলমানের সাথে কখনও শুভেচ্ছার কথা বলব না। কথিত আছে, পেট ভরে আহার করার কুফল ছয়টি। প্রথম, এতে অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয়, এতে মানুষের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা থাকে না। কেননা, সে সকলকে ভরা পেট মনে করে। তৃতীয়, আল্লাহ তাআলার এবাদত কঠিন হয়ে যায়। চতুর্থ, জ্ঞানের কথাবার্তা শুনে অন্তর নরম হয় না। পঞ্চম, অপরকে উপদেশ দিলে তাতে কারও অন্তর প্রভাবিত হয় না। ষষ্ঠ, উদর রোগব্যাধির আবাসস্থল হয়ে যায়।

শয়তানের আর একটি বড় পথ হচ্ছে সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ ইত্যাদি পছন্দ করা। শয়তান যখন এ বিষয়টি মানুষের মধ্যে প্রবল দেখে, তখন সে সর্বদাই প্ররোচিত করে যে, গৃহ খুব উঁচু ও প্রশস্ত তৈরী করে তার ছাদ ও প্রাচীরসমূহ সজ্জিত করা উচিত। এমনিভাবে পোশাক ও সওয়ারীও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া দরকার। এর পর সারাজীবন এতেই নিয়োজিত রাখে। শয়তান একবার মানুষকে এতে নিয়োজিত দেখলে পুনরায় তার কাছে আসার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কেননা, মানুষের শখ আপনা-আপনি এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে এই কামনা-বাসনা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। এতে পরকালের সর্বনাশ এবং কুফরেরও আশংকা আছে।

শয়তানের অন্যতম প্রবেশপথ হচ্ছে অপরের কাছে লোভ করা। কেননা, অন্তরে লোভ প্রবল হলে শয়তান শিক্ষা দেয় যে, যার কাছে লোভ করা হয়, তার সামনে খুব সাজসজ্জা ও লৌকিকতা প্রকাশ করতে হয়। ফলে তার সামনে এত রিয়া করা হয়, যেন সেই তার মাবুদ ও উপাস্য। তার দৃষ্টিতে প্রিয়পাত্র হওয়ার কৌশল উদ্ভাবনে সে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের স্থলে জেনেশুনে চুপ করে থাকে। হযরত সফওয়ান ইবনে সলীম রেওয়ায়েত করেন, একবার ইবলীস আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালার সামনে এসে বলল ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি– মনে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কিছু শেখার প্রয়োজন আমার নেই। সে বলল ঃ ভাল কথা হলে মনে রাখবে, নতুবা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে। কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে লোভের কোন বস্তু চাইবে না।

কাজেকর্মে তড়িঘড়ি করা এবং দৃঢ়তা বর্জন করাও শয়তানের একটি প্রবেশপথ। হাদীসে বলা হয়েছে–

العجلة من الشيطان والتانى من الله تعالى

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ এবং ধীরে-সুস্থে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

এর কারণ হচ্ছে, কাজকর্ম ভেবেচিন্তে করা উচিত। এর জন্যে বিচার-বিবেচনা ও সময়ের প্রয়োজন। তাড়াহুড়ার মধ্যে এটা সম্ভবপর নয়। তড়িঘড়ির মধ্যে শয়তান মানুষের উপর অনিষ্ট চাপিয়ে দেয়; অথচ মানুষ টেরও পায় না। বর্ণিত আছে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হন, তখন শয়তান ইবলীসের কাছে এসে বলল ঃ আজ সকল মূর্তি উপুড় হয়ে গেছে, ব্যাপার কি? ইবলীস বলল ঃ মনে হয় নতুন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তুমি এখানেই থাক। আমি দেখছি ব্যাপার কি? ইবলীস তখনি ভূপৃষ্ঠে উড়ে গেল; কিন্তু অনেক হন্যে হয়েও কিছু জানতে পারল না। এর পর দেখল, হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশতারা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। ইবলীস তার দলের মধ্যে ফিরে এসে বলল ঃ গতরাত্রে একজন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন। অথচ যে কোন মহিলা গর্ভবতী হয় অথবা সন্তান প্রসব করে, আমি সেখানে উপস্থিত থাকি, কিন্তু এই শিশুর জন্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। মনে হয় আজ থেকে মূর্তিপূজার আসর তেমন জমবে না। কাজেই তোমরা তড়িঘড়ির সময় মানুষকে বিভ্রান্ত কর।

শয়তানের আরেকটি বড় পথ হচ্ছে টাকা-পয়সা, আসবাবপত্র, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি। এসব বস্তু যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তখন এগুলোর উপর শয়তানের পাহারা বসে। কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাতে যদি অতিরিক্ত একশ' করে টাকা এসে যায়, তবে তার মনে দশটি এমন খাহেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, যার প্রত্যেকটি পূর্ণ করার জন্যে একশ' টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে তার কাছে যে পরিমাণ টাকা থাকে, তা দ্বারা কার্যোদ্ধার হয় না; বরং আরও নয়শ' টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ যখন একশ' টাকাও ছিল না, তখন সে সচ্ছল ও পরাঙ্মুখ ছিল। সে কেবল মনে করে, একশ' টাকা পেয়ে ধনী হয়ে গেছে; কিন্তু এটা বুঝে না যে, একশ' টাকা পাওয়ার কারণে আরও নয়শ' টাকার অভাবে পড়ে গেছে। এমনিভাবে অধিকতর বস্তুর চিন্তা করতে করতে পরিণামে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়।

হযরত সাবেত বানানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন রসূলে করীম (সাঃ) রেসালতপ্রাপ্ত হন, তখন ইবলীস তার সাঙ্গপাঙ্গকে বলল ঃ নতুন কিছু ঘটেছে। খোঁজ কর। অমনি শয়তানের দল এদিক-ওদিক ছুটে গেল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। ইবলীস বলল ঃ তোমরা এখানে থাক। আমি খবর আনছি। এর পর সে খবর আনল, আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পয়গম্বর করেছেন। এখন তোমরা তাঁর অনুচরদের খবর নাও। শয়তানের দল নিরাশ হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ এমন লোক আমরা কখনও দেখিনি। যদি আমরা তাদের দ্বারা কোন গোনাহ করিয়ে নেই, তারা অমনি নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে তাঁদের সকল গোনাহ্ মিটে যায়। ইবলীস বলল ঃ অধীর হয়ো না; কিছু দিন অপেক্ষা কর। যখন তারা দেশ-বিদেশ জয় করবে এবং দুনিয়া তাদের হাতে আসবে, তখন আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে।

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ঈসা (আঃ) একটি প্রস্তরখণ্ড মাথার নীচে রেখে দেন। ইবলীস তাঁর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে লাগল ঃ হযরত, আপনিও দেখা যায় দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তরখণ্ডটি দূরে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটা দুনিয়াসহ তোর জন্যই। চিন্তা করলে দেখা যায়, যার কাছে বালিশের জায়গায় পাথর থাকে, তার এতটুকু দুনিয়া তো অর্জিত হয়ে যায়, যদ্দ্বারা শয়তান আঘাত হানতে সক্ষম হয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে উঠে এবং তার নিকটে একটি পাথরও থাকে, তবে শয়তান অবশ্যই তার মনে একথা জাগ্রত করবে যে, এই পাথরে একটু হেলান দিয়ে নেই।

এমতাবস্থায় ঘুমের প্রতি আকর্ষণ হয়ে যাবে। কেননা, কথায় বলে, গাড়ী দেখলে পা ফুলে। যদি কাছে পাথর না থাকত, তবে মনে এই কল্পনা জাগত না এবং ঘুমের প্রতিও আকর্ষণ হত না। এ হচ্ছে পাথরের অবস্থা, কিন্তু যার কাছে বড় বড় বালিশ, তুলতুলে ফরাশ এবং আরাম-আয়েশের সর্বোত্তম উপকরণ রয়েছে, সে আল্লাহর এবাদত করে কি স্বাদ পেতে পারে?

শয়তানের আরেকটি বড় প্রবেশপথ হচ্ছে কৃপণতা ও দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়। এ বিষয়টি মানুষকে সদকা, খয়রাত ইত্যাদি কিছুই করতে দেয় না। বরং ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত করতে ও পুঁতে রাখতে উৎসাহিত করে। এরূপ লোকদের জন্যে কোরআন মজীদে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি উচ্চারিত হয়েছে। খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ শয়তান বলে, মানুষ আমার উপর যতই প্রবল হোক না কেন, তিনটি বিষয়ে আমার অবাধ্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমি যা বলি, সে তাই করে। এক, অন্যায়ভাবে কারও ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। দুই, ধনসম্পদ অযথা ব্যয় করা এবং তিন, যেখানে ব্যয় করা প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় না করা। আবু সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ দারিদ্র্যের ভয় দেখানোর চেয়ে বড় কোন হাতিয়ার শয়তানের কাছে নেই। মানুষ এটা মেনে নিলে অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং সত্য বিষয় থেকে বিরত থাকে। সে কেবল মতলবের কথাই বলে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ করতে থাকে। ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্যে শয়তানের আড্ডা বাজারে উপস্থিত থাকাও কৃপণতা ও লালসার অন্যতম আপদ। হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ ইবলীস পৃথিবীতে অবতরণ করে পরওয়ারদেগারের কাছে আবেদন করল ঃ ইলাহী, তুমি আমাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে আপন রহমত থেকে বিতাড়িত করেছ। এখন আমার থাকার জায়গা কোথায়? আল্লাহ বললেন ঃ হাম্মাম (স্নানাগার) তোর থাকার জায়গা। ইবলীস বলল ঃ আমার জন্য একটি বৈঠকখানাও নির্দেশ করা হোক। এরশাদ হল ঃ বাজার ও চৌরাস্তা তোর বৈঠকখানা। ইবলীস আরজ করল ঃ আমার খোরাক কি হবে? উত্তর হল ঃ যে খাদ্যের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেটাই তোর খোরাক। ইবলীস আরজ করল ঃ আমাকে পানীয় দান করুন। জওয়াব হল ঃ নেশার বস্তু তোর পানীয়। ইবলীস আরজ করল ঃ আমাকে একটি সংবাদ মাধ্যমও প্রদান করা হোক। এরশাদ হল ঃ বাদ্যযন্ত্র তোর সংবাদ মাধ্যম। ইবলীস আরজ করল ঃ আমার শিকার ক্ষেত্র কোন্‌টি হবে?

আল্লাহ বললেন ঃ মহিলারা তোর শিকার ক্ষেত্র।

মত ও পথ সম্পর্কিত বিদ্বেষও শয়তানের একটি বড় প্রবেশপথ। এর সারকথা হচ্ছে, নিজের বিরুদ্ধে মতামত পোষণকারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া ও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা। এই দোষ দ্বারা শয়তান আবেদ ফাসেক উভয়েরই সর্বনাশ করে থাকে। কেননা, অন্যের প্রতি দোষারোপ করা এবং তার কুকীর্তি বর্ণনা করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যখন শয়তান এ প্রবৃত্তিকে মানুষের দৃষ্টিতে হক সাব্যস্ত করে, তখন অন্তরে এর প্রতি মোহ জন্মে যায় এবং মানুষ সর্বপ্রযত্নে এতে আত্মনিয়োগ করে। সে মনে করে, সে ধর্মের খেদমত করছে। অথচ বাস্তবে সে শয়তানের অনুসরণ করে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মহব্বতের ব্যাপারে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; কিন্তু নিজে হারামখোর, মিথ্যাবাদী ও কলহপ্রিয়। তাকে হযরত আবুবকর রাঃ) দেখলে নিজের বড় শত্রু জ্ঞান করতেন। কেননা, তাঁর বন্ধু সেই ব্যক্তি হবে, যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর ভাবাদর্শ মেনে চলে এবং বাজে কথাবার্তা থেকে রসনা সংযত রাখে। যেমন– হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে অনর্থক কথাবার্তা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মুখে কংকর পুরে রাখতেন। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তি তাঁর আদর্শ অনুসরণ না করে কিরূপে তাঁর মহব্বত দাবী করতে পারে? অনুরূপভাবে কোন কোন লোক হযরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বতের ব্যাপারে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অথচ নিজে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এবং হারাম ধসসম্পদ দ্বারা খুব জাঁকজমক প্রকাশ করে। অথচ হযরত আলী (রাঃ) খেলাফত আমলেও এমন বস্ত্র পরিধান করেছেন, যার মূল্য এক টাকার চেয়েও কম ছিল। সুতরাং এমন ব্যক্তির প্রতি তিনি কিরূপে প্রসন্ন হবেন? বরং কেয়ামতের দিন এ ব্যক্তি তাঁর দুশমন হবে।

সারকথা, শয়তানী কল্পনাবিলাসের ফলে এসব লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যে কেউ হযরত আবু বকর ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মহব্বত নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে দোযখের অগ্নি থেকে বেঁচে থাকবে। তারা এ হাদীসটি দেখে না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ اعمل فاني لااغني عنك من الله شيئا নিজে আমল কর। কেননা, আমি আল্লাহর সামনে তোমার কোন উপকার করতে পারব না। তাদের অবস্থাও তদ্রূপ, যারা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ

(রঃ)-এর ব্যাপারে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। অতএব যারা কোন এক ইমামের মাযহাব দাবী করে এবং তাঁর জীবনাদর্শ অবলম্বন করে না, কেয়ামতের দিন সেই ইমামই তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমার মাযহাব তো আমল ছিল– বাগাড়ম্বর ছিল না। তুমি আমার আমলের বিরুদ্ধাচরণ করলে কেন? হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এরশাদ করেন যে, শয়তান বলে, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে যেসকল পাপকর্ম সজ্জিত করেছি, সেগুলোতে তারা আল্লাহর কাছে এস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। এর পর আমি এমন গোনাহ্ গড়ে দিয়েছি, যাতে তারা এস্তেগফার করবে না। তা হচ্ছে মনের খাহেশ, যা ধর্মের কাজ মনে করে করা হয়। অভিশপ্ত শয়তানের এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কেননা, এ ধরনের কাজে মানুষ জানেই না যে, পরিণামে নাফরমানী হচ্ছে। জানলে তারা অবশ্যই এস্তেগফার করত।

শয়তানের আরেকটি বড় কৌশল, মানুষ আপনা আপনি অপরের পারস্পরিক বিরোধ ও কলহের মধ্যে লেগে যায়। সেমতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ একদল লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল। শয়তান চাইল, তারা এখান থেকে প্রস্থান করুক এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক, কিন্তু কিছু করতে না পেরে সে অপর একটি দলের মধ্যে ভিড়ে গেল, যারা সাংসারিক কথাবার্তায় ব্যাপৃত ছিল। সে তাদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে দিল। ফলে খুনখারাবী শুরু হয়ে গেল। এতে প্রথম দল যিকির ভঙ্গ করে চলে গেল এবং তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দিল। এখানে শেষোক্ত দলে খুনখারাবী হোক– এটা শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং প্রথম দলকে স্থানত্যাগে বাধ্য করাই তার লক্ষ্য ছিল।

শয়তানের এক তরীকা হচ্ছে, সে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলী এবং এমন বিষয়সমূহের আলোচনায় জড়িয়ে ফেলে, যা তাদের বোধগম্য নয়। ফলে তারা মূল ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন ধারণা করতে থাকে, যা কুফর ছাড়া কিছু নয়। হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله فاذا وجد احدكم ذالك فليقل امنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه ـ

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে বলে ঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? সে উত্তরে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা। এর পর শয়তান জিজ্ঞেস করে ঃ আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কেউ যখন নিজের মধ্যে এই অবস্থা অনুভব করে, তখন সে বলুক- আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এটা বললে তার এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে।

এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের কুমন্ত্রণার প্রতিকারের আলোচনা করার অনুমতি দেননি। কেননা, এই কুমন্ত্রণা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয়- আলেমদের মনে দেখা দেয় না। সুতরাং জনসাধারণের উচিত ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করে এবাদত ও জীবিকা উপার্জনের কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া। সাধারণ মানুষ যদি যিনা ও চুরি করে, তবে এটা এ ধরনের কুমন্ত্রণার পেছনে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি না জেনে না শুনে আল্লাহ ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলবে, সে অজ্ঞাতেই কাফের হয়ে যাবে। এটা এমন হবে, যেমন কেউ সাঁতার না শিখে উত্তাল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শয়তানের দ্বারসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে অপর মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يايها الذين امنوا اجتنبو كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم -

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছ শুন, তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা করা পাপ।

সুতরাং যে কেউ অপরের প্রতি কুধারণা করবে, শয়তান তাকে তার গীবত করতেও প্ররোচিত করবে। অথবা সে অপরের হক আদায় করবে সম্মান প্রদর্শনে শৈথিল্য করবে এবং তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে। এগুলো সব সর্বনাশা কাজ। এ কারণেই শরীয়তে অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ আছে। হাদীসে আছে اتقوا مواضع التهمة তোমরা অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) অপবাদের স্থান থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ) সফিয়্যা বিনতে হুয়াই থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন ঋতুবতী হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় সেখান থেকে ফিরে আসার জন্যে রওয়ানা

হলে তিনিও আমার সাথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে দু'জন আনসারীর সাথে দেখা হল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করে যেতে লাগল। তিনি তাদেরকে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার স্ত্রী সফিয়্যা– উম্মুল মুমিনীন। তারা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি সুধারণা রাখি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা ঠিক। কিন্তু শয়তান মানুষের সাথে দেহের রক্তের মত মিশে আছে। তাই আমি আশংকা করলাম, কোথাও তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে দেয়। এখানে দেখা উচিত, নবী করীম (সাঃ) উম্মতের প্রতি কতটুকু স্নেহপরায়ণ ছিলেন! তিনি আনসারীদ্বয়কেও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং উম্মতকে অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার পন্থাও শিখিয়ে দিলেন, যাতে কোন বিশিষ্ট আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি অপবাদের ব্যাপারটিকে হালকা মনে না করে এবং আত্মম্ভরিতার কারণে এরূপ ধারণা না করে যে, মানুষ তার প্রতি সুধারণাই পোষণ করবে। কারণ, যত বড় পরহেযগারই হোক না কেন, সকল মানুষ তার সমান ভক্ত হবে না; বরং কেউ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং কেউ অসন্তুষ্ট। যারা সন্তুষ্ট, তারা তার দোষ দেখবে না; কিন্তু অসন্তুষ্টরা দোষ গেয়েই ফিরবে। অতএব কুধারণা ও দুষ্ট লোকদের অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। কেননা, দুষ্টরা সকল মানুষের প্রতি কুধারণা রাখে। সুতরাং যখন এমন কোন লোক দেখা যায়, যে মানুষের প্রতি কুধারণা করে এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে নিজের অন্তরে ভ্রষ্টামি পোষণ করে এবং এই দোষ অন্বেষণ তারই বহিঃপ্রকাশ। কারণ, সে সকলকে নিজের মতই মনে করে। জানা দরকার, দোষ অন্বেষণ মোনাফেকের কাজ। মুমিনের বক্ষ সকল মানুষের তরফ থেকে পরিষ্কার থাকে।

এ পর্যন্ত অন্তরের দিকে শয়তানের প্রবেশপথ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেয়া হল। তার সবগুলো পথ লিপিবদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে জানা উচিত, মানুষের যত মন্দ স্বভাব রয়েছে, সবগুলো শয়তানের হাতিয়ার এবং প্রবেশপথ। এখন প্রশ্ন হয়, শয়তানকে দূরে রাখার উপায় কি এবং তাকে দূরে রাখার জন্যে মুখে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে দেয়া যথেষ্ট কি না? জওয়াব, শয়তানের সকল পথ বন্ধ করে দেয়াই অন্তরকে তার কুপ্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়। অর্থাৎ, অন্তরকে যাবতীয় মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। এর বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এক খণ্ডে কেবল মারাত্মক স্বভাবগুলো বর্ণনা করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যেকটি স্বভাবের জন্যে একটি আলাদা অধ্যায় জরুরী। যেমন

ভবিষ্যতে এর বিশদ বর্ণনা হবে। এখানে এতটুকু বলা জরুরী যে, যখন অন্তর এসব স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তাতে কেবল আনাগোনাই করতে থাকে– স্থায়ীভাবে আসন গাড়ে না। আল্লাহর যিকির এই আনাগোনার পথে বাধা হয়ে যায়। কেননা, অন্তর কুস্বভাব থেকে মুক্ত হলেই যিকির তাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, নতুবা যিকিরও কেবল আনাগোনার পর্যায়ে থেকে যায়। অন্তরের উপর তার কোন ক্ষমতা থাকে না এবং শয়তানকেও দূর করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে শয়তান দূর করার বিষয়টিকে মুত্তাকীদের সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা মুত্তাকী, তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করলে তারা হুঁশিয়ার হয়ে যায়, অতঃপর তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়।

মোট কথা, শয়তানকে ক্ষুধার্ত কুকুরের অনুরূপ মনে করতে হবে। কারও কাছে ভাত, মাংস ইত্যাদি না থাকলে কেবল 'ধ্যাৎ' বললেই সরে যাবে; কিন্তু সামনে খাদ্যসামগ্রী থাকলে ক্ষুধার্ত কুকুর অবশ্যই খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। তখন কেবল 'ধ্যাৎ' বলে কুকুরকে সরানো যাবে না। এমনিভাবে যে অন্তরে শয়তানের খাদ্য নেই, তার কাছ থেকে শয়তান শুধু যিকির দ্বারা সরে যাবে; কিন্তু কামপ্রবৃত্তি প্রবল হলে অন্তর শয়তানের করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর যিকিরকে দূরে সরিয়ে রাখবে। মুত্তাকীদের অন্তর কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত থাকে বিধায় তাতে শয়তানের আগমন কুপ্রবৃত্তির কারণে নয়; বরং গাফলতির কারণে হয়ে থাকে। যখন তাদের অন্তর যিকির থেকে গাফেল থাকে, তখন নিজের পথ বের করে নেয়। পুনরায় আবার যিকির শুরু করলে শয়তান হটে যায়। এর প্রমাণ, আল্লাহ তাআলা শয়তান দূর করার জন্যে বলেছেনঃ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ

অতঃপর আশ্রয় প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে। এমনিভাবে যিকির সম্পর্কিত আরও অনেক আয়াত এবং হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– একবার মুমিনের শয়তান ও কাফেরের শয়তান এক জায়গায় মিলিত হল। কাফেরের শয়তান অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান মসৃণ ও সুন্দর পোশাক

পরিহিত ছিল। অপরপক্ষে মুমিনের শয়তান বিবস্ত্র, শীর্ণ ও ধূলি ধূসরিত ছিল। কাফেরের শয়তান তাকে শুধাল ঃ তুমি এমন শীর্ণ কেন? সে বলল ঃ আমি যার সাথে থাকি, সে পানাহার, বস্ত্র পরিধান এবং মাথায় তেল মালিশ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে। ফলে আমি খানাপানি, বস্ত্র ও তেল পাই না। তাই ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ ও এলোকেশী হয়ে থাকি। একথা শুনে কাফেরের শয়তান বলল ঃ ভাই, আমি যার সাথে থাকি, সে এসব কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। তাই আমি তার সকল কাজে শরীক থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর এই দোয়া করতেন—

اللهم انك سلطت علينا عدوا بصيرا لعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لانراهم اللهم فايسه منى كما ايسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর এক শত্রুকে ক্ষমতা দান করেছেন, যে আমাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সে এবং তার দলবল আমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখে, যেখান থেকে আমরা তাদেরকে দেখি না। হে আল্লাহ! অতএব আপনি তাকে আশা থেকে নিরাশ করুন, যেমন তাকে আপনার রহমত থেকে নিরাশ করেছেন। তাকে আমাদের থেকে হতাশ করুন, যেমন আপনার ক্ষমা থেকে হতাশ করেছেন। তার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যেমন তার মধ্যে ও আপনার রহমতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন ঃ একদিন মসজিদের পথে শয়তানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে চেনেন? আমি বললাম ঃ তুমি কে? সে বলল, আমি ইবলীস। আমি শুধালাম ঃ কি উদ্দেশে এসেছ? সে বলল ঃ আমি চাই আপনি এই দোয়া কাউকে না শেখান। আমি আপনার পথে কণ্টক হব না। আমি বললাম ঃ আমি কাউকে নিষেধ করব না। যে কেউ পড়তে পারে। তোমার মনে যা চায় তাই কর। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেন ঃ এক শয়তান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে নামাযের অবস্থায় আগুনের মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কেরাআত ও এস্তেগফারের পরও সে সরে যেত না। এরপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরচ করলেন ঃ

আপনি এই দোয়া পাঠ করুন–

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِى لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেগুলোর খেলাফ করে না সাধু ও অসাধুরা– সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং পৃথিবী থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং আকাশে উত্থিত হয়, আর দিবারাত্রির ফেতনার অনিষ্ট থেকে এবং দিবারাতে আগত দুর্ঘটনার অনিষ্ট থেকে।

রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করলে শয়তানের মশাল নিভে যায় এবং সে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন, এক শয়তান আপনার সাথে প্রতারণা করতে চায়। আপনি যখন শয্যা গ্রহণ করেন, তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নেবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

لَقَدْ اَتَانِى الشَّيْطٰنُ وَنَازَ عَنِى فَاَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَوَالَّذِى بَعَثَنِى بِالْحَقِّ مَا اَرْسَلْتُهُ حَتّٰى وَجَدْتُّ بَرْدَ مَاءِ لِسَانِهِ عَلٰى يَدِى وَلَوْلَا دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاَصْبَحَ طَرِيْحًا فِى الْمَسْجِدِ -

অর্থাৎ, আমার কাছে শয়তান এসে বাদানুবাদ শুরু করলে আমি তার গলা টিপে ধরলাম। আল্লাহর কসম! আমি তাকে ততক্ষণ ছাড়িনি, যতক্ষণ না তার থুথুর শীতলতা আমার হাতে অনুভব করলাম। যদি আমার ভাই সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে সে মসজিদে ভূতলশায়ী হয়ে থাকত।

আরও বর্ণিত আছে–

مَا سَلَكَ عُمَرُ فَجًا اِلَّا سَلَكَ الشَّيْطٰنُ فَجًا اِلَّذِى سَلَكَ عُمَرُ -

অর্থাৎ, হযরত ওমর যে পথে চলেছেন, সেই পথে শয়তান চলেনি। এর কারণ, তাঁর অন্তর শয়তানের প্রবেশপথ ও খাদ্য থেকে পবিত্র

ছিল অর্থাৎ খাহেশের কোন দখল ছিল না। সুতরাং যদি অন্য কোন ব্যক্তি যিকির দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় শয়তানকে দূরে রাখতে চায়, তবে এটা অসম্ভব। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি ওষুধ সেবন করে কিন্তু পরহেয করে না; অথচ পাকস্থলী দূষিত পদ্দার্থে পরিপূর্ণ। এমতাবস্থায় ওষুধের উপকার আশা করা যায় না। এখানে যিকরকে ওষুধ এবং তাকওয়াকে পরহেয মনে করতে হবে। যে অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত, যিকির দ্বারা সেই অন্তর থেকে শয়তান দূর হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

–নিশ্চয় এতে চিন্তার বিষয় আছে তার জন্যে, যার অন্তর আছে।

সুতরাং যদি কেউ শয়তান থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবে তাকে প্রথমে তাকওয়ার পরহেয অবলম্বন করতে হবে, এরপর যিকিরের ওষুধ সেবন করতে হবে। তাহলেই শয়তান তার কাছ থেকে পলায়ন করবে, যেমন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে পলায়ন করেছিল। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং বাহ্যত শয়তানকে মন্দ বলো না, যখন অন্তরে তুমি তার বন্ধু অর্থাৎ আজ্ঞাবহ। এক আয়াতে বলা হয়েছে– ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ –তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। এই আয়াত অনুযায়ী দোয়া করা হয়, কিন্তু কবুল হয় না। এমনিভাবে আল্লাহর যিকির করার পরও শয়তান দূর হয় না। কেননা, যিকির ও দোয়ার শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করলঃ বলুন, আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন, অথচ আল্লাহ বলেছেন– তোমরা দোয়া কর, আমি কবুল করব? তিনি জওয়াব দিলেন, তোমাদের অন্তর মৃত। প্রশ্ন করা হল ঃ অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আটটি অভ্যাস এর কারণ। ১। তোমরা আল্লাহর হক জেনেও তা পালন কর না। ২। তোমরা কোরআন পাঠ কর, কিন্তু তদনুযায়ী আমল কর না। ৩। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত দাবী কর; কিন্তু তাঁর সুন্নত পালন কর না। ৪। মৃত্যুকে ভয় কর, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। ৫। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে তোমরা শয়তানকে শত্রু মনে কর; কিন্তু তোমরা গোনাহের কাজে তার সাথে মিত্রতা কর। ৬। তোমরা দোযখকে ভয় কর বলে দাবী কর; কিন্তু নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করেছ। ৭। জান্নাতকে মনে প্রাণে কামনা কর; কিন্তু তার জন্যে কোন কাজ কর না। ৮। সকালে ঘুম থেকে উঠেই

নিজের দোষসমূহ পশ্চাতে ফেলে দাও, আর অন্যের দোষ খুঁজতে শুরু কর। এসব কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নারাজ হয়ে গেছেন। কাজেই দোয়া কবুল করবেন কিরূপে?

একই শয়তান মানুষকে বিভিন্ন পাপাচারের প্রতি আহ্বান করে, না আলাদা আলাদা পাপাচারের জন্যে আলাদা আলাদা শয়তান রয়েছে– এ বিষয়টি জানা এলমে মোয়ামালায় মোটেই জরুরী নয়। এখানে জরুরী হচ্ছে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আপন কাজে ব্যস্ত থাকা। কথায় বলে, আম খাও– বৃক্ষ গণনা করো না। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রত্যেক প্রকার গোনাহের জন্যে একটি করে নির্দিষ্ট শয়তান রয়েছে। সেই বিশেষ গোনাহের প্রতি আহ্বান করাই তার কাজ। এই হিসাব অনুযায়ী শয়তানের অসংখ্য দল রয়েছে। কেননা, ঘটনার বিভিন্নতা থেকে কারণের বিভিন্নতা জানা যায়। এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ শয়তানের সন্তান পাঁচটি । তাদের প্রত্যেককে এক এক কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। এক সন্তানের নাম ছিবর। তাকে বিপদাপদের কাজ দেয়া হয়েছে। সুতরাং হা-হুতাশ করা, পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা, বিলাপ করা ইত্যাদি সব তারই প্ররোচনায় হয়ে থাকে। দ্বিতীয় সন্তানের নাম আওয়ার । তার কাজ হচ্ছে যিনার প্রতি উস্কানি দেয়া। তৃতীয় মবসূত, যাকে মিথ্যাচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ ওয়াসেম। সে গৃহে যেয়ে মানুষের সামনে আত্মীয়-স্বজনের দোষত্রুটি পেশ করে এবং তাকে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে । পঞ্চম জলম্বুর। সে বাজারে থাকে এবং সকল প্রকার গোলযোগ সংঘটিত করে। শয়তানের ন্যায় ফেরেশতাদের মধ্যেও প্রাচুর্য রয়েছে। হযরত আবু উমামা বাহেলীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

وكل بالمؤمن ماة وستون ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذبون الذباب من قصعة العسل في اليوم الصائب لو بدأ لكم لرءيتموه على كل سهل وجبل باسطا يده فاعز فاه لو وكل العبد الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين ـ

–মুমিনের উপর একশ' ষাট জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। তারা তার উপর থেকে এমন বিষয় প্রতিহত করে, যার সাধ্য তার নেই। তন্মধ্যে চোখের জন্যে সাত জন ফেরেশতা রয়েছে, যারা এমনভাবে প্রতিহত করে, যেমন গ্রীষ্মকালে মধুর পেয়ালা থেকে মাছি প্রতিহত করা হয়। যাকে প্রতিহত করা হয়, তা যদি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে দেখবে, সে প্রত্যেক নিম্নভূমি ও পাহাড়ের উপর বাহু প্রসারিত এবং মুখ বিস্তৃত করে রয়েছে। যদি মুমিন বান্দাকে এক মুহূর্তের জন্যেও তার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শয়তানরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

আইউব ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেন– আমি জেনেছি, আদম সন্তানের সাথে জিন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে– হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি শয়তানকে আমার শত্রু করে দিয়েছ। এখন তোমার সাহায্য না হলে আমি তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব না। এরশাদ হল ঃ তোমার যে সন্তান হবে, তার উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। তিনি আরজ করলেন ঃ আরও বেশী দান করা হোক। আদেশ হল ঃ যদি কেউ একটি পাপ করে, তবে এক পাপেরই শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পুণ্যের প্রতিদান দশ গুণ থেকে যত বেশী ইচ্ছা আমি দেব। এরপর আরও বেশী সাহায্যের আবেদন করলে আল্লাহ বললেন ঃ যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকবে, তওবার দরজা বন্ধ হবে না। অপর দিকে শয়তান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করল ঃ ইলাহী, তুমি মানুষকে আমা থেকে শ্রেষ্ঠ করেছ। এখন আমাকে সাহায্য করা না হলে আমি কিরূপে বিজয়ী হব? এরশাদ হল ঃ আদমের ঘরে যে সন্তান হবে, তার সাথে সাথে তোরও সন্তান হবে। সে আরজ করল, আরও বেশী সাহায্য দান করা হোক। আদেশ হল ঃ দেহে যেমন রক্ত চলাচল করে, তেমনি তুইও তাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করবি এবং তাদের বক্ষে আসন করে নিবি। শয়তান আরও সাহায্যের আবেদন করলে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ

اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطن الا غرورا .

অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ডেকে

আন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে ওয়াদা দে। শয়তান তাদেরকে প্রবঞ্চনা ছাড়া কোন ওয়াদা দেয় না।

হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وحشاش الارض وصنف فى ظل كالريح فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق الله الانسان ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كما قال الله تعالى لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل وصنف اجسامهم كاجسام بنى ادم وارواحهم ارواح الشياطين ـ

–আল্লাহ তাআলা জিনকে তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী হচ্ছে সর্প, বিচ্ছু ও কীটপতঙ্গ। আরেক শ্রেণী হচ্ছে শূন্যস্থিত বায়ুর ন্যায়। আরেক শ্রেণীর কারণে সওয়াব ও আযাব দেয়া হয়। মানুষকেও আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ নিজে বলেন ঃ তাদের অন্তর আছে, যদ্দ্বারা তারা হৃদয়ঙ্গম করে না; তাদের চক্ষু আছে, যদ্দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে, যদ্দ্বারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং আরও নিকৃষ্ট। আরেক শ্রেণী এমন, যাদের দেহ মানুষের দেহের মত; কিন্তু আত্মা শয়তানদের মত। আরেক শ্রেণী তারা, যারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার ছায়ায় থাকবে। সেদিন আল্লাহ্ তাআলার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া হবে না।

ওহায়ব ইবনুল ওরদ বলেন ঃ শয়তান একবার হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ আমি আপনাকে উপদেশ দিতে চাই। তিনি বললেন ঃ তোর উপদেশের কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আদম সন্তানদের অবস্থা বর্ণনা কর। শয়তান বলল ঃ আমাদের কাছে আদম সন্তানরা তিন ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার তারা, যাদের কাছে আমরা যাই এবং প্ররোচনা দিয়ে বশীভূত করি; কিন্তু তারা এস্তেগফার ও তওবা করতে শুরু করে। ফলে আমাদের জমানো খেলা পণ্ড হয়ে যায়। পুনরায় যদি আমরা কিছু প্রচেষ্টা চালাই, তবে তারা পরেও তাই করে। এ প্রকার মানুষ আমাদের জন্যে খুবই কঠিন। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ আমাদের

হাতে এমন থাকে, যেমন খেলোয়াড়ের হাতে বল থাকে। তাদেরকে আমরা যেদিকে ইচ্ছা পরিচালনা করি। এদের ব্যাপারে আমাদের কোন ভাবনা নেই। তৃতীয় প্রকার তারা, যারা আপনার মত নিষ্পাপ। তাদের উপর আমাদের কোন কারসাজি চলে না।

প্রকাশ থাকে যে, শয়তান আসল আকৃতিতেও দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিভিন্ন আকৃতিতেও। তবে শয়তান সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। ফেরেশতাগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের আসল আকৃতিও আছে। নবুওয়তের নূর দ্বারা তাদের আসল আকৃতি দেখা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈলকে আসল আকৃতিতে মাত্র দু'বার দেখেছিলেন। একবার তিনি স্বয়ং হযরত জিব্রাঈলকে তার আসল আকৃতি দেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। সেমতে জিব্রাঈল হেরা পর্বতে আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। দ্বিতীয়বার মেরাজের রাতে সিদরাতুল মুন্তাহায় তাকে আসল আকৃতিতে দেখেন। এছাড়া অন্যান্য সময় জিব্রাঈল হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে আগমন করেছেন। দেহইয়া কালবী (রাঃ) নেহায়েত সুশ্রী ছিলেন।

অধিকাংশ সময় কাশ্‌ফবিশিষ্ট বুযুর্গগণের সামনে আসল আকৃতির মিছাল তথা নমুনা ভেসে উঠে। উদাহরণতঃ শয়তান জাগ্রত অবস্থায় আকৃতি ধারণ করে তাদের দৃষ্টির সামনে আসে। তখন তারা শয়তানকে দেখেন এবং কথাও শুনেন। বলাবাহুল্য, কাশ্‌ফবিশিষ্ট বুযুর্গগণ জাগ্রত অবস্থায় এমন বিষয় জানতে পারেন, যা অন্যরা কেবল স্বপ্নেই জানতে পারে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই মর্মে দোয়া করে- ইলাহী, আমাকে মানুষের অন্তরের সেই স্থান দেখান- যেখানে শয়তান থাকে। এরপর সে স্বপ্নে দেখল, এক ব্যক্তির দেহ স্বচ্ছ স্ফটিকের মত; অর্থাৎ তার ভিতরের সবকিছু বাইরে থেকে দেখা যায়। শয়তান ব্যাঙের আকৃতিতে তার বাম ঝুটিতে কাঁধ ও কানের মধ্যস্থলে বসে আছে। সে তার চিকন ও লম্বা শুঁড় লোকটির অন্তরে প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকেই কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। লোকটি যখন যিকর করে, তখন শয়তান সরে যায়। এমনি ধরনের ব্যাপার কখনও জাগ্রত অবস্থায় হুবহু দেখা যায়। সেমতে জনৈক কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ দেখেন, শয়তান কুকুরের আকৃতি ধারণ করে মৃতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বান করছে। অর্থাৎ, তিনি দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পান।

যিকিরের সময় কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয় কি না

প্রকাশ থাকে যে, অন্তরের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী আলেমগণের এ বিষয়ে মতামত পাঁচ প্রকার। একদল আলেমের মত হচ্ছে, যিকির দ্বারা কুমন্ত্রণা ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন- فاذا ذكر الله خنس অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান চুপ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলের উক্তি হচ্ছে, মূল কুমন্ত্রণা দূর হয় না- তার প্রভার বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, যখন যিকির দ্বারা অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়, তখন কুমন্ত্রণা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকলে কথার আওয়ায শুনেও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তৃতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, কুমন্ত্রণাও ছিন্ন হয় না এবং প্রভাবও বিনষ্ট হয় না; বরং প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কুমন্ত্রণা হয়, কিন্তু খুবই দুর্বল! চতুর্থ দল বলেন, সামান্য সময়ের যিকির দ্বারা কুমন্ত্রণা খতম হয়ে যায় এবং ততটুকু সময়ের কুমন্ত্রণা দ্বারা যিকির খতম হয়ে যায়। যিকির ও কুমন্ত্রণা একের পর এক দ্রুতগতিতে আসার কারণে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা চালু হয়ে যায়। উদাহরণতঃ একটি গোলকের গায়ে কয়েকটি আলাদা বিন্দু বসিয়ে যদি গোলকটিকে দ্রুতগতিতে ঘুরানো হয়, তবে সেই বিন্দুগুলো একটি গোলাকার চক্র বলে মনে হবে। কেননা, দ্রুতগতির কারণে বিন্দুগুলো মনে হবে যেন একটি অপরটির সাথে মিলিত। এই দল প্রমাণ পেশ করেন যে, উপরোক্ত হাদীসে 'শয়তান চুপ হয়ে যায়' বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যিকর করার সময় কুমন্ত্রণা অনুভব করি। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বর্ণিত উক্তি অনুযায়ীই হতে পারে। পঞ্চম দলের অভিমত হচ্ছে, কুমন্ত্রণা ও যিকির অন্তরের উপর সর্বদা একে অপরের পেছনে চলে এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। কোন ব্যক্তি একই অবস্থায় যেমন আপন চক্ষু দ্বারা দুই বস্তু দেখতে পারে, তেমনি অন্তরও দুই বস্তুর অবস্থানস্থলে হতে পারে। হাদীসে আছে ঃ

ما من عبد الا وله اربعة اعين عينان فى راسه يبصربها امر دنياه وعينان فى قلبه يصبر بها امر دينه .

-প্রত্যেক বান্দার চারটি করে চক্ষু আছে। দুটি তার মস্তকে, যদ্দ্বারা সে তার দুনিয়ার ব্যাপারাদি দেখে এবং দু'টি অন্তরে, যদ্দ্বারা সে

আখেরাতের বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করে। এটি হযরত মুহাসেবীর মাযহাব। আমাদের মতে সবগুলো উক্তিই সঠিক, কিন্তু সর্বপ্রকার কুমন্ত্রণার কথা কোন এক উক্তিতে বর্ণিত হয়নি। প্রত্যেকেই যেমন কুমন্ত্রণা দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। তাই আমরা এক্ষণে কুমন্ত্রণার প্রকারভেদ বর্ণনা করব।

কুমন্ত্রণা তিন প্রকার। প্রথম, সত্য বিষয়কে সন্দিগ্ধ করে কুমন্ত্রণা দেয়া। উদাহরণতঃ শয়তান এভাবে বুঝাবে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা উচিত নয়। জীবনের অনেক কামনা-বাসনা এতদিন বিসর্জন দেয়া আযাব বৈ নয়। এসময় যদি বান্দা আল্লাহ তা'আলার হক, তাঁর বিরাট পুরস্কার ও শাস্তিকে স্মরণ করে এবং নিজেকে বুঝায় যে, কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা অবশ্যই কঠিন; কিন্তু জাহান্নামের অগ্নি সহ্য করা আরও অধিক কঠিন, তবে শয়তান প্রশ্রয় পাবে না, পালিয়ে যাবে। কেননা, শয়তান এ কথা বলবে না যে, দোযখের কষ্ট গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার কষ্টের তুলনায় হালকা এবং একথাও বলবে না যে, গোনাহের পরিণতি দোযখ ভোগ নয়। যদি বলেও, তবে কোরআনে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে বান্দা তার কথা শুনবে না। অনুরূপভাবে যদি আত্মম্ভরিতার জন্যে কুমন্ত্রণা দেয় এবং অন্তরে একথা জাগ্রত করে যে, আজ মারেফত ও এবাদতে তোমার সমতুল্য কেউ নেই, তবে শয়তান হটে যাবে। যদি বান্দা স্মরণ করে যে, তার মারেফত, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং আত্মম্ভরিতা কিসের? মোট কথা, এই প্রথম প্রকারের কুমন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। যারা আরেফ এবং ঈমানের আলোকে আলোকিত, তাদের কাছে এই প্রকার কুমন্ত্রণা থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়, কাম-প্রবৃত্তিকে গতিশীল করে কুমন্ত্রণা দেয়া। যদি কাম-প্রবৃত্তিকে এমন বিষয়ের প্রতি গতিশীল করে, যার সম্পর্কে বান্দা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, এটা গোনাহ্, তবে শয়তান কামভাব উত্তেজিত করা থেকে বিরত হবে না ঠিক; কিন্তু এমন উত্তেজিত করবে না, যাতে গতিশীলতা থাকে। পক্ষান্তরে যদি এমন বিষয়ের প্রতি গতিশীল করে, যার গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে বান্দা নিশ্চিত নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুমন্ত্রণা প্রভাবশালী হবে এবং তা দূর করার জন্যে সাধনার প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা থাকবে; কিন্তু স্তিমিত অবস্থায় থাকবে।

তৃতীয়, অনুপস্থিত বিষয় স্মরণ করিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়া। এতে অন্তর

যখন যিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করে, তখন কুমন্ত্রণা কিছুটা দূর হয়ে যায় এবং পুনরায় এসে পড়ে। আবার দূর হয়ে যায় এবং আবার আসে। এমনিভাবে যিকির ও কুমন্ত্রণা একের পর এক আসতে থাকে। ফলে ধারণা হতে থাকে যে, উভয়েরই একটি অব্যাহত ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং যেন উভয় বিষয়ের ঠিকানা অন্তরে দুটি জায়গা। এ ধরনের কুমন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হওয়া সুকঠিন, তবে অসম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه .

–যে ব্যক্তি দু'রাকআত এমনভাবে নামায পড়ে যে, তাতে তার মন দুনিয়ার কোন কথা না বলে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

সুতরাং এটা অসম্ভব হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উল্লেখ করতেন না। হাঁ, আল্লাহর মহব্বতে পরিবেষ্টিত অন্তরেই এটা সম্ভব। কেননা, অন্তর যে বিষয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকে, সে বিষয় ছাড়া অন্তরে অন্য কোন কিছু আসে না। যেমন আশেক ব্যক্তি এশকের চিন্তায় নিমজ্জিত থাকলে তার অন্তরে মাশুকের কথা ছাড়া অন্য কিছু আসে না। সুতরাং কুমন্ত্রণার উপরোক্ত প্রকারত্রয় থেকে বুঝা যায়, বর্ণিত পাঁচটি মাযহাবই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য।

সারকথা, এক মুহূর্ত অথবা কিছু সময়ের জন্যে শয়তান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু সারা জীবনের জন্যে তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই অবান্তর; বরং অসম্ভব। কেননা, এটা সম্ভবপর হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন সময় কোন কুমন্ত্রণা হত না। অথচ কুমন্ত্রণা তাঁরও হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে– একবার নামাযে তিনি আপন বস্ত্রের কারুকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। নামাযান্তে সেই বস্ত্র খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ شغلنى من الصلوة এটা আমাকে নামাযে বাধা দিয়েছে। পুরুষের জন্যে স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। খোতবা পাঠ করার সময় সেটির উপর দৃষ্টিপাত হলে তিনি তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন– نظرة اليه ونظرة اليكم تولدت –আমি একবার এর দিকে এবং একবার তোমাদের দিকে দেখি। বস্ত্রের কারুকার্য ও স্বর্ণের আংটির

দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ ছিল কুমন্ত্রণা। তাই তিনি এগুলো দূরে নিক্ষেপ করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, সাংসারিক আসবাবপত্র ও টাকা পয়সার কুমন্ত্রণা তখনই ছিন্ন হবে, যখন এগুলো আলাদা করে দেয়া হবে। যে পর্যন্ত মালিকানায় একটি টাকাও থাকবে, শয়তান তারই কুমন্ত্রণা দেবে। একে কিভাবে মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা যায়, কিভাবে ব্যয় করা যায় এবং কিভাবে প্রকাশ করে বড়লোকী ফুটানো যায় ইত্যাদি বহু প্রকার কুমন্ত্রণা অন্তরে আসতে থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কাজ-কারবারে জড়িত হয়ে যে ব্যক্তি আশা করে যে, সে শয়তান থেকে মুক্তি পাবে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যে সর্বাঙ্গে মধু মেখে মনে করতে থাকে যে, এর উপর মাছি বসবে না। এটা অসম্ভব।

মোট কথা, দুনিয়া কুমন্ত্রণার একটি সুবৃহৎ ফটক। এতে গমন পথ একটি নয়– অসংখ্য। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ শয়তান প্রথমে মানুষের কাছে গোনাহের দিক থেকে আসে। এতে মানুষ অবাধ্য হলে উপদেশের ছলে আগমন করে এবং কোন বেদআতের সাথে জড়িত করে দেয়। এতেও মানুষ অবাধ্য হলে তাকে কঠোরতার আদেশ দিয়ে যা হারাম নয়, তাও হারাম করার প্রয়াস পায়। এতেও কাজ না হলে ওযু ও নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি এতেও কার্য সিদ্ধি না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে সৎকর্ম সহজ করে দেয়। অতঃপর সৎকর্মপরায়ণতার সুবাদে মানুষ যখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন শয়তান তাকে আত্মম্ভরিতার বেড়াজালে ফাঁসিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ কাজে শয়তান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং কোন ত্রুটির অবকাশ রাখে না। কেননা, শয়তান জানে, এ ফাঁদে আটকা না পড়লে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

পরিবর্তনের দিক দিয়ে অন্তরের প্রকারভেদ

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্তর বিভিন্ন পথে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক অন্তর এমন, যার উপর চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষিত হতে থাকে। একদিক থেকে কোন কিছুর প্রভাব তার উপর পড়লে দ্বিতীয় দিক থেকে তার বিপরীত কোন প্রভাব এসে যায়। ফলে প্রথম প্রভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ যদি শয়তান অন্তরকে মানসিক খেয়াল-খুশীর দিক থেকে টানে, তবে ফেরেশতা এসে তাকে সেই বিষয় থেকে বিরত রাখে। যদি এক শয়তান একটি মন্দ কাজ করতে বলে, তবে অন্য শয়তান তাকে অন্য দিকে টেনে নেয়। যদি এক ফেরেশতা অন্তরকে এক বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করে, তবে অন্য ফেরেশতা অন্য বস্তুর দিকে

উৎসাহিত করে। সুতরাং অন্তর কখনও দু'ফেরেশতার টানা হেচঁড়ার মধ্যে থাকে, কখনও দু'শয়তানের এবং কখনও এক ফেরেশতা ও এক শয়তানের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়, কিন্তু কোন সময়েই অবসর পায় না। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে-

ونقلب افئدتهم وابصارهم

-আমি তাদের হৃদয় ও নয়নযুগল পাল্টে দেই।

আল্লাহ তাআলা অন্তরকে এক অভিনব বস্তুরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং একে অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছেন। এসব আশ্চর্যজনক বস্তু ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্যক অবহিত করা হয়েছিল। তাই তিনি প্রায়ই এভাবে কসম খেতেন ঃ ومقلب القلوب -অন্তর পরিবর্তনকারীর কসম।

এছাড়া তিনি প্রায়ই এই দোয়া করতেন- يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করতেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও অন্তরের ব্যাপারে ভীত? তিনি বলতেন- আল্লাহ ইচ্ছা করলে অন্তরকে সোজা রাখেন এবং বক্র করতে চাইলে বক্র করে দেন। এক রেওয়ায়েতে আছে- অন্তর চড়ুই পাখীর মত সর্বক্ষণ নাচানাচি করতে থাকে। হাদীসে অন্তরের আরও দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে-

مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها .

-পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্তর ডেগের মত, যখন তাতে খুব স্ফুটন আসে।

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

مثل القلب كمثل ريشة الارض ملاة تقلبها الرياح ظهر البطن

-অন্তর জঙ্গলের পাখীর মত, যাকে ঝড়ের বায়ু ওলট পালট করতে থাকে।

যারা আপন আপন অন্তরের অবস্থা দেখা-শুনা করে এবং

মোরাকাবায় মগ্ন থাকে, কেবল তারাই অন্তরের উপরোক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে।

ভাল অথবা মন্দের উপর অন্তরের প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এতদুভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থাকার ব্যাপারে অন্তর তিন প্রকার। প্রথম প্রকার সেই অন্তর, যা তাকওয়া ও খোদাভীতিতে পূর্ণ, সাধনা দ্বারা পরিশোধিত এবং কুঅভ্যাস থেকে পাক পবিত্র। এরূপ অন্তরে অদৃশ্যের ভাণ্ডার ও উর্ধ্বজগত থেকে প্রেরণা আসে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি সেই প্রেরণা নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপৃত হয়, যাতে তার কল্যাণ ও উপকারিতার রহস্য অবগত হওয়া যায়। এরপর অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা যখন রহস্য অবগত হয়ে যায়, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি বলে দেয় যে, এ কাজটি করা জরুরী। ফেরেশতা এই অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে, এর মূল উপাদান পরিষ্কার, বুদ্ধিমত্তার নূরে আলোকিত এবং ফেরেশতাদের থাকার যোগ্য। তখন বহু ফেরেশতা তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং একের পর এক অসংখ্য সৎকাজের প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এসব সৎকাজ তার জন্যে সহজও করে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى -

–অতঃপর যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তমকে গ্রহণ করে, আমি তার জন্যে সুখকর পরিণামের পথ সহজ করে দেই।

এই প্রকার অন্তরে মারেফতের সূর্য উদিত হয়, যার কিরণে গোপন শেরকও অদৃশ্য থাকে না। অথচ গোপন শিরক অন্ধকার রাতে কাল পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক রহস্যাবৃত থাকে। এমনিভাবে অন্যান্য গোপন বিষয়ও এই অন্তরের কাছে গোপন থাকে না। ফলে শয়তানের কোন চক্রান্ত সফল হয় না। শয়তান দাঁড়িয়ে প্রতারণার অনেক মাসআলাযুক্ত কথা বলে; কিন্তু অন্তর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। এই প্রকার অন্তর যখন বিনাশকারী বিষয়াদি থেকে পাক সাফ হয়ে যায়, তখন শোকর, সবর, ভয়, আশা, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, মহব্বত, সন্তুষ্টি, আগ্রহ, তাওয়াক্কুল, চিন্তাভাবনা, আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি উদ্ধারকারী গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হয়ে যায়। এরূপ অন্তরের প্রতিই আল্লাহ তাআলা অভিনিবেশ করেন এবং এরই নাম 'কলবে মুতমাইন্নাহ' তথা প্রশান্ত অন্তর, যা এই আয়াতে বুঝান হয়েছে– الا بذكر الله تطمئن القلوب

–খবরদার, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

নিম্নোক্ত আয়াতে এই অন্তরই উদ্দেশ্য–

يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك

–অর্থাৎ, হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পরওয়ারদেগারের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

দ্বিতীয় প্রকার অন্তর প্রথমটির বিপরীত। অর্থাৎ, খেয়াল-খুশীতে পরিপূর্ণ। বদভ্যাস দ্বারা কলুষিত। এই প্রকার অন্তরের সামনে শয়তানের দরজা থাকে উন্মুক্ত এবং ফেরেশতাদের দরজা তালাবদ্ধ। এরূপ অন্তরে অনিষ্টের সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে তার মধ্যে মানসিক খেয়াল-খুশীর একটি শংকা জাগরিত হয়। সে শাসক জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে উপযোগিতা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি পূর্ব থেকেই খেয়াল-খুশীর সেবায় অভ্যস্ত থাকে, সর্বদা তার খাতিরে কৌশল আবিষ্কারে রত থাকে এবং তারই মর্জি অনুযায়ী কাজ করে। তাই এখনও নফসেরই সহযোগিতা করে এবং তদনুযায়ী জওয়াব দেয়। ফলে খেয়াল-খুশীর বক্ষ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং তার তমসা বিস্তৃতি লাভ করে। জ্ঞান-বুদ্ধি পরাভূত হয়ে যায়। শয়তান সুযোগ পেয়ে খুব পা ছড়ায় এবং বাহ্যিক সাজসজ্জা, প্রতারণা, দীর্ঘ আশা এবং এমনি ধরনের অসার বিষয়সমূহের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকে। অবশেষে ঈমানের শাসন দুর্বল এবং বিশ্বাসের প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াদা, শাস্তি ও পরকাল ভীতির বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, খেয়াল-খুশীর একটি কাল ধূম্র নির্গত হয়ে অন্তরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্তরের নূরকে নিষ্প্রভ করে দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থা তখন এমন হয়ে যায়, যেমন কারও চোখ তীব্র ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সে দেখতে পারে না। কামভাবের প্রাবল্যের দরুন অন্তরের অবস্থা এমনি হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান ও সুমতি মোটেই থাকে না। সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে না এবং তৎপ্রতি কানও লাগায় না। এমতাবস্থায় শয়তান হামলা করে। কামভাবে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়াল-খুশীর ইচ্ছানুযায়ী গতিশীল হয়। এই প্রকার অন্তরের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইশারা করা হয়েছে–

ارءيت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ۔

অর্থাৎ, আপনি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছেন, 'যে তার

খেয়াল-খুশীকে আপন উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? আপনি কি তার দায়িত্ব নেবেন? না, আপনি ধারণা করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে অথবা বুঝে? তারা চতুষ্পদ জন্তু বৈ নয়; বরং তাদের পথ আরও অধিক ভ্রষ্ট।

لقد حق القول على اكثرهم فهم لايؤمنون

–তাদের অধিকাংশের জন্যে আল্লাহর শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না।

وسواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون তাদেরকে সতর্ক করা এবং না করা তাদের জন্যে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

কতক অন্তরের অবস্থা সকল প্রকার কাম-বাসনার ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে এবং কোন কোন অন্তর কতক কাম-বাসনার বেলায় এরূপ হয়। উদাহরণতঃ কতক লোক কতক গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু যখন কোন সুশ্রী চেহারার উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন সংযম হারিয়ে ফেলে, বুদ্ধি-বিবেচনা বিদায় হয়ে যায় এবং অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। কিছু লোক জাঁকজমক, প্রতিপত্তি ও অহংকারের সামগ্রী দেখলে তা অর্জন করার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। আবার কতক লোক নিজের সম্পর্কে কোন অপমানজনক উক্তি ও সমালোচনা শুনলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। কেউ কেউ টাকা-পয়সা নেয়ার সময় এমন রূঢ় হয়ে যায় যে, ভদ্রতা ও খোদাভীতির রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এ সবের কারণ, অন্তর খেয়াল-খুশীর কাল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং অন্তর্দৃষ্টির নূর ঘোলাটে হয়ে যায়। ফলে লজ্জা-শরম, ঈমান ও ভদ্রতাকে শিকায় রেখে শয়তানী অভিপ্রায় অর্জনের চেষ্টায় লেগে যায়।

তৃতীয় প্রকার অন্তর এমন, যার মধ্যে খেয়াল-খুশীর প্রবণতা প্রকাশ পায় এবং তাকে অনিষ্টের দিকে আকৃষ্ট করে। তখনই ঈমানের প্রবণতা আসে এবং তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। কামপূজারী নফস তখন অনিষ্টের প্রবণতার পক্ষপাতিত্ব করতে তৎপর হয়ে উঠে। এ সময় কামভাব কিছুটা প্রবল হয় এবং ভোগবিলাস ও আনন্দ ভাল মনে হতে থাকে। অতঃপর জ্ঞান-বুদ্ধি কল্যাণমুখী প্রবণতার প্রশংসা করে এবং কামপ্রবৃত্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বলে ঃ এটা মূর্খতার কাজ এবং চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুদের আচরণের অনুরূপ, যারা পরিণামের পরওয়া করে না এবং কুকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নফস জ্ঞান বুদ্ধির এই উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট

হয়। এ সময় শয়তান জ্ঞান-বুদ্ধির উপর হামলা চালায় এবং বলে ঃ শুষ্ক বৈরাগ্য কেমন? তুমি কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিরত হও কেন? দুনিয়ার আরও মানুষ কি ভোগবিলাসে মত্ত নয়? তোমার ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ ছাড়া কিছু নেই। মানুষ তোমাকে দেখে হাসবে। দেখ, অমুক অমুক ব্যক্তি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কেমন সুখে দিন যাপন করছে। তুমি মর্তবায় তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাও না কেন? অমুক আলেম ব্যক্তিও তো তাই করে। নিষিদ্ধ হলে সে এরূপ করত না। এ ধরনের কথা শুনে নফস শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন ফেরেশতা শয়তানের উপর চড়াও হয় এবং অন্তরকে এভাবে বুঝায়– যে ব্যক্তি ভোগ-বিলাসের পেছনে পড়ে এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে না, সে ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি কি ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে সন্তুষ্ট হয়ে চিরস্থায়ী বেহেশতী সুখ বর্জন করতে চাও? তুমি কি দোযখের আযাবের ভয়াবহতা কল্পনা করে কামপ্রবৃত্তিতে সবর করার কষ্ট সহ্য করতে পার না? অপরের অনুকরণে তুমি নিজের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাচ্ছ। এটা মস্ত বড় ধোঁকা। অপরের গোনাহ তোমার আযাব হালকা করবে না। অন্য মানুষ যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রতাপে চলাচল করে এবং তোমার একটি শীতল গৃহ থাকে, তবে তুমি অন্যদের সাথে রৌদ্র তাপের কষ্ট ভোগ করবে, না আপন গৃহে সুখে থাকবে? যদি অপরের সাথে রৌদ্রতাপে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার ভয় লাগে, তবে অপরের সাথে দোযখের আযাবে প্রবেশ করতে ভয় কর না কেন? এই উপদেশের ফলে নফস ফেরেশতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবে সে শয়তান ও ফেরেশতা উভয়ের দ্বন্দ্বে জড়িত থাকে। এমতাবস্থায় যদি অন্তরে শয়তানী স্বভাব প্রবল থাকে, তবে শয়তানেরই অনুগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি ফেরেশতার স্বভাব প্রবল থাকে, তবে শয়তানী প্ররোচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হয় না; বরং আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এমন কাজই প্রকাশ পায়, যদ্দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এটি তাকদীরগত ব্যাপার। কেননা, হাদীস অনুযায়ী মুমিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থিত। অর্থাৎ শয়তান ও ফেরেশতা এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে এবং অন্তর এদিক-ওদিক পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু এক পক্ষের দিকে চিরকাল অটল থাকা খুবই কম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان

يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء .

–আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সজোরে আকাশে আরোহণ করে।

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده .

–যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর প্রবল হবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে তোমাদের সাহায্য কে করবে?

এ থেকে জানা গেল, পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টকরণ তাঁরই কাজ। তাঁর আদেশ কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না এবং তাঁর ফয়সালা কেউ বিলম্বিত করতে পারে না। তিনিই জান্নাত সৃষ্টি করে তার জন্যে কিছু লোককে সৃষ্টি করেছেন এবং তেমনি কাজে নিয়োজিত করেছেন। দোযখও তাঁরই তৈরী এবং এর জন্যে কিছু লোক সৃজিত হয়েছে। তাদেরকেও তেমনি কাজে লাগানো হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহর ব্যাপার অনেক উর্ধ্বে– لايسئل عما يفعل وهم يسئلون তিনি যা করেন, তজ্জন্যে কারও কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

এ পর্যন্ত অন্তরের আশ্চর্যজনক অবস্থাসমূহের সামান্যই বর্ণিত হল। এর পূর্ণ বর্ণনা এলমে মোয়ামালায় সমীচীন নয়; বরং এলমে মোয়ামালার সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু বর্ণনা করেই এ আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা, চরিত্র সংশোধন ও আন্তরিক রোগের চিকিৎসা

জানা উচিত, সচ্চরিত্রতা নবীকুল শিরোমণি (সাঃ)-এর একটি উজ্জ্বল গুণ। সিদ্দীকগণের আমলসমূহের মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক দ্বীনদারী, পরহেযগারদের সাধনার ফল এবং আবেদদের অধ্যবসায়ের পরিণতি একেই বলা উচিত। পক্ষান্তরে অসচ্চরিত্রতা মারাত্মক বিষতুল্য। অপমান, লাঞ্ছনা, অপকীর্তি ও অখ্যাতি এর মাধ্যমেই হয়। এটা মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্য থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের দলে গ্রথিত করে দেয়। মোট কথা, অসচ্চরিত্রতা অন্তরের এমন ব্যাধি, যদ্দ্বারা চিরন্তন জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। দৈহিক রোগ কেবল দৈহিক জীবনকেই ব্যাহত করে।

চিকিৎসকগণ এমন রোগের চিকিৎসা করে, যদ্দ্বারা ধ্বংসশীল জীবনের ধারা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্যে তারা নীতিমালা, রোগ নিরূপণ ও উপসর্গ নির্ণয় পদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করে। সুতরাং অন্তরের যেসব ব্যাধির কারণে চিরন্তন জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেগুলোর চিকিৎসার জন্যেও আইন-কানুন রচনা করা অত্যাবশ্যক। এই চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। কেননা, প্রত্যেক অন্তরে কোন না কোন ব্যাধি অবশ্যই থাকে। যদি এর চিকিৎসা করা না হয়, তবে এ থেকে শত শত দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মলাভ করতে পারে। কাজেই অন্তরের এই রোগ চেনা, তার কারণসমূহ জানা এবং এর সুচিকিৎসার জন্যে তৎপর হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য। কোরআনের বাণী قد افلح من زكها (যে একে শুদ্ধ করে, সে সফলকাম হয়।) –এতে অন্তরের চিকিৎসাই উদ্দেশ্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে অন্তরের কতক রোগ ও তার চিকিৎসা সংক্ষেপে বর্ণনা করব। বিস্তারিত বর্ণনা পরে পৃথকভাবে আসবে।

সচ্চরিত্রতার ফযীলত ও অসচ্চরিত্রতার নিন্দা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করে বলেন ঃ

انك لعلى خلق عظيم

–নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল কোরআন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে–

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجهلين ـ

অর্থাৎ, ক্ষমা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের থেকে নিবৃত্ত থাকুন।

এই আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিব্রাঈলকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অতঃপর জিব্রাঈল আকাশে গেলেন এবং ফিরে এসে আরজ করলেন ঃ এর উদ্দেশ্য, যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। যে আপনাকে না দেয়, আপনি তাকে দেবেন এবং যে আপনার প্রতি অন্যায় করে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

অর্থাৎ, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি।

তিনি আরও বলেন ঃ

اثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী বস্তু যা রাখা হবে, তা হবে আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতা।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ধর্ম কি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রবান হওয়া। এরপর লোকটি ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এসে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও প্রত্যেক বার তাকে একই জওয়াব দিলেন, অবশেষে বললেন ঃ اما تفقه هو ان لاتغضب –তুমি কি বুঝ না? এটা হচ্ছে তোমার ক্রুদ্ধ না হওয়া। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ অশুভ ব্যাপার কি?

তিনি বললেন ঃ سؤ الخلق অর্থাৎ, অসচ্চরিত্রতা। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। সে আরজ করল ঃ আরও বলুন। এরশাদ হল ঃ কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তার পশ্চাতে সৎকাজ কর। এতে সেই গোনাহ্ মিটে যাবে। লোকটি বলল ঃ আরও বলুন। তিনি বললেন ঃ خالق الناس بخلق حسن মানুষের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রতা। হযরত ফোযায়ল থেকে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ বলল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু তার চরিত্র খারাপ। সে মুখ দ্বারা পড়শীদেরকে পীড়ন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ لاخير فيها هى من اهل النار তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই; সে দোযখী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– সর্বপ্রথম দাঁড়িপাল্লায় যে বস্তু ওজন করা হবে, তা হবে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা। আল্লাহ তাআলা যখন ঈমান সৃষ্টি করলেন, তখন ঈমান বলল ঃ ইলাহী, আমাকে শক্তি দান কর। সেমতে আল্লাহ তাকে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা দ্বারা শক্তিশালী করলেন। কুফর সৃষ্টি করার পর সেও আল্লাহর কাছে শক্তি প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাকে কৃপণতা ও অসচ্চরিত্রতা দিয়ে জোরদার করলেন। হযরত জারীর ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুশ্রী করেছেন। অতএব তুমি তোমার চরিত্রও সুন্দর কর। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (সাঃ) সর্বাধিক সুশ্রী ও সর্বাধিক চরিত্রবান ছিলেন। হযরত আবু মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া ছিল এই– اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দৈহিক সৌন্দর্য দান করেছেন। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করুন। ওসামা ইবনে শরীক (রাঃ) বলেন ঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন বেদুঈনরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল– বান্দাকে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি দান করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্রতা। বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর কাছে কয়েকজন কোরায়শ মহিলা সমবেত ছিল এবং জোরে জোরে কথা

বলছিল। হযরত ওমরের আওয়ায শুনে তারা দ্রুতবেগে পর্দার আড়ালে চলে গেল। হযরত ওমর (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হাস্যরত পেলেন। তিনি হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কয়েকজন মহিলার আচরণ আমার হাসির কারণ। একটু আগে তারা আমার কাছে ছিল। তোমার আগমন টের পেয়ে তারা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হুযুর, আপনিই তো ভয় করার অধিক যোগ্য ছিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বললেন ঃ বেকুবরা, তোমরা আমাকে ভয় কর, আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ভয় কর না? তারা জওয়াব দিল ঃ হাঁ, তোমাকেই ভয় করি। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তুলনায় রূঢ়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الاسلك فجا غير فجك .

অর্থাৎ, হে ইবনুল খাত্তাব, আল্লাহর কসম! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখবে, সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে।

এক হাদীসে আছে ঃ ان العبد ليبلغ من سوء خلقه اسفل درك جهنم –নিশ্চয় বান্দা তার অসচ্চরিত্রতার কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।

লোকমান হাকীমকে তার পুত্র জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে কোন্ স্বভাবটি উত্তম। তিনি বললেনঃ ধর্মপরায়ণতা। পুত্র বলল ঃ দুটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ ধর্মপরায়ণতা ও ধনাঢ্যতা। প্রশ্ন হল ঃ তিনটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? উত্তর হল ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা ও লজ্জাশীলতা। আবার প্রশ্ন হল ঃ চারটি হলে কোন্ কোন্টি উত্তম? জওয়াব হল ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা, লজ্জাশীলতা ও সচ্চরত্রিতা। পুত্র আবার জিজ্ঞেস করল ঃ যদি পাঁচটি হয়? তিনি বললেন ঃ ধর্মপরায়ণতা, ধনাঢ্যতা, লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা। প্রশ্ন হল ঃ যদি ছয়টি হয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ বৎস, এই পাঁচটি স্বভাবের সমাবেশ ঘটলেই মানুষ পরিষ্কার পরহেযগার, আল্লাহর ওলী ও শয়তান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বেশীর কি প্রয়োজন? হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যে অসচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, সে নিজেকে পীড়ন করে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার সচ্চরিত্রতার বদৌলত জান্নাতের উচ্চস্তরে

পৌঁছে যায়, যদিও এবাদত না করে এবং অসচ্চরিত্রতার কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়, যদিও সে আবেদ হয়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ চরিত্রহীন মানুষ ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্রের ন্যায়, যা জোড়া লয় না এবং মাটিও হয়ে যায় না। বর্ণিত আছে, একবার হুহব ইবনুল মোবারকের সঙ্গে জনৈক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সফরে রওয়ানা হয়। তিনি তাকে খুব আদর যত্ন করতে থাকেন। সফরের পর যখন লোকটি আলাদা হয়ে গেল, তখন তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। লোকেরা ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তার প্রতি আমার করুণা হয়। আমি তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি; কিন্তু তার অসচ্চরিত্রতা তার সাথেই রয়ে গেছে– আলাদা হয়নি। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেন ঃ মানুষের চারটি অভ্যাস এমন যে, আমল ও এলেম কম হলেও সে উচ্চ মর্তবা লাভ করতে পারে। অভ্যাসগুলো হচ্ছে– সহনশীলতা, নম্রতা, দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতা। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ অসচ্চরিত্রতা এমন একটি বিপদ, যা থাকলে সৎ কর্মের আধিক্যও উপকারী হয় না। পক্ষান্তরে সচ্চরিত্রতা এমন শোভা যে, এটা থাকলে মন্দ কাজের প্রাচুর্যও তেমন ক্ষতিকর হয় না। হযরত ইবনে আব্বাসকে কেউ বংশমর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ যার চরিত্র যত বেশী ভাল, সে বংশমর্যাদায় ততবেশী সম্ভ্রান্ত। হযরত ইবনে আতা বলেন ঃ গৌরবের আসন একমাত্র সচ্চরিত্রতা দ্বারাই অর্জিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ সচ্চরিত্রতায় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। চরিত্রে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তারাই যারা এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করে চলে।

সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতার স্বরূপ

সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেকেই অনেক কিছু লেখেছেন; কিন্তু এর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সকলেই নীরব। কেবল এর ফলাফল ও পরিণতি লিখিত হয়েছে, তাও পূর্ণ মাত্রায় নয়; বরং যার যা বুঝে এসেছে, তাই লেখেছেন। তার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও ফলাফল বিস্তারিতভাবে কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। আমরা এখানে সে সবের কিছু উদ্ধৃত করছি।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ সচ্চরিত্রতা হচ্ছে মনখোলা থাকা, অর্থসম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। ওয়াসেতী বলেন ঃ দরিদ্রতায় ও ধনাঢ্যতায় মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা। শাহ কিরিয়ানী বলেন ঃ কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং কষ্ট সহ্য করা।

আবু ওসমান বলেন ঃ উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি। সহল তস্তরীকে সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া; বরং যালেমের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা করা এবং তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করা। তাঁর অপর উক্তি এই ঃ রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কুধারণা না করা, তাঁর উপর ভরসা করা এবং যে বিষয়ের তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পূর্ণ হয়ে গেলে চুপ থাকা; তাঁর হক ও বান্দার হকে তাঁর নাফরমানী না করা; বরং আনুগত্য করা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সচ্চরিত্রতা তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত; হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা, হালাল রুজি অন্বেষণ করা এবং পরিজনের উপর অধিক ব্যয় না করা। আবু সাঈদ খেরায বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর দিকে প্রত্যাশী না হওয়ার নাম সচ্চরিত্রতা। এমনি ধরনের আরও অনেক উক্তির মধ্যে কেবল সচ্চরিত্রতার ফলাফল উল্লিখিত হয়েছে এবং স্বয়ং সচ্চরিত্রতার স্বরূপ বর্ণিত হয়নি। তাই এক্ষণে আমরা এর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

জানা উচিত, আরবীতে 'খালক' ও 'খুল্ক'– এ দু'টি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, অমুক ব্যক্তির খালক ও খুলক উভয়টি ভাল। অর্থাৎ, সে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যের অধিকারী। সুতরাং জানা গেল, 'খাল্ক' বলে বাহ্যিক আকৃতি এবং 'খুলক' বলে অভ্যন্তরীণ আকৃতি বুঝানো হয়। কেননা, মানুষ দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। একটি দেহ, যা চোখে দেখা যায় এবং অপরটি আত্মা অর্থাৎ, নফস, যা অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক দ্বারা জানা যায়। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির একটি আকৃতি আছে– ভাল হোক অথবা মন্দ। যে নফস বিবেকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তার মান-মর্যাদা দেহের তুলনায় বেশী। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলাও একে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যাতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন ঃ

انى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين -

অর্থাৎ, আমি একটি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে দেই এবং তার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁকে দেই, তখন তোমরা (হে ফেরেশতাকুল) তার উদ্দেশে সেজদায় লুটিয়ে পড়।

এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, দেহ সম্বন্ধযুক্ত মাটির সাথে এবং

রূহ তথা আত্মা সম্বন্ধযুক্ত আল্লাহ্ তাআলার সাথে। এখানে রূহ্ ও নফ্স একই বস্তু।

মোট কথা, 'খুলক' (চরিত্র) শব্দের সংজ্ঞা, খুল্ক নফসের মধ্যে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যদ্দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতি দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় সচ্চরিত্রতা। পক্ষান্তরে যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায়, তবে তার নাম হয় অসচ্চরিত্রতা। এখানে "নফসের মধ্যে বদ্ধমূল" বলার কারণ, যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে কোন প্রয়োজনে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করে দেয়, তবে একে দানশীলতারূপী সচ্চরিত্রতা বলা হবে না, যে পর্যন্ত এটা তার অন্তরের বদ্ধমূল অভ্যাস না হয়। ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে "চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে" কথাটি যোগ করার কারণ, যদি কেউ অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রয়াস সহকারে অর্থ ব্যয় করে অথবা আপন ক্রোধকে দমন করে, তবে একে দানশীলতা ও সহনশীলতার চরিত্র বলা হবে না। মোট কথা, এখানে চারটি বিষয় জরুরী। (১) ভাল অথবা মন্দ ক্রিয়াকর্ম, (২) তাতে সক্ষমতা, (৩) তাকে চেনা এবং (৪) নফসের মধ্যে এমন আকৃতি থাকা, যদ্দ্বারা ভাল অথবা মন্দের মধ্য থেকে একটি সহজ হয়ে যায়। সুতরাং শুধু ক্রিয়াকর্মকে চরিত্র বলা হবে না। কেননা, অনেক মানুষের মধ্যে দানশীলতার চরিত্র আছে; কিন্তু নিঃস্বতা অথবা অন্য কোন কারণে দান করতে পারে না। কিংবা কতক লোকের মধ্যে কৃপণতার চরিত্র আছে, কিন্তু লোক দেখানোর উদ্দেশে দান করে। সক্ষমতার নামও চরিত্র নয়। কেননা, সক্ষমতার সম্বন্ধ দানশীলতা ও কৃপণতার সাথে সমান এবং প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে দানশীলতা ও কৃপণতার ক্ষমতা রাখে। এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে কৃপণতা ও দানশীলতার চরিত্র আছে। কেবল চেনাও চরিত্র নয়। কেননা, চেনাও সক্ষমতার ন্যায় ভাল মন্দ উভয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ, যে আকৃতি দ্বারা নফস ভাল ও মন্দ ক্রিয়াকর্মের জন্যে তৎপর হয় তারই নাম চরিত্র। বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমন শুধু একটি অঙ্গ– উদাহরণতঃ নেত্রদ্বয় সুন্দর হলেই পূর্ণাঙ্গ হয় না; বরং নাক, মুখ, গণ্ড সবগুলো সুশ্রী হলে বাহ্যিক সৌন্দর্য পূর্ণ হয়; তেমনি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের জন্যে চারটি বিষয় রয়েছে। এগুলো সুন্দর হলে সচ্চরিত্রতা পূর্ণাঙ্গ হবে। অর্থাৎ কারও মধ্যে যখন এ চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে সুসমন্বিত থাকবে, তখন তাকে সচ্চরিত্র বলা হবে। এ চারটি বিষয় হচ্ছে জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, কামশক্তি ও সমতাশক্তি।

অর্থাৎ, প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়কে সমতার পর্যায়ে রাখার ক্ষমতা। জ্ঞানশক্তির উপকারিতা হচ্ছে, মানুষ এর মাধ্যমে কথাবার্তায় সত্য, মিথ্যা, বিশ্বাসে হক ও বাতিল এবং কাজে, কর্মে ভাল ও মন্দ জেনে নেয়। জ্ঞানশক্তি এরূপ হয়ে গেলে তার ফলস্বরূপ প্রজ্ঞা অর্জিত হয়, যা সকল সচ্চরিত্রতার মূল এবং যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ـ

অর্থাৎ, যে প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

আর ক্রোধশক্তি এবং কামশক্তির ফায়দা হচ্ছে ক্রোধ ও কাম উভয়টি প্রজ্ঞা অনুযায়ী হবে এবং প্রজ্ঞার ইশারায় পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, বুদ্ধি ও শরীয়ত যা পছন্দ করে, তেমনই আমল করবে। সমতাশক্তির উদ্দেশ্যও তাই, অর্থাৎ,. ক্রোধ ও কামকে বুদ্ধি ও শরীয়তের অনুসারী করে দেয়ার ক্ষমতা হবে।

যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে বিদ্যমান থাকবে, তাকে সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্র বলা হবে। যার মধ্যে কেবল একটি বিষয় অথবা দু'টি বিষয় থাকবে, তাকে সেদিক দিয়েই চরিত্রবান বলা হবে, যেমন মুখমণ্ডলের কোন কোন অংশ সুশ্রী হলে সেই অংশকেই সুশ্রী বলা হয়, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলকে সুশ্রী বলা হয় না। ক্রোধশক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় বীরত্ব এবং কামশক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় সাধুতা। এ দু'টি পর্যায়ই প্রশংসনীয়। এতে কমবেশী নিন্দনীয়।

জানা দরকার, জ্ঞানশক্তির সমতা দ্বারা সুপরিচালন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, বিশুদ্ধ অভিমত, সূক্ষ্ম আমল ও নফসের গোপন আপদ সম্পর্কিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর বাহুল্য দ্বারা ধোকা, প্রতারণা ও বিদ্বেষ জন্মলাভ করে। এর স্বল্পতা দ্বারা অনভিজ্ঞতা, অচেতনতা, নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদনা অস্তিত্ব লাভ করে। ক্রোধশক্তির সমতা অর্থাৎ, বীরত্ব থেকে যে যে গুণের সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে– দয়া, সাহসিকতা, ঔদার্য, বিনয়, সহনশীলতা, ক্রোধ দমন, গাম্ভীর্য ইত্যাদি। এর বাহুল্য থেকে অহংকার, আস্ফালন, রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া, অহমিকা ইত্যাদি স্বভাব জন্মলাভ করে এবং এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, অপমান, লাঞ্ছনা, ভয়, জরুরী কাজে সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি। দোষ প্রকাশ পায়। কামশক্তির সমতা অর্থাৎ, সাধুতা থেকে সৃষ্ট গুণাবলী এই ঃ দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, সবর, অল্পে তুষ্টি, পরহেযগারী, নির্লোভ হওয়া ইত্যাদি এর স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে সৃষ্ট স্বভাবগুলো এই ঃ লালসা, নির্লজ্জতা, অপব্যয়, পরিজনের জন্যে কম ব্যয়

করা, বেইয্যতী, অশ্লীলতা, অনর্থক খোশামোদ, হিংসা, অপরের দুঃখে হাসা, ধনীদের মধ্যে লাঞ্ছিত হওয়া, ফকীরদেরকে হেয় মনে করা ইত্যাদি। মোট কথা, উপরোক্ত প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাধুতা ও মিতাচার,- এ চারটি বিষয় হচ্ছে চরিত্র মাধুর্যের মূল। অবশিষ্ট সবগুলো এসবের শাখা-প্রশাখা। এ চারটি বিষয়েরই পূর্ণ সমতার পর্যায় রসূলে আকরাম (সাঃ) ছাড়া অপর কারও নছীব হয়নি। তাঁর পরে সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে ব্যক্তি এসব চরিত্রে তাঁর যত বেশী নিকটবর্তী, সে সেই পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী। আর যে দূরবর্তী, সে দূরবর্তী। যে ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো চরিত্র বিদ্যমান, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, সকল মানুষ তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব বিশেষণে বিশেষিত নয়; বরং এগুলোর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, তাকে জনবসতি থেকে বের করে দেয়া হবে। কেননা, সে বিতাড়িত শয়তানের নিকটবর্তী।

কোরআন মজীদেও মুমিনদের গুণাবলীতে উপরোক্ত চরিত্রসমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

অর্থাৎ, মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এর পর সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করেছে। তারাই সাচ্চা।

আল্লাহ ও রসূলের প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা বিশ্বাসশক্তির মাধ্যমে হয়, যা বুদ্ধির ফল ও প্রজ্ঞার চরম পরিণতি। ধনসম্পদের বিনিময়ে জেহাদ করা দানশীলতা, যা কামশক্তিকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে হয়। প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ হচ্ছে বীরত্ব, যা ক্রোধশক্তিকে সমতার পর্যায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলা হয়েছে-

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর এবং পরস্পরে দয়াশীল।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কঠোরতা ও দয়া পৃথক পৃথক পাত্রে হয়। সুতরাং না সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা করা পূর্ণতা, না সর্বক্ষেত্রে দয়া।

সাধনা দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া না হওয়া

যাদের উপর বাতিল বিশ্বাসের প্রধান্য রয়েছে, তাদের জন্যে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে অধ্যবসায় ও সাধনা করা কঠিন। এই শ্রেণীর লোকেরা বলে যে, চরিত্রে পরিবর্তন হতেই পারে না। তারা এই দাবীর দুটি কারণ বর্ণনা করে থাকে। প্রথম হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ আকৃতির নাম হচ্ছে 'খুল্‌ক' তথা চরিত্র। যেমন বাহ্যিক আকৃতিকে বলা হয় 'খাল্‌ক'। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ বেঁটে ব্যক্তি তার দৈহিক উচ্চতা বাড়াতে পারে না এবং দীর্ঘদেহী ব্যক্তি বেঁটে হতে পারে না। তেমনি কুশ্রী ব্যক্তি সুশ্রী এবং সুশ্রী কুশ্রী হতে পারে না। সুতরাং অভ্যন্তরীণ দোষকে এমনি মনে করে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কারণ, সচ্চরিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন। দীর্ঘ সাধনা দ্বারা জানা গেছে, এগুলোর মূলোৎপাটন কখনও হয় না। কারণ, এগুলো হচ্ছে মেযাজ ও স্বভাবের দাবী। সুতরাং সাধনার পেছনে পড়া নিষ্ফল ও জীবনকে বিনষ্ট করার নামান্তর। এক্ষণে আমরা এ দু'টি কারণের জওয়াব লিপিবদ্ধ করছি।

যদি চরিত্রে পরিবর্তন না হত, তবে ওয়ায, নসীহত, শাসন ইত্যাদি সমস্তই পন্ডশ্রম হত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন বলতেন যে حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ –তোমরা তোমাদের চরিত্র সুন্দর কর? মানুষ তো দূরের কথা, এই পরিবর্তন জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও সম্ভবপর। দেখ, বাজপাখীর পলায়নী স্বভাব কিরূপে মেলামেশায় পরিবর্তিত হয়ে যায়? তালীমের প্রভাবে শিকারী কুকুর কেমন সুশিক্ষিত হয়ে যায়? সে শিকারকে শুধু ধরে ফেলে, লোভ মোটেই করে না। অবাধ্য ঘোড়া সহিসের কেমন অনুগত ও বাধ্য হয়ে যায়। এগুলো চরিত্রের পরিবর্তন নয় তো কি? এক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব জগতের কতক বস্তু এমন, যেগুলোর অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ। তাতে যে যে বিষয়ের প্রয়োজন ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন মানুষের ইচ্ছায় তাতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন আকাশ, নক্ষত্র ও মানুষ এবং জীবজন্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর কতক বস্তু এমন, যার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে নিহিত আছে। পূর্ণতার শর্তাদি পাওয়া গেলে সে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছতে পারে। এসব শর্ত কখনও মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে। উদাহরণতঃ আমের

আঁটি ফলও নয়, বৃক্ষও নয়; কিন্তু এমনভাবে সৃজিত যে, মামুলী পরিচর্যা করলে তা বৃক্ষ হতে পারে। যখন আঁটি বান্দার ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তখন ক্রোধ ও কাম পরিবর্তিত হয়ে গেলে তা অবান্তর হবে কেন? তবে মোটেই কোন প্রভাব থাকবে না- এভাবে মূল্যেৎপাটন করা আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু এগুলোকে দাবিয়ে রাখা এবং অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা বশে রাখা সম্ভবপর। আমাদের প্রতি আদেশও তাই এবং এটাই আমাদের মুক্তি ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার উপায়। হাঁ, মানুষের স্বভাব বিভিন্নরূপ। কতক স্বভাব দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং কতক বিলম্বে। স্বভাবের বিভিন্নতার কারণ দুটি। এক, যাকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য, জন্মের গোড়া থেকে স্বভাবের সাথে তার জড়িত থাকা। উদাহরণতঃ কাম, ক্রোধ ও অহংকার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু কামকে পরিবর্তন করা সর্বাধিক কঠিন। কেননা, এটা জন্মের গোড়া থেকে মানুষের সাথে রয়েছে। সেমতে শৈশব থেকে শিশুর খাহেশ হয়। ক্রোধ প্রায়শ সাত বছর বয়সে সৃষ্টি হয়। এর পর বিচারশক্তি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ, স্বভাব কখনও অধিক কর্ম দ্বারাও মযবুত হয়। মানুষ স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে এবং একেই পছন্দনীয় ও উৎকৃষ্ট মনে করে। এক্ষেত্রে মানুষের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম হচ্ছে, মানুষ যেমন জন্মগ্রহণ করে, তেমনি থেকে যায় এবং সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। সকল বিশ্বাস থেকে গাফেল ও মুক্ত। এমন মানুষের চিকিৎসা দ্রুত সম্ভবপর। তার জন্যে কেবল একজন ওস্তাদ ও মুর্শিদ প্রয়োজন হয়। মনের মধ্যে সাধনার প্রেরণা থাকলে অল্প দিনের মধ্যে তার চরিত্র সংশোধিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর এমন মানুষ, যে মন্দ কাজের জ্ঞান তো রাখে, কিন্তু সৎকর্মে অভ্যস্ত নয়। মন্দ কাজকেই ভাল মনে করে। এ ব্যাপারে সে তার খাহেশের অনুসারী এবং বিশুদ্ধ মতের প্রতি বিমুখ। এতদসত্ত্বেও আপন কর্মের ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এরূপ ব্যক্তির সৎপথে আসা প্রথম স্তরের তুলনায় কঠিন। কেননা, এতে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন হবে- এক, কুকর্ম ত্যাগ করানো এবং দুই, সৎকর্মের অভ্যাস গড়ে তোলা। মোট কথা, এরূপ ব্যক্তি সাধনায় বিশেষভাবে তৎপর হলে প্রভাবিত হতে পারে। তৃতীয় স্তর এমন মানুষ, যে বিশ্বাস করে যে, চরিত্রহীনতার কাজ খুব ভাল এবং তা করা ওয়াজিব। তার লালন-পালনও চরিত্রহীনতার উপর হয়। এরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। তার সংশোধনের আশা নেই। কেননা, এখানে গোমরাহীর কারণ অনেক। চতুর্থ স্তর এমন মানুষ, যে কুকর্মে লালিত-পালিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক মন্দ কাজ করা এবং মানুষের

ধ্বংস সাধন করাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কাজ মনে করে। এ স্তরটি সর্বাধিক গুরুতর। উপরোক্ত স্তর চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে নির্ভেজাল মূর্খ, দ্বিতীয় স্তর গোমরাহ মূর্খ, তৃতীয় স্তর মূর্খ ও গোমরাহ ফাসেক এবং চতুর্থ স্তর মূর্খ, গোমরাহ, ফাসেক ও দুর্মতি।

এখন দ্বিতীয় কারণের জওয়াব শুনুন। তাদের উক্তি হচ্ছে, সচ্চরিত্রতার দ্বারা কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য। মানুষের মধ্যে এটা অসম্ভব। বাস্তব সত্য হল, মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য নয়; বরং কাম-ক্রোধও মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। মানব চরিত্রে এগুলো থাকাও জরুরী। যদি মানুষের মধ্যে আহারের খাহেশ না থাকে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা যদি সহবাসের খাহেশ না থাকে, তবে বংশবিস্তার ব্যাহত হবে। অনুরূপভাবে ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলে ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহকে প্রতিহত করতে পারবে না। ফলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। মোট কথা, কাম ও ক্রোধের মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বল্পতা ও বাহুল্য বর্জন করে এগুলোকে সমতার পর্যায়ে রাখাই লক্ষ্য। কোন মানুষ কাম ও ক্রোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। কেননা, পয়গম্বরগণও এগুলো থেকে মুক্ত ছিলেন না। হাদীসে আছে ঃ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ —আমি তো মানুষ বৈ নই। মানুষ যেমন রাগ করে, আমিও তেমনি রাগ করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে মরযীর খেলাফ কোন কিছু বর্ণিত হলে রাগে তাঁর গণ্ডদেশ লাল হয়ে যেত, কিন্তু তখনও সত্য কথাই বলতেন। ক্রোধও তাঁকে সত্যের গণ্ডির বাইরে যেতে দিত না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ —এতে এমন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা রাগ করে, কিন্তু রাগকে দাবিয়ে রাখে। একথা নাই যে, তারা রাগই করে না। এ থেকে জানা গেল, কাম ও ক্রোধের সমতার পর্যায়ে আসা সম্ভবপর। চরিত্রের পরিবর্তন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য তাই। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। চরিত্রের মধ্যে স্বল্পতা ও বাহুল্যের স্তর উদ্দেশ্য নয়, বরং মধ্যবর্তী স্তর কাম্য। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত—

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

—তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা করে

না; বরং মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে।

এতে দানশীলতার প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী স্তর। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ -

অর্থাৎ, তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং তাকে পুরাপুরি প্রসারিতও করো না।

অনুরূপভাবে খানাপিনার খাহেশে সমতা কাম্য লালসা ও অনীহা অপছন্দনীয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

অর্থাৎ, খাও, পান কর- অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

হাদীসে বলা হয়েছে- خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا -সব ব্যাপারে মধ্যবর্তী স্তরই উত্তম।

সচ্চরিত্রতা কিরূপে অর্জিত হয়?

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সচ্চরিত্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কামশক্তি ও ক্রোধশক্তির সমতা এবং এগুলো শরীয়তের অনুগত হওয়া। এ বিষয়টি দুই উপায়ে অর্জিত হয়। প্রথম, আল্লাহ্ তাআলার দান হিসেবে। অর্থাৎ, জন্মলগ্ন থেকে মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী ও চরিত্রবান হবে। কাম ও ক্রোধ তার উপর প্রবল হবে না; বরং উভয়টি শরীয়তের অনুগত থাকবে। এরূপ ব্যক্তি তালীম ছাড়াই আলেম হয়ে যায়। যেমন হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এমন বিষয় মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে থাকা অবান্তর নয়। অধিকাংশ শিশু শুরু থেকেই দাতা, নির্ভীক ও স্পষ্টভাষীরূপে জন্ম গ্রহণ করে। কতক এর বিপরীত হয়, কিন্তু অন্যদের সাথে মেলামেশায় এটা তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। আবার কখনও শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় উপায়- অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে চরিত্র অর্জন করা। অর্থাৎ নফ্সকে এমন কাজে নিয়োজিত করা, যদ্দারা চরিত্রের প্রার্থিত বিষয় হাসিল হয়ে যায়। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি দানশীলতার চরিত্র অর্জন করতে চায়, সে কষ্ট সহকারে দানশীলদের কাজ অর্থাৎ অর্থ ব্যয় অবলম্বন

করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে সব সময় এ কাজ করতে থাকবে। অবশেষে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। ফলে সে দানশীল হয়ে যাবে। শরীয়তের উৎকৃষ্ট চরিত্রাবলী এমনিভাবে অর্জিত হতে পারে। এর চূড়ান্ত হচ্ছে, এ কাজে সংশিষ্ট আনন্দ অনুভব করবে। উদাহরণতঃ দানশীল তাকেই বলা হবে, যে অর্থব্যয় করে আনন্দ অনুভব করে। হাদীসে আছে ঃ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلٰوةِ –নামাযে আমার চোখের শীতলতা নিহিত আছে। যে পর্যন্ত এবাদত ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন খারাপ মনে হবে এবং নফস কঠিন মনে করবে, সে পর্যন্ত ত্রুটি থেকে যাবে, পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ –নিশ্চয় এটা কঠিন, কিন্তু বিনয়ীদের জন্যে কঠিন নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اُعْبُدِ اللّٰهَ فِى الرِّضَاءِ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَفِى الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদত সন্তুষ্টির অবস্থায় কর। যদি সক্ষম না হও, তবে অসহনীয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক বরকত আছে।

উপস্থিত সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট নয় যে, কখনও এবাদতে মজা পাবে ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হবে এবং কখনও হবে না; বরং মজা পাওয়া ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হওয়া আজীবন অব্যাহত থাকতে হবে। এর পর বয়স যতই বাড়বে, এই সৌভাগ্য অধিক দৃঢ় হবে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখন প্রশ্ন করা হল, সৌভাগ্য কি? তখনও তিনি বললেন ঃ

طُوْلُ الْعُمْرِ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ –অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যে দীর্ঘজীবী হওয়া।

এদিক দিয়েই নবীগণ ও ওলীগণ মৃত্যুকে খারাপ মনে করতেন। কেননা, দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। সুতরাং দীর্ঘ জীবনের কারণে এবাদত যত বেশী হবে, ততই সওয়াব বেশী হবে এবং নফস পবিত্র ও পবিত্রতম হবে। এছাড়া এবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরের উপর তার প্রভাব হওয়া। এই প্রভাব তখনই হবে, যখন এবাদত অধিক দীর্ঘ ও অধিক স্থায়ী হয়। এখন জানা দরকার, চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য নফস থেকে জাগতিক মহব্বত দূর হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর মহব্বত তাতে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া, এমনকি তার কাছে আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন কিছু না থাকা। সেমতে ধন-সম্পদও এমন বিষয়ে ব্যয় করবে, যদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং কাম ক্রোধকেও এমনভাবে কাজে লাগাবে, যাতে আল্লাহকে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এটা তখন হবে, যখন এসব কাজ শরীয়ত ও বিবেক অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, এর পর এ ধরনের কাজে মজাও পায়। যদি কেউ নামাযে শান্তি ও চোখের শীতলতা পায় কিংবা এবাদত সুখকর মনে হতে থাকে, তবে এটা মোটেই অবান্তর নয়। অভ্যাসের কারণে নফসের মধ্যে এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে। দেখ, নিঃস্ব জুয়াড়ি জুয়া খেলে কেমন আনন্দ পায়! অথচ যে অবস্থায় সে পতিত তাতে যদি অন্যরা পতিত হয়, তবে জুয়া ছাড়াই জীবন অসহনীয় হয়ে যাবে। জুয়ার কারণে ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়, পরিবারে বিশৃংখলা দেখা দেয়, এর পরও জুয়ার প্রতি ভালবাসা ও টান লেগেই থাকে। চোর-পকেটমারদের উপর কেমন বেত্রাঘাত বর্ষিত হয়, হাত কাটা হয়; কিন্তু তারা একে গর্বের বিষয় মনে করে এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করে আনন্দিত হয়। এমনকি, তাদের দেহ কেটে খন্ড খন্ড করা হলেও তারা চোরাই মালের সন্ধান দেয় না এবং সঙ্গী চোরদের নাম বলে না। এটা এ কারণেই যে, তারা তাদের কাজকে বাহাদুরীর চরমোৎকর্ষ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সুতরাং অভ্যাসের কারণে বাতিল বিষয়ে এমন আনন্দ পাওয়া গেলে সত্য বিষয়ে দীর্ঘ দিন অভ্যাস করলে তাতে আনন্দ পাওয়া যাবে না কেন?

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্রতা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ, প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে এসব কাজ করলে অবশেষে তা স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হয়। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি 'ফকীহ' হতে চায়, তবে প্রথমে সে ফকীহদের ক্রিয়াকর্ম যথারীতি অনুশীলন করবে। অর্থাৎ ফেকাহ্ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহ বার বার মুখে উচ্চারণ করবে; যাতে অন্তরের উপর ফেকাহর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এটা হয়ে গেলে সে ফকীহ্ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে দানশীল, সাধু, সহনশীল ও বিনম্র হতে চায়, তার উচিত শুরুতে এহেন লোকদের ক্রিয়াকর্ম মনের উপর জোর দিয়ে সম্পন্ন করা, যাতে আস্তে আস্তে এসব কাজ তার স্বভাবে স্থান করে নেয়। এটা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ফেকাহ্র অন্বেষী ব্যক্তি যেমন একদিন অনুশীলন বন্ধ রাখলে ফেকাহ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং একদিনের অনুশীলন দ্বারা ফকীহ হয়ে যায় না, তেমনি যেব্যক্তি সৎকর্ম দ্বারা আত্মশুদ্ধি চায়, সে

একদিনের এবাদত দ্বারা এই মর্তবা পেতে পারে না এবং একদিনের অবাধ্যতা দ্বারা এই মর্তবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। একটি কবীরা গোনাহ্ চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কারণ হয় না- বুযুর্গগণের এই উক্তির অর্থ তাই। হাঁ, একদিনকে কর্মহীন রাখা দ্বিতীয় দিনকে কর্মহীন রাখার কারণ হয়। এর পর ক্রমে ক্রমে মন অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে একদিন আরব্ধ কর্মই পরিত্যাগ করে বসে। অনুরূপভাবে একট সগীরা গোনাহ্ করলে সে আরেকটি সগীরা গোনাহকে টেনে আনে। সুতরাং একদিনের বন্ধকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

চরিত্র সংশোধনের উপায়

জানা উচিত যে, মনের চিকিৎসা দেহের চিকিৎসার অনুরূপ। অধিকাংশ দেহ সুস্থ ও সমতাবিশিষ্টই হয়ে থাকে। এর পর খাদ্য ও অন্যান্য কারণে পাকস্থলীতে ত্রুটি দেখা দেয় এবং দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে মনও বিশুদ্ধ এবং সমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর পর বাইরের প্রভাব দ্বারা তা কলুষিত হয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ -

-প্রত্যেক শিশু মূল ঈমানের উপর জন্মগ্রহণ করে, এর পর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজারী বানায়।

দেহ যেমন শুরুতে পূর্ণাঙ্গ হয় না; বরং লালন-পালন ও খাদ্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ হয়, তেমনি নফসও অপূর্ণ জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ণতার যোগ্যতা তার মধ্যে থাকে। আত্মশুদ্ধি, চরিত্র সংশোধন ইত্যাদি দ্বারা পরে কামেল হয়ে যায়। দেহ সুস্থ হলে চিকিৎসক কেবল সুস্থতা অক্ষুণ্ন রাখার উপায় করে, আর দেহ অসুস্থ হলে চিকিৎসক স্বাস্থ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। এমনিভাবে মানুষের নফস পাক সাফ হলে তাকে তেমনি রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর যদি নফসে কোন পূর্ণতার গুণ না থাকে, তবে তা অর্জন করার ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে।

যে কারণে দেহের সমতা বিনষ্ট হয়, তার বিপরীত বস্তু দ্বারা দেহের চিকিৎসা করা হয়। উদাহরণতঃ উত্তাপের কারণে রোগ হলে তার চিকিৎসা শৈত্য দ্বারা করা হয়।এমনিভাবে আন্তরিক রোগের চিকিৎসাও তার বিপরীতদভ বস্তু দ্বারা হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ মূর্খতার চিকিৎসা শিক্ষা দ্বারা, কৃপণতার চিকিৎসা দানশীলতা দ্বারা এবং অহংকারের

চিকিৎসা বিনয় দ্বারা হয়। দৈহিক রোগে ওষুধের তিক্ততা সহ্য করতে হয় এবং মনে চায় এমন কুপথ্য থেকে সবর করতে হয়। এমনিভাবে আন্তরিক রোগে সাধনার তিক্ততা এবং চিকিৎসার কষ্ট বরদাশত করা দরকার; বরং এ ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন আরও বেশী। কেননা, মৃত্যু হলে দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি হয়ে যায়; কিন্তু অন্তরের রোগ এমন যে, মৃত্যুর পরও অনন্তকাল পর্যন্ত থেকে যায়। দৈহিক রোগের চিকিৎসক যদি সকল প্রকার রোগীকে একই ওষুধ সেবন করায়, অধিকাংশ রোগী মারা যাবে। এমনিভাবে আন্তরিক রোগের চিকিৎসক মুর্শিদ ও ওস্তাদ সকল মুরীদকে একই লাঠি দিয়ে হাঁকালে তাদেরও সর্বনাশ না হয়ে গত্যন্তর নেই। মুর্শীদের উচিত মুরশীদের রোগ, অবস্থা, বয়স ও মেযাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যে, তার দ্বারা কোন্ প্রকার সাধনা সম্ভবপর। এটা জানার পর মুর্শিদ তার দ্বারা সাধ্যানুযায়ী কষ্টের কাজ নেবে। উদাহরণতঃ মুরীদ মূর্খ হলে এবং শরীয়তের বিধি-বিধান না জানলে প্রথমে তাকে ওযু,নামায ও বাহ্যিক এবাদত শিক্ষা দেবে। সে হারাম ধন-সম্পদ ও গোনাহে মশগুল থাকলে তা বর্জন করার আদেশ দিবে। যখন তার বাহ্যিক অবস্থা বাহ্যিক এবাদতের অলংকারে অলংকৃত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ্য গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন অবস্থার ইঙ্গিতে তার অভ্যন্তরের দিকে মনোযোগ দিয়ে তার চরিত্র ও আন্তরিক রোগ পর্যবেক্ষণ করবে। যদি জানা যায় যে, তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, তবে সেগুলো খয়রাত করতে বলবে, যাতে ধন-সম্পদের চিন্তা থেকে মন মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি মুরীদের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে বাজারে ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে পাঠিয়ে দেবে। কেননা, নফসের ঔদ্ধত্য ও অহমিকা লাঞ্ছনা ছাড়া দূর হয় না। ভিক্ষার চেয়ে অধিক লাঞ্ছনার কোন কাজ নেই। অহংকার দূর না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখবে। কারণ, ঔদ্ধত্য ও অহংকার অন্তরের মারাত্মক রোগ। আর যদি মুরীদের মধ্যে দৈহিক পারিপাট্য প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে ময়লা ও আবর্জনার জায়গায় ঝাড়ু দিতে বলবে এবং বাবুর্চিখানা ও ধোঁয়ার জায়গায় বসতে বলবে, যে পর্যন্ত তার মেযাজ থেকে পরিপাট্য হটে না যায়। কেননা, যারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি করে, তাদের মধ্যে ও নববধূর মধ্যে কি পার্থক্য? মানুষ তার দেহের পূজা করুক অথবা মূর্তির আরাধনা করুক- এতেও কোন তফাৎ নেই। কেননা, যখন অন্যের এবাদত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা থেকে আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে আপন নফস ও প্রতিমা উভয়ই সমান। যদি

মুরীদের মধ্যে আহারের লালসা প্রবল দেখা যায়, তবে তাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রোযা রাখাবে, কম খাওয়াবে এবং সুস্বাদু খাদ্য পাকিয়ে অন্যকে খাওয়াতে বলবে– নিজে খাবে না। সবরের অভ্যাস ও খাওয়ার লোভ দূর না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখবে। যদি জানা যায়, মুরীদ যুবক ও বিবাহযোগ্য; কিন্তু স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম, তবে তাকে রোযা রাখার আদেশ করবে। এতে খাহেশ না কমলে বলবে যে, রাতে পানি দিয়ে ইফতার কর এবং দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় খানা খাও– পানি পান করো না। এছাড়া গোশত ও তরকারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেবে– যাতে তার নফস লাঞ্ছিত হয় এবং খাহেশ কমে যায়। কেননা, শুরুতে ক্ষুধা অপেক্ষা ভাল কোন চিকিৎসা নেই। যদি মুরীদের মধ্যে ক্রোধ প্রবল দেখা যায়, তবে সহনশীলতার আদেশ করবে এবং কোন বদমেযাজ ব্যক্তির সাথে দিয়ে তার আনুগত্য করতে বলবে। এভাবে তার নফস সহনশীলতায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সেমতে কোন কোন বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা স্বীয় নফসকে সহনশীলতায় অভ্যস্ত এবং ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস করার জন্যে এমন লোকদের মজুরি করতেন, যারা উঠতে বসতে গালি দিত। এভাবে তারা নফসকে সবর করতে বাধ্য করতেন এবং ক্রোধ দাবিয়ে রাখতেন। হিন্দু যোগীরা এবাদতে আলস্য দূর করার জন্যে সারারাত একই অবস্থায় দন্ডায়মান থাকে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে অন্তরের চিকিৎসার পদ্ধতি জানা যায়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেক রোগের জন্যে আলাদা আলাদা চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা নয়। এটা পরে বর্ণিত হবে। এখানে উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, এক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে চলা। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র কথায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى -

–যে তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে ফিরিয়ে রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

যদি কোন ব্যক্তি খাহেশ বর্জনের সংকল্প করার পর খাহেশের উপকরণাদির সম্মুখীন হয়, তবে একে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে নেবে। তখন উচিত হবে সবর করা এবং সংকল্পে অটল থাকা। কেননা, সংকল্প ছেড়ে দিলে নফস তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বরং সংকল্প ভঙ্গ করলে নিজের জন্যে একটি শাস্তি নির্দিষ্ট করে নেবে, যা

মোরাকাবা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শাস্তি দিয়ে সতর্ক না করলে নফস প্রবল হয়ে খাহেশ অনুযায়ী কাজ করবে। ফলে সাধনা বরবাদ হয়ে যাবে।

অন্তরের রোগ ও স্বাস্থ্যের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ একটি বিশেষ কাজের জন্যে সৃজিত হয়েছে। যদি সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কাজ সাধিত না হয় কিংবা অস্থিরতা সহকারে সাধিত হয়, তবে অঙ্গটিকে সুস্থ বলা হবে না। উদাহরণতঃ ধরতে না পারা হাতের রোগ এবং দেখতে না পারা কিংবা দেখা কঠিন হওয়া চোখের রোগ। অনুরূপভাবে অন্তরের রোগ তাকে বলা হবে, যার কারণে অন্তর তার বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম না হয়। অন্তরের বিশেষ কাজ হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মারেফত, মহব্বত, এবাদত এবং আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা আনন্দ পাওয়া। এছাড়া প্রত্যেক বস্তুর খাহেশের উপর এই আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং এরই জন্যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে সাহায্য চাওয়া ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

—আমি মানব ও জিনকে কেবল আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। এ থেকে জানা গেল, মানব অন্তরের বিশেষ কাজ হচ্ছে এবাদত ও আল্লাহ্‌র মারেফত। আসলে এটাই হওয়া উচিত, যাতে মানুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেননা, পানাহার, সহবাস ও দেখার ক্ষেত্রে মানুষ জন্তু থেকে পৃথক নয়। বরং এসব বস্তুকে মূল স্বরূপ অনুযায়ী জানার ক্ষেত্রে পৃথক। সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। তাই কেউ যদি সকল বস্তু চেনে এবং সৃষ্টাকে না চেনে, তবে সে কিছুই চিনল না। আল্লাহ্‌কে চেনার আলামত হচ্ছে তাঁর মহব্বত। যে আল্লাহ্‌কে চিনে নেয়, সে তাঁর মহব্বতে বিভোর হয়ে যায়। মহব্বতের চিহ্ন হচ্ছে, সে আল্লাহ্‌র উপর দুনিয়া, দুনিয়াস্থিত সবকিছু এবং আপন প্রিয় বস্তুসমূহকে অগ্রাধিকার দেবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوه حتى ياتى الله بامره ـ

–বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, সমাজ, অর্থসম্পদ, যা উপার্জন কর, ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দার ভয় কর এবং বাসভবন, যা তোমরা পছন্দ কর, তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা অপেক্ষা, তবে আল্লাহ্র আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুতরং যার কাছেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তু অধিক প্রিয় হয়, তার অন্তর রুগ্ন। এগুলো হচ্ছে অন্তর রোগের আলামত। এ বর্ণনা থেকে জানা গেল, সকল অন্তর রুগ্ন। তবে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেছেন, তার কথা ভিন্ন। কতক রোগ এমন হয়, যা রোগী জানতে পারে না। অন্তর রোগের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়ে থাকে। তাই মানুষ গাফেল থাকে। যদি জেনেও নেয়, তবে চিকিৎসার তিক্ততায় সবর করা কঠিন হয়। কেননা, এর চিকিৎসা হচ্ছে খাহেশের বিরোধিতা করা। নফসের মধ্যে সবর করার সামর্থ্য থাকলেও কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক পায় না। কেননা, এ রোগের চিকিৎসক আলেম সম্প্রদায়। তারা স্বয়ং এ রোগে আক্রান্ত। সুতরাং তারা যখন নিজেদেরই চিকিৎসা করে না, তখন অপরের চিকিৎসা কিরূপে করবে? এদিক দিয়ে অন্তরের রোগ দূরারোগ্য।

এখন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভের আলামত শুনা উচিত। যদি চিকিৎসাধীন রোগটি কৃপণতা হয়, যা ধ্বংস ও আল্লাহ্ থেকে দূরত্বের কারণ, তবে এর চিকিৎসা ধন–সম্পদ দান ও ব্যয় দ্বারা করতে হবে। কিন্তু ধন-সম্পদ এই পরিমাণ ব্যয় করবে যেন, অপব্যয় না হয়ে যায়। নতুবা অন্য এক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে। বরং মধ্যবর্তী স্তর অবলম্বন করতে হবে, যা কৃপণতা ও অপব্যয়ের প্রান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত । উদাহরণতঃ যদি ধন-সম্পদ হকদারদেরকে দেয়ার তুলনায় আটকে রাখা এবং সঞ্চয় করা সহজ ও মিষ্ট মনে হয়, তবে জানতে হবে যে, কৃপণতার প্রাধান্য রয়েছে। তখন দান-খয়রাত অধিক করা দরকার। পক্ষান্তরে যদি হকদার নয়, এমন লোকদেরকে দেয়া আটকে রাখার তুলনায় সহজ ও মিষ্ট মনে হয় তবে অপব্যয় প্রবল বলে মনে করে নেবে। এমতাবস্থায় ধন-সম্পদ আটকে রাখার প্রতি মনোনিবেশ করবে। এভাবে নফসের ক্রিয়াকর্ম দেখে বুঝে নিতে থাকবে। যে পর্যন্ত অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ থেকে অন্তর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং ব্যয় করা ও আটকে রাখা এতদুভয়ের কোনটি না করে; বরং ধনসম্পদের অবস্থা পানির মত হয়ে যায় যে, আটকে রাখলেও কোন অভাবগ্রস্তের জন্যে এবং ব্যয় করলেও অভাবগ্রস্তের জন্যেই ব্যয় করা হয়। যে অন্তর এরূপ হয়ে যাবে, সে নিশ্চিন্তে তার

পরওয়ারদেগারের সামনে যাবে। আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সেও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। সে নৈকট্যশীল বান্দা অর্থাৎ পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের দলে শামিল হবে।

নিজের দোষ কিরূপে চিনা যায়?

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারও মঙ্গল করতে চান, তখন নিজেই তার দৃষ্টিকে তার দোষত্রুটির দিকে ফিরিয়ে দেন। সুতরাং যার বোধশক্তি প্রখর হয়, তার সামনে তার দোষ গোপন থাকে না। দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিকিৎসাও সম্ভবপর হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয়, মানুষ নিজেদের বড় বড় দোষ সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও অপরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দোষও জানে।

অতএব যে কেউ নিজের দোষ জানতে চায়, তার উপায় চারটি। প্রথম, যে মুর্শিদ নফসের দোষ ও গোপন বিপদ জানতে পারে, তার সামনে বসা এবং নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দেয়া। এর পর যে সাধনা সে বলে দেয়, তদনুযায়ী আমল করা । মুরীদ ও মুর্শিদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে, মুর্শিদ মুরীদের দোষ ও প্রতিকার উভয়টি বলে দেয়। কিন্তু আজ-কাল এরূপ মুর্শিদ খুবই বিরল।

দ্বিতীয় উপায়, নিজের কোন ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জ্ঞানী বন্ধুকে বলে দেবে যে, আমার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং আমার চরিত্র, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজ-কর্মের মধ্যে যে দোষ দেখ, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। প্রধান প্রধান মুসলিম মনীষীগণ তাই করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্র রহমত হোক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে আমাকে আমার দোষ সম্পর্কে অবগত করে। তিনি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে নিজের দোষ জিজ্ঞেস করতেন। একবার হযরত সালমান তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি বললেন ঃ আমার সম্পর্কে এমন কোন কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কি, যা তোমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে? তিনি আরজ করলেন ঃ আমাকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করুন। এর পর হযরত ওমর পীড়াপীড়ি সহকারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আপনি দস্তরখানে দু'প্রকার ব্যঞ্জন একত্রিত করেন এবং আপনার কাছে দু'প্রকার পোশাক আছে– এক প্রকার দিনের এবং এক প্রকার রাত্রের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আরও কিছু শুনেছ? সালমান জওয়াব দিলেন ঃ না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এ দুটি দোষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাক। এগুলোর যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। তিনি

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)- কে জিজ্ঞেস করতেন ঃ আপনি মোনাফেকদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনেক কিছু জানেন। বলুন, আমার মধ্যে মোনাফেকীর কোন আলামত আছে কি না? সোবহানাল্লাহ, এত উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি নিজের নফসকে কতটুকু দোষী মনে করতেন! সুতরাং যে কেউ অধিক বোধশক্তি ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবে, সে দোষ কম করবে এবং নিজেকে অধিক দোষী মনে করবে। আজ-কাল এমন বন্ধু পাওয়া দুষ্কর, যে চক্ষুলজ্জা দুরে রেখে দোষ বলে দিবে। আজ-কালকার বন্ধু হিংসুটে ও স্বার্থপর। ফলে যেটা দোষ নয়, সেটাকেও দোষ মনে করে অথবা খোশামোদের কারণে দোষ গোপন করে। এ কারণেই দাউদ তায়ী মানুষের সাথে উঠাবসা বর্জন করেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করলে আমার লাভ কি, যারা আমার দোষ গোপন রাখে। মোট কথা, ধার্মিক লোকদের বাসনা এটাই থাকে যে, অপরের বলে দেয়ার কারণে তারা নিজেদের দোষ সম্পর্কে অবহিত হবেন। কিন্তু এখন যমানা এমন হয়ে গেছে যে, কেউ উপদেশের কথা বললে এবং দোষ প্রকাশ করলে তাকে বড় দুশমন গণ্য করা হয়। এটা ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, অসচ্চরিত্রতা সর্প ও বিচ্ছুর মত। যদি কেউ আমাদেরকে বলে, তোমার কাপড়ে বিচ্ছু রয়েছে, তবে আমাদের তার কাছে ঋণী হওয়া এবং খুশী হয়ে বিচ্ছুকে আলাদা করতে ও মেরে ফেলতে সচেষ্ট হওয়া উচিত! অথচ বিচ্ছুর বিষ মাত্র একদিন অথবা আরও কম সময় থাকে। আর অসচ্চরিত্রতার শাস্তি মৃত্যুর পরও হাজারো বছর পর্যন্ত থাকে! কিন্তু অসচ্চরিত্রতার কথা কেউ বললে আমরা তার প্রতি খুশী এবং তা দূর করতে সচেষ্ট হই না; বরং এর বিপরীতে উপদেশদাতার কোন দোষ বলতে শুরু করে দেই যে, তোমার মধ্যেও অমুক দোষ আছে। এটা অধিক গোনাহের কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার চিহ্ন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন সঠিক পথ দেখান এবং আমাদের দোষ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে তার চিকিৎসায় ব্যাপৃত করে দেন। কেউ কোন দোষ বলে দিলে আমরা যেন তার কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ হই।

তৃতীয় উপায় হচ্ছে, নিজের দোষ শত্রুর মুখ থেকে জেনে নেয়া। কেননা, শত্রুরা ছিদ্রান্বেষী হয়ে থাকে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষ এ ব্যাপারে বন্ধুর তুলনায় ছিদ্রান্বেষী শত্রু দ্বারা অধিক উপকৃত হতে পারে। কেননা, বন্ধু খোশামোদের কারণে দোষ প্রকাশ করে না। কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে, মানুষ জন্মগতভাবে শত্রুর উক্তিকে মিথ্যা ও হিংসা-প্রণোদিত জানে। তবে অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী ব্যক্তিগণ শত্রুর কথা দ্বারাও উপকৃত হন।

চতুর্থ উপায় হচ্ছে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে খারাপ যা দেখবে, নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, মুমিনগণ একজন অপরজনের আয়না। অপরের দোষ দেখে তারা নিজেদের দোষ জেনে নেয়। তারা জানে যে, প্রকৃতি সব মানুষের কাছাকাছি হয়ে থাকে। যে দোষ একজনের মধ্যে থাকে, তার মূল অপরের মধ্যে থাকবে কিংবা আরও বেশী থাকবে। এই শাসনপদ্ধতি খুবই উত্তম। একে কার্যকর করলে মুর্শিদ ও আদব শিক্ষাদাতার কোন প্রয়োজন থাকে না। হযরত ঈসা (আঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাকে কে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল? তিনি বললেন ঃ আমাকে কেউ শিষ্টাচার শেখায়নি। মূর্খের মূর্খতা আমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে। তাই আমি একে পরিহার করেছি।

কামবর্জন আন্তরিক রোগের চিকিৎসা

উপরোক্ত বর্ণনা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মানুষের অন্তশ্চক্ষু খুলে যাবে এবং অন্তরের যাবতীয় রোগ তার চিকিৎসাসহ এলেম ও একীনের নূর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। যদি কেউ এতে অক্ষম হয়, তবে তার উচিত তাকলীদ তথা অনুসরণের পন্থায় ঈমান আনা। কেননা, ঈমান এবং এলেমের স্তর আলাদা। এলেম ঈমানের পরে অর্জিত হয় এবং তার মর্তবাও ঈমানের উপরে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

–তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন এবং যারা এলেমপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্তবা উঁচু করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কামপ্রবৃত্তির বিরোধিতা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সিঁড়ি, কিন্তু এর কারণ ও রহস্য জানে না, সে মুমিন। আর যখন সে কারণ ও রহস্যও অবগত হয়ে যায়, তখন সে আলেম। وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আল্লাহ তাদের প্রত্যেককেই পুণ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কামপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের এই উপকারিতা বিশ্বাস করা কোরআন ও বিজ্ঞজনদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনে বলা হয়েছে–

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

–এবং যে নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَمْسِ شَدَائِدَ مُؤْمِنٌ يَحْسُدُهُ وَمُنَافِقٌ يَبْغِضُهُ وَكَافِرٌ يُقَاتِلُهُ وَشَيْطَانٌ يُضِلُّهُ وَنَفْسٌ تُنَازِعُهُ ـ

–মুমিন ব্যক্তি পাঁচটি সংকটের মধ্যে থাকে– এক, মুমিন, যে তার প্রতি হিংসা রাখে। দুই, মোনাফেক, যে তার সাথে শত্রুতা করে। তিন, কাফের, যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। চার, শয়তান, যে তাকে বিভ্রান্ত রাখে। পাঁচ, নফস, যে তার সাথে তর্ক করে।'

এতে বর্ণিত হয়েছে, মানুষের নফস তার সাথে তর্ক করে বিধায় সাধনা করা জরুরী। এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন– হে দাঊদ, তোমার অনুচরবর্গকে খাহেশের খাদ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, যে সকল অন্তর জাগতিক খাহেশের সাথে জড়িত, তারা আমা থেকে আড়ালে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্যে, যে বর্তমানের খাহেশকে ভবিষ্যত অদেখা ওয়াদার জন্যে ছেড়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে বলেছিলেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ ـ

–তোমাদেরকে মারহাবা, তোমরা ক্ষুদ্র জেহাদ থেকে বৃহৎ জেহাদের দিকে ফিরে এসেছ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ বৃহৎ জেহাদ কি? তিনি বললেন, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। তিনি আরও বলেন ঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ ـ

–মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যে আপন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে।

হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ নফসের চিকিৎসা অপেক্ষা কঠিনতর চিকিৎসা আমি দেখিনি। এটা কখনও উপকারী হয় এবং কখনও ক্ষতিকর। আবুল আব্বাস মুসেলী আপন নফসকে বলতেন ঃ তুমি তো শাহজাদাদের সাথে দুনিয়ার আনন্দ পাও না এবং আখেরাতের অন্বেষণে এবাদতকারীদের সাথে কষ্ট সহ্য কর না। তুমি কি আমাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যস্থলে বন্দী করবে? তোমার লজ্জা হয় না? হাসান বসরী

বলেন ঃ অবাধ্য ঘোড়াকেও নফসের চেয়ে অধিক শক্ত ল্যাগামের প্রয়োজন হয় না। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ নফসের বিরুদ্ধে সাধনার তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। সাধনা চার প্রকার -অল্প আহার করা, অল্প নিদ্রা যাওয়া, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কথা বলা এবং সকল মানুষের পীড়ন সহ্য করা। অল্প আহার করলে খাহেশের মৃত্যু ঘটে। অল্প নিদ্রায় নিয়ত পরিষ্কার হয়। কম কথা বললে বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। পীড়ন সহ্য করলে চূড়ান্ত মর্তবায় পৌঁছা যায়। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের দুশমন তিনটি- দুনিয়া, শয়তান ও নফস। সংসার নির্লিপ্ততার দ্বারা দুনিয়া থেকে শয়তান থেকে তার বিরোধিতা দ্বারা এবং নফ্স থেকে খাহেশ বর্জন দ্বারা আত্মরক্ষা করা উচিত। ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) বলেন ঃ আলেম ও দার্শনিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়েশ পরিত্যাগ না করে চিরন্তন আয়েশ লাভ করা যায় না। আবু ইয়াহইয়া ওয়াররাক বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাহেশের কাজ করে অঙ্গকে খুশী করে, সে অন্তরের কৃষিক্ষেত্রে পরিতাপের বীজ বপন করে। ওহায়ব ইবনে ওরদ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার খাহেশকে মহব্বত করে, সে যেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জন্যে প্রস্তুত থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের শাসনকর্তা হন, তখন একদিন যুলায়খা আরজ করল ঃ হে ইউসুফ, লালসা ও কামনা বাদশাহকে গোলামে পরিণত করেছে। আর সবর ও তাকওয়া গোলামকে বাদশাহ করেছে। হযরত ইউসুফ বললেন ঃ এটা তো আল্লাহ তা'আলারই উক্তি। তিনি বলেন ঃ

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ -

-নিশ্চয় যে তাকওয়া করে ও সবর করে, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

হযরত জুনায়েদ বলেন ঃ একবার আমি রাত্রে জাগ্রত হয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। কিন্তু সব সময় যে আনন্দ পেতাম, তা পেলাম না। এর পর ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছা করলাম। তাও সম্ভব হল না। এর পর বসে থাকতে চাইলাম। তাও সম্ভব হল না। অবশেষে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লাম। পথিমধ্যে দেখলাম, এক ব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। সে আমার পদশব্দ শুনে বলল ঃ হে আবুল কাসেম, আমার কাছে একটু আসুন। আমি বললাম ঃ মিয়া, তুমি পূর্বে তো আমাকে সংবাদ দাওনি। সে বলল ঃ ঠিক, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম আপনার মনকে আমার দিকে গতিশীল করার জন্যে। আমি বললাম ঃ এটা আল্লাহ

তা'আলা করেছেন। এখন বল, তোমার উদ্দেশ্য কি ? সে বলল ঃ নফ্‌স ব্যাধিগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসা কিভাবে হয় ? আমি জওয়াব দিলাম ঃ মানুষ যখন নফসের খাহেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন কষ্ট হয় বটে; কিন্তু এটাই তার চিকিৎসা। অতঃপর লোকটি তার নফসকে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ শুন, আমি তোকে সাতবার এ জওয়াবই দিয়েছিলাম। তুই মানলি না এবং বললি যে, জুনায়দের মুখে শুনবি। এখন শুনলি তো? এর পর লোকটি সেখান থেকে প্রস্থান করল। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। ইয়াযীদ রাক্কাশী বলতেন ঃ তোমরা আমাকে ঠান্ডা পানি দিয়ো না। আখেরাতে আবার কোথাও এ থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই। এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কখন কথা বলব ? তিনি বললেন ঃ যখন তোমার নফস চুপ থাকতে চায়। লোকটি আবার প্রশ্ন করল ঃ কখন চুপ থাকব? জওয়াব হল ঃ যখন সে কথা বলতে চায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে জান্নাতের জন্যে উৎসুক, সে যেন দুনিয়াতে খাহেশ থেকে আলাদা থাকে। এসব রেওয়ায়াতদৃষ্টে আলেম ও দার্শনিকগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য বুঝা যায় যে, পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের পথ খেয়ালখুশী বর্জন ও খাহেশের বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

যে বস্তু কবরে সঙ্গে যায় না, তা দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হওয়াই মূল সাধনা। অর্থাৎ আহার্য, পোশাক, বিবাহ, বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী বস্তু দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপকৃত হবে। এর বেশী যতটুকু হবে, ততটুকুর সাথেই মহব্বত ও মনের টান হবে। মৃত্যুর পর এর কারণেই পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা প্রকাশ করবে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে। তা হচ্ছে, অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত, মহব্বত ও চিন্তায় মশগুল থাকবে এবং একমাত্র তাঁরই হয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ চার প্রকার। প্রথম তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত থাকে এবং জীবিকার প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপই করে না। এরা হলেন সিদ্দীকীন। এই মর্তবা দীর্ঘ দিনের সাধনা ও খাহেশ বর্জনের পর অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সেই ব্যক্তি, যার অন্তর দুনিয়াতে নিমজ্জিত এবং আল্লাহর যিকির কেবল মুখে হয়, অন্তর দ্বারা নয়। এরূপ ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রকার সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া আখেরাত উভয়ের কাজে মশগুল, কিন্তু অন্তরের উপর আখেরাত প্রবল। এরূপ ব্যক্তি অগ্নিতে অবশ্য প্রবেশ করবে; কিন্তু অন্তরের উপর আল্লাহর যিকির যত

জোরদার হবে, তত শীঘ্রই মুক্তি পাবে। চতুর্থ প্রকার সেই ব্যক্তি, যে উভয়ের কাজে মশগুল; কিন্তু অন্তরের উপর দুনিয়া প্রবল। এ ব্যক্তি বেশী দিন দোযখে থাকবে এবং একদিন না একদিন মুক্তি পাবে। কেননা, তার অন্তরে দুনিয়া প্রবল হলেও সে আল্লাহর যিকির অন্তরের অন্তস্তল থেকে করত। এর ফলেই সে মুক্তি পাবে। ইলাহী, আমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান। আমীন।

কতক লোক বলে, বৈধ বস্তু দ্বারা আনন্দ লাভ করা বৈধ। সুতরাং এর কারণে আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হবে কেন? কিন্তু এটা তাদের খামখেয়ালী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ –দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক গোনাহের মূল। বৈধ বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা দুনিয়া ছাড়া কিছু নয়। এটাই দূরত্বের কারণ। "দুনিয়ার নিন্দা" অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার লাকাম পাহাড়ে ছিলাম। একটি ডালিম দেখে তা খেতে মন চাইল। সেমতে ডালিমটি ছিঁড়ে মুখে দিতেই টক মনে হল। আমি ডালিমটি ফেলে দিয়ে চলতে লাগলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখলাম। তার উপর বোলতা ভনভন করছিল। সে আমাকে দেখে বলল ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া ইবরাহীম– হে ইবরাহীম তোমাকে সালাম। আমি বললাম ঃ তুমি আমাকে চিনলে কিরূপে? সে বলল ঃ যে আল্লাহকে চেনে, তার সামনে কোন কিছু গোপন থাকে না। আমি বললাম ঃ তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ। আল্লাহর কাছে দোয়া কর না কেন, যাতে তোমাকে এই বোলতার কবল থেকে রক্ষা করেন? সে বলল ঃ আপনিও তো কামেল পুরুষ। ডালিমের খাহেশ থেকে আপনার অন্তরকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না কেন? বোলতার কষ্ট তো দুনিয়া পর্যন্তই। কিন্তু খাহেশের দুঃখ আখেরাত পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর আমি নিরুত্তর হয়ে সেখান থেকে চলে গেলাম। সিররী সকতী বলেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে আমার মন চাইছে যে, রুটি কিশমিশের ঘন রসে ভিজিয়ে খাই। কিন্তু আমি খাইনি।

এ থেকে জানা গেল, আখেরাতের পথে চলার জন্যে অন্তরের সংশোধন ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ নফসকে খাহেশ এবং বৈধ বস্তুর আনন্দ থেকে ফিরিয়ে না রাখা যায়। কেননা, বৈধ বস্তুর আনন্দের কারণে মানুষ নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে পড়ে যায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ গীবত ও অনর্থক কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করতে না চায়, তবে তার উচিত আল্লাহর

যিকির ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোন কথা উচ্চরণ না করা এবং চুপ থাকা। এতে তার কথা বলার খাহেশ ফানা হয়ে যাবে। এর পর যে কথা বলবে, তা হক এবং কথা বলা ও চুপ থাকা উভয়টি এবাদত হবে। এমনিভাবে যদি চোখের এই অভ্যাস প্রকাশ পায় যে, সে প্রত্যেক ভাল বস্তুর উপর পতিত হয়, তবে হারাম বস্তুর উপরও পতিত হবে। অন্যান্য খাহেশের বেলায়ও এরূপ বুঝতে হবে। কেননা, হারাম হালাল উভয়ের খাহেশ একটিই। তবে হারাম থেকে খাহেশকে আটকে রাখার আদেশ আছে। সুতরাং যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুকে যথেষ্ট মনে করার অভ্যাস গড়ে না তুললে খাহেশ প্রবল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বৈধ বিষয়াদির সামান্যতম বিপদ। এ ছাড়া আরও বড় বড় বিপদ হচ্ছে, দুনিয়ার আনন্দ পেয়ে নফস খুশী হয়, তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং মাতালের মত হয়ে যায়। অথচ এই খুশী তার জন্যে বিষতুল্য। এটা শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম অন্তরের মৃত্যু। কোরআন পাকের অনেক জায়গায় দুনিয়া ও দুনিয়ার কারণে আনন্দিত হওয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا

–তারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এর দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করেছে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

–আখেরাতের হিসাবে পার্থিব জীবন কিছুই নয়; কিন্তু সামান্য সম্ভোগ।

اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ـ

–জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য বৈ কিছু নয়।

এছাড়া সাবধানী অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করে পার্থিব আনন্দের অবস্থায় অন্তরকে কঠোর, অবাধ্য এবং যিকির দ্বারা কম প্রভাবিত পেয়েছেন, বিষণ্ন অবস্থায় নম্র, পরিষ্কার ও প্রভাবিত দেখেছেন। তারা জেনে নিয়েছেন যে, মানুষের মুক্তি এতেই নিহিত রয়েছে যে, তারা

সদা-সর্বদা বিষণ্ন এবং আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কারণাদি থেকে বহু দূরে থাকবে। এ কারণেই তারা হালাল-হারাম নির্বিশেষে সকল প্রকার খাহেশ থেকে সবর করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। তারা আরও জেনেছেন, হালাল খাহেশেরও হিসাব হবে, যা এক প্রকার আযাব। এসব কারণে তারা নিজেদেরকে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন এবং খাহেশের গোলামী ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উভয় জাহানের স্বাধীনতা এবং বাদশাহী গ্রহণ করেছেন। তারা নিজেদের নফসের সাথে এমন ব্যবহার করেছেন, যা বাজপাখীর সাথে পোষ মানানোর সময় করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে বাজপাখীকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয় এবং তার চক্ষু সেলাই করে দেয়া হয়, যাতে শূন্যে উড়া পরিত্যাগ করে, যার অভ্যাস পূর্বে ছিল। এর পর তাকে গোশ্‌ত খাওয়ানো হয়, যাতে মালিককে চেনে এবং তার ডাক শুনে তার কাছে চলে আসে। এমনিভাবে নফসও তার পরওয়ারদেগারকে চেনে না। তাই প্রথমে নির্জনবাস দ্বারা তার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়ে পরিচিত বিষয়সমূহ থেকে চক্ষু ও কর্ণের হেফাযত করা হয়। এর পর আল্লাহ্‌র যিকির ও প্রশংসার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। অবশেষে এর সাথেই অন্তরের ভালবাসা স্থাপিত হয়ে যায় এবং পার্থিব ভালবাসা যাবতীয় খাহেশসহ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এটা মুরীদের কাছে প্রথমে কঠিন মনে হয়; কিন্তু পরিণামে স্বাদ পেয়ে যায়। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দিলে প্রথমে কেমন ক্রন্দন করে। দুধের পরিবর্তে যে খাদ্য তার সামনে আনা হয়, তাকেও ঘৃণা করে; কিন্তু পরিণামে সে একেই ভাল মনে করে।

সচ্চরিত্রতার আলামত

মানুষ নিজের দোষ-ক্রটির খবর রাখে না। তাই যখন সামান্য সাধনা করে বড় বড় পাপকর্ম ছেড়ে দেয়, তখন মনে করতে থাকে যে, সে সংস্কৃতিবান, ভদ্র ও চরিত্রবান হয়ে গেছে। এখন সাধনার প্রয়োজন নেই। তাই সচ্চরিত্রতার আলামত বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা, সচ্চরিত্রতা সাক্ষাৎ ঈমান এবং অসচ্চরিত্রতা সাক্ষাৎ মোনাফেকী। কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের গুণাবলী এবং মোনাফেকদের স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করে দিয়েছেন। এগুলো সব সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতার ফল। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যাতে সচ্চরিত্রতার আলামত জানা হয়ে যায়। বলা হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -------- أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ .

–মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নামাযে বিনম্র হয়, যারা বাজে বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাকাত প্রদান করে, লজ্জাস্থানকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু আপন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নয়।

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ -------- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

–তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী,........ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا . الى اخر السورة .

–রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। তাদের সাথে যখন মূর্খরা তর্ক করতে চায় ,তখন তারা বলে, সালাম। যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা,আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাসস্থল হিসেবে এটা কত নিকৃষ্ট! তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। তারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অতএব নিজের অবস্থা সম্পর্কে যার মনে সংশয় দেখা দেয়, সে এসব আয়াতের আয়নায় নিজেকে পরখ করে দেখুক। যদি তার সকল অবস্থা আয়াতগুলোর সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, তবে তার সচ্চরিত্রতা অর্জিত হয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি কোন সঙ্গতি না থাকে, তবে এটা অসচ্চরিত্রতার আলামত হবে। পক্ষান্তরে যদি কিছু অবস্থা সঙ্গতিসম্পন্ন হয় এবং কিছু না হয়, তবে সেই পরিমাণ ত্রুটি আছে বুঝতে হবে। এমতাবস্থায় যা অর্জিত হয়েছে, তার হেফাযত করা এবং যা অর্জিত হয়নি, তা অর্জন করার জন্যে সচেষ্ট হবে। রসূলে করীম (সাঃ) মুমিনের অনেক

গুণ বর্ণনা করে সচ্চরিত্রতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদাহরণতঃ কয়েকটি রেওয়ায়াত এই ঃ

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ـ

–মুমিন সেই, যে তার ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ـ

–যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।

এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

–সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে– فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَصْمُتْ

–সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ اَخْلَاقًا اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوْتًا وَقُوْرًا فَادْنُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يُلَقِّنُ الْحِكْمَةَ

–মুমিনের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর, তার ঈমান অধিক পূর্ণাঙ্গ। তোমরা যখন মুমিনকে চুপচাপ গাম্ভীর্যপূর্ণ দেখ, তখন তার নিকটবর্তী হও। কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়।

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

–যাকে পুণ্য কাজ আনন্দিত করে এবং কুকর্ম দুঃখিত করে, সে মুমিন।

لَايَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

–মুমিনের জন্যে কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা জায়েয নয়।

اِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَحِلُّ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يُّفْشِىَ عَلٰى اَخِيْهِ مَا يَكْرَهُهُ ـ

–দু'ব্যক্তি আল্লাহর আমানতের উপর একত্রে উপবেশন করে। অতএব একজনের জন্যে হালাল হবে না যে, সে এমন কথা বলে যা অপরের জন্যে অপছন্দনীয় হয়।

কেউ কেউ সচ্চরিত্রতার সকল আলামত একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ সচ্চরিত্র সেই ব্যক্তি, যে অধিক লজ্জাশীল, অধিক উপদেশদাতা, কম কষ্টদাতা, স্বল্পভাষী, অধিক কর্মী, সত্যবাদী, সাধু, গম্ভীর, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, সন্তুষ্ট, সহনশীল, উত্তম সঙ্গী, পুণ্যবান, স্নেহশীল, প্রফুল্ল এবং যে কুভাষী, অপবাদদাতা, হিংসুটে, বিদ্বেষ পোষণকারী ও কৃপণ নয়, হিংসা ও শত্রুতা আল্লাহর নিমিত্তই করে, সন্তুষ্টি এবং মহব্বতও আল্লাহর ওয়াস্তেই পোষণ করে। এতটুকু বিশেষণ দ্বারা সচ্চরিত্র হওয়া যায়। রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে মুমিন ও মোনাফেকের আলামাত জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ هِمَّتُهُ فِى الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْمُنَافِقُ هِمَّتُهُ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْبَهَائِمِ

–মুমিনের সাহসিকতা নামায, রোযা ও এবাদতে এবং মোনাফেকের সাহসিকতা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায় পানাহারে হয়ে থাকে।

হযরত হাতেম আসাম (রহঃ) বলেন, মুমিন শিক্ষা গ্রহণের চিন্তায় আর মোনাফেক লোভ ও লালসায় মশগুল থাকে। মুমিন আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে কিছু আশা করে না, আর মোনাফেক আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের কাছে আশা করে। মুমিন আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের তরফ থেকে নিরাপদ ও নির্ভীক থাকে, আর মোনাফেক আল্লাহ ব্যতীত সকলকে ভয় করে। মুমিন ধন-সম্পদ দেয়– ধার্মিকতা দেয় না, আর মোনাফেক ধার্মিকতা দেয়– ধন সম্পদ দেয় না। মুমিন পুণ্য কাজ করে কাঁদে, আর মোনাফেক গোনাহ করে হাসে। মুমিনের কাছে নির্জনবাস ভাল মনে হয়, আর মোনাফেকের কাছে জমজমাট অবস্থা উত্তম বিবেচিত হয়। মুমিন চাষাবাদ করে এবং তা নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শংকিত থাকে, আর মোনাফেক মূলোৎপাটন করে ও শস্যের গোলা আশা করে। মুমিন জনশাসনে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে সংস্কার করে, আর মোনাফেক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে গোলযোগ সৃষ্টি করে। সচ্চরিত্রতার প্রথম পরীক্ষা নিপীড়নে সবর দ্বারা হয়। সুতরং যে অপরের অসচ্চরিত্রতার অভিযোগ করে, এটা তার নিজেরই অসচ্চরিত্রতার প্রমাণ। কেননা, সচ্চরিত্রতা যুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করার নাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মোটা পাড়ের নাজরানী চাদর পরিধান করে পথ চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আনাস (রাঃ)। জনৈক বেদুঈন পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাদর ধরে

এমন সজোরে টান মারল যে, চাদরের পাড় তাঁর ঘাড়ে বিদ্ধ হয়ে গেল। বেদুঈন বলল ঃ হে মুহাম্মদ, তোমার কাছে আল্লাহর যে ধন-সম্পদ রয়েছে, তা থেকে আমাকেও দাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেদুঈনের দিকে তাকালেন এবং হেসে কিছু দিয়ে দিলেন। তাঁর প্রতি কোরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা যখন চরমে পৌঁছে, তখন তিনি এই বলে দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ

–হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না।

কেউ কেউ বলেন, এ দোয়াটি তিনি ওহুদ যুদ্ধে করেছিলেন। মোট কথা, এসব কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর শানে এরশাদ করেন ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ –নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

বর্ণিত আছে, একদিন ইবরাহীম আদহাম কোন জঙ্গলে চলার সময় জনৈক সিপাহীর সাক্ষাৎ পান। সিপাহী জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি বান্দা (দাস)? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সিপাহী প্রশ্ন করল ঃ জনবসতি কোন্ দিকে? তিনি গোরস্থানের দিকে ইশারা করলে সিপাহী রেগে বলল ঃ আমি আবাদীর কথা জিজ্ঞেস করছি। তিনি বললেন ঃ গোরস্থানই আবাদী। এতে সিপাহী গোসসার আতিশয্যে তাঁর মস্তকে এমন বেত্রাঘাত করল যে, মস্তক ফেটে গেল। এর পর সিপাহী তাঁকে গ্রেফতার করে শহরে নিয়ে এল। পরিচিতরা এসে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলে সিপাহী সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। পরিচিতরা বলল ঃ সর্বনাশ করেছ। ইনি তো ইবরাহীম আদহাম। সিপাহী একথা শুনতেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ইবরাহীম আদহামের হস্তপদ চুম্বন করতে লাগল। এর পর লোকেরা ইবরাহীম আদহামকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কেন বললেন, আপনি বান্দা? তিনি বললেন ঃ সিপাহী আমাকে একথা জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি কার বান্দা? বরং সে শুধু বলেছে, তুমি কি বান্দা? আমি যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই বলে দিয়েছি, হাঁ, আমি বান্দা। এর পর সে যখন আমাকে বেত্রাঘাত করল, তখন আমি তার জন্যে জান্নাতের দোয়া করেছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে তো আপনার উপর যুলুম করেছে। তিনি বললেন ঃ আমার বিশ্বাস ছিল, তার এ যুলুমের কারণে আমি সওয়াব পাব । তাই আমি ভাল মনে করিনি যে, যার কারণে আমি সওয়াব পাব, আমার কারণে তার আযাব হোক।

আবু ওসমান হিরীকে এক ব্যক্তি পরীক্ষার উদ্দেশে দাওয়াতের বাহানায় আপন গৃহে ডেকে আনল। তিনি যখন তার গৃহে পৌঁছলেন, তখন লোকটি বলল ঃ এক্ষণে কিছু আহার্য যোগাড় করা সম্ভব হল না। তিনি ফিরে গেলেন। অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর লোকটি এসে বলল ঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে যা মওজুদ আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি যখন পুনরায় গৃহের দরজায় পৌঁছলেন, তখন লোকটি পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি আবার ফিরে গেলেন। লোকটি এমনিভাবে কয়েকবার ডেকে আনল এবং ফিরিয়ে দিল। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও মনঃক্ষুণ্ন হলেন না। এর পর লোকটি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল ঃ মাফ করবেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। সোবহানাল্লাহ, কি চরিত্র আপনার! তিনি বললেন ঃ তুমি আমার যে বিষয়টি দেখেছ, সেটি হচ্ছে কুকুরের স্বভাব। যখন ডাক, চলে আসে। যখন তাড়িয়ে দাও, চলে যায়।

আবু ওসমান হিরীরই আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদিন তিনি সওয়ার হয়ে এক গলিপথে গমন করছিলেন। উপর থেকে কেউ তাঁর উপর ছাই নিক্ষেপ করল। তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন এবং আল্লাহর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার সেজদা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি ছাই নিক্ষেপকারীকে ধমক দিলেন না কেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আগুনের যোগ্য তার উপর ছাই পড়লে গোসসা করা শোভা পায় না।

বর্ণিত আছে, হযরত আলী ইবনে মূসা (রঃ)-এর গায়ের রঙ শ্যামল ছিল। কারণ, তাঁর জননী ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত। নিশাপুরে তাঁর গৃহের কাছে একটি হাম্মাম ছিল। তিনি হাম্মামে যেতে চাইলে পরিচালক তাঁর জন্যে হাম্মাম খালি করে দিত। একদিন তিনি যখন হাম্মামে গেলেন, তখন পরিচালক দরজা ভিড়িয়ে কোন কাজে চলে গেল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে দরজা খুলে হাম্মামের ভিতরে গেল। সে হযরত আলী ইবনে মূসাকে দেখে মনে করল, হাম্মামের কোন খাদেম হবে। সে বলল ঃ উঠ, আমার জন্যে পানি আন। তিনি তার আদেশ পালন করলেন এবং আরও যা যা আদেশ হল সবই আনজাম দিলেন। হাম্মামের পরিচালক ফিরে এসে আগন্তুকের কাপড় দেখতে পেল এবং আলী ইবনে মূসার সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনল। অমনি সে ভয়ে পালিয়ে গেল। তিনি হাম্মাম থেকে বের হয়ে পরিচালকের নিকট খোঁজ নিয়ে জানলেন, সে ভয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ সে পালিয়ে গেল কেন? দোষ তো সে ব্যক্তির, যে তার বীর্য হাবশী মহিলার কাছে সমর্পণ করেছিল।

আবু আবদুল্লাহ্ খাইয়াত (দর্জি) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি দোকানে বসে কাপড় সেলাই করতেন। জনৈক অগ্নিপূজারী তাঁর কাছ থেকে কাপড় সেলাই করিয়ে নিত এবং শত্রুতাবশত মজুরি বাবদ অচল মুদ্রা দিয়ে যেত। তিনি এ মুদ্রা ফেরত দিতেন না এবং তাকে কিছু বলতেনও না। একদিন অগ্নিপূজারী মজুরি দিতে এসে তাঁকে পেল না। তাঁর শাগরেদ দোকানে বসা ছিল। তাকে মজুরি দিয়ে কাপড় চাইলে শাগরেদ অচল মুদ্রা দেখে ফিরিয়ে দিল। আবু আবদুল্লাহ এসে জানতে পেরে বললেন, তুমি ভাল করনি। এই অগ্নিপূজারী এক বছর ধরে এ কাজ করে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ মজুরি নিয়ে কূপে ফেলে দেই, যাতে সে কোন মুসলমানকে ধোঁকা দিতে না পারে।

সহল তস্তরীকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সচ্চরিত্রতা কি? তিনি বললেন ঃ সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রতিশোধ না নেয়া, নিপীড়ন সহ্য করা এবং যালেমের প্রতি অনুকম্পা করে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা। আহনাফ ইবনে কায়সকে প্রশ্ন করা হল, আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখলেন? তিনি বললেন ঃ কায়স ইবনে আসেমের কাছে। লোকেরা বলল ঃ তার সহনশীলতা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ একদিন তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। বাঁদী একটি কাবাবপূর্ণ শিক তাঁর কাছে নিয়ে এল। ঘটনাক্রমে শিকটি বাঁদীর হাত থেকে খসে গিয়ে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলের উপর পতিত হল। আঘাতের চোটে ছেলেটি মারা গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাঁদী ভয়ে কাপতে লাগল। তিনি বললেন ঃ ভয় করিস না। আমি তোকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

হযরত ওয়ায়েস কারনী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁকে যখন ডানপিটে ছেলেরা দেখত, তখন পাথর ছুঁড়ে মারতো। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ করে বলতেন ঃ ভাই সকল, যদি মারতেই হয়, তবে ছোট ছোট পাথর মার, যাতে আমার পা থেকে রক্ত বের না হয় এবং নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। একবার আহনাফ ইবনে কায়সকে জনৈক ব্যক্তি গালি দিতে শুরু করে। তিনি চুপচাপ চলে গেলেন এবং মহল্লার নিকটে পৌঁছে বললেন ঃ যদি মনে আরও কিছু গালি থেকে থাকে, তবে তাও বলে ফেল। কোথাও মহল্লার কোন বেওকুফ তোমার গালি শুনে তোমার উপর চড়াও না হয়।

হযরত আলী (রাঃ) একবার তাঁর গোলামকে ডাকলেন। সে জওয়াব দিল না। এর পর তিনি দ্বিতীয় বার ও তৃততীয় বার ডাকলেন, কিন্তু গোলামের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি স্বয়ং

গোলামের কাছে গিয়ে দেখলেন, সে দিব্যি শুয়ে আছে। তিনি বললেনঃ তুমি আমার ডাক শুননি? গোলাম বলল ঃ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ তা হলে জওয়াব দিলে না কেন? গোলাম আরজ করল ঃ আপনি মারবেন- এরূপ ভয় আমার মোটেই ছিল না। তাই অবহেলাবশত জওয়াব দেইনি। হযরত আলী বললেন ঃ যাও, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

মালেক ইবনে দীনারকে লক্ষ্য করে জনৈকা মহিলা বলল, হে রিয়াকার। তিনি বললেন ঃ তুমি চমৎকার এ নামটি বের করেছ, যা বসরার লোকেরা ভুলে গিয়েছিল।

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, সাধনার ফলে এসব পুণ্যাত্মাদের নফস শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং চরিত্র সমতার পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। এর ফলে তাঁরা আল্লাহর তকদীরে সন্তুষ্ট ছিলেন, যা সচ্চরিত্রতার চূড়ান্ত সীমা। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজকে ভাল মনে করে না এবং তাতে সন্তুষ্ট হয় না, তার চরিত্র নিঃসন্দেহে অসৎ।

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সচ্চরিত্রতা

শিশুদের চরিত্র গঠন একটি নেহায়েত জরুরী বিষয়। শিশুরা পিতামাতার কাছে একটি আমানত। শিশুর অন্তর একটি উৎকৃষ্ট মুক্তা, সরল, অকৃত্রিম, সকল চিত্র থেকে মুক্ত এবং প্রত্যেক চিত্র গ্রহণের যোগ্য হয়ে থাকে। এই অন্তরকে যেদিকে ঝুঁকানো যায়- উদাহরণতঃ যদি তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়া হয় এবং সততায় অভ্যস্ত করা হয়, তবে বড় হয়েও তাই করবে এবং উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এই সওয়াবে পিতামাতা, ওস্তাদ, আদব শিক্ষাদাতা সকলেই অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে কুশিক্ষায় অভ্যস্ত করা হয় এবং জানোয়ারদের মত বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয়, তবে শিশু নিশ্চিতই বরবাদ হয়ে যাবে এবং এর দায়-দায়িত্ব শিশুর মুরব্বির উপর বর্তাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

-মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।

পিতা যখন দুনিয়ার অগ্নি থেকে তার সন্তানদেরকে রক্ষা করে, তখন আখেরাতের অগ্নি থেকে রক্ষা করা আরও বেশী জরুরী হয়ে পড়ে। আখেরাতের অগ্নি থেকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে সন্তানকে শিষ্টাচার,

ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দেয়া, কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখা এবং সাজসজ্জা, বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তাকে তার দৃষ্টিতে হেয় করা, যাতে বড় হয়ে এগুলোর অন্বেষণ না করে। শুরু থেকেই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরী। সেমতে তাকে কোন পুণ্যবতী, ধর্মপরায়ণা ও হালালখোর মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা, হারামের দুধে বরকত হয় না। শৈশবে হারামের দুধ পান করলে তা বিবেকের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বড় হয়ে সে দুশ্চরিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শিশুর মধ্যে যখন কিছু সদ্বিবেচনা শুরু হয়, তখন তার অধিক দেখাশুনা করা জরুরী। লজ্জা-শরমের বিকাশ দ্বারা সদ্বিবেচনার সূচনা হয়। ফলে শিশু কতক কাজ-কর্ম লজ্জাবশত ছেড়ে দেয়। এটা এ কারণে হয় যে, তখন তার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধিরূপী নূরের ঝলক এসে যায় এবং সে কতক বিষয়কে কতক বিষয়ের তুলনায় খারাপ মনে করে। ফলে কুকর্ম করতে লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ্ তাআলার এ দানটি চরিত্রের সমতা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা জ্ঞাপন করে। এতে বুঝা যায়, বড় হয়ে সে পূর্ণ বুদ্ধিমান হবে। এমন লজ্জাশীল শিশুকে অযত্নে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং লজ্জা ও শিষ্টাচার আয়ত্তের কাজে তাকে সাহায্য করা দরকার।

শুরুতে শিশুর মধ্যে যে স্বভাব প্রবল হয়, তা হচ্ছে খাওয়ার বাসনা। অতএব এরই শিষ্টাচার তাকে শেখানো উচিত। অর্থাৎ সে ডান হাতে খাবে। খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ্ বলবে। সম্মুখভাগ থেকে খাবে। অন্যের আগে খাওয়া শুরু করবে না। খাদ্যের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকাবে না। তড়িঘড়ি করে খাবে না। উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবে। মুখে উপর্যুপরি লোকমা দেবে না। মাঝে মাঝে তরকারি ছাড়া শুধু রুটি খাওয়ার অভ্যাস করবে, যাতে সে বুঝে, তরকারি দিয়ে রুটি খাওয়া জরুরী নয়।

শিশুর সামনে অধিক ভোজনের নিন্দা করা উচিত। যারা অল্প ভোজন করে তার সামনে তাদের প্রশংসা করবে। অপরকে খানা দেয়া যে ভাল, এ বিষয়টিও তার দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলবে। পোশাকের মধ্যে সাদা পোশাক শিশুকে পছন্দ করানো উচিত। রঙীন ও রেশমী পোশাক সম্বন্ধে বলে দেবে, এগুলো নারীদের পোশাক। পুরুষেরা এগুলোকে খারাপ মনে করে।

এরপর শিশুকে মক্তবে পাঠিয়ে কোরআন হাদীস ও সৎকর্মপরায়ণদের গল্প শেখানো উচিত, যাতে তার মনে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুকে এশক ও প্রেমের কবিতা পাঠ করতে দেবে না। কেননা, এতে অন্তরে অনর্থের বীজ বপন করা হয়। শিশু কোন উত্তম কাজ

করলে তাকে পুরস্কৃত করবে। এতে সে খুশী হবে। এক, দু'বার খেলাফ কাজ করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, পর্দা উন্মোচন করবে না। বিশেষভাবে এমন কাজে যা শিশু নিজেই গোপন করে। কেননা, সে যদি জেনে নেয় যে, এ কাজটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় কিছু হয়নি, তবে ভবিষ্যতে আরও দুঃসাহসী হয়ে যাবে। পুনরায় এ খারাপ কাজটি করলে তাকে গোপনে শাসাবে। শিশুকে সদাসর্বদা শাসানো উচিত নয়। এতে সে তিরস্কারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ করার সাহস বেড়ে যায়। পিতার ন্যায় মাতাও শিশুকে মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং পিতার ভয় দেখাবে।

শিশুকে নরম বিছানা দেবে না, এতে তার দেহ শক্ত হয় এবং সে আরামপ্রিয় হয় না। এমনিভাবে পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারেও শিশুকে আরামপ্রিয় হতে দেয়া উচিত নয়।

মক্তব থেকে ফিরে আসার পর শিশুকে কোন ভাল খেলার অনুমতি দেয়া উচিত, যাতে মক্তবের শ্রম লাঘব হয়। কিন্তু এত বেশী খেলবে না যাতে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতটুকু খেলার অনুমতি না দিলে এবং শিক্ষায় সব সময় কঠোরতা করলে শিশুর মন মরে যায়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ফলে সে শিক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে। শিশু সদ্বিবেচনার বয়সে পৌঁছলে তাকে ওযু ও নামায শিক্ষা দেবে। রমযান মাসে কিছু কিছু রোযা রাখাবে।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী বলেন ঃ আমি তিন বছর বয়সে রাত্রে জাগ্রত হতাম এবং আমার মামা মুহাম্মদ ইবনে সেওয়ারকে নামায পড়তে দেখতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর যিকির কর না কেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমি বললাম ঃ কিভাবে যিকির করব? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন শয়ন কর, তখন তিনবার এ শব্দগুলো মনে মনে বলে নিবে- জিহ্বা নড়াচড়া করবে না; اَللّٰهُ مَعِىْ اَللّٰهُ نَاظِرِىْ اَللّٰهُ شَاهِدِىْ (আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ্ আমাকে দেখেন, আল্লাহ্ আমার সাক্ষ্যদাতা।) আমি কয়েক রাত্রি পর্যন্ত তাই করলাম এবং তাঁকে জানালাম। মামা বললেন ঃ এখন থেকে সাত বার বল। আমি তাই করলাম। এর পর তিনি আমাকে এগার বার বলতে আদেশ করলেন। আমি প্রত্যহ এগার বার বলতে শুরু করলে অন্তরে এর স্বাদ অনুভব করলাম। এক বছর পর মামা বললেন ঃ আমি তোমাকে যা শেখালাম, তা মনে রাখবে এবং সদাসর্বদা কবরে যাওয়া পর্যন্ত বলে যাবে। এটা উভয় জাহানে তোমার উপকারে আসবে। আমি

কয়েক বছর পর্যন্ত এই ওযীফা পাঠ করে অন্তরে আরও বেশী মিষ্টতা অনুভব করলাম। একদিন মামা বললেন- সহল, যার সাথে আল্লাহ থাকেন, যাকে তিনি দেখেন এবং যার তিনি সাক্ষী হন, সে কি তার নাফরমানী করতে পারে? খবরদার, আল্লাহর নাফরমানী করো না। অতঃপর আমি একান্তে এই যিকিরই করতাম। যখন আমাকে মক্তবে প্রেরণ করা হল, তখন এই যিকিরে ত্রুটির আশংকা করে আমি ওস্তাদের সাথে শর্ত করলাম, এক ঘন্টা পড়াশুনা করে চলে আসব। মক্তবে গিয়ে ছয় অথবা সাত বছর বয়সে আমি কোরআন শরীফ হেফয করে নিলাম। আমি সর্বদা রোযা রাখতাম এবং বার বছর বয়স পর্যন্ত যবের রুটি খেলাম। তের বছর বয়সে আমার মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিল, যার উত্তর পাওয়ার জন্যে আমি মুরব্বীদের অনুমতি নিয়ে বসরায় গেলাম এবং সেখানকার আলেমদের সামনে প্রশ্নটি রাখলাম। কিন্তু কেউ আমাকে সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারল না। অতঃপর আমি আবাদানে চলে গেলাম। সেখানে একজন আবু হাবীব নামক বুযুগ বসবাস করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সন্তোষজনক জওয়াব দিলেন। আমি তাঁর কাছে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে তাঁর কালাম দ্বারা উপকৃত হলাম। এর পর তস্তরে চলে এলাম। এখানে এসে খাদ্য এই নির্ধারণ করলাম যে, এক দেরহামের যব ক্রয় করে তা পিষিয়ে সেহরীর সময় লবণবিহীন শুধু রুটি এক ছটাক পরিমাণে খেতাম। ফলে এক দেরহামই সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। এর পর আমি তিন দিন উপর্যুপরি রোযা রাখতাম এবং একদিন রোযা রাখতাম না। অতঃপর পাঁচ দিন ও সাত দিন উপর্যুপরি রোযা রেখেছি। বিশ বছর এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পর আমি কয়েক বছর বিভিন্ন দেশ সফর করেছি এবং তস্তরে ফিরে এসে সমগ্র রাত্রি জাগরণ অবলম্বন করেছি।

একাদশ অধ্যায়

উদর ও লজ্জাস্থানের খাহেশের প্রতিকার

জানা উচিত, উদরের খাহেশ আদম সন্তানের জন্যে বড় মারাত্মক, যার কারণে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) চিরস্থায়ী জান্নাত থেকে এই ধ্বংসশীল পৃথিবীতে বহিষ্কৃত হন। তাঁদেরকে এক বিশেষ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের খাহেশ প্রবল হওয়ায় তাঁরা তা খেয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে উদর খাহেশের ঝরণা এবং আপদের খনি। কারণ, উদরের জন্যে নারী সম্ভোগের খাহেশ অপরিহার্য। পেটপূর্তি হলে একাধিক স্ত্রী ও অত্যাধিক সহবাসের বাসনা জাগ্রত হয়। এর পর ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে। কেননা, এগুলো দ্বারা এই মতলব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়। ধন-সম্পদের আধিক্য থেকে নানা রকমের ঔদ্ধত্য ও হিংসার সৃষ্টি হয় এবং এরই বদৌলতে রিয়া, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার জন্মলাভ করে, ফলে বিদ্বেষ ও শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অবশেষে মানুষ অবাধ্যতা, নাফরমানী ও নিষিদ্ধ কাজ করতে শুরু করে। এগুলো সব এ বিষয়েরই ফল যে, উদরকে খালি ন রেখে আকণ্ঠ ভরে নেয়া হয়। যদি মানুষ তার নফসকে ক্ষুধার্ত রেখে শয়তানের পথ সংকীর্ণ করে দেয়, তবে অবশ্যই সে আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে পা উঠাবে না, অবাধ্যতা ও আস্ফালনের কাছেও ঘেঁষবে না, আখেরাত ছেড়ে দুনিয়াদার হয়ে থাকবে না এবং বাদানুবাদ ও কলহ কিনে নেবে না। এসব কারণে উদরের বিপদাপদ ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করা এবং এ সম্পর্কিত মোজাহাদার পদ্ধতি ও ফযীলত ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক, যাতে মানুষ এ থেকে বেঁচে থাকে এবং মোজাহাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লজ্জাস্থানের খাহেশও এমনি ধরনের, যা এর পরে আসে। তাই এর বর্ণনাও জরুরী। সেমতে আমরা এ বিষয়গুলোকে আটটি শিরোনামে বর্ণনা করব।

১॥ ক্ষুধার ফযীলত ও উদরপূর্তির নিন্দা

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

جَاهِدُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ وَالْعَطَشِ فَاِنَّ الْاَجْرَ فِىْ ذٰلِكَ كَاَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ جُوْعٍ وَ عَطَشٍ ـ

–তোমরা নফসের বিরুদ্ধে ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা জেহাদ কর। এতে এমন সওয়াব, যেমন আল্লাহর পথে জেহাদকারীর সওয়াব। আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষুধা পিপাসার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন আমল নেই।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আকাশের ফেরেশতা সেই ব্যক্তির কাছে আসে না, যে তার পেট ভরে নেয়। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন ঃ مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ وَضَحِكُهُ وَرَضِيَ بِمَا يَسْتُرُبِهِ عَوْرَتَهُ –যে কম খায়, কম হাসে এবং এমন পোশাকে সন্তুষ্ট থাকে, যা দ্বারা তার গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করতে পারে। আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 'পশমী বস্ত্র পরিধান কর এবং আধাপেট খাও। এটা নবুওয়তের একাংশ।' হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

افضلكم عند الله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا فى الله سبحانه وابغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نوام اكول شروب ـ

–কেয়ামতে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ মর্তবাশালী সেই ব্যক্তি হবে, যে অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে এবং যিকির বেশী করবে। কেয়ামতে আল্লাহর কাছে অধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি হবে, যে অধিক নিদ্রা যায়, অধিক খায় এবং অধিক পান করে।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) প্রয়োজনেও ক্ষুধার্ত থাকতেন, অর্থাৎ এটা তাঁর পছন্দনীয় ছিল। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির পানাহার দুনিয়াতে কম, আল্লাহ তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন ঃ আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে দুনিয়াতে পানাহার কম দিয়েছি। সে সবর করেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, যে লোকমা সে ছেড়ে দেবে, তার বিনিময়ে জান্নাতে তাকে উচ্চ মর্তবা দান করব। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا كثر عليه الماء ـ

–তোমরা অন্তরকে অধিক পানাহার দ্বারা মেরে ফেলো না। অন্তর কৃষিক্ষেত্রের মত। তাতে পানি বেশী হলে ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়।'

উসামা ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের অধিক নিকটবর্তী সে ব্যক্তিই হবে, যে দুনিয়াতে অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও চিন্তান্বিত থাকবে। এ ধরনের লোকেরা হচ্ছে গোপন মুত্তাকী। এরা আত্মপ্রকাশ করলে কেউ তাদেরকে চেনে না এবং অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ খোঁজে না। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। তারাই ভাল লোক। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যও উত্তমরূপে তারাই করে। লোকেরা নরম নরম শয্যায় শয়ন করে। আর তারা নিজেদের মস্তক ও হাঁটু বিছিয়ে দেয়। পয়গম্বরগণের চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম তাদের মুখস্থ। যে জায়গা থেকে তারা চলে যায়, সেই জায়গা কাঁদে। যে শহরে তাদের কেউ না থাকে, সেই শহরের উপর গযব নাযিল হয়। তারা দুনিয়ার জন্যে মৃতের উপর কুকুরের মত লড়াই করে না। যে পরিমাণ খেলে নিঃশ্বাস বাকী থাকে, তারা সেই পরিমাণই খায় এবং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে। মলিন অবস্থার কারণে লোকে তাদেরকে রোগগ্রস্ত মনে করে ; অথচ তাদের কোন রোগ নেই। কেউ কেউ মনে করে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত; অথচ এটাও নয়। পরকালের গৌরব তাদের জন্যেই। হে উসামা, যে শহরে এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয়, জেনে নেবে, সেই শহরের শান্তির কারণ তারাই। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা থাকে, আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে আযাব দেন না। ভূপৃষ্ঠও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের প্রতি রাযী। মানুষের মধ্যে তাদেরকে রাখার কারণ তাদের দ্বারা যথাসম্ভব মানুষকে মুক্তি দেয়া। তুমি যদি আমৃত্যু ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করতে পার, তবে কর। এর কারণে তুমি উচ্চ মর্যাদা পাবে এবং নবীগণের কাতারে দাখিল হবে। তোমার আত্মা যখন ফেরেশতাদের কাছে যাবে, তখন তারা আনন্দিত হবে এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করবেন। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اِلْبَسُوا الصُّوْفَ وَشَمِّرُوْا وَكُلُوْا فِى اَنْصَافِ الْبُطُوْنِ تَدْخُلُوْا فِى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ ـ

'পশম পরিধান কর এবং কর্মতৎপর থাক। আধাপেট আহার কর। তাহলে আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে।'

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ, তোমাদের পাকস্থলীকে ক্ষুধাতুর এবং দেহ উলঙ্গ রাখ, যাতে তোমাদের অন্তর আল্লাহকে দেখে। তওরাতে লিখিত আছে– আল্লাহ কোন স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন

না। কেননা, দৈহিক স্থূলতা অনবধানতা ও অধিক আহার জ্ঞাপন করে। এটা আলেমের জন্যে ভাল নয়। তাই হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেনঃ

যে আলেম পেট ভরে খেয়ে মোটা হয়েছে, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না। এক হাদীসে আছে, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত বিচরণ করে। তোমরা ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা তার চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দাও।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اَلْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِىْ مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

—মুমিন এক নাড়ি-ভুঁড়িতে এবং কাফের সাত নাড়ি-ভুঁড়িতে খায়।

অর্থাৎ মুমিনের তুলনায় কাফের সাত গুণ বেশী খায় কিংবা তার খাহেশ মুমিনের চেয়ে সাত গুণ বেশী হয়। রূপক অর্থে খাহেশের স্থলে নাড়ি-ভুঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের অর্থ এরূপ নয় যে, কাফেরের নাড়ি-ভুঁড়ি বাস্তবে মুমিনের তুলনায় বেশী হয়। হযরত হাসানের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছেন ঃ

اَدِيْمُوْا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ يُفْتَحْ لَكُمْ

—তোমরা সর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়। তোমাদের জন্যে তা খুলে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ জান্নাতের দরজার কড়া কিরূপে নাড়া দেব ? তিনি বললেন ঃ بِالْجُوْعِ وَالظَّمَاِ অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা। হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে ঢেকুর তুললে তিনি বললেন ঃ অধিক ঢেকুর তুলো না। কেননা, কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই অধিক ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে বেশী পেট ভরে খায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও পেটভরে আহার করেননি। মাঝে মাঝে তাঁর ক্ষুধা দেখে হযরত আয়েশার করুণা হত এবং তিনি কেঁদে দিতেন। তিনি তাঁর পেটে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ আপনার প্রতি আমি উৎসর্গ। দুনিয়া থেকে এতটুকু অংশ তো নিন, যদ্দ্বারা শক্তি বহাল থাকে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে যায়। জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ আয়েশা, আমার ভাইগণ অর্থাৎ প্রধান প্রধান পয়গম্বরগণ আমার চেয়েও অধিক কষ্ট সহ্য করেছেন। এসব কষ্টে সবর করে তাঁরা যখন পরওয়ারদেগারের কাছে গেছেন, তখন অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছেন এবং অপরিসীম সওয়াব লাভ করেছেন। আমি লজ্জাবোধ করি,

কোথাও জীবনে কিছু আরাম ভোগ করার কারণে আখেরাতে তাঁদের চেয়ে কম মর্তবা লাভ করি। আখেরাতে কম মর্তবা পাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে কয়েক দিন সবর করা সহজ। আপন ভাইদের সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু ভাল মনে হয় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, এই কথাবার্তার পর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ) একখন্ড রুটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি ? হযরত ফাতেমা বললেন ঃ আমি একটি রুটি তৈরী করেছিলাম। আমার মনে চাইল, তাই এ খন্ডটি আপনার জন্যে এনেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রুটির টুকরাটি খেয়ে বললেন ঃ তিন দিন পর তোমার পিতার মুখে এই প্রথম খাদ্য পৌঁছল। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সারা জীবনে কখনও পরিবার-পরিজনকে লাগাতার তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি দেননি। তিনি বলতেন ঃ

اِنَّ اَهْلَ الْجُوْعِ فِى الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الشِّبْعِ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَخِمُوْنَ الْمَلَاٴُ وَمَا تَرَكَ عَبْدٌ لُقْمَةً يَشْتَهِيْهَا اِلَّا كَانَتْ لَهٗ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

–দুনিয়াতে যারা ক্ষুধার্ত, আখেরাতে তারা তৃপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ব্যক্তি অধিক ঘৃণিত, যার বদহজম লেগে থাকে এবং পেট ভরে আহার করে। বান্দা খাহেশ সত্ত্বেও যে লোকমাটি ছেড়ে দেয়, তার বিনিময়ে সে জান্নাতে একটি স্তর লাভ করে।

ক্ষুধার ফযীলত সম্পর্কে মহাজন উক্তিও অনেক। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উদরপূর্তি থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, এটা জীবদ্দশায় দুর্মূল্যের এবং মৃত্যুর পর দুর্গন্ধের কারণ। হযরত শাকীক বলখী (রঃ) বলেন ঃ এবাদত একটি পেশা, যার দোকান হচ্ছে নির্জনতা এবং হাতিয়ার ক্ষুধা। হযরত লোকমান (রঃ) আপন পুত্রকে বলেন ঃ বৎস, যখন পাকস্থলী পূর্ণ থাকে, তখন চিন্তা ঝিমিয়ে পড়ে এবং এবাদতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেকার বসে থাকে। হযরত ফযল ইবনে আয়ায নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ তোমার কিসের ভয়? ক্ষুধার ? ক্ষুধাকে ভয় করা উচিত নয়। কেননা, এর কারণেই তুমি আল্লাহ তা'আলার সামনে হালকা-পাতলা থাক। আল্লাহর রসূল ও তাঁর সকল সাহাবী ক্ষুধার্ত থাকতেন। কাহমস (রঃ) বলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত রেখেছ, উলঙ্গ রেখেছ এবং অন্ধকার রাতে

প্রদীপহীন রেখেছ। কেমন কেমন ওসীলা দ্বারা আমাকে এই মর্তবায় পৌঁছিয়েছ। তওরাতে উল্লিখিত আছে– আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যখন পেট ভরে আহার কর, তখন ক্ষুধার্তকে স্মরণ কর। আবু সোলায়মান (রঃ) বলেন ঃ রাতের খাদ্য থেকে এক লোকমা কম খাওয়া আমার কাছে সারারাত জেগে এবাদত করার চেয়ে ভাল মনে হয়। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহর ভান্ডার থেকে ক্ষুধা তাকেই দান করা হয়, যাকে তিনি পছন্দ করেন। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (রঃ) পঁচিশ দিন পর্যন্ত খেতেন না এবং এক দেরহামের আটা দিয়ে এক বছর চালিয়ে দিতেন। তিনি ক্ষুধার উচ্চ মর্তবা বিশ্বাস করতেন এবং এ সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করে বলতেন ঃ কেয়ামতের দিন কোন নেক আমলের এতটুকু সওয়াব হবে না, যতটুকু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে বাড়তি খাদ্য ত্যাগ করলে হবে। তিনি আরও বলেন ঃ যারা আখেরাত তলব করে, তাদের জন্যে খাওয়ার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ক্ষুধার মধ্যে এবং গোনাহ ও মূর্খতা তৃপ্তির মধ্যে নিহিত। যে হাদীসে বলা হয়েছে, পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই পরিমাণের চেয়ে বেশী খায়, সে তার পুণ্য খায়। এর চেয়ে উচ্চ মর্তবার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ খাদ্য খাওয়ার তুলনায় না খাওয়া অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত কারও ফযীলত লাভ হবে না। এক রাত ক্ষুধার্ত থাকলে আল্লাহর কাছে দু'রাত ক্ষুধার্ত থাকার জন্যে দোয়া করবে। এই অবস্থা অর্জিত হলে সে খাদ্য না খাওয়া প্রিয় মনে করবে। তিনি আরও বলেন ঃ যারা আবদাল হয়েছেন, তারা পেটকে ক্ষুধার্ত রাখা, রাত্রি জাগরণ ও একান্তবাস দ্বারা আবদাল হয়েছেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর মহব্বত পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্ষুধা দ্বারা। ওলীগণ পানির উপর দিয়ে হেঁটে যান না, কিন্তু ক্ষুধার বদৌলত। তারা নিমেষের মধ্যে পথের দূরত্ব অতিক্রম করেন না, কিন্তু ক্ষুধার কারণে।

২ ॥ ক্ষুধার উপকারিতা ও তৃপ্তির বিপদাপদ

এক্ষণে প্রশ্ন হয়, ক্ষুধার এত ফযীলত কোত্থেকে এল এবং এর কারণ কি? ক্ষুধা দ্বারা কেবল পাকস্থলী দুঃখ ও কষ্টই ভোগ করে। যদি কষ্টের মধ্যেই ফযীলত নিহিত থাকে, তবে যারা আত্মহত্যা করে অথবা আপন দেহের মাংস কাটে অথবা এমনি ধরনের কোন কান্ড করে, তাদের অধিক সওয়াব হওয়া উচিত। এর জওয়াব হচ্ছে,এটা এমন, যেমন কেউ ওষুধ সেবন করে সুস্থ হওয়ার পর মনে করতে থাকে যে, ওষুধের মধ্যে যে

তিক্ততা ছিল, তাতেই আমি সুস্থ হয়েছি। এর পর আরও অধিক তিক্ত ওষুধ খেতে শুরু করে। অথচ এটা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। ওষুধের উপকারিতা তিক্ততার কারণে নয়। বরং ওষুধের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা চিকিৎসকরা জানে। এমনিভাবে ক্ষুধার মধ্যে যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো আলেমগণ জানেন। যে কেউ এর উপকারিতা বিশ্বাস করে নিজের জন্যে অবলম্বন করবে, সে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে, যদিও উপকারের কারণ তার অজানা থাকে। যেমন ঔষধ সেবনকারী কারণ না জানলেও ওষুধের উপকার পায়। কিন্তু যারা আপন জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে চায়, তাদের জন্য নিম্নে আমরা ক্ষুধার দশটি উপকারিতা লিখে দিচ্ছি।

প্রথম উপকারিতা, ক্ষুধা দ্বারা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবের তীক্ষ্ণতা এবং অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতা অর্জিত হয়। এর বিপরীতে তৃপ্তি স্থূলবুদ্ধিতা জন্ম দেয়, মেধা বিনষ্ট করে এবং মস্তিষ্কে নেশার মত পৌঁছে চিন্তা-ভাবনার জায়গাকে ঘিরে ফেলে। ফলে অন্তর ভারী হয়ে চিন্তার দিকে ধাবিত হয় না এবং দ্রুত অনুভব করতে পারে না। শিশুরা বেশী খেলে তাদের স্মরণশক্তিতে ত্রুটি দেখা দেয়। হযরত আবু সোলায়মান (রহঃ) বলেন ঃ ক্ষুধা অবলম্বন করা উচিত। এতে নফস লাঞ্ছিত এবং অন্তর সূক্ষ্ম হয়ে আসমানী জ্ঞান লাভের যোগ্য হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

اَحْيُوْا قُلُوْبَكُمْ بِقِلَّةِ الضِّحْكِ وَقِلَّةِ الشِّبْعِ وَطَهِّرُوْهَا بِالْجُوْعِ تَصْفُوْ وَتَرِقُّ -

–তোমাদের অন্তরকে কম হাসি ও কম তৃপ্তি দ্বারা পুনরুজ্জীবিত কর এবং পবিত্র কর ক্ষুধা দ্বারা। এতে তোমাদের অন্তর সাফ ও নরম হবে।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে পেট ভরে আহার করে ও নিদ্রা যায়, তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْبَدَنِ الْجُوْعُ প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে। দেহের যাকাত ক্ষুধা।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষুধার্ত থেকেছি, তখনই অন্তরে প্রজ্ঞা ও শিক্ষার একটি দরজা খোলা পেয়েছি, যা পূর্বে পাইনি।

হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (রহ) বলেন ঃ ক্ষুধা একটি মেঘ । এর কারণে বান্দার অন্তরে হেকমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ প্রজ্ঞার নূর হচ্ছে ক্ষুধা, আল্লাহ থেকে দূরত্ব হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য হচ্ছে মিসকীনদের ভালবাসা ও তাদের কাছে থাকা। তোমরা পেট ভরে খেয়ো না। খেলে অন্তর থেকে প্রজ্ঞার নূর নিভে যাবে। যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় সামান্য আহার করে নামায পড়ে, তার আশেপাশে সকাল পর্যন্ত বেহেশতের হুর থাকে।

দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, অন্তরের নম্রতা, যা দ্বারা অন্তরের যিকিরের ত্রুটি অনুভব করা যায়। প্রায়ই এমন হয় যে, অন্তরের উপস্থিতিসহ মুখে যিকির চালু থাকে; কিন্তু অন্তর তাতে প্রভাবিত হয় না। অন্তর ও প্রভাবের মধ্যে যেন আন্তরিক কঠোরতা আড়াল হয়ে যায়। আবার কোন সময় অন্তরে যিকিরের খুব প্রভাব পড়ে এবং মোনাজাতে আনন্দ পাওয়া যায়। এর বাহ্যিক কারণ পাকস্থলী খালি হওয়া। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি এবাদতে তখনই অধিক মিষ্টতা পাই, যখন আমার পিঠ পেটের সাথে লেগে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ অন্তর যখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে, তখন পরিষ্কার ও পাতলা থাকে। পক্ষান্তরে যখন পেট ভর্তি থাকে, অন্ধ ও স্থূল হয়ে যায়।

তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে, বিনয় ও বশ্যতা অর্জিত হওয়া এবং দর্প ও অহংকার দূর হওয়া । ক্ষুধা দ্বারা নফস যতটুকু নম্র ও লাঞ্ছিত হয়, অন্য কোন কিছু দ্বারা ততটুকু হয় না। ক্ষুধার অবস্থায় নফস দুর্বল হয়ে যখন এক খন্ড রুটি ও এক চুমুক পানি পায় না, তখন মালিকের আনুগত্য করে ও অক্ষম হয়ে থাকে। নিজেকে অক্ষম অপারগ মনে করা এবং আল্লাহ ত'আলাকে পরাক্রমশালী মনে করার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। তাই সর্বক্ষণ ক্ষুধার্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাশী থাকা নেহায়েত জরুরী। এ কারণেই যখন দুনিয়া ও তার সমস্ত ভান্ডার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিল, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন–

لَابَلْ اَجُوْعُ يَوْمًا وَاَشْبَعُ يَوْمًا فَاِذَا جِعْتُ صَبَرْتُ وَتَضَرَّعْتُ وَاِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ ـ

–না, বরং আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকব ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খাব। যখন ভুখা থাকব, তখন সবর করব ও আনুগত্য করব। আর যখন পেট ভরে খাব, তখন শোকর করব।

চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, খোদায়ী আযাব ও বিপদগ্রস্তদের কষ্ট বিস্মৃত না হওয়া। কেননা, যারা পেট ভরে খায়, তারা ক্ষুধার্ত ও ক্ষুধা উভয়টি ভুলে যায়। হুশিয়ার ব্যক্তি কোন বিপদ দেখেই আখেরাতের বিপদ স্মরণ করে। সে পিপাসা দেখে কেয়ামতের মাঠে পরকালে পিপাসা স্মরণ করে এবং ক্ষুধা দেখে দোযখীদের ক্ষুধা স্মরণ করে। দোযখীরা ভুখা অবস্থায় কন্টকযুক্ত বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে পাবে এবং পিপাসার সময় পুঁজ পাবে। যে ব্যক্তি কখনও ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট না করে, সে আখেরাতের আযাব ভুলে যায়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি ভুখা থাকেন কেন, আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডার তো আপনার করায়ত্ত? তিনি বললেন ঃ আমি আশংকা করি, পেট ভরে আহার করলে ভুখাদেরকে ভুলে যাব। এ থেকে বুঝা গেল, ভুখা ও অভাবগ্রস্তদেরকে স্মরণ করাও ক্ষুধার অন্যতম উপকারিতা। কারণ, ক্ষুধা থেকে দয়া, অন্নদান ও মানুষের প্রতি অনুকম্পা জন্ম লাভ করে।

পঞ্চম উপকারিতা হচ্ছে, খাহেশ চূর্ণ করা এবং "নফসে আম্মারা" তথা কুকর্মের আদেশদাতা নফসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। এ উপকারিতাটি সর্ববৃহৎ। বলা বাহুল্য, সকল গোনাহের মূল কারণ হচ্ছে খাহেশ ও শক্তি, যার উপাদান খাদ্য ও আহার্য। খাদ্য হ্রাস করলে যাবতীয় খাহেশ ও শক্তি দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মানুষের সৌভাগ্য সবটুকুই নফসকে কাবু করে রাখার মধ্যে এবং দুর্ভাগ্য সবটুকুই নফসের কাবুতে চলে যাওয়ার মধ্যে নিহিত। সেমতে অবাধ্য ঘোড়া যেমন দানাপানি না দিলে কাবুতে থাকে, তেমনি নফসকে ভুখা রাখলে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা বলল ঃ আপনি তো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এখন নফসের খেদমত করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ নফস দ্রুত আস্ফালন করতে থাকে এবং খুব দুষ্টামি করে। সে অবাধ্য হয়ে কোথাও আমাকে বিপদে না ফেলে দেয়, তাই তার খেদমত করি না। কোন গোনাহ করার চেয়ে নফসের সাথে কঠোরতা করাকেই আমি উত্তম মনে করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে সর্বপ্রথম যে বেদআতটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা ছিল, মানুষ তৃপ্ত হয়ে আহার করতে শুরু করল। পেট ভরে খেলে অবশ্যই তাদের নফস দুনিয়ার দিকে জোর দেখাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ক্ষুধা আল্লাহ্ তা'আলার একটি ভাণ্ডার। এর সামান্যতম কাজ হচ্ছে লজ্জাস্থানের খাহেশ ও কথা বলার খাহেশ বিলোপ করা। কারণ, ভুখার মন বেশী কথা বলতে চায় না। ফলে সে মুখের আপদ তথা গীবত,

অশ্লীলতা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকে। যিনার ক্ষতি কারও কাছে গোপন নয়; কিন্তু ক্ষুধা দ্বারা মানুষ এর অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকে। পেট ভরে আহার করলে এই খাহেশ জোরদার হয়। আল্লাহর ভয়ে এ থেকে বিরত থাকলেও দৃষ্টিকে ফেরানো যায় না। এটাও যিনার মধ্যে দাখিল। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে মুরীদ পানাহারের শাসনে সবর করে, এক বছরকাল আধা পেট রুটি খায় এবং তাতে কোন দিলপছন্দ বস্তু মিশ্রিত না করে,আল্লাহ্ তা'আলা তার মন থেকে নারীর চিন্তা দূর করে দেন।

ষষ্ঠ উপকারিতা হচ্ছে, নিদ্রা দূর হওয়া এবং অধিক সময় জাগ্রত থাকা। কেননা, যে পেট ভরে খায়, সে অনেক পানি পান করে। অধিক পানি পান করার কারণে নিদ্রা বেশী আসে। কোন কোন বুযুর্গ এ কারণেই আহারের সময় মুরীদকে বলতেন ঃ বেশী আহার করো না। বেশী আহার করলে পানি বেশী পান করবে এবং নিদ্রা বেশী হবে।

সপ্তম উপকারিতা হচ্ছে, ক্ষুধা দ্বারা এবাদত অব্যাহত রাখা সহজ হয়। কেননা, স্বয়ং আহার করা অধিক এবাদতের পথে এ কারণে বাধা যে, এর জন্যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। আটা ইত্যাদি ক্রয় করা ও রুটি তৈরী করার মধ্যেও বেশ সময় লেগে যায়। এ সময়কে যিকির, মোনাজাত ইত্যাদিতে ব্যয় করলে উপকার বেশী হত। হযরত সিররী (রহঃ) বলেন ঃ আমি জুরজানীর কাছে ছাতু দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনার ছাতু খাওয়া ও রুটি না খাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, হিসাব করে দেখেছি, রুটি তৈরী করতে যে অতিরিক্ত সময় লাগবে তাতে সত্তর বার সোবহানাল্লাহ্ বলা যায়। তাই চল্লিশ বছর ধরে আমি রুটি খাওয়া ত্যাগ করেছি। চিন্তার বিষয়, তিনি সময় নষ্ট হওয়ার কথা কোথায় চিন্তা করেছেন এবং সময় নষ্ট হতে দেননি। এমনিভাবে মানুষের প্রত্যেকটি শ্বাস একটি অমূল্য সম্পদ। এর দ্বারা আখেরাতের অক্ষয় ভাণ্ডার অর্জন করা উচিত। এটা সময়কে আল্লাহর যিকর ও আনুগত্যে ব্যয় করার মাধ্যমে হয়। এছাড়া অধিক খাদ্য গ্রহণ করলে সব সময় পাকসাফ থাকা যায় না এবং মসজিদে অবস্থান করা যায় না। কেননা, বার বার পেশাব করার জন্যে যেতে হয়।

অষ্টম উপকারিতা হচ্ছে, দৈহিক সুস্থতা ও রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা। কেননা, রোগব্যাধির কারণ হচ্ছে, অধিক ভোজন, যে কারণে অকর্মণ্য পিত্তাদি পাকস্থলী ও শিরায় একত্রিত থাকে। এর পর রোগী এবাদত করতে সক্ষম হয় না। মন সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে এবং জীবন তিক্ত হয়ে

যায়। বর্ণিত আছে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার ভারত, রোম, ইরাক ও আবিসিনিয়া– এই চার দেশ থেকে চার জন খ্যাতনামা চিকিৎসককে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এমন ওষুধের কথা বলুন যদ্দ্বারা কোন রোগ হয় না। ভারতীয় চিকিৎসক বলল ঃ আমার মতে এরূপ ওষুধ হচ্ছে কাল হরীতকী। ইরাকী চিকিৎসক বলল ঃ আমার মতে এটা হচ্ছে তেরাতীযক। রোমীয় চিকিৎসক গরম পানির কথা বলল। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ছিল আবিসিনীয় চিকিৎসক। সে বলল ঃ হরীতকী খেলে পাকস্থলী সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটাও একটা রোগ। তেরাতীযকের ফলে পাকস্থলী নরম হয়। এটা আলাদা ব্যাধি। গরম পানিতে পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ে, যা রোগ ছাড়া কিছু নয়। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা হলে আপনার মতে এরূপ ওষুধ কোন্‌টি? সে জওয়াবে বলল ঃ আমার মতে যে ব্যবস্থার ফলে রোগ হয় না, তা হচ্ছে, আহার তখন্‌ করবে যখন খাহেশ হয় এবং খতম তখন করবে, যখন খাহেশ বাকী থাকে। সকলেই তার কথা মেনে নিল।

জনৈক আহলে কিতাব আলেমের সামনে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয় ঃ ثُلُثٌ لِطَعَامٍ ثُلُثٌ لِشَرَابٍ وَثُلُثٌ لِنَفَسٍ –পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসের জন্যে।

আলেম আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ স্বল্পভোজন সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক মযবুত উক্তি আমি আর শুনিনি। এ উক্তি নিশ্চয়ই কোন দার্শনিকের মনে হয়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْبَطْنَةُ اَصْلُ الدَّاءِ وَالْحَمْيَةُ اَصْلُ الدَّوَاءِ وَعَوِّدُوْا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ

–'উদরপূর্তি মূল রোগ, পরহেয করা মূল ওষুধ। দেহ যে যে বিষয়ে অভ্যস্ত হয়, তারই অভ্যাস গড়ে তোল।'

আমাদের মতে এ হাদীসটি চিকিৎসকের নিকট অধিক আশ্চর্য মনে হওয়ার যোগ্য।

নবম উপকারিতা হচ্ছে, ব্যয় কম হওয়া। কেননা, যে অল্প ভোজন করবে, তার জন্যে অল্প সামগ্রী যথেষ্ট হবে। মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য খরচ কম করা। জনৈক আলেম বলেন ঃ আমি আমার অধিকাংশ প্রয়োজন এভাবে পূর্ণ করি যে, সেগুলো বাদ দিয়ে দেই। এতে অন্তর খুবই স্বস্তি

পায়। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) আপন সহচরদের কাছে খাদ্যদ্রব্যের দর জিজ্ঞেস করতেন। তারা দুর্মূল্যের কথা বললে তিনি বলতেন ঃ খাওয়া বর্জন করে সস্তা করে নাও।

দশম উপকারিতা হচ্ছে, কম আহারের কারণে যে খাদ্য বেঁচে যাবে, তা সদকা-খয়রাতে ব্যয় করা যাবে। মানুষ যে পরিমাণ খাদ্য খেয়ে নেয়, তা মাটি ও পায়খানা হয়ে যায়। আর যে পরিমাণ সদকা করে, তা আল্লাহর রহমত লাভের জন্যে ভাণ্ডার হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তির ভুঁড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যদি এই পরিমাণ অন্যের পেটে যেত, তবে তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হত। অর্থাৎ, তুমি যদি আপন খাদ্য হ্রাস করে অন্যকে খাওয়াতে, তবে তা আখেরাতের জন্য ভাণ্ডার হত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা এমন লোক দেখেছি, যাদের কাছে সামান্যই খাদ্য ছিল। ইচ্ছা করলে তারা সবটুকু খেতে পারতেন; কিন্তু তারা বলতেন ঃ আমরা সবটুকু নিজেদের পেটে দেব না। কিছু আল্লাহর জন্যেও রেখে দেব।

৩ ॥ উদরের খাহেশ চূর্ণকারী সাধনা

উদর ও খাদ্যের ব্যাপারে মুরীদের উচিত চারটি বিষয় নির্দিষ্ট করে নেয়া ঃ (১) খাদ্যের পরিমাণ, (২) খাদ্যের সময়, (৩) খাদ্যের শ্রেণী এবং (৪) পরহেযের স্তর। শেষোক্ত বিষয়টি আমরা হালাল ও হারাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এখানে প্রথমোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম কথা, খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে এবং এতে ধাপে ধাপে সাধনা করতে হবে, যাতে একটি অনুমানে পৌঁছা যায়। কারণ, অতিভোজনে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ খাদ্য হ্রাস করে দেয়, তবে কষ্টও বেশী হবে এবং দুর্বলতা হেতু সাধনা সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং অল্প অল্প করে খাদ্য হ্রাস করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কেউ দু'রুটি খায় এবং তা হ্রাস করে এক রুটিতে আনতে চায়, তবে পূর্ণ এক মাস সময়ের মধ্যে তা হ্রাস করা যায়। প্রথমে দু'রুটির পরিমাণ ওযন করবে। এর পর প্রত্যহ এক রুটির ওযনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ হ্রাস করবে। অথবা লোকমার গণনার মাধ্যমেও এটা করা যায়। এভাবে কোন ক্ষতি অথবা বিরূপ প্রভাবের আশংকা নেই। খাদ্যের পরিমাণের চারটি স্তর আছে। এক, এতটুকু কম, যাতে জীবনটা কোন রকমে বেঁচে যায়। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। সহল তস্তরী (রহঃ)ও একেই পছন্দ করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জীবন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও শক্তি– এই তিনটি বিষয় দ্বারা এবাদাত করান। যদি বান্দা জীবন ও বুদ্ধি-বিবেচনা

বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা করে, তবে আহার করবে- রোযা রাখবে, মাঝে মাঝে রোযা ছাড়াও থাকবে। খাদ্য নিজের কাছে না থাকলে তালাশ করবে। আর যদি এ দু'টি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা না হয়- কেবল শক্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তবে খাদ্যের কোন পরওয়া করবে না, যদিও দুর্বলতার কারণে বসে বসে নামায পড়তে হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে হবে যে, উপবাসের দুর্বলতার কারণে বসে নামায পড়া খাদ্যের শক্তি দ্বারা দাঁড়িয়ে নামায পড়ার তুলনায় উত্তম। কেউ তার খাদ্যের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি সারা বছরে তিন দেরহামের খাদ্য খাই। এক দেরহামের বিনিময়ে আঙ্গুরের ঘন রস ক্রয় করি, এক দেরহাম দিয়ে চাউলের আটা এবং এক দেরহাম দিয়ে ঘি কিনে নেই। এর পর সবগুলো মিলিয়ে তিনশ' ষাটটি বড়ি তৈরি করে নেই। প্রতি রাতে এক বড়ি দিয়ে ইফতার করি। তবে আজকাল সময়ের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। জনৈক সংসারত্যাগী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আপন খাদ্য সাড়ে তিন মাশা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, দিনে-রাতে পাঁচ ছটাক পরিমাণে খাদ্য খাবে। সম্ভবত এটা অধিকাংশ লোকের এক-তৃতীয়াংশ পেটের সমান হবে, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর অভ্যাস তাই ছিল। তিনি সাত লোকমা অথবা নয় লোকমা খেতেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, সারা দিনে আড়াই পোয়া পরিমাণে আহার করবে। এটা পেটের এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং খুব সম্ভব দু-তৃতীয়াংশের সমান। এমতাবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ পেট পানীয়ের জন্য থেকে যাবে।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, আরও বাড়িয়ে এক সের পর্যন্ত আহার করবে। এর বেশী খাওয়া অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল এবং (ولا تسرفوا) এই খোদায়ী আদেশের বিপরীত। এখানে বুঝা দরকার, অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত স্তরসমূহ বর্ণিত হয়েছে। নতুবা খাদ্যের পরিমাণ ব্যক্তি, বয়স ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা।

পঞ্চম স্তর হচ্ছে, সত্যিকার খাহেশ হলে আহার করবে এবং সত্যিকার খাহেশ বাকী থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নেবে; কিন্তু এক রুটি অথবা দু'রুটির পরিমাণ নির্দিষ্ট না করলে সত্যিকার খাহেশের শেষ সীমা প্রকাশ পাবে না। তবে সত্যিকার খাহেশের আলামত এই লিখিত আছে যে, যে কোন রুটি পেলে তা খেয়ে নেয়া। যদি নির্দিষ্ট রুটি মনে চায় কিংবা তরকারিও কামনা করে, তবে খাহেশ সত্যিকার হবে না।

আরেকটি আলামত হচ্ছে, থুথু ফেললে তাতে মাছি বসবে না। অর্থাৎ থুথুর মধ্যে তৈলাক্ততা না থাকায় বুঝা যায়, পাকস্থলী শূন্য। সুতরাং সত্যিকার খাহেশের পরিচয় কঠিন। সুতরাং মুরীদের জন্যে এটাই উত্তম যে, খাদ্যের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে যে এবাদত সে করে, তা সুন্দররূপে আনজাম দিতে পারে– তাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে। এ সীমায় পৌছে যাওয়ার পর খাহেশ বাকী থাকলেও থেমে যাবে এবং পরিমাণ বাড়াবে না।

সারকথা, খাদ্যের বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। কেননা, অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা সীমা রয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক দলের অভ্যাস ছিল, তাঁরা সপ্তাহে এক ছা' গম আহার করতেন এবং খেজুর খেলে সপ্তাহে দেড় ছা' খেতেন। চার মুদে এক ছা' হয়। প্রতি মুদ আড়াই পোয়ার সমান। এভাবে এক দিনের খাদ্য হয় গম আধা মুদের কিছু বেশী। খেজুর বেশী হওয়ার কারণ এ থেকে বীচি বের হয়ে যায়। এ পরিমাণটি পেটের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রতি সপ্তাহে তিন সের যব খেতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও তাই আহার করতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন এই পরিমাণ বৃদ্ধি করব না। আমি প্রিয় হাবীব (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটে থাকবে, যে আমৃত্যু বর্তমান অবস্থার উপর কায়েম থাকবে। তিনি কতক সাহাবীর সমালোচনা করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতিনীতি বদলে ফেলেছ। এখন যব শোধন করে খাও, চাপাতি রুটি তৈরী কর এবং দুধ, তরকারি ও নানা রকম খাদ্য খাও। পোশাক সকালে এক প্রকার ও বিকালে এক প্রকার পরিধান কর। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে কোথায় ছিল? সুফফাবাসীদের খাদ্য ছিল প্রত্যহ দু'জনের জন্যে তিন পোয়া খোরমা। এতে বীচিও রয়েছে, যা বাদ দেয়ার পর পরিমাণ খুব কম থেকে যেত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, খাদ্যের সময় নির্দিষ্ট করা; অর্থাৎ একবার খাওয়ার পর কতক্ষণ পর পুনরায় খাবে। এতে তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর, তিন দিন অথবা আরও বেশী সময় খাবে না। কোন কোন সাধক এ ক্ষেত্রে এত সাধনা করেছেন যে, এই মেয়াদ ত্রিশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আলেমগণের মধ্যে অনেকের অবস্থা এরূপ। উদাহরণতঃ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওরফী, আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম

তায়মী, সোলায়মান খাওয়াস, সহল তস্তরী, ইবরাহীম ইবনে আহমদ খাওয়াস প্রমুখ। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছয় দিন নির্দিষ্ট করতেন। সুফিয়ান সওরী ও ইবরাহীম ইবনে আদহাম তিন দিন নির্দিষ্ট করতেন। তাঁরা সকলেই উপদেশ দ্বারা আখেরাতে সাহায্য চাইতেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চল্লিশ দিন কিছু না খায়, তার কাছে কতক খোদায়ী রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, দু' থেকে তিন দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা। এটা অভ্যাস বহির্ভূত নয়; বরং সম্ভবপর। সামান্য চেষ্টা সাধনা করলেই এই স্তর অর্জন করা যায়। তৃতীয় স্তর হচ্ছে, দিন ও রাতের মধ্যে একবার খাবে। এর বেশী হলে তা অপব্যয় হবে। সর্বদা তৃপ্ত অবস্থায় থাকা এবং ক্ষুধা অনুভব না করা বিলাসীদের কাজ, সুন্নত বিরোধী। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকালে খেলে সন্ধ্যায় খেতেন না এবং সন্ধ্যায় খেলে সকালে খেতেন না। বড় বড় বুযুর্গগণও এ নিয়ম পালন করতেন। তারা দিনে একবার খাদ্য গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِيَّاكَ وَالسَّرَفَ فَإِنَّ أَكْلَتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ سَرَفٍ وَأَكْلَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَقْتَلُ وَأَكْلَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ قِوَامٌ بَيْنَ ذَالِكَ وَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

–'তুমি অপব্যয় থেকে বেঁচে থাক। প্রত্যহ দু'বার খাওয়া অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। প্রত্যেক দু'দিনে একবার খাওয়া মারাত্মক; কিন্তু প্রত্যহ একবার খাওয়া উভয়ের ঠিক মধ্যবর্তী স্তর। আল্লাহর কিতাবে এটা প্রশংসিত।'

অতএব, যে ব্যক্তি দিবারাত্রির মধ্যে একবার খেতে চায়, তার জন্যে তাহাজ্জুদের পর সোবহে সাদেকের পূর্বে অর্থাৎ সেহরীর সময়ে খাওয়া মোস্তাহাব। এতে দিনের বেলায় উপবাস করার কারণে রোযা হয়ে যাবে। এছাড়া রাতেও তাহাজ্জুদের জন্যে উঠা সহজ হবে।

তৃতীয় যে বিষয়টি নির্দিষ্ট করা দরকার, তা হচ্ছে খাদ্যের প্রসার। জানা দরকার, সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে গমের আটা। এটা শোধিত অবস্থায় পাওয়া গেলে তা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। মধ্যম খাদ্য হচ্ছে যবের শোধিত আটা এবং নিম্নস্তরের খাদ্য যবের অশোধিত আটা। উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন হচ্ছে গোশ্‌ত ও মিষ্টি, মধ্যম গোশতবিহীন শুরবা এবং

নিম্নস্তরের হচ্ছে লবণ ও সিরকা। অধ্যাত্ম পথের পথিকদের অভ্যাস, তারা কখনও ব্যঞ্জন খান না; মনোলোভা সুস্বাদু খাদ্য থেকেও তারা বিরত থাকেন। কেননা, এতে নফসের আস্ফালন ও কঠোরতা বাড়ে এবং মনে দুনিয়ার আনন্দ ও বিলাস আসন পেতে নেয়। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ হে সাধকবৃন্দ! যদি জান্নাতের ওলীমা খেতে চাও, তবে দুনিয়াতে নফসকে যত বেশী সম্ভব অনাহারে রাখ। এখানে ক্ষুধা যত বেশী হবে, ততই সেখানকার খাদ্য খাওয়ার খাহেশ বৃদ্ধি পাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

شِرَارُ اُمَّتِىَ الَّذِيْنَ غَذُوْا بِالنَّعِيْمِ وَهُيِّئَتْ عَلَيْهِ اَجْسَامُهُمْ وَاِنَّمَا هِمَّتُهُمْ اَلْوَانُ الطَّعَامِ وَاَنْوَاعُ اللِّبَاسِ يَتَشَدَّقُوْنَ فِى الْكَلَامِ ـ

–আমার উম্মতের মধ্যে অসৎ তারা, যারা ধনৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত এবং এর উপরই বড় হয়। তাদের সাহসিকতা কেবল নানা রকম খাদ্য এবং বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ। তারা গলা ফাটিয়ে কথাবার্তা বলে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ স্মরণ রাখ, তোমাকে কবরে থাকতে হবে। সেখানে অনেক খাহেশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সুস্বাদু খাদ্যকে খুব ভয় করতেন এবং একে দুর্ভাগ্যের আলামত মনে করতেন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) ঠাণ্ডা পানির শরবত পান করেননি এবং বলতেন ঃ আমাকে এর হিসাবের সাথে জড়িত করো না। হযরত নাফে' (রঃ) বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে টাটকা মাছ খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। মদীনায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তা পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর যখন পাওয়া গেল, তখন দেড় দেরহাম দিয়ে কিনে এনে রান্না করা হয়। অতঃপর একটি রুটির উপর মাছটি রেখে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করা হয়। ইতিমধ্যে জনৈক ভিক্ষুক দরজায় এসে হাঁক দিল। হযরত ইবনে ওমর খাদেমকে বললেন ঃ মাছটি রুটিতে জড়িয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। খাদেম আরজ করল ঃ জনাব, অনেক দিন থেকে যখন মাছ খেতে আপনার মন চাইছিল, তখন পাওয়া যায়নি। এখন পাওয়ার পর দেড় দেরহাম দিয়ে কিনে আপনার জন্যে রান্না করেছি। আপনি বললে ভিক্ষুককে এর মূল্য দিয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ না, এ মাছটি রুটিতে জড়িয়ে তাকে দিয়ে দাও। অতঃপর খাদেম গিয়ে ভিক্ষুককে বলল ঃ তুমি এটি এক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করবে? ভিক্ষুক সম্মতি দিলে খাদেম এক দেরহাম তাকে

দিয়ে মাছটি আবার তাঁর সামনে হাযির করল এবং বলল ঃ এ মাছটি এক দেরহাম দিয়ে কিনে এনেছি। তিনি বললেন ঃ ভিক্ষুকের কাছ থেকে দেরহাম ফেরত না নিয়ে মাছটি রুটিসহ তাকে দিয়ে এস। আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

ايما امرء اشتهى شهوة فرد شهوة واثر بها على نفسه غفر الله له .

–যে ব্যক্তির কোন খাহেশ হয়, অতঃপর তাকে বাধা দেয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকে সমর্পণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার সংবাদ পান যে, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান নানা রকম খাদ্য আহার করেন। সেমতে তিনি ইয়াযীদের খাদেমকে বললেন ঃ তার রাতের খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে আমাকে সংবাদ দিও। খাদেম তাই করল। হযরত ওমর (রাঃ) ইয়াযীদের গৃহে চলে গেলেন। যখন খাদ্য এল, তখন প্রথমে "ছরীদ" (গোশতের শুরুয়া) আনা হল। হযতর ওমরও তার সাথে আহার করলেন। এরপর ভাজা করা গোশত আনা হলে ইয়াযীদ হাত বাড়ালেন; কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান! তোমার এখানে এক খাদ্যের পর আরেক খাদ্য হয় নাকি? আল্লাহর কসম, যদি তুমি পূর্ববর্তীদের সুন্নত ছেড়ে দাও, তবে তাদের গোটা তরীকা থেকে তুমি আলাদা হয়ে যাবে। ইয়াসার ইবনে ওমায়র (রঃ) বলেন ঃ আমি কোন দিন হযরত ওমরের জন্যে আটা শোধন করিনি। কখনও করে থাকলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছি। ওতবা (রাঃ) আটাগুলো রৌদ্রে রেখে দিতেন। শুকিয়ে গেলে খেয়ে নিতেন এবং বলতেন ঃ একখন্ড রুটি ও নিমক খেয়ে থাকা উচিত, যাতে আখেরাতে ভাজা করা গোশত ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায়। তিনি একটি মাটির কলসী থেকে পানি পান করতেন, যা সারাদিন রৌদ্রে পড়ে থাকত। তাঁর বাঁদী বলত ঃ আটা দিয়ে দিলে আমি রুটি তৈরী করে এবং পানি ঠাণ্ডা করে দেব। ওতবা জওয়াবে বলতেন ঃ ক্ষুধার কুকুরকে দমন করা উদ্দেশ্য। সে এভাবেও দমিত হয়ে যায়।

শাকীক ইবনে ইবরাহীম বলেন ঃ একদিন আমি যখন মক্কায় রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্মস্থানের নিকটে অবস্থিত আলইয়াল বাজার দিয়ে গমন করছিলাম, তখন ইবরাহীম ইবনে আদহামকে রাস্তার ধারে বসে ক্রন্দন করতে দেখলাম। আমিও পথ ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম,

এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ভাল আছি, যাও। অবশেষে আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কারও কাছে না বললে বলতে পারি। আমি বললাম ঃ ঠিক আছে, বলব না, আপনি বলুন। তিনি বললেন ঃ তিরিশ বছর ধরে আমার মনে "হারীরা" খাওয়ার সাধ ছিল। কিন্তু আমি সর্বপ্রযত্নে মনকে তা থেকে বিরত রেখেছি। গতকাল রাতে যখন আমি বসে বসে ঝিমুচ্ছিলাম, তখন সবুজ পেয়ালা হাতে এক ব্যক্তি আগমন করল। পেয়ালা থেকে হারীরার সুগন্ধি বের হয়ে এল। আমি সাহস করে নফসকে বাধা দিলাম। লোকটি পেয়ালা আমার নিকটে রেখে বলল ঃ ইবরাহীম, খাও। আমি বললাম ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এটা ছেড়ে দিয়েছি। খাব না। সে বলল ঃ যদি আল্লাহ তাআলাই খাওয়ান, তবে খাওয়া উচিত। আমি এর কোন জওয়াব দিতে পারলাম না এবং কাঁদতে লাগলাম। লোকটি আবার বলল ঃ নাও, খাও। আমি বললাম ঃ খানা কোত্থেকে এল, এ কথা না জানা পর্যন্ত খেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সে বলল ঃ খাও, এটা তোমার জন্যে প্রদত্ত হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, হে ইসফের, এ পেয়ালাটি নিয়ে যাও এবং ইবরাহীমের নফসকে খাইয়ে দাও। সে অনেক দিন ধরে নফসকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। এখন আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেছেন। হে ইবরাহীম, স্মরণ রাখ, আমি ফেরেশতাদের মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে না, সে পরে তা তালাশ করেও পায় না। আমি বললাম ঃ যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার সম্মুখে আছি। এর সমাধান আল্লাহ্ তাআলাই দেবেন। এরপর আর এক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হল। সে প্রথম ব্যক্তিকে কিছু দিয়ে বলল ঃ তুমিই আপন হাতে খাইয়ে দাও। সেমতে সে আমার মুখে লোকমা দিতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জাগ্রত হয়ে আমি মুখে হারীরার স্বাদ অনুভব করলাম।

শাকীক বলেন ঃ ইবরাহীম এ কথা শেষ করতেই আমি বললাম ঃ আপনার হাতটি দেখান তো। আমি তাঁর হাত ধরে চুম্বন করলাম এবং বললাম ঃ হে আল্লাহ্! যাঁরা আপন খাহেশকে পূর্ণরূপে দাবিয়ে রাখে, তুমি তাদের সাধ পূর্ণ করে দাও। তুমিই অন্তরে বিশ্বাস দান কর এবং অন্তরকে প্রশান্ত রাখ। অধম বান্দা শাকীকের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি দাও। এরপর শাকীক হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললেন ঃ ইলাহী, এই হাত ও এই হাতের মালিকের বরকতে এবং ইবরাহীমকে প্রদত্ত অনুগ্রহের বরকতে এই মিসকীন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ কর। সে তোমারই কৃপা, অনুগ্রহ ও রহমতের মুখাপেক্ষী, যদিও এর

যোগ্য নয়। এরপর তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে হরম শরীফে প্রবেশ করলেন।

কথিত আছে, মালেক ইবনে দীনার (রঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত অন্তরে দুধের স্পৃহা নিয়েও দুধ পান করেননি। একদিন তাঁর কাছে খোরমা হাদিয়াস্বরূপ এলে লোকেরা তা খাওয়ার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করল। তিনি বললেন ঃ তোমরাই খেয়ে নাও। আমি চল্লিশ বছর এর স্বাদ গ্রহণ করিনি। তিনি বলেন ঃ আমি পঞ্চাশ বছর ধরে দুনিয়া ত্যাগ করেছি। আমার অন্তর চল্লিশ বছর ধরে দুধ পান করার সাধ পোষণ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন তা পান করব না। ক্রীতদাস ওতবা বলেন ঃ সাত বছর পর্যন্ত আমার মন গোশত খাওয়ার খাহেশ করতে থাকে। অবশেষে আমি এই ভেবে লজ্জাবোধ করলাম যে, মনের খাহেশ আর কত মুলতবী রাখব। সাত বছর তো হয়ে গেছে। অতঃপর একদিন একখন্ড গোশ্‌ত নিয়ে ভাজা করলাম এবং তা রুটিতে জড়িয়ে নিলাম। মুখে দেয়ার আগে একটি বালককে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি অমুকের পুত্র নও, যে মারা গেছে? সে বলল ঃ হাঁ। অতঃপর আমি গোশ্‌ত জড়ানো রুটিটি তাকে দিয়ে দিলাম। বর্ণিত আছে, বালকের হাতে রুটি সঁপে দিয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে এই আয়াত পাঠ করতে থাকেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ـ

—তারা খাদ্যের মহব্বত সত্ত্বেও মিসকীন, পিতৃহীন এতীম ও বন্দীকে খাদ্য খাওয়ায়।

এরপর তিনি কখনও গোশ্‌ত খাননি।

জাফর ইবনে নসর বলেন ঃ হযরত জুনায়েদ আমাকে কিছু আঞ্জীর ফল কিনে আনতে বললেন। আমি কিনে আনলে তিনি ইফতারের সময় তা মুখে দিলেন এবং সাথে সাথে ফেলে দিলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ অন্তরের কানে গায়েব থেকে আওয়াজ এসেছে, তুমি আমার খাতিরে এটি ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার খাবে?

সালেহ্ বলেন ঃ আমি আতা সলমীর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমি আপনার জন্যে একটি বস্তু প্রেরণ করতে চাই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, আপনি ফেরত দিতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা। আমি আমার পুত্রের হাতে ঘি ও মধুর সাথে ছাতু মিশ্রিত করে পাঠিয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম, যতক্ষণ তিনি না খান, সেখানেই থাকবে। তিনি

খেলেন। এর পরের দিন আমি আবার প্রেরণ করলাম। কিন্তু তিনি না খেয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সেমতে আমি রাগতস্বরে তাঁকে বললাম ঃ সোবহানাল্লাহ! আপনি আমার হাদিয়া ফেরত দিয়েছেন। তিনি আমাকে রাগ করতে দেখে বললেন ঃ রাগের কোন কথা নেই। একবার তো আমি তোমার আবদার রেখেছি। দ্বিতীয় বার যখন তুমি প্রেরণ করলে তখন আমি অনেক খেতে চেয়েছি. কিন্তু সম্ভব হয়নি। যখনই আমি খাওয়ার ইচ্ছা করতাম তখনই এ আয়াত মনে পড়ে যেত– يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ চুমুক দেয় এবং গলাধঃকরণ করতে পারে না। সালেহ্ বলেন ঃ আমি কেঁদে কেঁদে বললাম ঃ হায়! আমি এক জায়গায় এবং আপনি অন্য জায়গায় আছেন।.

জনৈক আবেদ তাঁর এক আপনজনকে দাওয়াত করে এনে কয়েকটি রুটি সামনে রেখে দিলেন। লোকটি রুটিগুলো ওলট-পালট করে খাওয়ার জন্যে ভাল রুটি বেছে নিতে লাগল। আবেদ বললেন ঃ এ কি করছ? তুমি জান না, যে রুটিটি তুমি বাদ দিয়েছ, সেটি কতজন কারিগরের হাত হয়ে তোমার কাছে এসেছে। প্রথমে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। বৃষ্টি দ্বারা মৃত্তিকা ও চতুষ্পদ জন্তু সতেজ হয়েছে। অনেক মানুষে কাজ করেছে। এরপর এ রুটি তোমার কাছে এসেছে। এখন তুমি ওলট-পালট করছ এবং খাওয়ায় আগ্রহ দেখাচ্ছ না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَدِيرُ الرَّغِيفُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى يَعْمَلَ فِيهِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ صَانِعًا أَوَّلُهُمْ مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي يَكِيلُ الْمَاءَ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمَةِ ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ الَّتِي تُزْجِي السَّحَابَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْأَفْلَاكُ وَمَلَائِكَةٌ ـ

–রুটি গোলাকার হয়ে তোমার সামনে আসে না যে পর্যন্ত তাতে তিন'শ ষাট জন কারিগর কাজ না করে। প্রথম কারিগর হচ্ছে মীকাঈল (আঃ), যে পানিকে রহমতের ভাণ্ডার থেকে মেপে দেয়। এরপর সেই সকল ফেরেশতা, যারা মেঘমালা হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এরপর রয়েছে সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের ফেরেশতাকুল। সর্বশেষ কারিগর হচ্ছে রুটি প্রস্তুতকারী। যদি তুমি আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ গণনা কর, তবে শেষ করতে পারবে না।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি কাসেম জাওরীর কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বৈরাগ্য কি? তিনি বললেন ঃ তুমি এ সম্পর্কে কি শুনেছ? আমি

কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি বললাম ঃ এ সম্পর্কে আপনার উক্তি কি? তিনি বললেন ঃ উদর হচ্ছে মানুষের দুনিয়া। একে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে ততটুকু বৈরাগ্য অর্জিত হবে এবং যে পরিমাণ একে বাধা না দেবে, সেই পরিমাণ তুমি দুনিয়ার করায়ত্ত হয়ে যাবে।

এসব গল্প থেকে জানা গেল, আমাদের বর্ণিত উপকারিতাসমূহ অর্জনের উদ্দেশেই বুযুর্গগণ খাহেশ থেকে বিরত রয়েছেন এবং উদরপূর্তি করে আহার বর্জন করেছেন। মাঝে মাঝে এর কারণ এটাও ছিল যে, তাঁরা খাদ্যদাতার রুযী হালাল ও স্বচ্ছ মনে করতেন না। জানা উচিত, মন যা চায় তাই প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ লবণও খাহেশ বা কামনার বস্তু। কারণ, এটা রুটির অতিরিক্ত। রুটির অতিরিক্ত সবকিছুই বাড়তি এবং খাহেশের মধ্যে দাখিল। এটা চূড়ান্ত নীতি। কেউ এতে সক্ষম না হলে তার উচিত কমপক্ষে আপন নফস সম্পর্কে গাফেল এবং খাহেশের মধ্যে নিমজ্জিত না হওয়া। যা মনে চায়, তাই খাওয়া এবং যা খুশী তাই করা অপব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট। তাই বিরতিহীনভাবে গোশত ভক্ষণ ত্যাগ করা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশত বর্জন করে, সে বদস্বভাব হয় এবং যে চল্লিশ দিন অবিরত গোশত খায়, সে কঠোর প্রাণ হয়ে যায়। সার কথা, নফসকে বৈধ খাদ্যসামগ্রীর খাহেশের মধ্যেও ফেলা উচিত নয়। যদি কেউ দুনিয়াতে সকল খাহেশ পূর্ণ করে নেয়, তবে কেয়ামতে তাকে বলা হবে أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ পার্থিব জীবনেই তোমরা তোমাদের মজা নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং ভোগ করে নিয়েছ। (এখন কি চাও?)

দুনিয়াতে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যে পরিমাণ খাহেশ বর্জন করা হবে, আখেরাতে সেই পরিমাণ লোভনীয় সামগ্রী পাওয়া যাবে। বসরার জনৈক বুযুর্গ বিশ বছর পর্যন্ত চাউলের রুটি ও মাছ খাওয়ার সাধ পোষণ করতে থাকেন; কিন্তু নফসের উপর মোজাহাদা করে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখেন। ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ যেসকল নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলো বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। সর্বপ্রথম আমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছিল চাউলের রুটি ও মাছ। আমাকে বলা হয়েছে– আজ যে পরিমাণ ইচ্ছা বেহিসাব খেয়ে নাও। আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ـ

–স্বচ্ছন্দে খাও ও পান কর, বিগত দিনে যা পাঠিয়েছিলে তার কারণে।

এ কারণেই আবু সালমান (রহঃ) বলেন ঃ একটি খাহেশ ত্যাগ করা এক বছর রোযা রাখা ও রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা অধিক উপকারী। আল্লাহ আমাদেরকেও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওসিলায় স্বীয় সন্তুষ্টির তওফীক দান করুন।

৪ ॥ ক্ষুধা ও তার ফযীলতে মিতাচার

জানা উচিত, সকল অবস্থা ও চরিত্রের মধ্যে মধ্যবর্তিতাই চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং স্বল্পতা ও বাহুল্য নিন্দনীয়। ক্ষুধার ফযীলত সম্পর্কে আমরা যা কিছু লিখে এসেছি, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, এর বাহুল্যই উদ্দেশ্য। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের মন যে সকল বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে কামনা করে এবং তাতে কিছু অনিষ্ট থাকে, সেখানে শরীয়ত অতিমাত্রায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করে, যাতে মূর্খরা বুঝে নেয় যে, সর্বাবস্থায় বিষয়টি থেকে বেঁচে থাকাই উদ্দেশ্য এবং যথাসম্ভব মনের চাহিদার বিপরীত আমল করা লক্ষ্য। কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে নেয়, মিতাচারের স্তরই কাম্য। উদাহরণতঃ অত্যধিক উদরপূর্তি কোন মনের চাহিদা হলে শরীয়ত তার সামনে পূর্ণমাত্রায় ক্ষুধার গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করে, যাতে মন কোনরূপে তার চাহিদা থেকে বিরত থেকে মিতাচারের স্তর অর্জন করে নেয়। কেননা, মনের চাহিদার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভবপর নয়। অতএব এমন কোন সীমা অবশ্যই থাকা দরকার, যার আমল শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হবে। উদাহরণতঃ রাত্রি জাগরণ ও রোযা সম্পর্কে শরীয়তে অতিমাত্রায় গুণকীর্তন করা হয়েছে। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানলেন, কিছু সংখ্যক লোক সদাসর্বদা রোযা রাখে এবং সারারাত জেগে নামায পড়ে, তখন তিনি তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন। এ থেকে জানা গেল, উদ্দেশ্য কেবল সমতার স্তর। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে উত্তম ও মিতাচার হচ্ছে, এতটুকু খাবে, যদ্দ্বারা পাকস্থলী ভারী না হয় এবং ক্ষুধার কষ্ট অনুভূত না হয়। কেননা, খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন রক্ষা করা এবং এবাদতের শক্তি অর্জন করা। পাকস্থলী ভারী হয়ে গেলে যেমন এবাদত হতে পারে না, তেমনি ক্ষুধার কষ্টও অন্তরের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এমনভাবে খাবে যাতে খাদ্যের বোঝা অনুভূত না হয়, যাতে ফেরেশতাদের অনুরূপ হওয়া যায়। ফেরেশতাদেরও খাদ্যের বোঝা ও

ক্ষুধার কষ্ট মালুম। তাদের অনুসরণ করাই মানুষের জন্যে পূর্ণতার স্তর। ভোজনে তৃপ্তি ও ক্ষুধা থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাই উভয় অবস্থা থেকে অধিকতর দূরবর্তী স্তরটিই মধ্যবর্তী স্তর, যাকে সমতা বলা হয়। স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মধ্যবর্তী স্তরে ফিরে যাওয়া এমন, যেমন লোহার একটি উত্তপ্ত বৃত্তকে মাটিতে রেখে একটি পিঁপড়াকে তার মধ্যস্থলে ছেড়ে দিলে পিঁপড়াটি বৃত্তের উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে চতুর্দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সকল দিকেই উত্তাপ বিদ্যমান। সে কোন দিক দিয়ে বের হতে পারবে না এবং ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকবে। অবশেষে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধে পৌঁছে থেমে সে সকল দিকের উত্তাপ থেকে অধিকতর দূরত্বে থাকবে। এমনিভাবে খাহেশও মানুষকে চতুর্দিক বেষ্টন করে রয়েছে। মানুষ পিঁপড়ার মত তার বৃত্তের মধ্যে পড়ে আছে। এই বৃত্ত অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অথচ মানুষ ফেরেশতাদের অনুরূপ হতে চায়। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষ খাহেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে। সমতা সকল দিক থেকে সমান দূরে বিধায় সকল অবস্থা ও চরিত্রে সমতাই কাম্য হওয়া উচিত। নিম্নোক্ত হাদীসে এই সমতাই উদ্দেশ্য خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا মধ্যবর্তী বিষয়ই সর্বোত্তম। নিম্নোক্ত আয়াতেও এই সমতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

–খাও, পান কর এবং অপচয় করো না।'

সুতরাং মানুষ যখন ক্ষুধা ও তৃপ্তি উভয়টি অনুভব করবে, তখন নফস হালকা থাকবে, এবাদত ও চিন্তা ভাবনা সহজ মনে হবে এবং আমল করতে সক্ষম হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নফস অবাধ্য, খাহেশের প্রতি আগ্রহী এবং বাহুল্যের প্রতি ঝুঁকে থাকে বিধায় সমতা অর্জন করা সহজ হয় না এবং এতে কোন উপকারও হয় না। তখন বরং ক্ষুধা দ্বারা তাকে অধিক মাত্রায় পীড়িত করা উচিত; যেমন ঘোড়াকে পোষ মানানোর জন্যে প্রথম তাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা হয় এবং খুব কষাঘাত করা হয়। এরপর ঘোড়া পোষ মানে এবং প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। পোষ মানার পর ঘোড়াকে সকল কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে সমতার পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এই রহস্যের ভিত্তিতেই মুরশিদ মুরীদকে এমন কাজ করতে বলে, যা সে নিজে করে না। উদাহরণতঃ সে মুরীদকে ক্ষুধার্ত থাকতে অথবা খাহেশ বর্জন করতে আদেশ করে; অথচ সে নিজে ক্ষুধার্ত এবং খাহেশ থেকে

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। কেননা, সে আপন নফসের সংশোধন সমাপ্ত করেছে। এখন নফসকে কষ্ট দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ অবস্থায় নফস খাহেশের পূজারী, দুষ্ট, অবাধ্য ও এবাদতবিমুখ হয় বিধায় তাকে ক্ষুধার্ত রাখাই সমীচীন। দুব্যক্তিই সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা হতে বিরত থাকে। এক, সিদ্দীক; তার ক্ষুধার্ত থাকার প্রয়োজন নেই; কারণ তার নফস সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। দুই, নির্বোধ; সে নিজেকে সিদ্দীক মনে করে সংশোধনের উপযুক্ত মনে করে না। এটা একটা বড় ধোঁকা বৈ কিছু নয়। সে প্রায়ই কোন সিদ্দীককে এ ব্যাপারে পরওয়া না করতে দেখে নিজেও তেমনি করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন রুগ্ন ব্যক্তি জনৈক রোগমুক্ত সুস্থ ব্যক্তিকে কোন বস্তু খেতে দেখে। এরপর সেও নিজেকে সুস্থ মনে করে সেই বস্তু খেয়ে ফেলে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্যেও খাদ্যের পরিমাণ এবং সময় নির্দিষ্ট ছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি এত বেশী রোযা রাখতেন যে, আমরা মনে করতাম, বোধ হয় আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও রোযাবিহীন দিন এত বেশী হত যে, আমরা ধারণা করতাম, বোধ হয় আর কোন দিন রোযা রাখবেন না। তিনি গৃহে পৌঁছে খাবার আছে কি না জিজ্ঞেস করলে যদি "হাঁ" বলা হত, তবে খেয়ে নিতেন। নতুবা বলতেন ঃ আজ তো আমি রোযা রেখেছি। এমনিভাবে তাঁর সামনে কোন খাদ্য পেশ করা হলে তিনি বলতেন ঃ আমি তো রোযা রাখতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, নিয়ে এস। সহল তস্তরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ শুরুতে আপনার অবস্থা কিরূপ ছিল? জওয়াবে তিনি অভাবনীয় কষ্ট করার কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি, তিনি বললেন ঃ দীর্ঘ দিন আমি বড়ই গাছের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করেছি। তিন বছর ডুমুর ফল চূর্ণ করে খেয়েছি এবং তিন বছরে তিন দেরহামের খাদ্য খেয়েছি। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হল ঃ বর্তমানে আপনার খাদ্য কি? তিনি বললেন ঃ এখন কোন সীমা ও সময় নির্দিষ্ট নেই। এর অর্থ এই নয় যে, এখন অনেক খাই। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, খাওয়ার কোন পরিমাণ ও সময় নির্দিষ্ট নেই। যে সময় যে পরিমাণ জরুরী এবং সমীচীন মনে করি, খেয়ে নেই।

হযরত মারুফ কারখীর কাছে লোকেরা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রেরণ করত। তিনি খেয়ে নিতেন। লোকেরা বলল ঃ আপনার ভাই বশীর এরূপ খাদ্য খান না। তিনি বললেন ঃ বশীরকে পরহেযগারী বাধা দেয়। আমাকে মারেফত প্রশস্ত করে রেখেছে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র

মেহমান। তিনি যখন খাওয়ান, খেয়ে নেই। যখন উপবাস রাখেন, সবর করি। আমার ওযর আপত্তি করার প্রয়োজন কি?

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম একদিন অনেক প্রকারের খাদ্য তৈরী করিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত করেন। তাঁদের মধ্যে আওযায়ী এবং সুফিয়ান সওরীও ছিলেন। খাদ্য সামগ্রীর আড়ম্বর দেখে সুফিয়ান সওরী বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, আপনি কি অপব্যয়ের আশংকা করেন না? ইবরাহীম বললেন ঃ খাদ্যের মধ্যে অপব্যয় হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে অপব্যয় হয়।

অতএব যে ব্যক্তি শুনে ও অনুকরণ করে জ্ঞান অর্জন করে, সে প্রকৃত কারণ বুঝে না। সে ইবরাহীম ইবনে আদহামের এই অবস্থা শুনে; আবার মালেক ইবনে দীনারের এই অবস্থা দেখে যে, তাঁর গৃহে বিশ বছর পর্যন্ত নিমক আসেনি। আবার সিররী সকতী সম্পর্কে সে পাঠ করে যে, তাঁর নফস চল্লিশ বছর পর্যন্ত আঙ্গুরের নির্যাস খাওয়ার সাধ পোষণ করে; কিন্তু তিনি তা খাননি। এসব শুনে ও পাঠ করে এ ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পায়। সে হয়রান হয়ে বিশ্বাস করতে থাকে, এই বুযুর্গগণের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চিতই ভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সামনে জ্ঞানের সকল রহস্য উন্মোচিত, সে জানে, সকলেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে অবস্থা ও সময়ভেদে তাঁদের আমল বিভিন্নরূপ ছিল। এসব বিভিন্ন অবস্থা শুনে সাবধানী ব্যক্তি বুঝে নেয়, সে মারেফতের স্তরে পৌঁছেনি। তাই এই বুযুর্গানের মত বেপরওয়া হওয়া তার উচিত নয়। তার নফস মালেক ইবনে দীনার অথবা সিররী সকতীর নফসের মত আনুগত্যশীল নয়, যাঁরা পার্থিব আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফলে সে তাঁদেরই অনুসরণ করতে থাকে। পক্ষান্তরে দাম্ভিক অহংকারী ব্যক্তি এভাবে চিন্তা করে– আমার নফস ইবরাহীম ইবনে আদহাম ও মারুফ কারখীর নফস অপেক্ষা অধিক নাফরমান নয়। অতএব আমিও তাঁদের অনুসরণ করে খাদ্যের নিয়মনীতি শিকায় তুলে রাখব। আমিও আল্লাহর মেহমান। সুতরাং বাছবিচারের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে নির্বোধদের সাথে সাথে শয়তানেরও অনেক দখল আছে। খাদ্য গ্রহণ করা না করা এবং শখের বস্তু খাওয়া না খাওয়া কেবল এমন ব্যক্তির জন্যেই শোভনীয়, যে বেলায়েত ও নবুওয়তের নূর দ্বারা দেখে। এই নূর তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ নফসের খাহেশ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং অভ্যাসের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সে যখন খায়, তখনও তাতে কোন মহৎ নিয়ত থাকে এবং যখন না খায়,

তখনও তা নিয়ত থেকে খালি হয় না। এমতাবস্থায় খাওয়া না খাওয়া উভয়টি আল্লাহর ওয়াস্তে হবে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাবধানতা দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত। তাঁর জানা ছিল, রসূলে আকরাম (সাঃ) মধু পছন্দ করতেন এবং তা সাগ্রহে খেতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) আপন নফসকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নফসের অনুরূপ মনে করেননি। ফলে লোকেরা যখন তাঁর সামনে মধুর ঠাণ্ডা শরবত পেশ করল, তখন তিনি পাত্রটি আপন হাতের মধ্যে ঘুরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ এটা পান করলে এর স্বাদ কিছুক্ষণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে; কিন্তু এর হিসাব নিকাশ বাকী থেকে যাবে। এরপর 'আমি পান করব না' বলে পাত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। মুরীদকে এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত না করাই মুরশিদের উচিত। তাকে কেবল ক্ষুধার্ত থাকতে বলবে এবং সমতার কথাও বলবে না। কারণ, সে সমতা অর্জন করতে কিছু ত্রুটি করবে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষুধার কথা বললে কমপক্ষে সমতা অর্জিত হয়ে যাবে। এ কথাও মুরীদকে বলবে না যে, কামেল সাধক সাধনা থেকে মুক্ত ও বেপরওয়া হয়ে যায়। এতে শয়তান সর্বক্ষণ তাকে কুমন্ত্রণা দেবে– তুমি তো কামেল হয়ে গেছ। এতে কোন ত্রুটি নেই। সবই অর্জিত হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস মুরীদকে সাধনা করতে বললে নিজেও তার সাথে সাধনা করতেন, যাতে সে মনে না করে যে, নিজে তো কিছু করেন না, আমাকে করতে বলেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সমতা কোন্‌টি, তা এক গোপন বিষয়। তাই কোন অবস্থাতেই যেন সাবধানতা হাতছাড়া না হয়। হযরত ওমর (রাঃ) একবার আপন পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে দেখলেন, সে গোশত ও ঘি রুটির সাথে খাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দোররা দিয়ে মারলেন এবং বললেন ঃ কোন দিন দুধ দিয়ে, কোন দিন ঘি দিয়ে, কোন্‌দিন তেল দিয়ে, কোন্‌দিন লবণ দিয়ে এবং কোন দিন কোন কিছু ছাড়াই শুকনো রুটি খাবে। এ থেকে সমতা কাকে বলে জানা গেল। সব সময় গোশত এবং খাহেশের বস্তু খাওয়া বাহুল্য ও অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। পক্ষান্তরে গোশত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা স্বল্পতা ও দীনতার মধ্যে গণ্য। মাঝে মাঝে খেয়ে নেয়া মধ্যবর্তী স্তর ও সমতা।

রিয়ার বিপদাপদ

জানা উচিত, খাহেশ বর্জনকারী ব্যক্তি এমন দু'টি বিপদের সম্মুখীন হয়, যা সাধের বস্তু খাওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। প্রথম হচ্ছে, নফস

কোন কোন খাহেশ ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু কেউ জানুক, এটাও চায় না। তাই নির্জনে সে বস্তুটি খেয়ে নেয়– জনসমাবেশে খায় না। একে বলা হয় "শেরকে খফী" তথা গোপন শেরক। জনৈক আলেমকে কোন দরবেশের হাল জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকেরা বলল ঃ তার কোন দোষ আপনি জানেন? তিনি বললেন ঃ সে একান্তে এমন বস্তু খায়, যা প্রকাশ্যে খায় না। মোট কথা, এটা খুব বড় বিপদ। কেউ খাহেশের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে গেলে তার উচিত তা প্রকাশ করে দেয়া। 'সাচ্চা হাল' একেই বলা হয়। এতে শুধু এটাই জানা যাবে যে, আমলের দোষে সাধনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোন দোষ গোপন করে তার বিপরীতে জনসমক্ষে পূর্ণতা প্রকাশ করলে দু'টি ক্ষতি হবে; যেমন মিথ্যা বলে তা গোপন করলে দু'টি মিথ্যা হয়ে যায়। দু'টি সত্যিকার তওবা না করা পর্যন্ত কেউ এরূপ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয় না। এ কারণেই আল্লাহ পাক মোনাফেকদের আযাব বেশী বলে এরশাদ করেছেন। কেননা, কাফের প্রকাশ্যে কুফর করে; কিন্তু মোনাফেক কুফর করে তা গোপন করে। অতএব গোপন করা দ্বিতীয় কুফর হল। সে মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহর দৃষ্টির চেয়ে অধিক প্রখর বলে বিশ্বাস করে আপন কুফর গোপন করে। তাই সে দ্বিগুণ আযাবের যোগ্য হয়। বিভুজ্ঞানীগণ খাহেশ এমনকি, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যান; কিন্তু রিয়ায় গ্রেফতার হন না। তাঁরা আপন দোষত্রুটি গোপন করেন না; বরং পূর্ণ বিভুজ্ঞান হচ্ছে, খাহেশকে আপন নফস থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে দূর করবে এবং বাহ্যতঃ মানুষের বিশ্বাস হ্রাস করার জন্যে খাহেশ প্রকাশ করবে। জনৈক বুযুর্গ সাধের মামুলী বস্তু এনে গৃহে লটকিয়ে রাখতেন; অথচ খেতেন না, যাতে গাফেল লোক তাঁর কাছে এসে ভিড় না জমায় এবং তাঁকেও খাহেশ পূজারী মনে করে। দরবেশের বড় কৃতিত্ব হচ্ছে দরবেশীতে দরবেশী করা; অর্থাৎ দরবেশীর বিপরীত প্রকাশ করা। এটা সিদ্দীকগণের কাজ। এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মত, যাকে কেউ কিছু দিলে প্রকাশ্যে তা গ্রহণ করে; কিন্তু পরে গোপনে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, তার অন্তর দু'বার বিনয়ী হয়। এক, বাহ্যতঃ গ্রহণ করার লাঞ্ছনা মেনে নেয়ার সময় এবং দুই, গোপনে ফেরত দেয়ার কালে আপন অভাব অব্যাহত রাখার সময়। এই স্তর অর্জিত হওয়া পর্যন্ত নিজেকে অপূর্ণ জ্ঞান করা এবং খাহেশ প্রকাশ করা উচিত। শয়তান তাকে এই বলে ধোকা দিতে চাইবে যে, এ খাহেশ প্রকাশ করলে অন্যেরাও তোমার অনুসরণ করবে। সুতরাং গোপন করার মধ্যেই অপরের সংশোধন

নিহিত। অথচ বাস্তবে অপরের সংশোধন লক্ষ্য হলে আপন নফসের সংশোধন অগ্রে এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হত। এতে বুঝা গেল, উদ্দেশ্য রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, খাহেশ বর্জনে সক্ষম; কিন্তু সাধু বলে পরিচিতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। এমতাবস্থায় খাদ্যের খাহেশ, যা আসলে দুর্বল, তা তো বর্জন করা হল; কিন্তু সুখ্যাতির খাহেশ, যা অধিক অনিষ্টকর– তার খপ্পরে পড়া হল। একে বলা হয় গোপন খাহেশ। এটা খাদ্যের খাহেশ অপেক্ষা অধিক জোরালো। কেউ নিজের মধ্যে এ ধারার খাহেশ অনুভব করার পর যদি একে অধিক জোরালো মনে করে খাদ্যের খাহেশ মিটিয়ে নেয় এবং খেয়ে ফেলে, তবে এটা তার জন্যে উত্তম। হযরত আবু সোলায়মান বলেন ঃ তোমার সামনে যখন বর্জন করা সাধের খাদ্য আসে, তখন তা থেকে সামান্য খেয়ে নাও, নফসের চাহিদা মোতাবেক খেয়ো না। এতে দু'টি উপকারিতা আছে। এক, খাহেশ থাকবে না এবং দুই, নফস আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে যাবে। হযরত ইমাম জাফর (রহঃ) বলতেন ঃ আমার সামনে কোন খাহেশের বস্তু এলে আমি আপন নফসকে দেখি। যদি প্রকাশ্যে আকাঙ্ক্ষা করতে দেখি, তবে খাইয়ে দেই। বাধা দেয়ার চেয়ে এটা ভাল। আর যদি দেখি, গোপনে আকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রকাশ্যে বর্জনকারী হতে চায়, তবে খাওয়া বর্জন করি– কখনও খাই না। এ থেকে গোপন খাহেশের জন্যে নফসকে সাজা দেয়ার পদ্ধতি জানা গেল। মোট কথা, খাদ্যের খাহেশ ত্যাগ করে গোপন খাহেশে লিপ্ত হওয়া এমন, যেমন কেউ বিচ্ছুকে ভয় করতঃ সাপের কাছে চলে যায়। কেননা, রিয়ার ক্ষতি খাদ্যের খাহেশের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

লজ্জাস্থানের খাহেশ

প্রকাশ থাকে যে, দুটি উপকারিতা অর্জনের জন্যে মানুষকে স্ত্রী সহবাসের খাহেশে লিপ্ত করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এর দ্বারা আনন্দ ও সুখ লাভ করে মানুষ পরকালের আনন্দ এবং সুখ স্মরণ করবে। কেননা, এই আনন্দ ও সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলে দেহের আনন্দসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হত; যেমন অগ্নি সর্বাধিক কষ্ট দায়ক। ফলে এই আনন্দ মানুষকে জান্নাতের জন্যে আগ্রহান্বিত করত। জান্নাতের আগ্রহ দোযখের ভয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কষ্ট ছাড়া সম্ভবপর নয়। অতএব দুনিয়াতে যখন কেউ স্ত্রী সহবাসের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করবে, তখন জেনে নেবে যে, জান্নাতের সুখও এমনি ধরনের অথবা এর চেয়েও

উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের বংশ পরম্পরা অব্যাহত রাখা। এ দু'টি উপকারিতা ছাড়া এই খাহেশের মধ্যে বিপদাপদ ও অপকারিতা এত বেশী যে, মানুষ একে নিয়ন্ত্রণ করে সমতার পর্যায়ে না রাখলে তার দ্বীন দুনিয়া উভয় বরবাদ হয়ে যায়।

رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ -

–পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে এমন বোঝা দিয়ো না, যার শক্তি আমাদের নেই।

এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ লেখেন, এখানে "শক্তির অধিক বস্তু" বলে সহবাসের তীব্র খাহেশ বুঝানো হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষের এই খাহেশ যখন উত্তেজিত হয়ে উঠে, তখন তার দুই তৃতীয়াংশ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَقَلْبِىْ وَمَنِيِّىْ

–আল্লাহ, তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কান, চক্ষু অন্তর ও বীর্যের অনিষ্ট থেকে।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَلَوْ لَا هٰذِهِ الشَّهْوَةُ لَمَا كَانَتِ النِّسَاءُ سُلْطَنَةٌ عَلَى الرِّجَالِ -

–নারী শয়তানের জাল। এই খাহেশ না থাকলে নারীরা পুরুষদের উপর রাজত্ব করতে পারত না।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় ইবলীস আগমন করল। তার মস্তকে বহুরঙ্গের চাকচিক্যময় টুপি। মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী হয়ে সে টুপি খুলে রেখে দিল। অতঃপর সালাম করল। মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? সে আরজ করল ঃ আমি ইবলীস। তিনি বললেন ঃ তোমার মৃত্যু হোক, এখানে আসার কারণ কি? ইবলীস বলল ঃ আল্লাহর কাছে আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তাই আপনাকে সালাম করতে এসেছি। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো, মানুষ কি কাজ করলে তুমি তার উপর প্রবল হয়ে যাও? ইবলীস আরজ করল ঃ যখন মানুষ নিজেকে বড় এবং গোনাহ ভুলে গিয়ে নিজের আমলকে বেশী মনে করতে থাকে, তখন সে আমার করায়ত্ত হয়ে যায়। আমি আপনাকে দুইটি বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রথম, বেগানা নারীর সাথে নির্জনে যাবেন না। কেননা, যে পুরুষ বেগানা নারীর

সাথে একান্তে থাকে. আমি স্বয়ং সেখানে যাই. চেলাদেরকে পাঠাই না। এরপর এই পুরুষকে কুকর্মে লিপ্ত করে দেই। দ্বিতীয়, আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেন তা পূর্ণ করুন এবং যাকাত ও সদকার জন্যে নির্দিষ্ট মাল বণ্টন করে দিন। কারণ, মানুষ খয়রাতের জন্যে যে অর্থ আলাদা করে, আমি তাতেও নানা জটিলতা সৃষ্টি করি, যাতে সে তার নিয়ত পূর্ণ করতে না পারে। এরপর ইবলীস চলে গেল। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, পূর্বকালে প্রেরিত সকল নবী সম্পর্কেই শয়তান আশা করত যে, নারীর ফাঁদে ফেলে তাঁদেরকে ধ্বংস করে দেবে। আমার কাছেও নারীর চেয়ে অধিক বিপজ্জনক কোন কিছু নেই। তাই আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আপন গৃহ ছাড়া কারও গৃহে যাই না অথবা আপন কন্যার গৃহে জুমুআর দিন কেবল গোসল করতে যাই। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শয়তান নারীকে বলে, তুমি আমার অর্ধেক বাহিনী। তুমি আমার তীর, যা কখনও লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয় না। তুমি আমার রহস্য। তুমি আমার দারোয়ান ও দূত। অর্থাৎ শয়তানের অর্ধেক বাহিনী হচ্ছে খাহেশ এবং অর্ধেক বাহিনী ক্রোধ। কিন্তু নারীর খাহেশ হচ্ছে সর্ববৃহৎ। এই খাহেশের তিনটি স্তর আছে- স্বল্পতা, বাহুল্য ও সমতার স্তর। বাহুল্য হচ্ছে, নারীর প্রতি এমন খাহেশ হওয়া যে, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়, সাধনা ও আখেরাতের পথ থেকে বঞ্চিত করে দেয় অথবা দ্বীনদার পশ্চাতে ফেলে কুকর্মে লিপ্ত করে দেয়। এই পর্যায়ের খাহেশ অত্যন্ত নিন্দনীয়। স্বল্পতার স্তর হচ্ছে পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়া। এটাই নিন্দাযোগ্য ও খারাপ। সমতার স্তর হচ্ছে প্রশংসনীয়। তা হল, নারীর খাহেশ সর্বদা জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের আইনের অধীনে থাকবে। এতে বাড়াবাড়ি দেখা দিলে ক্ষুধা ও বিবাহের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে হবে। হাদীসে আছে-

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ -

যুবকগণ, অবশ্যই বিবাহ কর। যে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার জন্যে খাসী হওয়ার মত।

মুরীদের বিবাহ্ করা না করা

প্রথম অবস্থায় মুরীদের বিবাহের ঝামেলায় পড়া উচিত নয়। কারণ, এটা আখেরাতের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। মুরীদ স্ত্রীর মহব্বতে আটকা পড়ে যাবে। এ বিষয় থেকে ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

অনেক বিবাহ করেছিলেন। কেননা, স্ত্রীর মহব্বত দূরের কথা, দুনিয়ার সকল বস্তু মিলেও তাঁর অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিক থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর মহব্বতে তাঁর মগ্নতা এতদূর ছিল যে, মাঝে মাঝে যখন মহব্বতের উত্তাপ অন্তরে উথলে উঠত, তখন অন্তর বিস্ফারিত হওয়ার আশংকা দেখা দিত। তিনি তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঊরুতে করাঘাত করে বলতেন, কিছু কথাবার্তা বল। তাঁর কথাবার্তার ফলে উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হত। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে তুলনা করতে পারে না। করলে সে ধোকা খাবে।

মোট কথা, প্রাথমিক পর্যায়ে অবিবাহিত থাকাই মুরীদের জন্যে উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বলেন ঃ যে বিবাহ করে, সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমি এমন কোন মুরীদ দেখিনি যে বিবাহ করে পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। যে কোন বস্তু আল্লাহ্ থেকে বিরত রাখে– স্ত্রী হোক, অর্থ হোক অথবা সন্তান-সন্ততি হোক, তাকেই অলক্ষুণে মনে করা উচিত। তবে মুরীদের অবিবাহিত থাকা তখন পর্যন্তই শোভনীয়, যে পর্যন্ত খাহেশ জোরালো না হয়। খাহেশ প্রবল হতে দেখলে প্রথমে ক্ষুধা ও সার্বক্ষণিক রোযা দ্বারা তা দমন করবে। এতেও দমিত না হলে খাহেশকে শান্ত করার জন্যে বিবাহ করবে। নতুবা দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এবং উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে। দৃষ্টির গোনাহ সগীরা গোনাহসমূহের মধ্যে অনেক বড়। এ থেকে কবীরা গোনাহ্ও হয়ে থাকে। যে তার দৃষ্টি আয়ত্তে রাখতে পারে না, সে তার দ্বীনদারীরও হেফাযত করতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ তাকানো থেকে বেঁচে থাক। এর কারণে অন্তরে খাহেশের বীজ পড়ে এবং এতটুকু অনর্থই যথেষ্ট। হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র বলেন ঃ কেবল দৃষ্টির কারণে হযরত দাউদ (আঃ) অনর্থে লিপ্ত হন। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) এরশাদ করেন ঃ সিংহ ও সর্পের পেছনে যেয়ো; কিন্তু নারীর পেছনে যেয়ো না। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ যিনার সূচনা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ দেখা ও বাসনা করার মাধ্যমে। হযরত ফোযায়ল এরশাদ করেন, ইবলীস বলে ঃ দৃষ্টি আমার প্রাচীন তীর ধনুক, যা কখনও ভুল করে না। দৃষ্টি সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উক্তিসমূহ নিম্নরূপ–

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِيْمَانًا يَّجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ ـ

দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর। যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এটি পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন ঈমান দেবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

–আমি আমার পরে পুরুষদের জন্যে নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা ছেড়ে যাইনি।

اِتَّقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ـ

–তোমরা দুনিয়ার ফেতনা ও নারীদের ফেতনা থেকে বেঁচে থাক। বনী ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা নারীদের পক্ষ থেকেই ছিল।

لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ الحديث ـ

–প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিনার কিছু অংশ আছে। কেননা, চক্ষুদ্বয় যিনা করে। তাদের যিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। হস্তদ্বয় যিনা করে। তাদের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। পদদ্বয় যিনা করে, তাদের যিনা হচ্ছে হাঁটা। মুখ যিনা করে। তার যিনা হচ্ছে বলা। অন্তর ইচ্ছা ও বাসনা করে। লজ্জাস্থান তাকে সত্যে পরিণত অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ الآية মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন ঃ একবার অন্ধ ইবনে মকতুম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসতে চাইলেন। তখন আমি ও মায়মুনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে পর্দা করতে বললেন। আমরা বললাম, সে তো অন্ধ। পর্দা করার প্রয়োজন কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো তাকে দেখ।

এ থেকে জানা গেল, নারীদের অন্ধের কাছে বসা এবং বিনা প্রয়োজনে তার সাথে কথা বলা জায়েয নয়। আজকাল এটা প্রচলিত আছে। হাঁ, প্রয়োজনের সময় নারী পুরুষের সাথে কথা বলতে অথবা দেখতে পারে।

যদি মুরীদের অবস্থা এমন হয় যে, সে নারীদের থেকে তো দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু বালকদের থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না; তবুও বিবাহ করা উত্তম। কেননা, বালকদের সৌন্দর্যপ্রীতির মধ্যে অনিষ্ট বেশী। কোন নারীর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করে মনের আশা পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু বালকদের দ্বারা এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই বালককে কুদৃষ্টিতে দেখা হারাম। এক্ষেত্রে মানুষ খুব শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং পরিণামে ধ্বংসের মুখে পড়ে। জনৈক তাবেয়ী বলেন ঃ যুবক সাধকের সাথে শ্মশ্রুবিহীন বালকের উঠাবসা আমি হিংস্র জন্তুর চেয়েও অধিক ভয় করি। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি খাহেশবশতঃ কোন বালকের পায়ের অঙ্গুলিতেও সুড়সুড়ি দেয়, তবুও সে সমকামী হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এই উম্মতে তিন প্রকার সমকামী হবে। কেউ তো কেবল দেখবে, কেউ করমর্দন করবে এবং কেউ কুকর্মই করবে। এ থেকে বুঝা গেল, দৃষ্টির কারণে বড় বড় বিপদের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং যখন আপন দৃষ্টি ফেরাতে এবং চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে না, তখন বিবাহ করাই তার জন্যে শ্রেয়ঃ। অধিকাংশ মানুষের যৌন উত্তেজনা ক্ষুধার কারণে হ্রাস পায় না। সেমতে জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, সাধনার প্রথম পর্যায়ে একবার আমার উপর খাহেশ প্রবল হয়ে গেলে আমি আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি করলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? আমি ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এগিয়ে এস। আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি আপন হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি এর শীতলতা অন্তরে ও দেহে অনুভব করলাম। সকালে ঘুম থেকে জেগে নিজের মধ্যে সেই যৌন উত্তেজনা পেলাম না। এক বছর কাল এ অবস্থা বহাল রইল। এরপর আবার প্রাবল্য দেখা দিল। আমি আবার হাহুতাশ করলে স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে বলল ঃ যদি তুমি তোমার ঘাড় কাটাতে সম্মত হও, তবে আমি তোমার চিকিৎসা করি। আমি বললাম ঃ উত্তম। সে বলল ঃ ঘাড় নত কর। আমি ঘাড় নত করলে সে একটি নূরের তরবারি দিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করল। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল। এক বছর কাল আবার সুস্থ থাকার পর পুনরায় সেই রোগ দ্বিগুণ বেগে দেখা দিল। এ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম, সে আমার বক্ষ ও পাঁজরের মাঝখানে বসে আমাকে বলছে ঃ যে বিষয়টি দূর করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, তা দূর করার জন্য আর কতদিন কাকুতি মিনতি করবে? এরপর

আমি জাগ্রত হয়ে বিবাহ করলাম এবং সন্তানাদি হল। এখন সেই খাহেশের জোর আর নেই।

সুতরাং মুরীদের বিবাহ করার প্রয়োজন দেখা দিলে বিবাহের শুরুতে নিয়ত ভাল রাখবে এবং পরিণামে জরুরী হক আদায় করবে। নিয়ত ভাল রাখার আলামত হচ্ছে, কোন সম্বলহীন ধর্মপরায়ণা মহিলাকে বিবাহ করবে, বিত্তশালিনী তালাশ করবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বিত্তশালিনী মহিলাকে বিবাহ করার অনিষ্ট পাঁচটি, (১) মোহরানা বেশী হওয়া, (২) স্বামী গৃহে গমনে ইতস্ততঃ করা, (৩) সেবা না করা, (৪) অধিক ব্যয়ভার বহন করা এবং (৫) ত্যাগ করতে মনে চাইলে বিত্তের লোভে তা না পারা। পক্ষান্তরে সম্বলহীনাকে বিবাহ করার মধ্যে এরূপ কোন অনিষ্ট নেই। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ চারটি বিষয়ে নারীর পুরুষের চেয়ে কম হওয়া চাই। নতুবা সে পুরুষকে হেয় মনে করবে। চারটি বিষয় এই ঃ বয়সে, দৈহিক গড়নে, অর্থকড়িতে এবং বংশ মর্যাদায়। পক্ষান্তরে চারটি বিষয়ে নারীর পুরুষের চেয়ে বেশী হওয়া দরকার– সৌন্দর্যে, শিষ্টাচারে, সংযমে এবং চরিত্রে। পরিণামে জরুরী হক আদায়ের আলামত হচ্ছে সদা সদাচার প্রদর্শন করা। জনৈক মুরীদ বিবাহ করে সদা সর্বদা স্ত্রীর সেবাযত্ন করতে থাকে। অবশেষে স্ত্রী লজ্জিত হয়ে তার পিতা-মাতাকে বলল ঃ আমি আমার স্বামীর সদাচারে বিস্মিত হয়েছি। এত বছর ধরে তার গৃহে যখনই পায়খানা করতে যাই তখনই সে বদনা আমার পূর্বে সেখানে রেখে দেয়। অন্য একজন বুযুর্গ জনৈকা রূপসী মহিলাকে বিবাহ করেন। স্বামী গৃহে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে স্ত্রী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল। তার পরিবারের লোকজন মহাচিন্তায় পড়ল, এখন স্বামী তাকে পছন্দ করবে না। বুযুর্গ ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে প্রথমে চক্ষু রোগের বাহানা করলেন, এরপর অন্ধ সেজে গেলেন। স্ত্রী স্বামী গৃহে এসে বিশ বছর সদ্ভাবে সংসার করার পর মারা গেল। এরপর বুযুর্গ ব্যক্তি চক্ষু খুললেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেই অন্ধ সেজেছিলাম যাতে শ্বশুরালয়ের লোকেরা দুঃখ না করেন। এতে সকলেই পরম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ এমন সদাচারী লোক দুনিয়াতে দ্বিতীয়জন আর নেই। জনৈক সুফী এক বদমেযাজ মহিলাকে বিবাহ করে সর্বদাই তার কটূক্তি সহ্য করতে থাকেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি এই মহিলাকে তালাক দেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আশংকা হয়, অন্য কোন ব্যক্তি তার হাতে নিপীড়িত হবে। অতএব মুরীদ বিবাহ করলে এরূপই হওয়া উচিত। আর

যদি বিবাহ ছাড়া থাকতে পারে এবং বিবাহের কারণে আখেরাতের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে মনে করে, তবে বিবাহ না করাই উত্তম।

বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান হাশেমীর দৈনিক আমদানী ছিল আশি হাজার দেরহাম। তিনি বসরার আলেমগণের কাছে এ মর্মে পত্র লেখলেন ঃ আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাই। আপনারা পছন্দ করে দিন। সকলেই একমত হয়ে তাঁকে জওয়াব দিলেন, রাবেয়া বসরীয়াকে বিবাহ করাই আপনার জন্যে উপযুক্ত। সেমতে তিনি রাবেয়া বসরীয়াকে এভাবে পত্র লেখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। হামদ ও সালাতের পর আবেদন হল, আল্লাহ তাআলা আমাকে আজ দৈনিক আশি হাজার দেরহাম আমদানী দিয়েছেন। আশা করা যায়, কিছু দিন পরেই আমদানী বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক এক লাখ দেরহাম হয়ে যাবে। যদি তুমি আমাকে মঞ্জুর কর, তবে এই ধন-সম্পদ সমস্তই তোমার হবে। –ইতি

হযরত রাবেয়া বসরীয়া এই পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হামদ ও না'তের পর জানাচ্ছি, সংসার নির্লিপ্ততার মধ্যেই অন্তরের শান্তি ও দেহের সুখ নিহিত এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ দুঃখ ও অশান্তির কারণ। পত্র পাওয়ার সাথে সাথে আপনার উচিত পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা এবং পরকালের চিন্তায় মগ্ন হওয়া। আপনি নিজেই নিজের ওছি হয়ে যান, যাতে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের জন্যে অন্যকে ওছি নিযুক্ত করার প্রয়োজন না থাকে। সারা জীবন রোযা রাখুন এবং মৃত্যুর সময় ইফতার করুন। আমার অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আপনার সমপরিমাণ অথবা আরও কয়েকগুণ বেশী ধন-সম্পদ দিয়ে দেন, তবুও এক মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ না করে থাকতে পারব না। –ইতি

এ থেকে জানা যায়, যে বিষয় আল্লাহর স্মরণে অন্তরায় হয়, তা ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং মুরীদ তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করবে। অবিবাহিত থাকা সম্ভব না হলে বিবাহ করা উত্তম। এ রোগের তিনটি প্রতিকার রয়েছে– প্রথম অনাহারে থাকা দ্বিতীয়, দৃষ্টি সংযত রাখা এবং তৃতীয়, অন্তরকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখা, যাতে আচ্ছন্ন রাখে। এ তিনটি তদবীরে কোন উপকার না হলে সর্বশেষে বিবাহ করতে হবে। এতে এ রোগের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাড়াহুড়া করে কন্যাদের বিবাহ দিতেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ

শয়তান কারও তরফ থেকে নিরাশ হয় না। সে নারীদের দ্বারা অবশ্যই ফাঁদ পাতে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িবের বয়স যখন চৌরাশি বছরে পৌঁছে, তখন তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় এবং অপর চক্ষু থেকেও পানি ঝরতে থাকে। তখনও তিনি বলতেন ঃ আমি নারীদের চেয়ে অধিক অন্য কিছুকে ভয় করি না। আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়া বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। কয়েক দিন যাইনি। এরপর একদিন গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কয়দিন কোথায় ছিলে? আমি বললাম ঃ আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিল। তাই হাযির হতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে খবর দিলে না কেন? এরপর আমি প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি বললেন ঃ খুব তো চলে যাচ্ছ; কিন্তু জিজ্ঞেস করি, পরে বিয়ে শাদী করলে কি না? আমি আরজ করলাম ঃ হুযুর, আমি গরীব মানুষ। আমাকে কে কন্যা দান করবে। তিনি বললেন ঃ আমি দিচ্ছি। আমি সবিস্ময়ে বললাম ঃ আপনি ! তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর খোতবা পাঠ করে সামান্য মোহরানার বিনিময়ে আপন কন্যার বিবাহ আমার সাথে সম্পন্ন করে দিলেন। আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম এবং কারও কাছ থেকে কিছু কর্জ নেয়ার কথা ভাবছিলাম। ইতিমধ্যে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। আমি নামায পড়ে গৃহে ফিরে এলাম। বাতি জ্বালিয়ে রুটি ও তেল নিয়ে ইফতার করতে বসলাম। এমন সময় দরজা থেকে করাঘাতের শব্দ কানে ভেসে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে? জওয়াব এল ঃ সায়ীদ। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম, কোন্ সায়ীদ হতে পারে! সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব হবেন, তা কল্পনায়ও ছিল না। কারণ, তিনি চল্লিশ বছর ধরে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দরজা খুলেই দেখি, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব দণ্ডায়মান। আমি ধারণা করলাম, বোধ হয় কোন সাংঘাতিক প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন। আমি আরজ করলাম ঃ আমাকে ডেকে নিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে আসাই সমীচীন মনে হল। আমি বললাম ঃ আদেশ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি বিবাহ করেছ। এখন একাকী শয়ন করবে– এটা আমার কাছে ভাল মনে হয়নি। তাই তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। আমি ভাল করে দেখতেই দেখি, বাস্তবে সেই ভাগ্যবতী কন্যা সলজ্জ ভঙ্গিতে তাঁর পেছনেই দণ্ডায়মান রয়েছে। তিনি তার হাত ধরে ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। এদিকে কন্যাটি লজ্জা শরমের আতিশয্যে মাটিতে পড়ে গেল। আমি দরজা খুব

ভাল করে বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর যে পেয়ালায় রুটি ও তেল রাখা ছিল, তা বাতির কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম, যাতে স্ত্রীর দৃষ্টিগোচর না হয়। এরপর গৃহের ছাদে উঠে প্রতিবেশীদেরকে ডাক দিলাম। সকলেই একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি? আমি বললাম ঃ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব আজ দিনের বেলায় তাঁর কন্যার বিবাহ আমার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এখন রাতের বেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তাঁর কন্যাকে এখানে রেখে গেছেন। লোকেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল ঃ সায়ীদ তোমাকে বিবাহ করিয়েছেন? আমি বললাম ঃ হাঁ। তারা বলল ঃ তাঁর কন্যা এখন তোমার গৃহে? আমি বললাম ঃ হাঁ। অতঃপর তারা সকলেই তার কাছে গেল। আমার মা সংবাদ পেয়ে এলেন এবং বললেন ঃ তিন দিন পর্যন্ত তুই বউ মাকে স্পর্শ করতে পারবি না। যদি করিস কখনও তোর মুখ দেখব না। এই তিন দিনে আমরা তাকে ঠিক করে নেব। মায়ের আদেশমত আমি তিন দিন আলাদা রইলাম। এরপর যখন তাকে দেখলাম, তখন পরমাসুন্দরী, কালামুল্লাহর হাফেয, সুন্নতের আলেম এবং স্বামীর হক সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল পেলাম। একমাস পর্যন্ত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব আমার গৃহে এলেন না এবং আমিও তাঁর কাছে গেলাম না। একমাস পর যখন গেলাম, তখন তিনি ভক্তদের বৃত্তের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সালাম করলে তিনি শুধু জওয়াব দিলেন এবং কিছু বললেন না। ভক্তদের প্রস্থানের পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি? আমি বললাম ঃ খুব ভাল। তিনি বললেন ঃ মর্জির খেলাফ কোন কিছু পেলে লাঠি দিয়ে খবর নেবে। আমি গৃহে চলে এলাম। এরপর তিনি বিশ হাজার দেরহাম আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এ ছিল সেই কন্যা, যাকে খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার খেলাফত কালে আপন পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব অস্বীকৃত হন। এরপর খলীফা মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে একশ' বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং কনকনে শীতের মধ্যে এক কলসী ঠাণ্ডা পানি তাঁর গায়ে ঢেলে দেন। এছাড়া কম্বলের কোর্তাও পরিধান করান। এসব কারণে কন্যাকে রাতেই স্বামী গৃহে বিদায় দেয়া পূর্ণ ধার্মিকতা ও সাবধানতার পরিচায়ক ছিল। (আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।)

যিনা ও কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা

জানা উচিত, লজ্জাস্থানের খাহেশ সর্বাধিক প্রবল এবং উত্তেজনার মুহূর্তে জ্ঞান-বুদ্ধির সর্বাধিক অবাধ্য। এর ফলাফল খুবই লজ্জাজনক।

মানুষ যে এ খাহেশ থেকে বেঁচে থাকে, তার কারণ হয় অক্ষমতা, না হয় লোকনিন্দার ভয়, না হয় লজ্জা শরম, না হয় মান-ইযযত রক্ষা করা। এগুলোর মধ্যে কোনটিতেই সওয়াব নেই। কারণ, এতে মনের এক আনন্দকে অন্য আনন্দের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয় মাত্র। হাঁ, এসব বাধার মধ্যেও একটি ফায়দা আছে। তা হচ্ছে, মানুষ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তা যে কোন কারণেই বেঁচে থাকুক। কিন্তু উচ্চ মর্তব্য ও সওয়াব তখন অর্জিত হবে, যখন সকল প্রকার সামর্থ্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ শুধু আল্লাহর ভয়ে যিনা থেকে বিরত থাকে, বিশেষতঃ যখন সত্যিকার খাহেশ বিদ্যমান। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَهُوَ شَهِيْدٌ -যে আশেক হয়ে সাধু থাকে এবং এশক গোপন রাখে, অতঃপর মারা যায়, সে শহীদ। তিনি আরও বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপবতী নারী নিজের দিকে আহ্বান করে, সে জওয়াবে বলে ঃ

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -আমি বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি। সামর্থ্য এবং আগ্রহ সত্ত্বেও যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কিস্‌সা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আল্লাহ তা'আলা পাক কালামে এ জন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আঃ) সকল সৎ ও সাধু পুরুষের ইমাম। সাহাবী হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) অসাধারণ সুশ্রী যুবক ছিলেন। তাঁর গৃহে জনৈকা মহিলা আগমন করে তাঁর সাথে কুকর্ম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি অস্বীকার করেন এবং গৃহ থেকে পালিয়ে যান। তিনি রাত্রে স্বপ্নে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে আরজ করলেন ঃ আপনি ইউসুফ? উত্তর হল ঃ হাঁ, আমি সেই ইউসুফ, যে ইচ্ছা করেছিল, আর তুমি সেই সোলায়মান, যে ইচ্ছাও করেনি। এই সাহাবীরই আর একটি আশ্চর্যজনক কাহিনী বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে, একবার একজন সঙ্গীসহ তিনি মদীনা থেকে হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁর সঙ্গী কিছু কেনাকাটা করার জন্যে বাজারে চলে গেল। তিনি তাঁবুতে একাকী বসে রইলেন। জনৈকা বেদুঈন মহিলার দৃষ্টি তাঁর অনন্য রূপ সৌন্দর্যের উপর পতিত হতেই সে মনে প্রাণে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং পাহাড়

থেকে নেমে একেবারে তাঁর সামনে এসে দণ্ডায়মান হল। মহিলা নিজেও রূপ-সৌন্দর্যে ছিল চন্দ্র-সূর্যবৎ অপরূপা। সে বোরকা উত্তোলন করে চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ ঘটাতে বিলম্ব করল না। অতঃপর সে বলল ঃ আমাকে কিছু দিন। সোলায়মান মনে করলেন, খাবার চাইছে, তাই রুটি দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। সে বলল ঃ আমি এটা চাই না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয়, আমি তাই কামনা করি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে শয়তান আমার কাছে পাঠিয়েছে। অতঃপর তিনি আপন মস্তক দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে সজোরে ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। মহিলা তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে আপন গৃহে চলে গেল। সঙ্গী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখল, কাঁদতে কাঁদতে সোলায়মানের চক্ষুদ্বয় ফুলে গেছে এবং কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বললেন ঃ কিছুই নয়। আমার কন্যার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গী বলল ঃ না, ব্যাপার অন্যকিছু। তিন মনযিল পথ অতিক্রম করার সময় তো আপনার কন্যার কথা একবারও মনে পড়ল না। আজ হঠাৎ মনে পড়বে কেন? মোট কথা, অনেক পীড়াপীড়ি করে জিজ্ঞেস করার পর সোলায়মান বেদুঈন মহিলার ঘটনা বলে দিলেন। সঙ্গী বাজার সওদার থলে রেখে অঝোরে কান্না শুরু করে দিল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমার কান্নার কারণ হচ্ছে, যদি আপনার স্থলে আমি থাকতাম তবে সবর করতে পারতাম না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই কাঁদলেন। অতঃপর তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। তওয়াফ ও সায়ীর পর যখন তাঁরা হাজারে আসওয়াদের কাছে এলেন, তখন সোলায়মান ইবনে ইয়াসার উপবিষ্ট অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে জনৈক দীর্ঘদেহী, সুশ্রী, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত, আতরমাখা ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি ইউসুফ। সোলায়মান আরজ করলেন ঃ যুলায়খার সাথে আপনার আচরণ খুবই বিস্ময়কর। ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ আবওয়ার মহিলার সাথে তোমার আচরণ আরও বেশী আশ্চর্যজনক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি, প্রাচীনকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়েছিল। তারা রাতের বেলায় একটি গুহায় অবস্থান গ্রহণ করে। ঘটনাক্রমে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। তারা একে অপরকে বলল ঃ আপন আপন সৎকর্ম

স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর। সৎকর্মের বরকতে এই পাথর সরে যেতে পারে। সেমতে তাদের একজন হাত তুলে বলল ঃ ইলাহী, তুমি জান, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি সন্ধ্যায় প্রথমে তাদেরকে আহার করিয়ে দিতাম, এরপর সন্তান-সন্ততি ও গৃহপালিত গবাদিপশুকে আহার দিতাম। একদিন গবাদিপশুর খাদ্য যোগাড় করতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দেরীতে বাড়ী পৌঁছলাম। অতঃপর গাভীর দুধ দোহন করে তা পিতামাতার কাছে নিয়ে দেখি, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডেকে জাগানো আমি ভাল মনে করলাম না। তাই দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি পর্যন্ত তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্তানরা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি পিতামাতার পূর্বে তাদেরকে খাবার দেয়া ভাল মনে করিনি। সকালে যখন তারা পান করলেন, তখন অন্যদেরকে দিলাম। ইলাহী, যদি তুমি জান, এ কাজ আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করেছি, তবে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। এ দোয়ার বরকতে পাথরটি এই পরিমাণ সরে গেল যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হল। দ্বিতীয় জন দোয়ায় বলল ঃ ইলাহী, তুমি জান, আমি আমার পিতৃব্য-কন্যার প্রতি আশেক ছিলাম। আমি তার কাছে মিলনের বাসনা প্রকাশ করলে সে অস্বীকৃতি জানাল। এরপর দুর্ভিক্ষের সময় নিদারুণ কষ্টে পড়ে সে আমার কাছে আগমন করল। সে অস্বীকার করবে না। আমি তাকে এই শর্তে একশ' বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। সে আমার কথা মেনে নিল; কিন্তু আমি যখন তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে চাইলাম, তখন বলল ঃ আল্লাহকে ভয় কর। আমার বেইজ্জতী করো না। এতে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। তাকে যা দিয়েছিলাম, তাও ফেরত নিলাম না। ভালবাসাও যথারীতি কায়েম রাখলাম। ইলাহী, যদি আমি কেবল তোমার ভয়ে এ কাজ করে থাকি, তবে এর বরকতে এ বিপদ দূর করে দাও। এরপর পাথরটি আরও সামান্য সরে গেল। কিন্তু বের হওয়ার পথ হল না তৃতীয় জন বলল ঃ ইলাহী, আমি একবার কয়েকজন মজুরকে কাজে নিয়োগ করেছিলাম এবং সকলের মজুরিই শোধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু জনৈক মজুর তার মজুরি রেখেই চলে গেল। তার অনুপস্থিতিতে আমি তার অর্থ কারবারে নিয়োগ করায় তা বেড়ে অনেক হয়ে গেল। অনেক দিন পর যখন সে মজুরি চাইতে এল, তখন আমি অনেকগুলো উট, গরু ও ছাগল দেখিয়ে বললাম ঃ এগুলো সব তোমার। সে বলল ঃ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা মস্করা করছেন? আমি বললাম ঃ ঠাট্টা নয়। এগুলো তোমার মজুরির অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে অর্জিত হয়েছে। এগুলো নিয়ে

যাও। সে জন্তুগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। ইলাহী, যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তার এই দোয়ার পর পাথরটি সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারাও গন্তব্য পথে রওয়ানা হয়ে গেল। যে নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে রাখে তার হচ্ছে এই ফযীলত। তারই নিকটবর্তী সে ব্যক্তি, যে চোখের যিনা থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা, যিনার সূচনা চোখ দ্বারাই হয়। তাই চোখ সংযত রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ কাজ। কিন্তু একে হালকা মনে করা হয়, তেমন ভয় করা হয় না। অথচ সব বিপদের উৎসমূল হচ্ছে চোখ। যদি ইচ্ছা ব্যতিরেকে একবার দেখা হয়, তবে তার জন্যে শাস্তি নেই; কিন্তু পুনর্বার দেখার মধ্যে শাস্তি আছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ-

لَكَ الْاُوْلٰى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ –প্রথম বার দেখা তোমার জন্যে জায়েয এবং দ্বিতীয় বার দেখা বিপদ।

এখানে চোখের দেখাই উদ্দেশ্য। আলা ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ নারীর চাদরের উপরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে খাহেশের বীজ বপন করে। মানুষ যখন কোন নারীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন দ্বিতীয় বার না তাকানোটা খুবই বিরল। রূপের ধারণা দৃষ্টিতে থাকলে দ্বিতীয় বার দেখতে মন চাইবে। তখন নিজের মনে সাব্যস্ত করে নেবে যে, পুনর্বার দেখা নিছক বোকামি। কেননা, দ্বিতীয় বার দেখলে যদি মুখমণ্ডল ভাল মনে হয়, তবে নফসে খাহেশ হবে, অথচ সে পাওয়ার নয়। অতএব পরিতাপ ছাড়া আর কি হাতে আসবে। আর যদি মুখমন্ডল বিশ্রী মনে হয় তবে যে উদ্দেশে দেখা; অর্থাৎ আনন্দ লাভ, তা অর্জিত হবে না। কেবল মজাবিহীন গোনাহে লিপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়া হয় তবে মনের উপর থেকে অনেক বিপদ টলে যায়। চোখের ত্রুটির পর যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে নেয়, তবে এটা বড় শক্তিমত্তা ও অসাধারণ তওফীকের কাজ হবে। আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানী রেওয়ায়াত করেন, জনৈক কসাই তার প্রতিবেশীর বাঁদীর প্রতি আশেক হয়ে যায়। বাঁদীর মালিক তাকে কার্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে প্রেরণ করলে কসাই তার পিছু নেয় এবং আপন কুমতলব প্রকাশ করে। বাঁদী বলল ঃ যতটুকু তুমি আমাকে চাও আমি তার চেয়ে বেশী তোমাকে চাই। কিন্তু অপকর্ম থেকে আমাকে মাফ কর। কারণ, আমি আল্লাহকে ভয় করি। কসাই বলল ঃ তুমি আল্লাহকে ভয়

করলে আমি করব না কেন? অতঃপর সে তওবাকারী হয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে সে দারুণ পিপাসায় মরণোন্মুখ হয়ে পড়ল। এমন সময় বনী ইসরাঈলের একজন পয়গম্বরের দূতের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। দূত অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে পিপাসার কথা জানাল। দূত বলল ঃ আমি তুমি মিলে দোয়া করি, যাতে গ্রামে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা দ্বারা আমাদেরকে ছায়া দান করেন। কসাই বলল ঃ দোয়া করার মত কোন নেক কাজ আমি করিনি। তুমিই দোয়া কর। দূত বলল ঃ আচ্ছা, আমিই দোয়া করি। তুমি কেবল 'আমীন' বলবে। অতঃপর দূত দোয়া আরম্ভ করল এবং কসাই আমীন বলে গেল। অবশেষে এক খণ্ড মেঘ তাদের মাথার উপর চলতে লাগল এবং তার গ্রামে পৌঁছে গেল। কসাই যখন আলাদা হয়ে তার গৃহের দিকে চলতে লাগল, তখন মেঘখণ্ডটিও তার সাথে যেতে লাগল। দূত বলল ঃ তুমি তো বলছিলে, তোমার কোন নেক আমল নেই। তাই আমি দোয়া করেছিলাম। এখন মেঘখণ্ড তোমার সাথে চলল কিরূপে? তোমার অবস্থা আমাকে খুলে বল। কসাই তওবার ঘটনা বর্ণনা করলে দূত বলল ঃ আল্লাহর কাছে তওবাকারীর এমন মর্তবা, যা অন্য কারও নেই।

আহমদ ইবনে সায়ীদ তাঁর পিতার বাচনিক বর্ণনা করেন- কুফায় আমাদের কাছে একজন সুগঠন, সুশ্রী ও সৎস্বভাবের আবেদ বসবাস করত। তিনি বেশীর ভাগ সময় মসজিদেই অতিবাহিত করতেন। জনৈকা রূপসী বুদ্ধিমতী মহিলা তাঁকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত প্রেম অন্তরে গোপন রাখল। একদিন আবেদ যখন মসজিদে গমন করছিলেন, তখন মহিলা তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল ঃ আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই, প্রথমে তা শুনে নিন, এরপর মনে যা চায় করুন। কিন্তু আবেদ কিছুই না বলে সোজা চলে গেলেন। ঘরে ফেরার পথে মহিলা আবার তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমার কথা শুনে যান। আবেদ মথা নত করল এবং অনেকক্ষণ পর বলল ঃ এটা অপবাদের জায়গা। কেউ আমাকে অপবাদ দিক, আমি তা ভাল মনে করি না। মহিলা বলল ঃ আমি আপনার অবস্থা না জেনে এখানে দাঁড়াইনি। খোদা না করুন, কেউ আমার পক্ষ থেকে খারাপ কিছু জানুক। কিন্তু এহেন কাজে আমার নিজেরই আসতে হল। আমি জানি, মানুষ তিলকে তাল বানায়। আপনারা আবেদ সম্প্রদায় আয়নার মত। সামান্য বিষয়েই আপনাদের গায়ে দোষ লেগে যায়। আমার একশ' কথার এক কথা হল, আমি আপনার প্রতি প্রেমাসক্ত। এখন আমার আপনার ব্যাপারটি আল্লাহ

তা'আলাই নিষ্পত্তি করুন। যুবক আবেদ এ কথা শুনে গৃহে চলে গেলে। তিনি দিশেহারা অবস্থায় নামায পড়তে চাইলেন; কিন্তু পারলেন না। অবশেষে এক চিরকুট লেখে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লেন। দেখলেন, মহিলা পথিমধ্যে পূর্বের জায়গায়ই দণ্ডায়মান আছেন। তিনি চিরকুটটি মহিলার দিকে নিক্ষেপ করে আপন গৃহে ফিরে এলেন– চিরকুটের বিষযবস্তু ছিল এই ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হে নারী! জেনে রাখ, যখন বান্দা আল্লাহর নাফরমানী করে, তখন আল্লাহ্ সহ্য করেন। যখন পুনর্বার করে তখনও দোষ গোপন রাখেন। কিন্তু যখন গোনাহে গা ভাসিয়ে দেয় তখন এমন গযব নাযিল করেন, যা পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় ও বৃক্ষলতা কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। সুতরাং এমন গযব সহ্য করার ক্ষমতা কার? তুমি যে কথা বলেছিলে, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে সেদিনকে স্মরণ কর যখন আকাশমণ্ডলী গলিত তামার আকার ধারণ করবে, পাহাড়-পর্বত ধুনা তুলার মত হবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতাপ এমন প্রচণ্ড হবে যে, সকল মানুষ হাঁটু গেড়ে পড়ে থাকবে। আমার অবস্থা হচ্ছে, আমি নিজেকে সংশোধন করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে যদি আমার উক্তি সত্য হয়, তবে এমন চিকিৎসকের সন্ধান দিচ্ছি, যিনি সকল ব্যথা নিরাময় এবং মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা করবেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু। খাঁটি মনে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্যে এ আয়াতটিই যথেষ্ট ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَاشَفِيْعٍ يُّطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ـ

–তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন কষ্টের কারণে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। জালেমদের জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং সুপারিশ গ্রাহ্য হয় এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। চোখের অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বিষয় আল্লাহ জানেন।

এ আয়াত থেকে পলায়নের উপায় নেই। ইতি-

কয়েকদিন পরে এই মহিলা আবার এসে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হল। আবেদ তাকে দূর থেকে দেখেই গৃহপানে ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

মহিলা বলল ঃ চলে যান কেন? আজই শেষ সাক্ষাৎ। এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছেই দেখা হবে। এরপর সে খুব কান্নাকাটি করল এবং বলল ঃ যে আল্লাহর হাতে আপনার প্রাণ, আমি তাঁর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার সমস্যাটি আমার জন্যে সহজ করে দেন। কিন্তু আমাকে কোন উপদেশ দিন। আবেদ বললেন ঃ নিজেকে নফসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং এ আয়াতটি মনে রেখ ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ -

তিনিই তোমাদেরকে রাতের বেলায় ওফাত দেন এবং দিনে যা কর, তা জানেন।

মহিলা আঁচলে মুখ লুকিয়ে প্রথম বারের চেয়েও অধিক কান্না শুরু করল। এরপর আপন গৃহে চলে গেল। কয়েকদিন আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকার পর সে দুঃখেই ইন্তেকাল করল। আবেদ তাকে স্মরণ করে কাঁদত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত ঃ আপনিই তো তাকে নিরাশ করেছেন। এখন কাঁদেন কেন? আবেদ বলতেন, সূচনাতেই তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর কাছে নিজের জন্যে ভাণ্ডার করেছি। এখন তা বিনষ্ট হয় কি না, তাই ভেবে কাঁদি।

দ্বাদশ অধ্যায়

জিহ্বার বিপদাপদ

প্রকাশ থাকে যে, জিহ্বা একটি মাংসখণ্ড হলেও এটি আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নেয়ামতসমূহ এবং সূক্ষ্ম কারিগরিসমূহের অন্যতম। এর গোনাহ যেমন সর্বাধিক বেশী, তেমনি এর আনুগত্যও সর্বোপরি। কেননা, হীনতম ঔদ্ধত্য তথা কুফর এবং শ্রেষ্ঠতম আনুগত্য তথা ঈমান এই জিহ্বার সাক্ষ্য দ্বারাই বিকশিত হয়। এছাড়া প্রত্যেক বস্তু– তা অনুপস্থিত হোক অথবা উপস্থিত, স্রষ্টা হোক অথবা সৃষ্টি, জানা হোক অথবা অজানা, বাহ্যিক হোক অথবা আভ্যন্তরীণ, সমস্তই জিহ্বায় উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ জ্ঞান যে বস্তুকে বেষ্টন করে, জিহ্বাই তা বর্ণনা করে– সত্য হোক অথবা মিথ্যা। জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই নেই। এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা জিহ্বা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। উদাহরণতঃ চক্ষু রঙ্গিন বস্তুর আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পারে না। কান আওয়াজ ব্যতীত অন্য কিছু শুনে না। অন্যান্য অঙ্গের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু জিহ্বার কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে বশে রাখে না, শয়তান তাকে দিয়ে অনেক কিছু বলাতে পারে এবং তাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

وَلَا يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ -

-জিহ্বার ফসলই মানুষকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করে।

হাঁ, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে সে ব্যক্তিই বেঁচে থাকবে, যে তাকে শরীয়তের লাগাম পরাবে এবং মুখ দিয়ে সেই কথাই বের করবে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার নিহিত থাকে। কোন্ কথা বলা ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ, তা জানা খুবই দুষ্কর এবং তা আমলে আনা আরও কঠিন। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে জিহ্বাই মানুষের জন্যে অধিক নাফরমান। কেননা, এটি সঞ্চালন করা খুবই সহজ। জিহ্বার বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং তার ক্ষতিকে ভয় করার ব্যাপারে মানুষ মোটেই তৎপরতা প্রদর্শন করে না। অথচ এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। তাই নিম্নে আমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে ও তওফীকে জিহ্বার সমস্ত বিপদাপদ একটি একটি করে সংজ্ঞা, কারণ ও আত্মরক্ষার উপায়সহ সবিস্তার উল্লেখ করব।

জিহ্বার বিপদাশংকা ও চুপ থাকার ফযীলত

জানা উচিত, জিহ্বার কারণে বিপদাশংকা অনেক বড় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে চুপ থাকা। এ কারণেই শরীয়তে চুপ থাকার প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান লক্ষ্য করা যায়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ صَمَتَ نَجَا -যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়। তিনি আরও বলেন- اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ -চুপ থাকা প্রজ্ঞা ও সাবধানতা। কিন্তু কম লোকই চুপ থাকে। আবদুল্লাহ্ ইবনে সুফিয়ানের পিতা রেওয়ায়াত করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন, যেন আপনার পরে কারও কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন ঃ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -বল, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; এরপর সরল পথে কায়েম থাক। আমি আরজ করলাম ঃ আমি কি বিষয় থেকে বেঁচে থাকব? তিনি জিহ্বার দিকে হাতে ইশারা করে বললেন ঃ এ থেকে বেঁচে থাক। ওকবা ইবনে আমের বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ

اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ .

-জিহ্বাকে সংযত রাখ, গৃহে থাক এবং গোনাহের জন্যে ক্রন্দন কর।

তিনি আরও বলেন ঃ যে আমাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব। অন্য এক হাদীসে আছে- যে ব্যক্তি উদর, লজ্জাস্থান ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকে, সে সকল অনিষ্ট থেকেই নিরাপদ থাকে। কেননা, অধিকাংশ লোক এ তিনটি খাহেশ দ্বারাই বিপন্ন হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বিষয়ের কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতার কারণে। আবার প্রশ্ন করা হল, কোন্ বিষয়ের কারণে বেশীর ভাগ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন ঃ

اَلْاَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

-দুটি খালি বস্তুর কারণে- মুখ ও লজ্জাস্থান।

এখানে মুখের অর্থ জিহ্বার বিপদাপদও হতে পারে। কেননা মুখ

জিহ্বার পাত্র এবং মুখের অর্থ পেটও হতে পারে। কেননা, পেট ভরার পথ মুখই। হযরত মুয়ায (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি আপন জিহ্বা বের করে তার উপর অঙ্গুলি রাখলেন; অর্থাৎ চুপ থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সায়ীদ ইবনে জোবায়রের রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন সকাল হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তুমি সোজা থাকলে আমরাও সোজা থাকব। আর তুমি বক্র হলে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে আপন জিহ্বা ধরে টানতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে নায়েবে রসূল, আপনি এ কি করছেন? তিনি বললেন ঃ সে আমাকে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দেহের মধ্যে এমন কোন অঙ্গ নেই, যে আল্লাহর কাছে জিহ্বার ক্ষিপ্রতার অভিযোগ করে না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বলতেন ঃ

يَالِسَانُ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْدِمَ -

–হে জিহ্বা, ভাল কথা বল, গনীমত পাবে এবং অনিষ্ট থেকে অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বে চুপ কর, বিপদমুক্ত থাকবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন? তিনি বললেন ঃ না। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– বনী আদমের অধিকাংশ গোনাহ্ তার জিহ্বার মধ্যে। হযরত ওমর (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন-

مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللّٰهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ -

–যে জিহ্বা সংযত রাখে আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন, যে ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করেন; যে আল্লাহর সামনে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন।

হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَسْكُتْ -

–যে আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে লোকেরা আরয করল ঃ এমন আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। তিনি বললেন ঃ কখনও কথা বলো না। লোকেরা বলল ঃ

এটা তো অসম্ভব। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা ছাড়া মুখ থেকে কিছু বের করো না। হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেন ঃ যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে কথা বলা রূপা হয়, তবে চুপ থাকা স্বর্ণ হবে। এক হাদীসে আছে, মুমিনের জিহ্বা অন্তরের পেছনে থাকে। কথা বলার আগে অন্তরে চিন্তা করে, এর পর কথা বলে। মোনাফেকের জিহ্বা অন্তরের অগ্রে থাকে। সে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যা মনে চায় বলে দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা থেকে বিরত থাকার জন্যে মুখে কংকর রাখতেন। তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলতেন, সে আমাকে অনেক অধঃপতিত করেছে। হযরত তাউস (রঃ) বলেন ঃ আমার জিহ্বা হিংস্র জন্তু। ছেড়ে দিলে আমাকে গিলে ফেলবে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর দরবারে লোকজন কথা বলছিল; কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ) চুপচাপ বসেছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনি কিছুই বলছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ যদি মিথ্যা বলি, আল্লাহর ভয় লাগে, আর যদি সত্য বলি, তবে তোমার ভয় লাগে। এগুলো হচ্ছে চুপ থাকার ফযীলত।

চুপ থাকা যে শ্রেষ্ঠ এর কারণ, কথা বলার মধ্যে শত শত বিপদাশংকা থাকে। ভুল, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, রিয়া, কপটতা, নির্লজ্জতা, কথা কাটাকাটি, আত্মপ্রশংসা, বাড়িয়ে বলা, হ্রাস করা, অপরকে কষ্ট দেয়া, গোপন বিষয় ফাঁস করা ইত্যাদি সব গর্হিত কর্ম জিহ্বার কারণেই হয়ে থাকে। জিহ্বা সঞ্চালন কঠিন মনে হয় না; এর অন্তরে স্বাদ অনুভূত হয়। কথা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি জিহ্বা বশে রাখবে, যেখানে বলা দরকার সেখানেই বলবে এবং যে কথা বলা উচিত নয়, তা থেকে বিরত থাকবে এটা খুবই বিরল। কেননা, কোন্ কথা বলার যোগ্য এবং কোন্‌টি যোগ্য নয়, তা জানা খুবই কঠিন। তাই কথা বলার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া চুপ থাকার আরও কিছু ফায়দা আছে। তা হচ্ছে, এতে সাহস সংহত থাকে, ভয়ভীতি কায়েম থাকে এবং যিকির ও এবাদতের জন্যে অবসর হাতে আসে। চুপ থাকলে কথা বলার বিপদ থেকে দুনিয়াতে মুক্তি অর্জিত হয় এবং পরকালে হিসাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

—মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লেখার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।

চুপ থাকা যে উত্তম, এর যৌক্তিক প্রমাণ হচ্ছে, কথা চার প্রকার। এক, যার মধ্যে ক্ষতিই ক্ষতি নিহিত। দুই, যার মধ্যে উপকারই উপকার নিহিত। তিন, যার মধ্যে ক্ষতি ও উপকার উভয়টি নিহিত। চার, যার মধ্যে ক্ষতিও নেই উপকারও নেই। প্রথম প্রকার কথার ক্ষেত্রে চুপ থাকা জরুরী। তৃতীয় প্রকারে যদি উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়, তবে তাতেও চুপ থাকা জরুরী। চতুর্থ প্রকার কথা বলা অযথা সময় নষ্ট করার নামান্তর। সুতরাং বলার যোগ্য একমাত্র দ্বিতীয় প্রকার কথাই রয়ে গেল। শব্দান্তরে কথার এক চতুর্থাংশ কথা বলাও বিপন্মুক্ত নয়। কেননা এতে কতক গোপন বিপদ যেমন রিয়া, লৌকিকতা, আত্মপ্রীতি, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে যায়। বক্তা টেরও পায় না। তাই কথা বলার মধ্যে সর্বদা বিপদাশংকা লেগেই থাকে। যে ব্যক্তি আমাদের বিশদ বর্ণনা অনুযায়ী কথা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে যাবে, সে নিশ্চিতরূপেই হৃদয়ঙ্গম করবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়' উক্তিটি কতদূর সঠিক। এক্ষণে আমরা কথা সংশ্লিষ্ট বিপদের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু করছি।

অনর্থক কথাবার্তা ঃ যে কথা না বললে কোন গোনাহ্ হয় না এবং জান-মালেরও কোন ক্ষতি হয় না, তাই অনর্থক কথা। মানুষের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে, সে কথা বলার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন তার সবগুলো কথা গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। সে কেবল এমন কথাই মুখে উচ্চারণ করবে, যা শরীয়ত অনুমোদিত এবং যাতে তার নিজের ও কোন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অনাবশ্যক কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায়। এতে একদিকে সময় নষ্ট হয়, অপর দিকে জিহ্বার হিসাব ঘাড়ে চাপে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা, কথা বলার সময় যদি কেউ চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত হয় তবে অদৃশ্য জগত থেকে এমন বিষয়ও প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার উপকার বেশী অথবা তসবীহ্ কিংবা অন্য কোন যিকিরেও মশগুল হওয়া যায়। অবশ্যই বহু কথা এমন আছে, যেগুলোর কারণে জান্নাতে গৃহ নির্মিত হয়। সুতরাং

ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করার ক্ষমতা যার আছে, সে যদি এর বিনিময়ে ঢিলা সঞ্চয় করে, তবে একে ক্ষতি ছাড়া আর কি বলা হবে ? অতএব আল্লাহ্র যিকির, যা উৎকৃষ্ট ধনভাণ্ডার, তা ছেড়ে অনাবশ্যক কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করাও তেমনি ক্ষতির কাজ, যদিও তা উচ্চারণ করা মোবাহ্ তথা অনুমোদিত হয়। ঈমানদারের চুপ থাকা চিন্তাভাবনা, কথা বলা যিকির এবং দেখা শিক্ষা গ্রহণ হয়ে থাকে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ মানুষের পুঁজি হচ্ছে সময়। এ সময় অনাবশ্যক কথায় ব্যয় করলে এবং সওয়াব ও আখেরাতে সম্বল অর্জন না করলে পুঁজি বিনষ্ট হতে বাধ্য। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

–ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে এমন বিষয় বর্জন করা, যা উপকারী নয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে এ বিষয়টি আরও কঠোর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধে জনৈক যুবক শহীদ হলে আমরা দেখলাম, ক্ষুধার কারণে তার পেটে পাথর বাঁধা রয়েছে। তাঁর মাতা মুখ থেকে মাটি মুছে দিয়ে বলল ঃ বৎস! জান্নাত মোবারক হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কিরূপে জানা গেল, সে জান্নাতে যাবে ? সম্ভবতঃ সে অনর্থক কথাবার্তা বলত। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত কা'বকে কয়েকদিন না দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কা'ব কোথায় ? লোকেরা বলল ঃ অসুস্থ। তিনি তাঁকে দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ হে কা'ব। কা'বের মাতা বললেন ঃ তোমাকে বেহিসাব জান্নাত মোবারক হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র উপর আদেশ জারি করে কে এই মহিলা ? কা'ব আরজ করলেন, আমার জননী । তিনি বললেন ঃ তুমি কিরূপে জানলে ? তোমার পুত্র হয় তো কখনও অনর্থক কথাবার্তা বলেছে। এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যার যিম্মায় কোন হিসাব নেই সে-ই বেহিসাব জান্নাতে যেতে পারে। যে অনাবশ্যক কথা বলে, তার যিম্মায় হিসাব থেকে যায়, যদিও সে কথা মোবাহ্ হয়।

অধিক কথা বলা ঃ এতে অনর্থক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও শামিল। উদাহরণতঃ যেখানে প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপেও বলা যায়, সেখানে এক বাক্যের স্থলে দু'বাক্য বললে দ্বিতীয় বাক্য অতিরিক্ত হবে। গোনাহ্ অথবা ক্ষতি না হলেও এটা খারাপ। আতা ইবনে আবী রাবাহ

বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অতিরিক্ত কথা খারাপ মনে করতেন। মুতরিফ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অস্থানে তাঁর উল্লেখ করো না। উদাহরণতঃ কুকুর অথবা গাধা দেখে বলো না, আল্লাহ, একে সরিয়ে দাও।

জানা উচিত, অতিরিক্ত কথার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তবে কোরআন পাকে জরুরী কথার সীমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

–তাদেরকে অনেক পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে খয়রাত করার আদেশ করে অথবা সৎকাজ করতে বলে অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কথা বলে, তার কথা ভিন্ন।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সেই ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যে জিহ্বাকে বাড়তি কথা থেকে সংযত রাখে এবং বাড়তি অর্থ ব্যয় করে দেয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ এ বিষয়টিকে উল্টে দিয়েছে। তারা অতিরিক্ত অর্থ আগলে রাখে এবং জিহ্বাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়। মুতরিফের পিতার বর্ণনা, তিনি আমের গোত্রের লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশংসা করে বলতে থাকে– আপনি আমাদের পিতা, সরদার, শ্রেষ্ঠতম এবং অনুগ্রহদাতা, আপনি এমন, আপনি এমন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

–তোমরা তোমাদের কথা বল, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

এ হাদীস থেকে জানা গেল, যখন কারও সত্য প্রশংসাও করা হয় তখন শয়তান অতিরিক্ত কথা মুখ দিয়ে বের করে দিতে পারে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত কথার ব্যাপারে সতর্ক করছি। কথা ততটুকুই বলা উচিত, যতটুকুতে প্রয়োজন মিটে যায়। হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ মানুষের সব কথা লেখা হয়। কেউ যদি শিশুকে চুপ করানোর জন্যে কোন কিছু দেয়ার কথা বলে এরপর না দেয়, তবে তাকে মিথ্যাবাদী লেখা হয়। হযরত হাসান বলেন ঃ হে মানুষ! আমলনামা খোলা রয়েছে। দু'জন ফেরেশতা তোমার আমল লেখার জন্যে নিয়োজিত আছেন। এখন ইচ্ছা হয় কম কথা বল, ইচ্ছা হয় বেশী কথা

বল। বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) জনৈক জ্বিনকে এক জায়গায় প্রেরণ করে কয়েকজন জ্বিনকে এই বলে তার পেছনে লাগিয়ে দিলেন, তার যা অবস্থা দেখ এবং সে যা বলে, তা এসে আমাকে বলবে। তারা ফিরে এসে বলল ঃ সে বাজারে গিয়ে আপন মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করে, এরপর মানুষের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে থাকে। হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই জ্বিনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন করছিলে কেন? জ্বিন আরজ করল, আকাশের ফেরেশতাদেরকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, তারা মানুষের মাথার উপর বসে কত দ্রুত তাদের আমল লিপিবদ্ধ করছে। আর মানুষকে দেখেও অবাক হচ্ছিলাম, তারা কত তাড়াতাড়ি বিপথগামী হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম তায়মী (রঃ) বলেন ঃ মুমিনের কথা বলা চিন্তাভাবনা সহকারে হয়। কিছু ফায়দা দেখলে বলে ঃ নতুবা চুপ থাকে। পক্ষান্তরে পাপাচারীর জিহ্বা দর্জির কাঁচির মত চলে। চিন্তাভাবনা ছাড়াই অনর্গল বকতে থাকে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন ঃ যার কথা বেশী, সে বেশী মিথ্যাবাদী। যার কাছে অর্থসম্পদ বেশী, তার গোনাহ বেশী। চরিত্রহীন ব্যক্তি নিজের জন্যে আযাব টেনে আনে। ওমর ইবনে দীনার বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বললে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার জিহ্বার ওপাশে কয়টি দরজা আছে? লোকটি বলল ঃ দাঁত আছে, আর আছে ঠোঁট। তিনি বললেন ঃ এদের একটিও কি তোমার কথায় বাধা দিল না? ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন ঃ আলেমের জন্যে কথা বলার চেয়ে কথা শুনাও একটি পরীক্ষা। তাই যতক্ষণ অন্য ব্যক্তি কথা বলে, ততক্ষণ চুপ থাকা উচিত। কেননা, কথা শুনার মধ্যে নিরাপত্তা আছে– বলার মধ্যে নেই।

অবৈধ বিষয়াদি বলা ঃ অবৈধ বিষয়াদি বলাও অনর্থক কথাবার্তার মধ্যে দাখিল। পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমোক্ত দু'টি বিষয় ছিল মোবাহ্। যে কথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ছাড়া হারামও, এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ গোনাহের কথাবার্তা বলা, নারীর কথা বলা, শরাবের আসর ও খারাপ লোকের মজলিসের কথা বর্ণনা করা। এগুলো সব তৃতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল এবং নিশ্চিত রূপ নাজায়েয ও হারাম। এ বিপদটির সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে অনর্থক ও অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে। এরপর আস্তে আস্তে তা হারাম আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্যে আলাপ-আলোচনায় বসে, কিন্তু তাতে কারও ইযযতের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়, অথবা উপরোক্ত

বিষয়াদি নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে। বেলাল ইবনে হারেস বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বললেন, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির একটি কথা বলে। সে জানে না, এতে কোন বড় সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, কিন্তু একারণে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আপন সন্তুষ্টি লেখে নেন। কখনও মানুষের মুখ দিয়ে অসন্তুষ্টির একটি কথা বের হয়ে পড়ে। সে জানে না, এতে বিরাট অসন্তুষ্টি হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আপন অসন্তুষ্টি লেখে নেন। হযরত আলকামা বলেন ঃ বেলাল ইবনে হারেসের এই হাদীস আমাকে অনেক কথা বলতে বাধা দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ ـ

–তাদের সাথে বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় না যায়। নতুবা তোমরাও তাদের সমান হয়ে যাবে।

অপরের কথার মধ্যে কথা বলা এবং বিবাদ করা ঃ হাদীস শরীফে কথার মধ্যে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঝগড়া করো না। তাকে এমন ওয়াদা দিয়ো না, যা পালন করবে না। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

لَايَتَكَمَّلُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ حَقًّا

কথার মধ্যে কথা বলা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন বান্দা ঈমানের স্বরূপ পূর্ণ করে না, যদিও তা সত্য হয়। আরও বলা হয়েছে– যার মধ্যে ছয়টি অভ্যাস থাকে, সে ঈমানের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়– (১) গরমের দিনে রোযা রাখা, (২) খোদাদ্রোহীদেরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা, (৩) বৃষ্টি-বাদলের দিনে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া; (৪) বিপদে সবর করা; (৫) অধিক শীতেও ওযু পূর্ণরূপে করা এবং (৬) সত্যের দিকে থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ না করা। হযরত মালেক ইবনে আনাস বলেন, ঝগড়া বিবাদ ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। তিনি আরও বলেন ঃ ঝগড়া করলে অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং তাতে হিংসা-বিদ্বেষের বীজ পড়ে।

মোট কথা, কথার মধ্যে কথা বলার অনিষ্ট অনেক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে অপরের কথায় আপত্তির ছলে দোষক্রটি বের করা। এটাই বর্জনীয়। কেউ কোন কথা বললে তা যদি সত্য হয়, তবে মেনে নেয়া উচিত। আর ধর্ম

সম্পর্কিত মিথ্যা না হলে চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। দোষ তালাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসে এই স্বভাব مراء বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'খুসুমত' তথা বিবাদ ঃ এর মধ্যে এবং পূর্ববর্তী مراء -এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, অপরকে হেয় ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার মতলবে কারও কথার মধ্যে দোষত্রুটি বের করাকে বলা হয় مراء এবং অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে যে বিবাদ করা হয়, তাকে বলে 'খুসুমত'। এটা কখনও আপত্তি ছাড়াই এবং কখনও আপত্তি সহকারে হয়, কিন্তু مراء আপত্তি ছাড়া হয় না। এই খুসুমতও নিন্দনীয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

ان ابغض الرجال الى الله الد الخصم –অধিক বিবাদকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছে অধিক অপছন্দনীয়।

ইবনে কোতায়বা বলেন ঃ একদিন আমি বসা আছি, এমন সময় বশীর ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছ দিয়ে গমন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে বসে আছ কেন? আমি বললাম ঃ আমার মধ্যে ও আমার চাচাত ভাইয়ের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে বিবাদ আছে। তিনি বললেন ঃ আমার উপর তোমার পিতার অনুগ্রহ আছে। আমি এর প্রতিদান তোমাকে দিতে চাই। শুন, বিবাদ করার চেয়ে মন্দ কোন কিছু নেই। এতে ধর্মকর্ম বরবাদ হয়, ভদ্রতা বিনষ্ট হয় এবং জীবনের আনন্দ উধাও হয়ে যায়। অন্তর এতেই জড়িত থাকে। একথা শুনে আমি গৃহে চলে যাওয়ার জন্যে উঠলাম। আমার প্রতিপক্ষ বলল ঃ কোথায় যাও? আমি বললাম ঃ না– আর বিবাদ নয়। সে বলল ঃ বোধ হয় জেনে নিয়েছ যে, আমিই সত্যপথে আছি। বললাম ঃ না, তা নয়, কিন্তু আমি বিবাদ দূরে ঠেলে দিয়ে নিজে মহৎ হতে চাই। সে বলল ঃ যদি তাই হয় তবে আমিও আর কোন দাবী রাখছি না। সে বস্তুটি এখন তুমিই নিয়ে নাও।

এখানে প্রশ্ন হয়, যখন কারও হক কোন জালেম ব্যক্তি আত্মসাৎ করে, তখন তা উদ্ধার করার জন্যে মামলা মোকদ্দমা করা জরুরী হয়। সুতরাং এটা নিন্দনীয় হবে কেন? জওয়াব হচ্ছে, মামলা-মোকদ্দমা সব সময় এক রকমই হয় না। কখনও মিথ্যা হয় এবং কখনও না জেনে না শুনেও হয়; যেমন উকিল সত্য কোন্ পক্ষে তা না জেনেও যুক্তি প্রমাণ পেশ করে। আবার কখনও হকের পরিমাণের চেয়ে বেশী হকের জন্যেও মামলা-মোকদ্দমা করা হয়। মাঝে মাঝে কেবল প্রতিপক্ষকে হেয় ও

নির্যাতিত করার উদ্দেশে মোকদ্দমা করা হয়। এছাড়া শত্রুতার ভিত্তিতে সামান্য বিষয়ের জন্যেও এটা করা হয়। এ ধরনের মামলা-মোকদ্দমা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যদি মযলুম ব্যক্তি আপন হক পাওয়ার জন্যে শরীয়ত অনুযায়ী মামলা করে, নীচতা, অপব্যয় ও প্রয়োজনের অধিক হাঙ্গামা না করে এবং শত্রুতা ও নির্যাতনের ইচ্ছা মাঝখানে না থাকে, তবে এরূপ মামলা মোকদ্দমা হারাম নয়, কিন্তু যে পর্যন্ত মোকদ্দমা ছাড়াই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায় সেই পর্যন্ত নালিশ না করাই উত্তম। কেননা, মামলা মোকদ্দমা ও ঝগড়ার মধ্যে জিহ্বাকে সীমার মধ্যে রাখা খুবই কঠিন। ঝগড়ার কারণে বুকের মধ্যে ক্রোধের শিখা উত্থিত হয়। এর কারণে হক-নাহকের বিবেচনা শিকায় উঠে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল হিংসা বিদ্বেষই বাকী থেকে যায়। এমনকি, এক পক্ষের দুঃখে অপর পক্ষ আনন্দিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে ঝগড়া ও মামলা মোকদ্দমা করে, সে উপরোক্ত অনিষ্টসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কমপক্ষে তার মনে উদ্বেগ প্রবল থাকে। এমনকি, কিভাবে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা যায়, নামাযের মধ্যেও এই চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে।

কথার প্রাঞ্জলতার জন্যে লৌকিকতা ঃ অধিকাংশ বক্তার অভ্যাস হচ্ছে, তারা মূল বিষয়বস্তু বর্ণনার পূর্বে ভূমিকা সাজায়। এ ধরনের লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা নিন্দনীয়।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ انا واتقياء امتى براء من التكلف

–আমি এবং আমার উম্মতের পরহেযগার ব্যক্তিগণ লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

شرار امتى الذين غذوا بالنعيم ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب يتشدقون فى الكلام -

–আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা ধন-দৌলতের মধ্যে লালিত পালিত হয়, নানাবিধ খাদ্য ভক্ষণ করে, বৈচিত্র্যময় পোশাক পরিধান করে এবং কথা বলার মধ্যে লৌকিকতা করে।

ওমর ইবনে সা'দ একদিন তাঁর পিতার কাছে কিছু অভাব অনটনের কথা বলতে এসে দীর্ঘ ভূমিকা পেশ করলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, অভাবের কথা বলতে গিয়ে আজ যে দীর্ঘ ভূমিকা তুমি বর্ণনা

করলে, তা কখনও করনি। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন এক যমানা আসবে যখন মানুষ কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে, যেমন গাভী ঘাস চিবায়। এ থেকে জানা গেল, হযরত সা'দ (রাঃ) অভাব ব্যক্ত করার পূর্বে পুত্রের ভূমিকা বর্ণনাকে দূষণীয় মনে করেছেন। তিনি একে নিছক লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা আখ্যা দিয়েছেন। কথার মধ্যে অভ্যাস বহির্ভূত ছন্দের মিলও এর মধ্যে দাখিল। অতএব কথা এমনভাবে বলতে হবে, যাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। উদ্দেশ্য কেবল অন্যকে বুঝানো । এছাড়া যা কিছু করা হবে, সবই লৌকিকতা। হাঁ, খোতবা ও ওয়াযে উৎকৃষ্ট শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তাই এতে উৎকৃষ্ট ভাষা থাকা ভাল।

অশ্লীল কথন ও গালিগালাজ ঃ এটাও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। আভ্যন্তরীণ নষ্টামি ও বিদ্বেষ থেকেই এর উৎপত্তি। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ایاکم والفحش فان الله لایحب الفحش والتفحیش -

-তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও সীমাতিরিক্ত অনর্থক বকাবকি পছন্দ করেন না।

বদর যুদ্ধে যেসকল মুশরিক নিহত হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকেও গালি দিতে নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা তোমরা যা বল তাতে তাদের তো কিছুই হয় না, কেবল জীবিতদেরই কষ্ট হয়ে থাকে। আর সাবধান, মন্দ বলা নীচতা।

অশ্লীলতার সংজ্ঞা হচ্ছে, লজ্জাজনক বিষয়সমূহ পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা- যেমন লজ্জাস্থানের নাম মুখে উচ্চারণ করা। অধিকাংশ ভাঁড় দিবারাত্র এরূপ শব্দ উচ্চারণ করে ফিরে, কিন্তু সৎ সাধু ব্যক্তিরা এসব শব্দ মুখে আনতে লজ্জাবোধ করে এবং প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে উল্লেখ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু লজ্জাশীল। তিনি গোনাহ মাফ করেন এবং ইশারায় বর্ণনা করেন। দেখ, তিনি সহবাসকে "লমস" তথা স্পর্শ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু এর জন্যে কতক এমন শব্দ মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত আছে, যা না বলাই ভাল এবং প্রায়ই গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর কতক শব্দের মধ্যেও অশ্লীলতা বেশী এবং কতক শব্দের মধ্যে কম। দেশ ও জাতির অভ্যাসভেদে এগুলোর মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। কেবল স্ত্রী সঙ্গমের মধ্যেই অশ্লীলতা সীমিত নয়; বরং প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয়কেও

এরূপ মনে করা উচিত। উদাহরণতঃ মলত্যাগের জন্য পায়খানা ও প্রস্রাব শব্দ ব্যবহার করলে এটা অন্যান্য শব্দের তুলনায় ভাল। মোট কথা, যেসব শব্দ সাধারণভাবে পছন্দীয় নয় সেগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা অনুচিত। করলে অশ্লীলতার মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নারীদের উল্লেখও ইশারায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণতঃ 'আমার স্ত্রী একথা বলেছে' না বলে 'ঘরে একথা বলা হয়েছে', 'পর্দার আড়াল থেকে বলা হয়েছে', অথবা 'বাচ্চাদের মা একথা বলেছে' বলা উচিত। এমনিভাবে কারও ধবলকুষ্ঠ, কুষ্ঠ, অর্শ ইত্যাদি ঘৃণা উদ্রেককারী রোগ থাকলে এগুলো উল্লেখ করা ঠিক নয়, বরং 'দুরারোগ্য ব্যাধি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবে। আলা ইবনে হারুন বলেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের একবার বগলে ফোঁড়া বের হয়। তিনি জিহ্বার খুব হেফাযত করতেন। তাই আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম, দেখি, এ ব্যাপারে তিনি কি বলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ফোঁড়া কোথায় বের হয়েছে? তিনি বললেন ঃ বাহুর ভিতরের দিকে ।

অশ্লীলতার কারণে অপরকে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে অথবা মন্দ লোকের সংসর্গে এই বদভ্যাস গড়ে উঠে। জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর। তোমার মধ্যে কোন বিষয় দেখে যদি কেউ তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমিও তার বিষয় দেখে তাকে লজ্জা দিয়ো না। অর্থাৎ কেউ মন্দ বললে জওয়াবে তুমি তেমনি মন্দ বলো না। এতে সে শাস্তি ভোগ করবে এবং তুমি সওয়াব পাবে। কোন কিছুকে গালি দেবে না। বেদুঈন বলে, এরপর আমি কখনও গালি দেইনি। আয়ায ইবনে হেমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়। সে মর্তবায় আমার চেয়ে কম। আমিও তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নিলে ক্ষতি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ গালিগালাজকারী উভয়ই শয়তান হয়ে থাকে। তারা একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং অপবাদ আরোপ করে।

এক হাদীসে আছে– سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر

–মুমিনকে গালি দেয়া পাপাচার এবং লড়াই করা কুফর।

এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে– সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ হচ্ছে পিতামাতাকে গালি দেয়া। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ মানুষ পিতামাতাকে কিরূপে গালি দেবে? তিনি বললেন ঃ অন্যের পিতামাতাকে

গালি দেয় এবং জওয়াবে সে তার পিতামাতাকে গালি দেয়। এভাবে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়ার কারণ সে নিজেই হয়।

অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা ঃ এটা জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও জড় পদার্থ সকলের জন্যে সমান। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন-

لَاتَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَابِغَضَبِهٖ وَلَا بِجَهَنَّمَ

—তোমরা একে অপরকে আল্লাহর লানত, আল্লাহর গযব বা জাহান্নাম দ্বারা অভিসম্পাত করো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন- একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে তার এক গোলামের প্রতি অভিসম্পাত করতে শুনলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আবু বকর, সিদ্দীকও অভিসম্পাত করে? কাবার পালনকর্তার কসম! এ বাক্যটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেদিনই গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন ঃ এখন থেকে আমি কখনও এরূপ ভুল করব না।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اِنَّ اللَّاعِنِيْنَ لَايَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

—অভিসম্পাতকারীরা কেয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হবে না, সাক্ষ্যদাতাও হবে না।'

লানত তথা অভিসম্পাতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। সুতরাং এ শব্দটি তার ক্ষেত্রেই বলা দুরস্ত হবে, যার মধ্যে রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিশেষণ পাওয়া যায়। এরূপ বিশেষণ হচ্ছে কুফর ও জুলুম। অতএব কাফের উপর অথবা জালেমের উপর অভিসম্পাত হোক, একথা বলা জায়েয। মোট কথা, শরীয়তে যেমন বর্ণিত আছে, সেসব শব্দ দ্বারা অভিসম্পাত করা উচিত। কেননা, এতে বিপদও আছে। কারণ এটা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যে, তার অভিশপ্তকে আল্লাহ তাআলা রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না অথবা আল্লাহ আপন রসূলকে বলে দিলে তিনি জানতে পারেন।

জানা উচিত, তিনটি বিশেষণ লানতের দাবী রাখে- কুফর, বেদআত ও পাপাচার। এসব বিশেষণে লানত করার পন্থা তিনটি। প্রথম, ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করা; যেমন 'কাফের, বেদআতী ও ফাসেকদের

উপর আল্লাহর লানত হোক' বলা; অথবা 'ইহুদী, খৃষ্টান, যিনাকার, জালেম ও সুদখোরের উপর লানত হোক বলা। এই উভয়বিধ পন্থায় লানত করা জায়েয। তবে বেদআতীদের উপর লানত করতে সর্বসাধারণকে নিষেধ করা উচিত। কেননা, কোন্‌টি বেদআত, তা চেনা কঠিন। হাদীসে এর জন্যে কোন শব্দ বর্ণিত নেই। তৃতীয় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করা। উদাহরণতঃ যায়দ কাফের, ফাসেক অথবা বেদআতী হলেও যায়দের উপর অভিসম্পাত হোক বলা যাবে না, কিন্তু শরীয়তে যার উপর লানত প্রমাণিত আছে, তার উপর লানত হোক বলায় দোষ নেই; যেমন 'ফেরাউন ও আবু জাহলের উপর লানত হোক' বলা, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট জীবিত ব্যক্তি কট্টর কাফের হলেও তার উপর লানত করা ঠিক নয়; সম্ভবতঃ সে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতঃ মুমিন হয়ে যাবে।

ইয়াযীদ হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল অথবা হত্যার অনুমতি দিয়েছিল। তাকে লানত বলা জায়েয কিনা? এ প্রশ্নের জওয়াব হচ্ছে, হত্যা ও হত্যার অনুমতি উভয়টি যথার্থ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। হত্যা ও হত্যার অনুমতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঘাতক বলা যায় না। কেননা, হত্যা কবীরা গোনাহ্। কোন মুসলমানকে বিনা প্রমাণে হত্যাকারী বলা যায় না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ কাউকে কাফের অথবা ফাসেক বলে, বাস্তবে সে এরূপ না হলে যে বলে তার প্রতিই ফিরে আসে। যদি কেউ বলে, "ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীর উপর লানত হোক"– তবে এটা জায়েয কিনা? জওয়াব হল– এর সাথে একথাও বলা উত্তম, যদি সে তওবা না করে মরে থাকে, তবে তার উপর লানত হোক। কেননা, তওবার পর মৃত্যুবরণ করারও সম্ভাবনা আছে। দেখ, ওয়াহশী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ)-কে কাফের অবস্থায় শহীদ করেছিলেন। এরপর মুসলমান হয়ে কুফর ও হত্যা সবকিছু থেকে তওবা করেছিলেন। এখন কেউ তার উপর লানত করতে পারবে না। এখানে ইয়াযীদকে লানত করার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার কারণ, আজকাল মানুষ লানত করার ব্যাপারে তড়িঘড়ি মুখ খোলে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে– মুমিন লানতকারী হয় না। সুতরাং যে কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাকে ছাড়া কাউকে লানত করা ঠিক নয়। যদি একান্তই মনে চায়, তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ না করে ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করবে। লানত করার চেয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা উত্তম। এটা না হলে চুপ থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা।

গান ও কবিতা আবৃত্তি ঃ গানের মধ্যে কোন্‌টি হারাম ও কোন্‌টি

হালাল সেমা অধ্যায়ে আমরা তা লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতা ভালও আছে মন্দও আছে, অবশ্য একেবারে কবিতার মধ্যেই ডুবে যাওয়া নিন্দনীয়। অযথা কথাবার্তা না হলে কবিতা আবৃত্তি করা ও রচনা করা হারাম নয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, কবিতার মধ্যে প্রায়ই প্রশংসা, দুর্নাম রটনা ও নারীদের উল্লেখ থাকে। এতে মিথ্যারও অবকাশ আছে। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) হযরত হাসসান ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-কে কবিতায় কাফেরদের দুর্নাম বর্ণনা করার আদেশ করেছিলেন। কারও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করলে যদিও কিছুটা মিথ্যা হয়, কিন্তু হারাম হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেও এমন কবিতা পাঠ করা হয়েছে, যাতে তালাশ করলে বাড়াবাড়ির বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি কখনও নিষেধ করেননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি সূতা কাটছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুতা সেলাই করছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত এবং ঘর্মবিন্দু আলোর মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের অপরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করছে। আমি দেখামাত্রই এই অলৌকিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার হতবুদ্ধিতা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন বিস্ময়াবিষ্ট হচ্ছ কেন? আমি আরজ করলাম ঃ আপনার ললাটের ঘর্মবিন্দু থেকে সৌন্দর্যের যে তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, তাতেই আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। যদি আবু বকর হুযলী আপনাকে এই মুহূর্তে দেখতে পেত, তবে অবশ্যই জেনে নিত, তার কবিতার মূর্ত প্রতীক আপনিই। তিনি বললেন ঃ তার কবিতা কি ? আমি আরজ করলাম ঃ এ দু'টি পংক্তি –

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

واذا نظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

–সে মুক্ত ঋতুস্রাবের মলিনতা থেকে, দুধমাতার ভ্রষ্টতা থেকে এবং শয়তানের ব্যায়াম থেকে। তুমি যখন তার মুখমণ্ডলের পানে তাকাবে, তখন মনে হবে যেন তা বিদ্যুৎ উজ্জ্বল মেঘমালার ন্যায় ঝলমল করছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন কাজ ছেড়ে আমার ললাটে চুম্বন এঁকে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

جزاك الله خيرا يا عائشة –আয়েশা, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আমার প্রতি সম্ভবতঃ এতটুকু খুশী হওনি, যতটুকু আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

হোনায়ন যুদ্ধের পর রসূলে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করলেন এবং আব্বাস ইবনে মেরদাসকে চারটি উট দান করলেন। সে উট নিয়ে চলে গেল এবং তার হক আরও বেশী বলে অভিযোগ করে একটি কবিতা রচনা করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করলেন ঃ তার অভিযোগ মিটিয়ে দাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং এত বেশী দিলেন যে, সে ওযর পেশ করতে শুরু করল এবং বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। কবিতা যখন আমার জিহ্বায় পিঁপড়ার মত দংশন করতে থাকে, তখন কিছু না বলে উপায় থাকে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাসলেন এবং বললেন ঃ যতদিন উট উচ্চ কণ্ঠে চেঁচাবে, ততদিন আরবরা কবিতা বলা ত্যাগ করবে না।

হাসিঠাট্টা ঃ আসলে এটাও খারাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু অল্প হলে দোষ নেই। হাদীসে আছে ঃ لاتمار اخاك ولاتمارخه –আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঠাট্টা করো না। কথার মধ্যে কথা বললে অপরের মনে কষ্ট হয়; তাকে মিথ্যুক ও মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়। হাসিঠাট্টার মধ্যে এটা নেই। তবুও হাসিঠাট্টা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে বাড়াবাড়ির করা। এতে মন সর্বক্ষণ খেলাধুলা ও কৌতুকে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। খেলাধুলা যদিও মোবাহ, কিন্তু সর্বক্ষণ এতে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ। অধিক হাসির কারণে অট্টহাসির পথ খুলে যায়, যদ্দরুন অন্তর মরে যায় এবং অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ভাবমুর্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। হাসি এসব দোষ থেকে মুক্ত হলে নিন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– انى لامازح ولا اقول الاحقا – আমি হাসিঠাট্টা করি, কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। অন্যদের উদ্দেশ্য তো হয়ে থাকে যেভাবেই হোক কেবল অপরকে হাসানো। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে বেশী হাসে, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব হ্রাস পায়। যে আনন্দ গীত গায়, সে মানুষের দৃষ্টিতে পাতলা হয়ে যায়। যে এ কাজ বেশী করে, সে এ নামেই খ্যাত হয়ে যায়। যে বেশী কথা বলে, সে বেশী ভুল করে। যে বেশী ভুল করে তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কম, তার পরহেযগারীও কম। যার পরহেযগারী কম, তার অন্তর মরে যায়। আর একটি কারণ হচ্ছে, হাসির কারণে মানুষ আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا –যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে

ক্রন্দন করতে বেশী এবং হাসতে কম। ওহায়ব ইবনে ওয়ারদ কিছু লোককে ঈদুল ফিতরের দিন হাসাহাসি করতে দেখে বললেন ঃ যদি এদের মাগফেরাত হয়ে থাকে, তবে এটা শোকরকারীদের কাজ নয়। আর মাগফেরাত না হয়ে থাকলে এটা ভীতদেরও কাজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোনাহ করে হাসে, সে কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যাবে।

যে হাসি সরবে হয় তাই খারাপ। অর্থাৎ যা মুচকি হাসির চেয়ে বেশী তা নিষিদ্ধ। নীরব হাসি, যাকে আরবীতে 'তাবাস্সুম' বলা হয়, তা ভাল। রসূলে করীম (সাঃ)ও মুচকি হাসতেন।

এক্ষণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাসি ঠাট্টা কিরূপ ছিল, তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। হযরত হাসান (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, এক বৃদ্ধা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে বললেন ঃ কোন বৃদ্ধ জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিল। তিনি বললেন, আরে, কাঁদ কেন? তুমি যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধ থাকবে না, ষোড়শী হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا –আমি তাদেরকে আবার সৃষ্টি করব এবং কুমারী যুবতীতে পরিণত করব। যায়দ ইবনে আসলাম রেওয়ায়াত করেন, উম্মে আয়মন নাম্নী জনৈকা মহিলা রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ তোমার স্বামী কি সেই ব্যক্তি নয়, যার চোখে শুভ্রতা আছে? মহিলা বলল, তার চোখ তো ভাল। তাতে শুভ্রতা নেই। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আছে। মহিলা কসম খেয়ে বলল ঃ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার চোখে শুভ্রতা নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের চক্ষু কোটর সাদা ও কাল হয়ে থাকে। অন্য একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে সওয়ারীর জন্যে একটি উট প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে সওয়ারীর জন্যে একটি উটের বাচ্চা দেব। মহিলা বলল ঃ বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ উট তো উটের বাচ্চাই হয়ে থাকে। যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী যারপরনাই কুশ্রী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন বয়াত করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান ছিল না। বয়াতের পর যাহ্হাক আরজ করলেন ঃ আমার দু'জন স্ত্রী আছে, যারা এই গোরা মহিলা অর্থাৎ হযরত আয়েশা

(রাঃ)-এর চেয়েও ভাল। আপনি বিবাহ করলে তাদের একজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা সুশ্রী, না তুমি সুশ্রী? সে বলল ঃ আমি তাদের চেয়ে অনেক ভাল। এই সওয়াল জওয়াব শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ভেবে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না যে, এমন সুরত নিয়েও সে নিজেকে সুশ্রী মনে করে নায়ীমান আনসারী একজন হাস্যকারী ব্যক্তি ছিল, কিন্তু খুব মদ্যপান করত। মদ্যপানের পর তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হলে তিনি আপন জুতা দিয়ে তাকে খুব প্রহার করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও আদেশ করতেন, তাঁরাও জুতা মারতেন। অনেকবার এরূপ প্রহৃত হওয়ার পর একদিন জনৈক সাহাবী বললেন ঃ তোমার প্রতি আল্লাহর লানত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীকে বললেন ঃ এরূপ বলো না। এ ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মহব্বত রাখে। এই নায়ীমানের অবস্থা ছিল, মদীনায় কখনও দুধ অথবা অন্য কোন খাদ্যবস্তু এলে সে তা ক্রয় করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করত এবং বলত, হুযুর, এ বস্তুটি আমি আপনার জন্যেই ক্রয় করেছি এবং হাদিয়া এনেছি। যখন সেই বস্তুর মালিক দাম চাইতে আসত, তখন তাকেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করে বলত, হুযুর অমুক বস্তুর দামটি দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ তুমি তো আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলে। সে আরজ করত, আমার কাছে দাম ছিল না, কিন্তু মন চাচ্ছিল, আপনি এ বস্তুটি খান। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে দাম দিয়ে দিতেন। অতএব এ ধরনের হাসিঠাট্টা কখনও কখনও করা জায়েয।

উপহাস ও কৌতুক ঃ যদি এর দ্বারা অপরের কষ্ট হয়, তবে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ -

মুমিনগণ! তোমাদের একদল অপর দলের সাথে যেন উপহাস না করে। সম্ভবতঃ তারা তাদের চেয়ে উত্তম হবে। মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের সাথে উপহাস না করে। সম্ভবতঃ তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

উপহাসের অর্থ হচ্ছে অপরের হেয়তা প্রকাশ করা এবং তার দোষত্রুটি হাস্যকর পন্থায় বর্ণনা করা। এটা তার কথা ও কাজের অনুকরণ অথবা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা হতে পারে। অনুপস্থিতিতে হলে এটা গীবত

এবং উপস্থিতিতে হলে উপহাস, কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তির অনুকরণ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنِّىْ حَاكَيْتُ اِنْسَانًا وَلِىْ كَذَا وَكَذَا

—আল্লাহর কসম. অনেক কিছু পাওয়ার বিনিময়েও আমি পছন্দ করি না যে, কোন মানুষের অনুকরণ করি।

যদি কোন ব্যক্তি উপহাসে খুশী হয়, তবে একে উপহাস না বলে ঠাট্টা বলা হবে, যার বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

গোপন কথা ফাঁস করা ঃ এটাও নিষিদ্ধ। কারণ এতেও কষ্ট হয় এবং বন্ধুত্বের হক বিনষ্ট হয়।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ

—যখন কোন ব্যক্তি কথা বলার পর আড় চোখে তাকায় তখন এটা আমানত হয়ে যায়।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ কোন ভাইয়ের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়াও খেয়ানতের মধ্যে দাখিল।

বর্ণিত আছে, আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ওলীদ ইবনে ওতবাকে কোন গোপন তথ্য বললেন। তিনি আপন পিতা ওতবাকে গিয়ে বললেন ঃ আজ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) একটি গোপন কথা বলেছেন। আমাকে যখন বলেছেন, তখন আপনার কাছে আর গোপন থাকবে কেন? ওতবা বললেন, ব্যাপারটি আমাকে বলো না। কারণ, যতক্ষণ মানুষ গোপন তথ্য গোপন রাখে, ততক্ষণ তার থাকে, কিন্তু বলে দিলে অপরের এখতিয়ারে চলে যায়। ওলীদ বললেন ঃ পিতা পুত্রের মধ্যেও এরূপ হয় নাকি? তিনি বললেন ঃ পিতা পুত্রের মধ্যে হয় না ঠিক, কিন্তু আমি চাই, গোপন তথ্য ফাঁস করার অভ্যাস যেন তোমার না হয়। এরপর ওলীদ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেদমতে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা তোমাকে ভুলের গোলামী থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সারকথা, গোপন তথ্য ফাঁস করা খেয়ানত। এতে কারও ক্ষতি হলে হারাম। ক্ষতি না হলেও নীচতা।

মিথ্যা ওয়াদা ঃ ওয়াদা করার ক্ষেত্রে জিহ্বা অগ্রে থাকে, কিন্তু তা পূর্ণ করা মনের জন্যে অপ্রিয় হয়ে থাকে। ফলে ওয়াদা মিথ্যা কথায়

পর্যবসিত হয়। এটা মোনাফেকীর আলামত।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

—মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ওয়াদা করা দানের মধ্যে গণ্য। তিনি আরও বলেন ঃ ওয়াদাও এক প্রকার কর্জ। আল্লাহ্ পাক নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রশংসায় বলেন ঃ انه كان صادق الوعد—সে ছিল ওয়াদায় সাচ্চা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন ঃ জনৈক কোরায়শী ব্যক্তি আমার কাছে আমার কন্যা বিবাহ চেয়েছিল। আমি কিছুটা দোদুল্যমান ওয়াদা করেছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁর কাছে এক তৃতীয়াংশ মোনাফেকী নিয়ে যাব না। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সে ব্যক্তিকেই কন্যা দান করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হাসান রেওয়ায়াত করেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নবুওয়তের পূর্বে একটি লেনদেন করেছিলাম। তাঁর কিছু প্রাপ্য আমার কাছে বাকী ছিল। আমি আরজ করলাম ঃ এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, কিন্তু আমি সেদিন এবং পরের দিন সম্পূর্ণ ভুলে রইলাম। তৃতীয় দিন এসে তাঁকে সেই জায়গাতেই পেলাম। তিনি বললেন ঃ মিয়া, তুমি বড় বিপদে ফেলে দিলে। এখানে তিন দিন ধরে তোমার অপেক্ষা করছি।

ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ যদি কেউ আসার ওয়াদা করে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে, তবে তার জন্যে কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তিনি বললেন; পরবর্তী নামাযের সময় আসা পর্যন্ত। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) প্রত্যেক ওয়াদার সাথে "ইনশাআল্লাহ্" বলতেন। এতে ওয়াদা পূর্ণ করা না হলেও কোন দোষ থাকে না। এর সাথে পাকাপোক্ত ইচ্ছা থাকলে তা পূর্ণ করা উচিত। যদি কেউ ওয়াদা করার সময়ই পাকা ইচ্ছা রাখে যে, পূর্ণ করবে না, তবে এরই নাম 'নেফাক'। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস পাওয়া যাবে, সে পাকা মোনাফেক, যদিও সে নামায রোযা আদায় করে এবং মুসলমান বলে দাবী করতে থাকে। অভ্যাস তিনটি এই ঃ (১) কথা বললে মিথ্যা বলা (২) ওয়াদা করলে তা পূর্ণ না করা এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করা। এটা তারই অবস্থা, যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার নিয়ত রাখে না, অথবা ওযর ছাড়াই ওয়াদার খেলাফ করে, কিন্তু যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার ইচ্ছা রাখে, অতঃপর কোন ওযরের

কারণে পূর্ণ না করে, সে মোনাফেক হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) আবুল হায়সামকে একটি গোলাম দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এরপর গনীমতের মালে তিনটি গোলাম আসে। দুটি গোলাম বন্টন করে দেয়া হল। একটি রয়ে গেল। আদরের দুহিতা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে বললেন ঃ দেখুন, যাঁতাকল চালাতে চালাতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। এ গোলামটি আমাকে দান করুন, কিন্তু আবুল হায়সামের সাথে কৃত ওয়াদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে পড়ে গেল। তিনি কন্যাকে বললেন ঃ তোমাকে গোলাম দিয়ে দিলে আমার ওয়াদা বিপন্ন হবে। এরপর তিনি গোলামটি আবুল হায়সামকেই দান করেন।

মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া ঃ এটা জঘন্য অপরাধ ও মহাপাপ। ইসমাঈল ইবনে ওয়াসেতা বলেন ঃ রসূলল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খোতবায় এ কথা বলতে শুনলাম– আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, হিজরতের প্রথম বছরে রসূলে আকরাম (সাঃ) এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন -এতটুকু বলেই হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। এরপর কান্না থামিয়ে এই হাদীস বর্ণনা করলেন–

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ ـ

–তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের সঙ্গী, তাদের উভয়ের স্থান জাহান্নাম। তোমরা সততা আঁকড়ে থাক। সততা পুণ্য কাজের সঙ্গী। তারা উভয়েই জান্নাতে স্থান পাবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ব্যবসায়ীরা পাপাচারী হয়ে থাকে। সাহারায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ হুযূর, আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব ব্যবসায়ীদের পাপাচারী হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ কারণ, তারা কসম খেয়ে খেয়ে গোহাহগার হয় এবং কিছু বললে মিথ্যা বলে। তিনি আরও বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন না। প্রথম, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়, যে মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। তৃতীয়, যে গিঁটের নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিধান করে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের কাছে মিথ্যার চেয়ে অধিক কোন বদভ্যাস অপ্রিয় ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন

সাহাবীর মিথ্যা জেনে নিতেন, তখন সে ব্যক্তির নতুনভাবে আল্লাহ্‌র সামনে তওবা না করা পর্যন্ত তিনি তার প্রতি মন থেকে মলিনতা দূর করতে পারতেন না। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরজ করলেন ঃ তোমার বান্দাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে ভাল? এরশাদ হল ঃ যার জিহ্বা মিথ্যা বলে না, অন্তর পাপাচারে লিপ্ত হয় না এবং লজ্জাস্থান যিনা করে না। হযরত লোকমান আপন পুত্রকে বললেন ঃ মিথ্যা বলো না, যদিও তা পাখীর মাংসের মত সুস্বাদু মনে হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম মনে হয় যার নাম উত্তম। যখন সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তখন সে ব্যক্তি ভাল মনে হয়, যার অভ্যাস ভাল। লেনদেন করার পর সে ব্যক্তি ভাল মনে হয়, যে কথায় সাচ্চা এবং ওয়াদায় পাক্কা। খালেদ ইবনে সবীহ্‌কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ একবার মিথ্যা বললেও কি কাউকে মিথ্যাবাদী বলা হবে? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই।

যে যে স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয ঃ প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা সত্তাগতভাবে হারাম নয়; বরং এদিক দিয়ে হারাম যে, এর দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধিত হয়। এ ক্ষতির সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আসল সত্য সম্পর্কে মূর্খ থাকা। সুতরাং যদি কোথাও আসল সত্য সম্পর্কে মূর্খ থাকার মধ্যে উপকারিতা থাকে, তবে মিথ্যা বলার অনুমতি হওয়া উচিত; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব হওয়া দরকার। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ মিথ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি পলায়ন করে তোমার মাধ্যমে এক গৃহে আত্মগোপন করে এবং অন্য এক ব্যক্তি তরবারি নিয়ে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্যে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তবে এ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

সারকথা, যেখানে একটি উৎকৃষ্ট লক্ষ্য মিথ্যা ও সত্য উভয়টি দ্বারা অর্জিত হতে পারে, সেখানে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি কেবল মিথ্যা দ্বারাই সেই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, তবে লক্ষ্য বৈধ হলে মিথ্যা বলাও বৈধ এবং লক্ষ্য ওয়াজিব হলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব; যেমন বর্ণিত উদাহরণ দ্বারা বুঝা যায়। যেখানে পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন মিথ্যা ছাড়া সম্ভবপর হয় না, সেখানে মিথ্যা বলা বৈধ; কিন্তু যথাসম্ভব বৈধ মিথ্যা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস হয়ে গেলে অনাবশ্যক মিথ্যাও মুখে উচ্চারিত হওয়ার অথবা প্রয়োজনের বেশী মিথ্যা বলে ফেলার আশংকা থাকে। এ থেকে জানা গেল, মিথ্যা আসলে হারাম,

কিন্তু প্রয়োজনে জায়েয হতে পারে। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি কখনও শুনিনি যে, রসূলে করীম (সাঃ) তিনটি জায়গা ছাড়া কোথাও মিথ্যার অনুমতি দিয়েছেন। (১) দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর করার ক্ষেত্রে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمَّى خَيْرًا

–যে দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে ভাল কথা বলে এবং ভাল বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদী নয়।

হযরত আবু কাহেল বর্ণনা করেন ঃ দু'জন সাহাবীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। অবশেষে তারা খুন খারাবী করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। আমার সাথে তাদের একজনের দেখা হলে আমি তাকে বললাম ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে লড়তে চাও কেন? সে-তো তোমার প্রশংসা করছিল। এরপর অপরজনের সাথেও সাক্ষাৎ করে এ কথাই বললাম। অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। এরপর আমি ভাবতে লাগলাম, তাদের মধ্যে সন্ধি তো হয়ে গেছে, কিন্তু মিথ্যা বলার কারণে আমার কি দশা হবে? তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু কাহেল! পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা দরকার, যদিও মিথ্যা বলেই হয়। আতা ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আমার স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলব? তিনি বললেন ঃ মিথ্যার মধ্যে কল্যাণ নেই। সে আরজ করল ঃ আমি তার সাথে ওয়াদা করব? তিনি বললেন ঃ এতে দোষ নেই।

মিথ্যা বলার ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটি স্থানের ব্যতিক্রম হাদীস দ্বারা জানা গেল। যদি আরও কোন স্থান এমন হয়, যেখানে বিশুদ্ধ লক্ষ্য সামনে রেখে মিথ্যা বলা হয়, তবে সেই স্থানও এতে দাখিল হবে। উদাহরণ ঃ কোন ডাকাত ও জালেম যদি কাউকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করে ঃ বল, তোর ধনসম্পদ কোথায়? তবে ধন-সম্পদ নেই বলা তার জন্যে জায়েয।

ইঙ্গিতেও মিথ্যা বলা ঠিক নয় ঃ পূর্ববর্তীদের উক্তি হচ্ছে, ইঙ্গিতে মিথ্যা বললে তা মিথ্যা হয় না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ ইঙ্গিতে কিছু মিথ্যা বলে তবে সে মিথ্যা থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য, যখন কেউ মিথ্যা কথা বলার জন্যে বাধ্য হয়, তখন যেন ইঙ্গিতে বলে দেয়। নতুবা বিনা বাধ্যবাধকতায় মিথ্যা বলা প্রকাশ্যেও জায়েয নয়–

ইঙ্গিতেও নয়। ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা হচ্ছে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, যার এক অর্থ বক্তার উদ্দেশ্য হয় এবং অন্য অর্থ শ্রোতা বুঝে। উদাহরণতঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক জায়গার গভর্নর ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর পত্নী তাঁকে বলল ঃ অন্য গভর্নররা যেমন গৃহে এলে কিছু নিয়ে আসে, তুমিও কিছু এনেছ কি না? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ না। কারণ আমার সাথে একজন গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। এ কথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলা, কিন্তু তাঁর পত্নী বুঝলেন, সম্ভবতঃ হযরত ওমর তাঁর পেছনে কোন গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন। তাই বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ্! তুমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলে। আর হযরত ওমর (রাঃ) কি না তোমার পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। মহিলাদের মধ্যে এ বিষয়টির খুব চর্চা হল। অবশেষে হযরত ওমরের কাছেও অভিযোগ পৌছল। তিনি হযরত মুয়াযকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কবে তোমার পেছনে গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলাম? তিনি বললেন ঃ আমি একথা তো বলিনি যে, আপনি গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। আমি কেবল বলেছিলাম, আমার সাথে গুপ্তচর ছিল। পত্নীর আবদারের সামনে এছাড়া আমার কোন ওযর ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) হাসলেন এবং তাকে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বললেন ঃ নাও, এ দিয়ে পত্নীকে খুশী কর গে।

মোটকথা, প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা যায়। বিনা প্রয়োজনে এটা করা উচিত নয়। কেননা, এটা একটা কৌশল। এতে প্রতিপক্ষ বাস্তবের বিপরীত বুঝে। সুতরাং মাকরূহ। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওতবা বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের খেদমতে গেলাম। তখন আমার পরনে ছিল উৎকৃষ্ট দামী পোশাক। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন আমার উৎকৃষ্ট পোশাক দেখে লোকেরা বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন তোমাকে এই পোশাক দিয়েছেন? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। এতে আমার পিতা আমাকে শাঁসিয়ে বললেন ঃ খবরদার, মিথ্যা কথা বলো না। আবদুল্লাহর এ বাক্যটি মিথ্যা ছিল না, কিন্তু সাধারণত শাসনকর্তার জন্যে ওয়াদা কোন পুরস্কারের বিনিময়ে হয়ে থাকে বিধায় লোকেরা এ থেকে এটাই বুঝে থাকবে যে, খলীফা দান করেছেন। এতে যেন একটি মিথ্যা ভিত্তিহীন কথার উপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাই তিনি এ দোয়া করতে নিষেধ করলেন।

আর একটি মিথ্যা আছে, যদ্দ্বারা কেউ ফাসেক হয় না। তা হচ্ছে, অভ্যাসগতভাবে অতিরঞ্জিত বলা; যেমন কেউ বলে, তোমাকে এটা করতে একশ' বার নিষেধ করেছি। এতে সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না; বরং অতিরঞ্জন সহকারে আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য, কিন্তু যে জিহ্বা অতিরঞ্জিত কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে মিথ্যার আশংকা থেকে মুক্ত হয় না।

আর একটি মিথ্যার অভ্যাস মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে, যখন কাউকে বলা হয়– এস, খানা খাও। তখন সে জওয়াব দেয়, আমার ক্ষুধা নেই। কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য এর সাথে জড়িত না থাকলে এটাও মিথ্যা ও হারাম। আসমা বিনতে ওমায়েস বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) বাসর রাত্রিতে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং আমিই তাকে সাজিয়ে ছিলাম। আমার সাথে আরও কয়েকজন মহিলা ছিল। আমরা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুযুরের কাছে নিয়ে গেলাম তখন তার গৃহে এক পেয়ালা দুধ ছাড়া কিছুই ছিল না। তা থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন এবং বাকীটুকু হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিলেন। লজ্জায় তিনি হাত বাড়ালেন না। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত সরিয়ে দিয়ো না, নিয়ে নাও। তিনি লজ্জাভরেই তা নিলেন এবং পান করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সঙ্গিনীদেরকে দিয়ে দাও। মহিলারা আরজ করল ঃ আমাদের ক্ষুধা নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ পেটে ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করো না। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি কোন বস্তু আমাদের মনে চায় এবং আমরা বলে দেই, ক্ষুধা নেই, তবে এটাও কি মিথ্যার মধ্যে দাখিল? তিনি বললেন ঃ মিথ্যা মিথ্যাই লেখা হয়। অল্প হলে অল্পই লেখা হয়।

গীবত

গীবতের নিন্দা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন, যারা গীবত করে তারা যেন মৃতের গোশত ভক্ষণ করে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

–তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তা অপছন্দ কর।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

—মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও ইযযত সবটুকুই মুসলমানের উপর হারাম।

ইযযত কথাটির মধ্যে গীবতও এসে গেছে। ধনসম্পদ ও রক্তের সাথে একেও একত্রিত করা হয়েছে। হযরত জাবের ও আবু সায়ীদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

—তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত যিনার চেয়েও জঘন্যতম।

এর কারণ, যিনা করে মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে নেন, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ যার গীবত করা হয় সে ক্ষমা না করে। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মেরাজ রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছেও গমন করেছি, যারা আপন মুখমণ্ডল নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা মানুষের গীবত করত এবং তাদের ইযযত নিয়ে কথাবার্তা বলত। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন— যে ব্যক্তি গীবত থেকে তওবা করে মরবে, সে সকলের পেছনে জান্নাতে যাবে। আর যে তওবা না করে মরবে, সে সকলের অগ্রে দোযখে যাবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন নবী করীম (সাঃ) রোযা রাখার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ যে পর্যন্ত আমি অনুমতি না দেই কেউ ইফতার করবে না। সাহাবায়ে কেরাম রোযা রাখলেন। যখন সন্ধ্যা হল তখন এক একজন এসে ইফতারের অনুমতি নিতে লাগল। এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলাও রোযা রেখেছিল। আপনি অনুমতি দিলে তারাও ইফতার করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় আরয করল। তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় বার আরজ করার পর তিনি বললেন ঃ তারা রোযা রাখেনি। যারা সারাদিন মানুষের মাংস ভক্ষণ করে, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি যেয়ে তাদেরকে বল ঃ তোমরা রোযা রেখে থাকলে বমি কর, সে মহিলাদ্বয়কে এ নির্দেশ শুনিয়ে দিল। তারা বমি করলে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে জমাট রক্ত

নির্গত হল। লোকটি এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার কজায় আমার প্রাণ, যদি এ জমাট মাংসপিণ্ড তাদের পেটে থেকে যেত তবে তাদেরকে দোযখ খেয়ে নিত।

গীবতের সংজ্ঞা ঃ গীবত বলা হয় অপরের এমন আলোচনা করা– যা সে শুনলে খারাপ মনে করে। এ আলোচনা অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি অথবা কথা, কর্ম, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ, সওয়ারীর দোষ সম্পর্কিত হলেও গীবত।

কেউ কেউ বলেন ঃ কারও দ্বীনদারী সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা, এতে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়কে মন্দ বলেছেন, তার নিন্দা করা হয়। দেখ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে যখন জনৈকা মহিলার আলোচনা করা হয় যে, সে অনেক নামায রোযা করে, কিন্তু সাথে সাথে প্রতিবেশীদেরকে জিহ্বা দ্বারা জ্বালাতন করে, তখন তিনি বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। অতএব এ ধরনের সমালোচনা নিষিদ্ধ হলে তিনি অবশ্যই নিষেধ করে দিতেন যে, এরূপ আলোচনা করো না, কিন্তু আমরা বলি, এ উক্তি ও তার দলীল ঠিক নয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম যে আলোচনা করতেন, তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য কাউকে অপমানিত কিংবা নিন্দা করা ছিল না; বরং মাসআলার সত্যাসত্য জেনে নেয়া লক্ষ্য ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া এসব বিষয়ও যে অন্য স্থানে গীবতের মধ্যে দাখিল, এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গীবতের সংজ্ঞা এরূপই বর্ণনা করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ তোমরা জান গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ –তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়, তা যদি তার মধ্যে থাকে? তিনি বললেন ঃ সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। না থাকলে তা আরও বড় অন্যায়; অর্থাৎ অপবাদ হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈকা মহিলা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে বেঁটে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তুমি তার গীবত করেছ।

জানা উচিত, গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যে পন্থায় কেউ অপরের দোষ জেনে নিতে পারে, তা-ই গীবতের মধ্যে দাখিল হবে– ইঙ্গিতে অথবা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের মাধ্যমে হোক। হযরত

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একবার এক মহিলা আগমন করল। সে যখন চলে গেল, তখন আমি হাতে ইশারা করে প্রকাশ করলাম, সে বেঁটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি তার গীবত করেছ। যদি কেউ খোঁড়া ব্যক্তির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করে, তবে এটাও গীবত; বরং গীবতের চেয়েও বেশী। কেননা, এতে আসল আকারের চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়। যদি কোন লেখক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু লেখে কিংবা তার বাক্য পুস্তকে উদ্ধৃত করে, তবে এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন কারণ অথবা ওযর লেখে দিলে গীবত হবে না। নাম নির্দিষ্ট না করে যদি "কিছু লোকে বলে" লেখা হয়, তবে গীবত হবে না। যদি বলা হয়, "যার সাথে আজ দেখা হয়েছিল" অথবা "যে আমার কাছে এসেছিল" তবে গীবত হবে। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি এতেই লোকটিকে চিনে নেবে, কিন্তু নির্দিষ্ট হয় না, এমনভাবে বললে তাতে গীবত হবে না। যেমন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন ব্যক্তির কাজ খারাপ মনে করতেন, তখন এভাবে বলতেন ঃ মানুষের কি হল, তারা এমন এমন কাজ করে?

গীবত শুনার পর বিস্ময় প্রকাশ করাও গীবত। কেননা, বিস্ময় প্রকাশ করলে গীবতকারী আনন্দিত হয় এবং আরও বেশী বলতে উদ্যত হয়। বরং চুপচাপ শ্রবণ করাও গীবতের মধ্যে দাখিল।

হাদীসে আছে ঃ اَلْمُسْتَمِعُ اَحَدُ الْمُغْتَابِيْنَ

–শ্রোতাও গীবতকারীদের একজন।

শ্রোতার উচিত মুখে গীবত করতে নিষেধ করা। এতে সক্ষম না হলে অন্তরে খারাপ মনে করা। নিষেধ করা সম্পর্কে হাদীসে আছে-

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَذَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ ـ

–যার নিকটে কোন মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে সাহায্য না করে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

হযরত আবু যরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন-

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّذُبَّ عَنْ عِرْضِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

–যে তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইযযতের উপর হামলা

প্রতিহত করে, কেয়ামতের দিন তার ইযযত রক্ষা করা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে।

গীবতের কারণ ঃ গীবতের কারণ মোটামুটি এগারটি। তন্মধ্যে আটটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং তিনটি ধর্মপরায়ণ লোকদের মধ্যে বিদ্যমান। আটটির মধ্যে–

প্রথমতঃ, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্যে অপরের গীবত করা হয়। এর কারণে কখনও বাহ্যতঃ মন্দ বলা হয় না, কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ থেকে যায়; ফলে ভবিষ্যতে সদাসর্বদা মন্দ বলার ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ অপরের দেখাদেখি এবং তার হাঁ-র সাথে হাঁ মেলানোর জন্যে গীবত করা হয়। উদাহরণতঃ আপন সঙ্গী কারও সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করলে মনে করা হয়, তার মত না বললে সে নারাজ হয়ে যাবে কিংবা সঙ্গ ত্যাগ করবে। তখন তার কথার মত কথা বলা হয় এবং একে উত্তম সামাজিকতা ও মিশুকতা গণ্য করা হয়।

তৃতীয়তঃ পূর্ব সতর্কতার কারণে গীবত করা হয়। অর্থাৎ যখন কেউ বুঝতে পারে, অমুক ব্যক্তি কোন বড়লোকের সামনে তার দোষ বর্ণনা করবে কিংবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন পূর্ব থেকেই সে তার দোষ বর্ণনা করতে শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা শ্রবণযোগ্য না হয়।

চতুর্থতঃ কোন দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার লক্ষ্যে গীবত করা হয়। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়, সেও তো এরূপই করেছে কিংবা এ কাজে সে আমার সহযোগী ছিল।

পঞ্চমতঃ গর্ব ও আস্ফালনের ইচ্ছায় গীবত করা হয়, যাতে অপরকে হেয় বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়; যেমন কারও সম্পর্কে বলা, সে তো মূর্খ, কিছুই বুঝে না। এর উদ্দেশ্য থাকে, তার তুলনায় আমি বেশী জানি।

ষষ্ঠতঃ হিংসার কারণে গীবত করা হয়; অর্থাৎ যখন কাউকে দেখে, মানুষ তার প্রশংসা ও সম্মান করে, তখন হিংসার অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং অন্য কিছু করার ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ প্রকাশ করতে শুরু করে, যাতে মানুষ তার সম্মান ও প্রশংসা থেকে বিরত থাকে।

সপ্তমতঃ ক্রীড়া কৌতুকের বশবর্তী হয়ে গীবত করা হয়। এতে

অপরের দোষ বর্ণনা করে নিজে হাসা, অপরকে হাসানো এবং সময় ক্ষেপণ করা লক্ষ্য থাকে।

অষ্টমতঃ অপরকে ঘৃণার পাত্র করার লক্ষ্যে গীবত করা। এটা সামনে এবং পশ্চাতে উভয়ভাবে হয়।

যে তিনটি বিষয় বিশেষ দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে গীবতের হয়, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বাহ্যতঃ কল্যাণমূলক কথা, কিন্তু শয়তান তাতে অনিষ্টও মিশ্রিত করে দেয়।

প্রথম, কারও দ্বীনদারীর ত্রুটি অবগত হয়ে বিস্মিত হওয়া এবং এরূপ বলা যে, অমুকের ব্যাপার আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। যদিও ধার্মিক ব্যক্তির ত্রুটি বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু অপর ব্যক্তির উচিত ছিল তার নাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করা। এখানে নাম বলাটা শয়তানের কাজ।

দ্বিতীয়, কারও ত্রুটি দেখে দয়াপরবশ হওয়া এবং দুঃখ করা। উদাহরণতঃ কাউকে দূষণীয় কাজে লিপ্ত দেখে দয়ার ছলে বলা– তার অবস্থার প্রতি আমার খুব দুঃখ হয়। এখানে দুঃখের দাবী করা তার জন্যে শুদ্ধ হলেও তার নাম উচ্চারণ করার কারণে গীবতের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে।

তৃতীয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা; অর্থাৎ কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখার পর ধর্মের কারণেই ক্রোধ দেখা দেয়। এতে তার নাম উচ্চারণ করে ক্রোধ প্রকাশ করলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে "সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ" নীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং অন্যকে জানতে না দেয়া। এ তিনটি কারণ এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়; এমনকি, আলেমদের পক্ষেও সুকঠিন।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায় ঃ সচ্চরিত্রতার চিকিৎসা এলেম ও আমলের ওষুধ দ্বারা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক রোগের ওষুধ তার কারণের খেলাফ হয়; অর্থাৎ কারণ শৈত্য হলে চিকিৎসা উত্তাপ দ্বারা হবে। উপরে গীবতের কারণ সমূহ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখন জানা উচিত, গীবত থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখার উপায় দু'টি– একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত উপায় হচ্ছে, মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে নেবে যে, সে গীবতের কারণে আল্লাহর গযবে পতিত হবে; যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস

ও মহাজন উক্তিসমূহ থেকে জানা যায়। আরও বিশ্বাস করবে, কেয়ামতের দিন গীবতকারীর কাছে পুণ্য না থাকলে বদলাস্বরূপ অপর ব্যক্তির গোনাহ তার আমলনামায় লেখে দেয়া হবে। ফলে সে দোযখীই হবে। এক রেওয়ায়াতে আছে- কেউ হযরত হাসান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি শুনেছি, আপনি নাকি আমার গীবত করেন? তিনি বললেন ঃ আমার দৃষ্টিতে তোমার এত মূল্য নেই যে, নিজের পুণ্যসমূহ তোমাকে সমর্পন করব। মোট কথা, মানুষ যখন গীবত সম্পর্কিত হাদীসগুলো বিশ্বাস করে নেবে, তখন ভয়ে গীবত করার জন্যে মুখ খুলবে না।

আর একটি তদবীর হচ্ছে, যখন গীবত করার খেয়াল হয়, তখন মনে মনে ভাববে, নিজের মধ্যেও কোন দোষ আছে কি না? যদি কোন দোষ পায়, তবে তা দূর করার চেষ্টায় মশগুল হয়ে যাবে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি স্মরণ করবে طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ। –সে ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যার নিজের দোষ তাকে অপরের দোষ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যখন নিজের মধ্যে দোষ থাকে, তখন নিজের দোষকে খারাপ না বলে অপরের দোষকে খারাপ বলতে তার লজ্জা করা উচিত। কারও ইচ্ছাধীন দোষের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। নতুবা কোন সৃষ্টিগত আঙ্গিক ত্রুটির কারণে কাউকে মন্দ বলা স্রষ্টাকে মন্দ বলারই নামান্তর।

আর একটি পন্থা হচ্ছে, একথা চিন্তা করা যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার গীবত করে, তবে আমার কাছে তা কতটুকু খারাপ মনে হবে। সুতরাং আমি যদি অন্যের গীবত করি, তবে তার কাছেও ব্যাপারটি তেমনি দুঃখজনক হবে। অতএব নিজের গীবত অন্যে করলে যেমন তাকে পছন্দ করা হয় না, তেমনি অপরের গীবত করাও অপছন্দ করা দরকার।

বিস্তারিত উপায় হচ্ছে, যে কারণে গীবত করা হয়, সে কারণই দূর করতে হবে। কেননা, কারণ দূর হয়ে গেলেই ব্যাধি দূর হয়ে যায়। অতএব গীবতের কারণ যদি ক্রোধ হয়, তবে তা থেকে বাঁচার জন্যে মনে মনে এরূপ চিন্তা করবে- যদি আমি তার উপর রাগ ঝাড়ি, তবে আল্লাহ তাআলা গীবতের কারণে আমার উপর রাগ ঝাড়বেন। কেননা, তিনি গীবত না করার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার আদেশ অমান্য করেছি। কোন এক নবীর সহীফায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, যখন তোমার ক্রোধ হয়, তখন আমাকে স্মরণ কর। আমি আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করব।

গীবতের কারণ যদি দেখাদেখি ও বন্ধুদের মন রক্ষা করা হয়, তবে জানা উচিত, যে বিষয়ে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট হয়, তবে লাভ কি? বান্দা অপরের কারণে আপন প্রভুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবে, এটা কিরূপে সম্ভব? এরূপ করলে তার মত নির্বোধ ও নিমকহারাম কেউ হবে না।

গীবতের কারণ যদি নিজেকে পবিত্র ও নির্দোষ করা হয়, তবে চিন্তা করবে, মানুষের অসন্তুষ্টির তুলনায় আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অনেক বেশী কঠোর। গীবতের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তো নিশ্চিত, কিন্তু গীবতের পর মানুষ তাকে নির্দোষ মনে করবে কি না, তা অনিশ্চিত। অতএব আমি হারাম খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে; অমুক ব্যক্তিও তো হারাম খায়- এ কথা বলার কোন ফায়দা নেই। কেননা, সে ব্যক্তির অনুসরণই উপকারী হয়, যে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাজ করে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করে, তার অনুসরণ কখনও করা উচিত নয়- সে যে কেউ হোক না কেন। মনে কর, কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত আগুনে ঝাঁপ দেয়। তোমার এ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা থাকলেও কি তুমি তাতে ঝাঁপ দেবে? যদি দাও, তবে নির্বোধ কথিত হবে। চিন্তার বিষয়, নিজের ওজর বর্ণনা করার জন্যে যে ব্যক্তি অপরের নাম নেয়, সে দ্বিগুণ গোনাহ করে- একটি গীবত, অপরটি তার ওযর। কেননা, কথায় বলে عُذرِ گُناہ بَدتَراز گُناہ -গোনাহের ওযর আরও বড় গোনাহ।

গীবতের কারণ যদি অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা হয়, তবে চিন্তা করবে, গীবতের কারণে আল্লাহর কাছে যে মর্তবা ছিল, তা তো বিনষ্ট হল। এখন মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়া একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। বরং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়াও সম্ভবপর। কারণ, তারা দেখবে, সে অপরের দোষ বের করার কাজে লিপ্ত থাকে।

গীবতের কারণ যদি হিংসা হয়, তবে ভাবতে হবে, এর ফলে দুটি আযাব নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে- এক, দুনিয়াতে হিংসার অনলে দগ্ধ হওয়া এবং দুই, আখেরাতে গীবতের আযাবও ঘাড়ে চাপানো হবে।

আন্তরিক গীবতও হারাম ঃ প্রকাশ থাকে যে, মুখে খারাপ বলা যেমন হারাম, তেমনি অন্তরে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। কুধারণার অর্থ হচ্ছে অন্তরে ইচ্ছাপূর্বক অপরকে মন্দ মনে করে নেয়া। যদি মনের সংলাপস্বরূপ কাউকে মন্দ মনে করা হয়, তবে তা মাফ; বরং সন্দেহ

করাও মাফ। যা নিষিদ্ধ, তা হচ্ছে ظَنّ অর্থাৎ মন্দ বলে ধারণা করার প্রতি মনের ঝুঁকে পড়া।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

–হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্।

কুধারণা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরের রহস্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতএব অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়ার অধিকার বান্দার নেই। হাঁ, যখন কারও মধ্যে কুবস্তু এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, তাতে দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ থাকে না, তখন অবশ্য কুধারণা করা যায়, কিন্তু এর আগে কারও সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা শয়তানের কাজ। তাই একে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। মনে কর, এক ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। এতেই সে মদ খেয়েছে বলা যায় না। হতে পারে সে মদ দিয়ে কুলি করেছে অথবা কেউ জোরেজবরে তার মুখে লাগিয়ে দিয়েছে, সে পান করেনি। এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও আন্তরিক বিশ্বাস করা এবং মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা অনুচিত।

হাদীসে আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُسْلِمَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَاَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوْءِ

–আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন মুসলমানের রক্ত, তার ধনসম্পদ এবং তার প্রতি কুধারণা পোষণ।

এ থেকে জানা গেল, যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানের ধনসম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়, কুধারণাও সেগুলো দ্বারাই বৈধ হয়। অর্থাৎ যখন চোখে দেখে নেয় অথবা আদেল সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া মনে কুধারণা এলে তা দূর করা উচিত এবং মনকে বুঝানো দরকার, এ ব্যক্তির অবস্থা আজ পর্যন্ত তোর কাছে গোপন রয়েছে। যে কারণে এখন তুই কুধারণা করছিস, এতেও ভাল-মন্দ উভয় প্রকার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অযথা মন্দের দিকে যাওয়া এবং অন্তরে তাই বিশ্বাস করার প্রয়োজন কি? প্রশ্ন হয়, সন্দেহ তো মানুষের মনে ঘোরাফেরা করতেই থাকে এবং অন্তরের সংলাপও চলে। এমতাবস্থায় কোনটি "যন" তথা ধারণা, তা কিরূপে জানব? এর কিছু আলামত বলা দরকার। জওয়াব হচ্ছে, ধারণা শক্তিশালী

হওয়ার আলামত হচ্ছে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্বেকার বিশ্বাস দূর হয়ে যাওয়া, অন্তরে তার প্রতি কিছুটা ঘৃণাভাব উদ্রেক হওয়া, কাছে বসলে অসহনীয় মনে হওয়া, সম্মান ও খাতির হ্রাস পাওয়া এবং সে কোন গোনাহ করলে দুঃখিত না হওয়া। এসব আলামত পাওয়া গেলে বুঝে নেবে, অপরের প্রতি তুমি কুধারণার বশবর্তী হয়েছ। কুধারণা দূর করার উপায়, কোন মুসলমানের প্রতি কুধারণা হলে পূর্বের তুলনায় তার সম্মান ও খাতির বেশী করবে এবং তার জন্যে উত্তম দোয়া করবে। এতে কুধারণা লোপ পাবে।

গীবত জায়েয হওয়ার কারণাদি ঃ জানা উচিত, অপরের নিন্দা করার পেছনে যদি কোন বিশুদ্ধ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য থাকে, তবে সেই গীবতে গোনাহ হয় না– এরূপ উদ্দেশ্য ছয়টি হতে পারে।

প্রথম, জুলুমের বিচারপ্রাপ্তির জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ মজলুম ব্যক্তি যদি উচ্চতম শাসনকর্তাকে বলে যে, অমুক নিম্ন পর্যায়ের শাসক আমার উপর জুলুম করেছে, খেয়ানত করেছে অথবা আমার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে, তবে এটা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা, এটা না করলে বিচার পাওয়া যাবে না, কিন্তু মজলুম ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বললে গীবত হবে। মজলুমের জন্যে জালেমের নিন্দা করা দুরস্ত।

হাদীসে আছে- إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا –হকদারের জন্যে কথা বলার অধিকার আছে।

দ্বিতীয়, মন্দ বিষয় দূর করা অথবা গোনাহগারকে সৎপথে আসার জন্যে গীবত করা; যেমন একবার হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত ওসমান কিংবা তালহার কাছ দিয়ে গমন করেন এবং তাঁকে “আসসালামু আলাইকুম” বলেন, তখন তিনি জওয়াব দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে হযরত আবু বকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি নিজে তাঁদের কাছে গিয়ে মাঝে উভয়ের সন্ধি করে দেন। এ অভিযোগ সাহাবায়ে কেরামের মতে গীবত ছিল না। কেননা, এর উদ্দেশ্য ছিল সন্ধি স্থাপন করা।

তৃতীয়, কোন মাসআলায় শরীয়তের বিধান জানার জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ কেউ মুফতীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার পিতা, ভ্রাতা অথবা পত্নী আমার উপর জুলুম করেছে। এখন শরীয়তের আইনে আমার কি করা উচিত? এক্ষেত্রেও সাবধানতা এটাই যে, ইঙ্গিতে প্রশ্ন করবে; যেমন বলবে– আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন, এক ব্যক্তির উপর

তার কোন আত্মীয় জুলুম করেছে, এখন তার কি করা উচিত। যদি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলে তবুও জায়েয। বর্ণিত আছে, ওতবার কন্যা হিন্দা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ অর্থ সে আমাকে দেয় না। আপনি অনুমতি দিলে আমি এ পরিমাণ অর্থ তার কাছ থেকে গোপনে নিয়ে নেব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ঠিক যে পরিমাণ অর্থ তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ অর্থ তুমি নিতে পার। এখানে হিন্দা তার স্বামীর বিরুদ্ধে কৃপণতা ও জুলুমের আলোচনা করেছে। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে নিষেধ করেননি। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

চতুর্থ, কোন মুসলমানকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ একজন আলেম দ্বীনদার ব্যক্তিকে দেখা গেল, সে জনৈক ফাসেক পাপাচারীর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। এতে আশংকা হল, দ্বীনদার ব্যক্তিও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সেই পাপাচারীর পাপাচার সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিকে বলে দেয়া জায়েয, যাতে সে প্রভাবিত না হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে চাকর রাখতে চায়, কিন্তু তার কোন দোষ সম্পর্কে সে অবগত নয়। তার কোন বন্ধু চাকরের দোষ সম্পর্কে অবগত। এমতাবস্থায় বন্ধুর জন্যে জায়েয, সে চাকরের দোষ মনিব বন্ধুকে বলে দেবে। এতে যদিও চাকরের ক্ষতি, কিন্তু বন্ধুর উপকারের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও যদি কেউ কারও অবস্থা জিজ্ঞেস করে, তবে যেরূপ জানে, সেরূপই বলে দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বলেন ঃ চার ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা গীবত নয়– ১। জালেম শাসক, ২। বেদআতী, ৩। ফাসেক ও ৪। প্রকাশ্য পাপাচারী।

পঞ্চম, যে ব্যক্তি এমন পদবীতে খ্যাত হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন দোষ আছে; যেমন খোঁড়া, অন্ধ, টেকু ইত্যাদি। এসব পদবী বললে গীবত হয় না। হাদীসের রেওয়ায়াতে রাবীদের এরূপ পদবী পাওয়া যায়; যেমন رَوَى اَبُو الزِّنَادِ এবং عَنِ الْاَعْرَجِ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব পদবীকে খারাপ মনে করে না বিধায় এতে গীবত হয় না।

ষষ্ঠ, যার দোষ প্রকাশ করা হয়, সে প্রকাশ্য পাপাচারী হলে গীবত হয়

না। অর্থাৎ যে সর্বসমক্ষে পাপাচার করে এবং তার পাপাচার কারও কাছে গোপন নয়; যেমন মদ্যপায়ী, নারীবৎ পুরুষ ইত্যাদি।

হাদীসে আছে– مَنْ اَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ مِنْ وَجْهِهٖ فَلاَ غِيْبَةَ لَهٗ

–যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত গীবত নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খোলাখুলি পাপাচার করে, তার কোন ইযযত-হুরমত নেই; অর্থাৎ তার দোষ প্রকাশ করলে মানহানি ও গীবত হবে না, কিন্তু যে গোপনে করে, তার ইযযতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

গীবতের কাফফারা ঃ গীবতকারীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গীবত থেকে তওবা করা; অর্থাৎ স্বীয় কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, অতঃপর যার গীবত করা হয় তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এতে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির গীবত করা হয়, তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করাই যথেষ্ট। মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রমাণ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি ঃ كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهٗ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهٗ তুমি যার গীবত করছ, তার কাফফারা হচ্ছে, তুমি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কারও মাংস খাওয়ার কাফফারা এটাই যে, তার প্রশংসা করবে এবং তার জন্যে উত্তম দোয়া করবে। আতা ইবনে আবী রাবাহকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ গীবত থেকে তওবা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ যার গীবত করা হয় তার কাছে গিয়ে বলবে, আমি যা বলেছিলাম তা প্রলাপোক্তি ছিল। আপনার উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি হয়েছে। এখন আমি উপস্থিত। ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিন। নতুবা মাফ করে দিন। এ উক্তিটিই সঠিক। আর যারা বলে, ইযযতের কোন বদলা নেই; এর জন্যে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব নয়, তাদের উক্তি ঠিক নয়। কেননা, ইযযত নষ্ট হয় এমন গালি দিলে তজ্জন্যে শাস্তি দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা অন্য এক মহিলাকে "লম্বা আঁচলওয়ালী" বললে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি তার গীবত করেছ। এখন তার কাছে ক্ষমা চাও। এ থেকে বুঝা গেল, যদি সম্ভবপর হয় ক্ষমা করিয়ে নেয়া দরকার, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ অথবা মৃত হয়, তবে অবশ্য উত্তম দোয়া করবে এবং পুণ্য কাজের সওয়াব বখশে দেবে।

চোগলখোরী ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ –পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়। আরও

বলেন ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ রূঢ়স্বভাব এবং তদুপরি জারজ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক বলেন ঃ زَنِيْم -এর অর্থ হচ্ছে, যে জারজ কথা গোপন করে না। এ আয়াত থেকে তিনি একথাও চয়ন করেছেন যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করে না এবং চোগলখোরী করে, সে জারজ। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর জন্যে। এই আয়াতে কারও কারও মতে هُمَزَةٌ -এর অর্থ যে চোগলখোরী করে। কোরআনে আবু লাহাবের পত্নীকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (ইন্ধন বহনকারিণী) বলা হয়েছে। কথিত আছে, আবু লাহাবের স্ত্রী চোগলখোরী করত। কাজেই এর অর্থ হল "কথা বহনকারিণী।" কোরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -অতঃপর তারা উভয়েই তাদের সাথে খেয়ানত করল এবং তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেল না। এ আয়াত হযরত লূত ও হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্নীদ্বয়ের শানে নাযিল হয়েছে। হযরত লূত (আঃ)-এর পত্নী যখনই তাদের গৃহে কোন মেহমান আসত, সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে খবর পৌঁছে দিত। তারা সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে মেহমানদের সাথে অপকর্ম করতে সচেষ্ট হত। হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্নী লোকদের কাছে গিয়ে বলত, নূহ্ উন্মাদ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বাধিক দুষ্ট সম্পর্কে বলব না? সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ আপনি এরশাদ করুন- সর্বাধিক দুষ্ট কে? তিনি বললেন ঃ যে চোগলখোরী করে করে বন্ধুদের সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং স্বচ্ছ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

চোগলখোরীর যে সংজ্ঞা মানুষের মধ্যে প্রচলিত তা হচ্ছে, এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ কথা বলছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে চোগলখোরী এতেই সীমিত নয়; বরং যে বিষয় প্রকাশ করা ভাল নয় তা প্রকাশ করা- যার পক্ষ থেকে বলা হয়, তার কাছে খারাপ লাগুক অথবা যার কাছে বলা হয়, তার কাছে খারাপ লাগুক কিংবা কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে খারাপ মনে হোক। প্রকাশ করাও কথার মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে হোক। মোট কথা, চোগলখোরী হচ্ছে গোপন তথ্য ফাঁস করা এবং অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা। সুতরাং যখন কারও দৃষ্টি মানুষের অবস্থার উপর পড়ে, তখন তার চুপ থাকা উচিত, কিন্তু যে বিষয়ে কোন মুসলমানের উপকার অথবা কারও গোনাহ্ দূর করা প্রয়োজন, তাতে অবশ্য কথা বলা উচিত।

উদাহরণতঃ যখনই কাউকে কারও ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে দেখা যায়, তখন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া উচিত। এতে ধন-সম্পদের মালিকের প্রতি রেয়াত করা হবে, কিন্তু যদি দেখা যায়, কেউ আপন ধন-সম্পদ গোপন করছে, তখন তা প্রকাশ করে দিলে চোগলখোরী হবে।

মোট কথা, যে ব্যক্তির কাছে উপরোক্ত রূপ চোগলখোরী করা হয়, তার ছয়টি কাজ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে।

প্রথম ঃ তার কথা সত্য মনে করবে না। কেননা, যে চোগলখোরী করে, সে ফাসেক। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ـ

–মুমিনগণ, যদি ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে খুব যাচাই করে নাও যাতে মূর্খতাবশতঃ কাউকে বিপদে না ফেলে দাও।

দ্বিতীয় ঃ তাকে চোগলখোরী করতে মানা করবে এবং বলবে, দ্বিতীয় বার আমার কাছে এরূপ কথা বলবে না। কোরআনে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

তৃতীয় ঃ তার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখবে। কারণ, আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা রাখেন। আল্লাহ যার সাথে শত্রুতা রাখেন, তার সাথে শত্রুতা রাখা ওয়াজিব।

চতুর্থ ঃ কেবল তার কথায় অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা অনেক কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক কুধারণা পাপ।

পঞ্চম ঃ তার কথার কারণে তামাশা ও খোঁজাখুঁজি শুরু করবে না। আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوْا খোঁজাখুঁজি করো না।

ষষ্ঠ ঃ চোগলখোরকে চোগলখোরী করতে নিষেধ করে নিজে তাতে লিপ্ত হবে না। উদাহরণতঃ মানুষের কাছে বলবে না যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এমন এমন বলে।

মোট কথা, চোগলখোরী পরিহার করা উচিত। এর অনিষ্ট মারাত্মক হয়ে থাকে এবং কুফল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হাম্মাদ ইবনে সালমা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি গোলাম বিক্রয় করে ক্রেতাকে বলল ঃ এর মধ্যে

কোন দোষ নেই, কিন্তু সে চোগলখোর। খরিদ্দার বলল ঃ আমি এই দোষ মেনে নিলাম। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর গোলাম একদিন প্রভুপত্নীকে বলল ঃ আপনার স্বামী আপনাকে চান না। তিনি এখন অন্য একজন মহিলাকে গৃহে আনতে ইচ্ছুক। আমি একটি মন্ত্র জানি। আপনার স্বামী যখন নিদ্রামগ্ন থাকেন তখন ক্ষুর দিয়ে তার বিছানার কিছু অংশ কেটে আনবেন। আমি তাতে মন্ত্র পড়ে দেব। এতে আপনার স্বামী আপনারই হয়ে থাকবে। প্রভুপত্নী গোলামের এ কথা বিশ্বাস করে নিল। সে স্বামীর ঘুমের অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে ধূর্ত গোলাম প্রভুকে গোপনে বলল ঃ আপনার স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের সাথে প্রণয় রাখে এবং সুযোগমত আপনাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছে। যদি পরীক্ষা করতে চান, তবে নিদ্রার বাহানায় বিছানায় শায়িত থেকে লক্ষ্য করুন। প্রভু তার কথায় নিদ্রার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইল। পত্নী অপেক্ষায়ই ছিল। সে ক্ষুর নিয়ে স্বামীর দিকে অগ্রসর হল। যখনই সে শিয়রের দিকে নত হল, স্বামী মনে করল এই বুঝি গলা কাটতে চায়। সে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে পত্নীকে হত্যা করল। তার শ্বশুরালায়ে সংবাদ পৌঁছলে তারা এসে স্বামীকে হত্যা করল। এর পর এই হত্যাকাণ্ড স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সামান্য একটু চোগলখোরীর কারণে এত বড় অঘটন ঘটে গেল।

দ্বিমুখী কথা ঃ উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পরস্পরে শত্রু এমন দু'ব্যক্তির সাথে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করে প্রত্যেকের সাথে তার পছন্দসই কথা বলে। এটা সাক্ষাৎ মোনাফেকী। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন ঃ

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

–দুনিয়াতে যার দু'রকম চেহারা হবে, কেয়ামতের দিন তার দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে।

অযথা প্রশংসা ঃ এটাও কতক স্থানে নিষিদ্ধ। প্রশংসার মধ্যে ছয়টি বিপদ আছে। তন্মধ্যে চারটি যে প্রশংসা করে তার সাথে এবং দু'টি যার প্রশংসা করা হয় তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। প্রশংসাকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত চারটি বিপদের প্রথম, প্রশংসায় এত বাড়াবাড়ি করে যে, তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে যায়। খালেদ ইবনে মেদান বলেন ঃ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে কারও এমন বিষয়ে প্রশংসা করে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাআলা

তাকে কেয়ামতের দিন তোতলা করে উত্থিত করবেন।

দ্বিতীয় ঃ প্রশংসার মধ্যে কখনও রিয়ার দখল থাকে। উদাহরণতঃ প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে মহব্বত প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্তরে তার মহব্বত মোটেই থাকে না। ফলে সে রিয়াকার ও মোনাফেক হয়ে যায়।

তৃতীয় ঃ প্রশংসায় কতক গুণ এমন বর্ণনা করা, যেগুলো প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে আছে কিনা সে সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল নয়; যেমন কাউকে মুত্তাকী, পরহেযগার, দরবেশ ইত্যাদি বলে প্রশংসা করা। এ ধরনের গুণাবলী অপ্রকাশ্য এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে অপরের প্রশংসা করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার সাথে সফর করেছ? কখনও ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করেছ? অথবা সে কি তোমার প্রতিবেশী? লোকটি আরজ করল ঃ এসব বিষয়ের মধ্যে কোনটিই নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তার প্রশংসা করো না।

চতুর্থ ঃ প্রশংসিত ব্যক্তি জালেম ও ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও প্রশংসা করে তাকে খুশী করা হয়। এটা নাজায়েয। হাদীসে আছে, যখন ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন। হযরত হাসান বলেন ঃ যে জালেমের দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়া করে, সে যেন কামনা করে, আল্লাহর পৃথিবীতে আরও বেশী জুলুম হোক।

প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বিপদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, প্রশংসার ফলস্বরূপ তার মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়। এগুলো মারাত্মক দোষ। হযরত হাসান বর্ণনা করেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) দোররা নিয়ে বসে ছিলেন এবং সভাসদগণ তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় জারুদ ইবনে মুনযির আগমন করল। এক ব্যক্তি বলল ঃ রবীয়া গোত্রের সরদার। কথাটি সকলেরই শ্রুতিগোচর হল। জারুদ নিকটে এলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে দোররা দিয়ে আস্তে আস্তে প্রহার করলেন। সে আরজ করল ঃ ব্যাপার কি? তিনি বললেন, তুমি শুননি, তোমার সম্পর্কে লোকটি কি বলেছে? জারুদ বলল ঃ শুনেছি তো। তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হল, তুমি এতে আত্মম্ভরী হয়ে যাবে। তাই তোমার অহংকার হ্রাস করার জন্যে আমি এ কাজ করেছি।

দ্বিতীয় ঃ বিপদ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন প্রশংসা দ্বারা জানবে, সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে গেছে, তখন আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে অলসতা করবে। কেননা, উন্নতি সাধনের চেষ্টা সে-ই করে, যে নিজের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে জানে, কিন্তু যখন মানুষের মুখে প্রশংসাই শুনবে,

তখন নিজের সম্পর্কে কামেল হওয়ার ধারণা করে নেবে এবং আমল করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। এ কারণেই এক হাদীসে প্রশংসাকারীকে বলা হয়েছে, তুমি তোমার বন্ধুর গলা কেটে দিয়েছ।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

إِذَا مَدَحْتَ اَخَاكَ فِى وَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا اَمْرَرْتَ عَلٰى حَلْقِهِ مُوْسٰى رَمِيْضًا ۔

–তুমি তোমার ভাইয়ের প্রশংসা তার মুখের উপর করে তার গলায় যেন ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছ।

হাঁ, প্রশংসা যদি এসব বিপদ থেকে মুক্ত হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই; বরং এরূপ প্রশংসা মোস্তাহাব। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। হযরত আবু বকরের শানে তিনি বলেন ঃ

لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ اَبِىْ بَكْرٍ بِإِيْمَانِ الْعَالَمِ لَرَجَحَ

–যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে তাঁর ঈমানই ভারী হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

لولم ابعث لَبُعِثْتَ يَا عُمَرُ

–যদি আমি পয়গম্বর না হতাম তবে তুমি পয়গম্বর হতে। এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে? কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্তশ্চক্ষু দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, এই প্রশংসার কোন কুফল দেখা দেবে না।

আপন প্রশংসা শুনার পর প্রশংসিত ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, জীবনের শেষ মুহূর্তটি খুব নাজুক ও বিপদসংকুল। আমলের উপর কোন ভরসা করা যায় না। রিয়া ইত্যাদি কত প্রকারের বিপদাশংকা রয়ে গেছে। এরপর নিজের দোষ সম্পর্কেও চিন্তা করবে, যা সে নিজে জানে এবং প্রশংসাকারী জানে না। নিজের রহস্য ও অন্তরের অবস্থা চিন্তা করলে সে বাধ্য হয়ে প্রশংসাকারীকে বিরত রাখবে এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে।

হাদীসে আছে ঃ اُحْثُوْا فِى وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ

–প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর।

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের হাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, প্রশংসা তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। জনৈক বুযুর্গ আপন

প্রশংসা শুনে বললেন ঃ ইলাহী, এরা আমার অবস্থা জানে না, কিন্তু তুমি জান। কেউ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ, যে বিষয় তারা জানে না এবং আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, তজ্জন্যে আমাকে পাকড়াও করো না। আমাকে ক্ষমা কর এবং তাদের ধারণার চেয়েও উত্তম কর।

কথাবার্তার সূক্ষ্ম ভুল-ভ্রান্তি ঃ সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আলেম ব্যক্তি সঠিক ভাষায় কথাবার্তা বলে, অজ্ঞ জনসাধারণ এসব ক্ষেত্রে ভুল করে বসে, কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এরূপ করা হয় বিধায় আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لَايَقُلْ اَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ ـ

–তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে– যা আল্লাহ চান ও আপনি চান; বরং এরূপ বলা উচিত, যা আল্লাহ চান, অতঃপর আপনি চান।

উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার চাওয়ার সাথে অপরকে শরীক করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ ও আপনি চাইলে এরূপ হবে। কারণ, এতে অসম্মান ও বেআদবী হয়। এরূপ বলা উচিত, আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাগ্রে, এরপর আপনার ইচ্ছা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলল, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল চান। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ? এরূপ বল ঃ যা আল্লাহ একা চান। ইবরাহীম বলেন, 'আল্লাহর আশ্রয় ও আপনার আশ্রয়' এ কথা বলাও খারাপ। বরং এরূপ বলা জায়েয, আল্লাহর আশ্রয় এরপর আপনার আশ্রয়। ইবরাহীম আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যকে গাধা বলে সম্বোধন করে, কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে– বল, আমি কি তাকে গাধা সৃষ্টি করেছিলাম? তুমি তাকে গাধা বলতে কেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কতক লোক কথায় কথায় শেরক করে বসে। তারা বলে ঃ এ কুকুরটি না থাকলে আজ রাতে সর্বস্ব চুরি হয়ে যেত। তারা সত্যিকার রক্ষকের প্রতি লক্ষ্য করে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন "আমার বান্দা" ও "আমার বাঁদী" না বলে। কেননা, বান্দা সকলেই আল্লাহর এবং বাঁদীও তাঁরই। এক্ষেত্রে "আমার

গোলাম" বলা উচিত। গোলামও তার প্রভুকে "রব" (পালনকর্তা) বলবে না; বরং প্রভু ও সরদার বলবে। কেননা, সকলের পালনকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও কালাম নিত্য না অনিত্য- এ জাতীয় প্রশ্ন সাধারণ মানুষের করা উচিত নয়; বরং কোরআনে যে সকল আদেশ নিষেধ রয়েছে, সেগুলো মেনে চলাই তাদের কাজ, কিন্তু এটা মনের উপর কঠিন এবং অনর্থক কথাবার্তা খুব সহজ মনে হয়। সাধারণ মানুষ অনধিকার চর্চা করে আনন্দিত হয়। কারণ, শয়তান তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, তারা আলেম ও জ্ঞানীজন। অথচ তাদের মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে কতক কুফরী কালেমাও উচ্চারিত হয়ে যায়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, কোরআন পাকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনা এবং এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। কোরআনে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো এবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও তর্ক-বিতর্ক করা বেআদবী। এতে কুফরের আশংকা থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন সূক্ষ্ম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ, সে সেই বিষয়ে মূর্খদের স্তরে পরিগণিত হবে এবং শাস্তিযোগ্য ও নিন্দনীয় হবে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে -

ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

-আমি যে বিষয়ে বলা বর্জন করেছি, তা আমার মধ্যেই সীমিত থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা অযথা প্রশ্ন করেছে এবং পয়গম্বরদের সাথে মতবিরোধ করেছে। আমি যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা থেকে বেঁচে থাক এবং যা করতে আদেশ করি, তা যথাসম্ভব পালন কর।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এতবেশী প্রশ্ন করতে লাগল যে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ যত ইচ্ছা প্রশ্ন কর। আমি জওয়াব দেব। সেমতে এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ঃ আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হোযায়ফা। এরপর আরও দু'ভাই দাঁড়িয়ে প্রশ্ন

রাখল, আমাদের পিতা কে? তিনি বললেন ঃ যার সন্তান বলে তোমরা কথিত হও সে-ই তোমাদের পিতা। এরপর আরও একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি জান্নাতে যাব, না দোযখে? তিনি বললেন ঃ দোযখে। যখন সকলেই তাঁর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি টের পেল, তখন চুপ হয়ে গেল। কারও প্রশ্ন করার সাহস হল না। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا -

–আল্লাহ আমাদের রব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের নবী– এতেই আমরা সন্তুষ্ট। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, তুমি বসে যাও। মনে হয় তুমি তওফীকপ্রাপ্ত।

অন্য এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার মনে হয় লোকেরা অধিক প্রশ্ন করতে করতে এক পর্যায়ে বলতে শুরু করবে, মানুষকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন কখনও তোলা হলে তোমরা সূরা এখলাস পাঠ করে বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কাহিনী থেকে পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়, অস্থানে প্রশ্ন করা মোটেই সঙ্গত নয় এবং যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার বোধশক্তি নেই, তা কখনও জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) খিযিরের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, স্বেচ্ছায় না বলা পর্যন্ত তিনি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। এরপর প্রথমে নৌকার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই খিযির (আঃ) ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মূসা (আঃ) ওযর পেশ করলেন, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন। আর জিজ্ঞেস করব না, কিন্তু যখন তিন বার এরূপ হল তখন খিযির (আঃ) বলতে বাধ্য হলেন– هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ –এটাই আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত।

এরপর তিনি মূসা (আঃ)-কে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সারকথা, জনসাধারণের জন্যে অধিক সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা খুবই বিপজ্জনক। এ থেকে অনেক অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অতএব তাদেরকে বাধা দেয়াই সঙ্গত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্রোধ ও হিংসা

প্রকাশ থাকে যে, ক্রোধ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যার প্রকৃতি হচ্ছে এই আয়াত ঃ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ –আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়ের উপর উঁকি মারে।' অগ্নি যেমন ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি ক্রোধের হুতাশন অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে প্রচ্ছন্ন থাকে। চকমকি পাথরে ঠোকা লাগতেই যেমন অগ্নি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি অহংকারে সামান্যতম আঘাতেই ক্রোধের অগ্নিও অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গগণ ঈমানের নূরের সাহায্যে এ কথা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের মধ্যে এমন একটি শিরা রয়েছে, যা শয়তানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা ক্রোধাগ্নির পরশ পেয়ে জ্বলে উঠে এবং সত্যের সামনে ঝুঁকে পড়ে। তার বংশগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা শয়তানের সাথে পাকাপোক্ত। শয়তান বলেছিল ঃ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ –আমাকে সৃষ্টি করেছ অগ্নি দ্বারা এবং আদমকে সৃষ্টি করেছ মৃত্তিকা দ্বারা। মৃত্তিকার স্বভাব হচ্ছে স্থির ও গম্ভীর থাকা। পক্ষান্তরে অগ্নির কাজ হচ্ছে প্রজ্বলিত এবং লেলিহান শিখা হয়ে গতিশীল হওয়া। ক্রোধের মুহূর্তে যখন মানুষও গতিশীল এবং অস্থির হয়, তখন মনে হয় যেন মৃত্তিকা দ্বারা সৃজিত নয়; বরং শয়তানের অনুরূপ তার খামিরও অগ্নি।

ক্রোধের ফল হচ্ছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ; অর্থাৎ শত্রুতা ও অপরের অমঙ্গল কামনা। ক্রোধ ও হিংসা দ্বারা অনেক মানুষ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই ধ্বংসের স্থান বলে দেয়া অত্যাবশ্যক, যাতে এগুলো থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করে এবং অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। কেননা, মন্দ বিষয় সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত মানুষ তাতে লিপ্ত থাকে। কেবল মন্দ বিষয় জানাই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত তা থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ও উপায় না জানা হয়। তাই আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমোক্ত কয়েকটি বর্ণনায় ক্রোধের অনিষ্ট, তার স্বরূপ, কারণাদি, প্রতিকার, সহনশীলতার সওয়াব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। এরপর অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসমূহে হিংসা ও বিদ্বেষের অর্থ, ফলাফল, কারণাদি ও প্রতিকার লিপিবদ্ধ করব।

ক্রোধের অনিষ্ট ঃ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

–যখন কাফেররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করে নিল– অজ্ঞতার জেদ, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্থিরতা ও গাম্ভীর্য নাযিল করলেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এ কারণেই নিন্দা করেছেন যে, তারা অন্যায় জেদের বশবর্তী হয়ে মিথ্যার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যান্য জেদও ক্রোধেরই অপর নাম। তিনি স্থিরচিত্ততা ও গাম্ভীর্য নাযিল করার কথা বলে মুমিনদের প্রশংসা করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আমাকে সামান্য আমল বলে দিন। তিনি বললেন ঃ لَاتَغْضَبْ অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে কিসে রক্ষা করবে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি নিজে ক্রোধ করো না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা জবরদস্ত পাহলোয়ান কাকে মনে কর? সকলেই আরজ করল ঃ এমন ব্যক্তিকে মনে করি, যে কুস্তিতে কারও সাথে ধরাশায়ী হয় না। তিনি বললেন ঃ সে পাহলোয়ান নয়। জবরদস্ত পাহলোয়ান সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমিত রাখে। হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ - যে আপন ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখেন।

হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) বলেন ঃ অধিক ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, ক্রোধের আধিক্য অন্তরকে হালকা করে দেয়।

হযরত হাসান বলেন ঃ আদম সন্তান ক্রোধবশতঃ এমন লম্ফঝম্ফ করে যে, মনে হয় এবারের লম্ফে জাহান্নামে পড়ে যাবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রেওয়ায়াত করেন, জনৈক সংসারত্যাগী দরবেশ তার এবাদতখানায় ছিল। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইল, কিন্তু সে আপন কাজে অটল রইল। শয়তান একবার তার কক্ষের কাছে এসে ডেকে বলল

ঃ দরজা খোল। সে জওয়াব দিল, না। শয়তান আবার বলল ঃ দরজা খুলে দাও, নতুবা আমি চলে যাব আর তুমি আফসোস করবে। দরবেশ এতে ভ্রূক্ষেপ করল না। শয়তান বলল ঃ আমি মসীহ্। দরবেশ বলল ঃ তুমি মসীহ্ হলে আমি কি করব? মসীহ্ আমাদেরকে এবাদত ও সাধনার আদেশ করেছেন এবং কেয়ামতে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছেন। ওয়াদার খেলাফ করে যদি আজই চলে আসেন, তবে আমরা মানতে রাজি নই। এরপর শয়তান বলল ঃ আমি শয়তান। তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলাম। তা হল না। এখন তুমি যা জিজ্ঞেস করবে তা বলব। দরবেশ বলল ঃ আমি কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। অতঃপর শয়তান সেখান থেকে প্রস্থানোদ্যত হলে দরবেশ বলল ঃ শুনছ না কি? সে বলল ঃ শুনছি, বল। দরবেশ বলল ঃ মানুষের কোন্ স্বভাবটি তোমাকে অধিক সাহায্য করে। শয়তান বলল ঃ ক্রোধ! মানুষ যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন আমি তাকে এমনভাবে গড়িয়ে দেই, যেমন বালকেরা বলকে গড়িয়ে দেয়। হযরত খায়সামা বর্ণনা করেন– শয়তান বলে, আদম সন্তান আমার উপর প্রবল হতে পারে না। যখন সে সন্তুষ্ট থাকে তখন আমি তার অন্তরে থাকি; আর যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন উড়ে তার মাথায় বসি।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ ক্রোধ প্রত্যেক অনিষ্টের চাবি। জনৈক আনসার বলেন ঃ প্রখরতা নির্বুদ্ধিতার শিকড়। এর কারণ ক্রোধ। যে ব্যক্তি মূর্খতায় তুষ্ট থাকে, তার সহনশীলতার প্রয়োজন নেই। কেননা, সহনশীলতা হচ্ছে সজ্জা ও উপকারী বিষয় এবং মূর্খতা দোষ ও ক্ষতির বিষয়। হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন– শয়তান বলে, আমি আদম সন্তান থেকে কখনও ক্লান্ত হইনি এবং তিনটি বিষয়ে কখনও ক্লান্ত হব না।

প্রথম ঃ যখন সে কোন নেশা পান করবে, তখন তার লাগাম আমার হাতে থাকবে। আমি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাব। সে আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ করবে।

দ্বিতীয় ঃ যখন সে ক্রোধের বশবর্তী হবে তখন এমন কথা বলবে, যা জানে না এবং এমন কাজ করবে, যার কারণে অনুতপ্ত হবে। তৃতীয় ঃ আমি সর্বদা তাকে কৃপণতায় উৎসাহিত করতে থাকি এবং এমন বস্তুর লালসা দেই, যা তার সাধ্যে নেই।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এতে পরিণামে ক্ষমা চাওয়ার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। হযরত ইবনে মসঊদ

(রাঃ) রেওয়ায়াত করেন– ক্রোধের সময় সহনশীলতা পরীক্ষা করা এবং লোভের সময় আমানতদারী যাচাই করা উচিত। ক্রোধ না হলে তখনকার সহনশীলতার কি মূল্য। এমনিভাবে লালসার বিষয় ছাড়া আমানতদারীর কোন মূল্য নেই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) তাঁর জনৈক বিচারককে লেখেন, ক্রোধের সময় কাউকে শাস্তি দিয়ো না। কোন অপরাধীর প্রতি ক্রোধ হলে তাকে বন্দী করে রাখবে। এরপর ক্রোধ দূর হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করার পর অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেবে এবং শাস্তিও যেন পনেরটি বেত্রদণ্ডের বেশী না হয়। আলী ইবনে যায়দ হযরত ওমর ইবনে আদুল আজীজের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একবার জনৈক কোরায়শী ব্যক্তি তাঁকে কটু কথা বললে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা নত করে রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা ছিল, আমি ক্ষমতার মোহে শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে আজ তোমার সাথে এমন কথা বলি, যা কাল তুমি আমার সাথে বলবে।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বলেন ঃ কুফরের চারটি স্তম্ভ আছে। এক- ক্রোধ, দুই- খাহেশ, তিন - নির্বুদ্ধিতা এবং চার– লালসা।

ক্রোধের স্বরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রাণীকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণাদি দ্বারা বিলুপ্ত ও ধ্বংস হওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আপন ভাণ্ডার থেকে তাকে এমন একটি বস্তুও দান করেছেন, যদ্দ্বারা সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। আভ্যন্তরীণ কারণাদির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মানবদেহ উত্তাপ ও আর্দ্রতার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। উত্তাপ সর্বদাই আর্দ্রতাকে হজম ও শুষ্ক করতে থাকে। যদি আর্দ্রতা খাদ্যের কাছ থেকে সাহায্য না পায় এবং যে পরিমাণ শুষ্ক হয় সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ না হয়, তবে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা খাদ্যকে প্রাণীদেহের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন এবং দেহের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা নিহিত রেখেছেন, যাতে সে খাদ্য খায় এবং ক্ষতিপূরণ হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পক্ষান্তরে যে বাহ্যিক কারণাদি দ্বারা প্রাণী ধ্বংস হয়, সেগুলো হচ্ছে তরবারির মত অস্ত্র ও অন্যান্য মারণযন্ত্র। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ক্রোধশক্তি সৃষ্টি করেছেন, যা অন্তর থেকে স্ফুটিত হয় এবং ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহকে প্রতিহত করে। আল্লাহ্ তাআলা এই

ক্রোধকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করে মানুষের মজ্জার উপাদান করে দিয়েছেন। মানুষকে যখন কোন উদ্দেশ্য থেকে বাধা দেয়া হয় অথবা তার মর্জির বিপরীত কোন ঘটনা ঘটে, তখন সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তার শিখা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে, অন্তরের অভ্যন্তরের রক্ত স্ফুটিত হয়ে শিরা উপশিরায় উপরের দিকে ধাবিত হয়; যেমন হাঁড়ির স্ফুটন উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। এ কারণেই ক্রোধের সময় মানুষের মুখমণ্ডল ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়। মুখমন্ডলের ত্বক নরম ও স্বচ্ছ বিধায় রক্তের ঝলক তাতে খুব পরিস্ফুট হয়। এ অবস্থা তখন হয়, যখন মানুষ নিজের চেয়ে অধস্তন ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যদি নিজের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির উপর ক্রোধ আসে, যেখানে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয় না, তবে রক্ত ত্বক থেকে জমাট হয়ে অন্তরের দিকে ফিরে যায় এবং মানসিক দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। ফলে মুখমন্ডল ফেকাসে হয়ে যায়। আর যদি সমকক্ষ ব্যক্তির উপর ক্রোধ আসে, তবে উপরোক্ত উভয়বিধ অবস্থা দেখা দেয়। মোট কথা, অন্তরের মধ্যেই ক্রোধের স্থান।

এই ক্রোধশক্তিতে মানুষের অবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম ঃ স্বল্পতার স্তর। এটা নিন্দনীয় এবং এরূপ ক্রোধসম্পন্ন ব্যক্তিকেই "বে-গায়রত" বলা হয়ে থাকে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যে ক্রোধের ব্যাপার দেখেও ক্রুদ্ধ হয় না সে গাধা। এ থেকে জানা যায়, ক্রোধ ও জেদ মোটেই না থাকা খুবই ত্রুটির বিষয়।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

–তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তিনি আপন রসূল (সাঃ)-কে আদেশ করেছেন–

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

–কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। বলাবাহুল্য, কঠোরতা ক্রোধের পরই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ঃ বাহুল্যের স্তর। অর্থাৎ ক্রোধ এত প্রবল হওয়া যে, জ্ঞানবুদ্ধি, ধর্মের আনুগত্য ও শাসন ডিঙ্গিয়ে যাওয়া। এই প্রাবল্যের এক কারণ জন্মগত; অর্থাৎ, জন্মের শুরু থেকেই কতক লোক স্পর্শকাতর ও ত্বরিত রাগী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ অভ্যাসগত; অর্থাৎ এমন লোকদের সাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করা, যারা ক্রোধের হাতে পরাভূত, ত্বরিত

প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ক্রুদ্ধ হওয়াকে বীরত্ব মনে করে এবং যারা গর্বভরে বলে, আমরা কোন কিছু বরদাশত করতে পারি না, সামান্য কথাও না। অথচ তারা যেন বাস্তবে একথাই বলে, আমাদের মোটেই জ্ঞানবুদ্ধি নেই। যে ব্যক্তি এসব লোকের কাছ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে থাকে, তার অন্তরে ক্রোধ সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়। ফলে সেও তেমনি হয়ে যেতে চায়।

যখন ক্রোধের অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, তখন উপদেশ কোন কাজে আসে না; বরং উপদেশ দিলে ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। বুদ্ধি দ্বারা যে কিছু উপকৃত হবে– এটাও হতে পারে না। কেননা এ সময় বুদ্ধির নূর নির্বাপিত হয়ে যায় অথবা ক্রোধের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থায় মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করে, কিন্তু যখন ক্রোধের আতিশয্যে অন্তরে রক্ত টগবগ করে উঠে, তখন তা থেকে একটি কালো ধোঁয়া মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়ে চিন্তার জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে; রবং মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ের জায়গাকেও ঘিরে নেয়। ফলে চোখে কিছু দেখে না এবং কানে কিছু শুনে না। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

মাঝে মাঝে ক্রোধের অগ্নি এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, দেহের আর্দ্রতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। সত্যি বলতে কি, ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে নৌকার যে অবস্থা হয়, তা অন্তরের সেই অবস্থার তুলনায় অনেক ভাল, যা ক্রোধের সময় হয়ে থাকে। কেননা নৌকার বেঁচে যাওয়ার আশা থাকে। নৌকারোহীরা নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যে নৌকা থামিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে তো নৌকার মাঝি অন্তর, যা ক্রোধের আতিশয্যে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় চেষ্টা তদবীর করবে কে?

এখন জানা উচিত, ক্রোধাতিশয্যের বাহ্যিক আলামত হচ্ছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপতে থাকা, অসংলগ্ন কাজকর্ম করা, অসমাপ্ত কথা বলা, মুখে শ্লেষ্মা আসা, চুক্ষ রক্তবর্ণ ধারণ করা এবং নাক মুখ স্ফীত হয়ে মুখাকৃতি বদলে যাওয়া। যদি ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ক্রোধের সময় আপন মুখমন্ডল দেখত, তবে লজ্জায় ক্রোধ বর্জন করতে বাধ্য হত। বাহ্যিক অবয়ব যেহেতু আন্তরিক অবয়বের শিরোনাম হয়ে থাকে, তাই বুঝা যায়, অন্তরের অবস্থা আরও বিশ্রী হবে। কেননা, প্রথমে অন্তরের অবয়বই বিগড়ে যায়, যা পরে বাহ্যিক অবয়বেও বিস্তৃত হয়। ক্রোধের প্রভাবে জিহ্বার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনর্গল অকথ্য ও অশ্লীল

গালিগালাজ করতে থাকে, যা শুনে বুদ্ধিমানরা লজ্জাবোধ করে; এমনকি ক্রোধ থেমে গেলে স্বয়ং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও লজ্জিত হয়। ক্রোধের প্রভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং দ্বিধাহীনভাবে মারপিট, নখে আঁচড়ানো, হত্যা, জখম ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। যার উপর ক্রোধ আসে, সে সামনে থাকলে তো তার উপর এসব নিপীড়ন নির্বিচারে চলে। পক্ষান্তরে যদি সে পালিয়ে যায় তবে নিজের উপরই ঝাল মেটাতে থাকে এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে, আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে, মাটিতে হাত মারতে থাকে অথবা নেশাখোর মাতালের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কখনও রাগের কারণে দৌড়াদৌড়ি করার শক্তি থাকে না, ফলে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। কখনও জীবজন্তুকে মারতে থাকে এবং গৃহের থালা-বাসন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

অন্তরের উপর ক্রোধের প্রভাব হল, যার উপর ক্রোধ হয়, তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তার অনিষ্ট কামনা করা হয়, তার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়া হয় এবং তার মানহানির চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় ঃ ক্রোধের মধ্যবর্তী স্তর। এটা ভাল ও প্রশংসনীয়। এই ক্রোধ জ্ঞান-বুদ্ধির ইশারায় পরিচালিত এবং ধর্মীয় নীতির অনুগত হয়। শরীয়তের আইনানুযায়ী যেখানে ক্রোধ হওয়া ওয়াজিব, সেখানেই এই ক্রোধ প্রকাশ পায়। এরূপ ক্রোধ অবলম্বন করতেই আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। বলাবাহুল্য, ক্রোধের এই স্তরই নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্তরই উত্তম। এ থেকে জানা গেল, ক্রোধের স্বল্পতা ও বাহুল্য উভয়টি নিন্দনীয় এবং মধ্যবর্তী স্তরটি কাম্য। যার ক্রোধশক্তি এত দুর্বল যে, আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্তপ্রায় এবং অন্যায়, জুলুম অসহনীয় নয়। তার উচিত আপন নফসের চিকিৎসা করা, যাতে ক্রোধ শক্তিশালী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ বিদ্যমান, তারও নফসের চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া দরকার, যাতে ক্রোধ উত্তম ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে নেমে আসে। এ পর্যায়কেই বলা হয় "সিরাতে মুস্তাকীম" তথা সরল পথ। এই সরল পথ নিঃসন্দেহে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করে, তার কর্তব্য হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

–তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, যদিও আগ্রহ থাকে। অতএব একজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না যে, অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে।

সুতরাং এটা জরুরী নয় যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রযত্নে সৎকাজ করতে সক্ষম হয় না, সে সর্বপ্রযত্নে অসৎ কাজই করবে; বরং কতক অনিষ্ট কতকের তুলনায় হাল্কা এবং কতক সৎকাজ কতকের তুলনায় অধিক মর্তবার অধিকারী। অতএব যে বড় সৎকাজ করতে পারে না, সে ছোট সৎকাজ করবে এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না, সে কম ক্ষতিকর অনিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকবে।

সাধনা দ্বারা ক্রোধ দূর হয় কিনা ঃ কিছু লোকের ধারণ, সাধনা দ্বারা ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভবপর। সাধনার উদ্দেশ্যও তা-ই হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্রোধের কোন চিকিৎসাই নেই। এটা তাদের উক্তি, যারা মনে করে অভ্যাসও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিগত ত্রুটি যেমন মানুষ ঠিক করতে পারে না, তেমনি অভ্যাসও চিকিৎসাযোগ্য নয়। এই উভয় উক্তি দুর্বল। এ সম্পর্কে আসল কথা হচ্ছে, মানুষ এক বস্তু ভালবাসে এবং এক বস্তু ঘৃণা করে। এমনিভাবে কতক বস্তু তার মেযাজের অনুকূলে এবং কতক প্রতিকূলে। সুতরাং যে বস্তু তার মেযাজের প্রতিকূলে, তার উপর ক্রোধ না হয়ে পারে না। মনে কর, কেউ তার প্রিয়তম বস্তুটি ছিনিয়ে নিল অথবা কেউ ক্ষতি করতে চাইল; এমতাবস্থায় অবশ্যই ক্রোধ হবে, কিন্তু যে বস্তুকে মানুষ ভালবাসে, তা তিন প্রকার। এক, এমন বস্তু, যা সকলের জন্যে জরুরী; যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য। সুতরাং কেউ যদি তার অন্ন ছিনিয়ে নেয় অথবা বস্ত্র কেড়ে নেয় অথবা বাসগৃহ থেকে বের করে দেয়, তবে তার উপর অবশ্যই ক্রোধ হবে।

দুই, এমন বস্তু, যা কারও জন্যে জরুরী নয়; যেমন অনেক ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রয়োজনের অধিক চাকর-নওকর ইত্যাদি। এসব বস্তু অভ্যাসের কারণে প্রিয়; তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে দাখিল নয়। কেউ যদি এসব বস্তুর অপচয় করে, তবে তার উপর ক্রোধ হয়। এ ধরনের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হতে পারে। উদাহরণতঃ যদি কারও কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি গৃহ থাকে এবং কোন জালেম এসে তা ভূমিসাৎ করে দেয়, তবে এজন্যে ক্রোধ না-ও হতে পারে; যেমন ধর, গৃহস্বামী জ্ঞানীগুণী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহের প্রতি তার কোন মহব্বতই নেই। সুতরাং মহব্বত না থাকার কারণে সে ক্রুদ্ধ

হবে না, কিন্তু মহব্বত থাকলে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষের ক্রোধ এমন বিষয়ের জন্যে হয়ে থাকে, যা জরুরী নয়। উদাহরণতঃ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করা, মজলিসে স্বতন্ত্র হয়ে বসতে না দেয়া ইত্যাদি কারণে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে যার সভাপতির আসনে বসার শখ নেই, সে জুতার উপর বসলেও ক্রুদ্ধ হয় না।

মোট কথা, অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনীয় মহব্বতের কারণে কথায় কথায় রাগ করে। তারা বুঝে না যে, খাহেশ ও শখ যত বেশী হয়, মানুষের মধ্যে ত্রুটিও তত বেশী হয়। কেননা যার শখ বেশী, তার অভাব বেশী। অভাব পূর্ণতার গুণ নয়– বরং অপূর্ণতার গুণ। মূর্খ ব্যক্তি সর্বদাই চেষ্টা করে যাতে তার অধিকতর অভাব মিটে যায়। অথচ এটাই দুঃখ ও বিষাদের ভাণ্ডার। কেউ কেউ তো মূর্খতার সমুদ্রে এমন নিমজ্জিত থাকে যে, তাদেরকে মন্দ কাজের দোষ বললেও তারা ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কেউ যদি বলে, তুমি তো ভাল দাবা খেলতে পার না অথবা অনেক মদ পান করতে পার না, তবে তাদের মেযাজ বিগড়ে যায়। অথচ এসব বিষয় মানুষের মধ্যে না থাকাই উত্তম।

তিন, এমন বস্তু, যা কতক মানুষের জন্য জরুরী এবং কতক মানুষের জন্যে জরুরী নয়; যেমন বই-পুস্তক শিক্ষিত ব্যক্তির জন্যে জরুরী। সে বই পুস্তককে মহব্বত করে। কেউ যদি তার বই পুস্তক জ্বালিয়ে অথবা বিনষ্ট করে দেয়, তবে সে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক পেশাজীবী তার যন্ত্রপাতিকে মহব্বত করে। কেননা এর উপর তার জীবিকা নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত মহব্বতের তিন প্রকার বর্ণিত হল। এখন প্রত্যক প্রকারের মধ্যে সাধনার ফল কি হতে পারে তা দেখা দরকার। প্রথম প্রকারের মধ্যে সাধনা দ্বারা অন্তরের ক্রোধ ষোল আনা বিলুপ্ত করা যায় না। এতে সাধনা এ উদ্দেশে করা হয়, যাতে অন্তর ক্রোধের অনুগত হয়ে না থাকে এবং ক্রোধের ব্যবহার ততটুকুই করে, যতটুকু শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে উত্তম। চেষ্টা সাধনা দ্বারা এই স্তর অর্জন করা সম্ভব। প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে সহ্য করবে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সহ্য করতে থাকবে। অবশেষে সহ্য করা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এতে অবশ্য ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হবে না, কিন্তু তার প্রখরতা হ্রাস পাবে এবং দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে তার প্রভাব মুখে অনুভূত হবে না। তৃতীয় প্রকার সাধনার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, এতে কতক লোকের জন্যে তো সেসব

বস্তু জরুরী। সাধনা দ্বারা তাদেরও এই উপকার হবে যে, অন্তরে ক্রোধের তীব্রতা থাকবে না এবং সবরের কষ্ট অধিক অনুভূত হবে না। দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর মধ্যে যে ক্রোধ হয়, সাধনা দ্বারা তার মূলোৎপাটন সম্ভবপর। অর্থাৎ জরুরী নয় এমন বস্তুর মহব্বত যখন অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে সাধনার পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ এভাবে ধ্যান করবে– আমার দেশ অন্ধকার কবর এবং অবস্থানের জায়গা আখেরাত। দুনিয়া কেবল একটি মধ্যবর্তী পথ। এ পথ অতিক্রম করে যাওয়া সুনিশ্চিত। এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা। এরপর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া সবগুলোকে মনে করবে, আসল বাসস্থান তথা আখেরাতে এসব বস্তু দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। এসব চিন্তা-ভাবনার পর দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে মুছে ফেললে নিশ্চিতই আশা করা যায়, ক্রোধ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিছু না হলে এটা তো অবশ্যই হবে যে, ক্রোধ প্রকাশ করবে না এবং তদনুযায়ী আমল করবে না। কেননা, ক্রোধ মহব্বতের অনুসারী। মহব্বত বিলুপ্ত হয়ে গেলে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির কাছে কুকুর আছে, যার প্রতি তার মহব্বত নেই। যদি অন্য কোন ব্যক্তি কুকুরটি মেরে ফেলে তবে সে ক্রুদ্ধ হবে না।

মোট কথা, ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হওয়া তো খুবই কঠিন, কিন্তু দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং তদনুযায়ী আমল না হওয়া কম সাফল্য নয়। এখানে আপত্তি হতে পারে যে, প্রথম প্রকার অর্থাৎ জরুরী বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে দুঃখ বেদনা হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ক্রোধ হওয়া জরুরী নয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি ছাগল গোশ্‌ত খাওয়ার উদ্দেশে পালন করল। এখন সেই ছাগলটি মারা গেলে তজ্জন্যে তার দুঃখ অবশ্যই হবে, কিন্তু কারও প্রতি ক্রোধ হবে না। এছাড়া প্রত্যেক দুঃখের সাথে ক্রোধ হওয়া জরুরীও নয়। দেখ, দেহে অস্ত্রোপচার করলে কষ্ট ও ব্যথা তো হয়, কিন্তু যে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করে, তার প্রতি ক্রোধ হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর তওহীদ প্রবল এবং যে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার কুদরতে দাখিল ও তাঁর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে, সে ক্রুদ্ধ হবে না। কারণ, সে মানুষকে লেখকের হাতে কলমের মত নিছক একটি মাধ্যম মনে করবে। বাদশাহ কলম দ্বারা কারও মৃত্যুদণ্ড লেখে দিলে যেমন সে কলমের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না, তেমনি কেউ তার ছাগল যবেহ করে খেয়ে ফেললে সে সেই ব্যক্তির প্রতিও ক্রুদ্ধ হবে না। কেননা, যবেহ ও মৃত্যু সে আল্লাহর পক্ষ থেকেই বিশ্বাস করে। অতএব তওহীদ প্রবল হওয়ার অবস্থায় ক্রোধ না হওয়া

উচিত। এছাড়া আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখার দাবীও তা-ই; অর্থাৎ কেউ যখন ধারণা করবে- আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে যা উত্তম তাই করেন, তখন সে বুঝে নেবে, ক্ষুধার্ত থাকা কিংবা রুগ্ন থাকাই সম্ভবতঃ আল্লাহর কাছে আমার জন্যে উত্তম। সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্রোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই আপত্তির জওয়াব হচ্ছে, বাস্তবে তওহীদ প্রবল হলে এটা সম্ভবপর, কিন্তু তওহীদের এই স্তরের প্রবলতা সব সময় থাকে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না; বিদ্যুতের মত আসে এবং চলে যায়। ফলে পরিণামে অন্তরকে ওসিলার উপর ভরসা করতে হয়। যদি তওহীদ দ্বারা এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হত, তবে সৃষ্টির সেরা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই তা অর্জন করতে পারতেন। অথচ তিনিও ক্রুদ্ধ হতেন; এমন কি, ক্রোধে তাঁর গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ ধারণ করত। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ইলাহী, আমি মানুষ, মানুষের মত আমারও ক্রোধ হয়। অতএব আমি কোন মুসলমানকে গালি দিয়ে থাকলে অভিসম্পাত করে থাকলে অথবা প্রহার করে থাকলে তুমি আমার পক্ষ থেকে এসব বিষয়কে তার জন্যে রহমত ও নৈকট্যের কারণ করে দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যে সমস্ত কথা ক্রোধ ও খুশীর অবস্থায় বলেন, সেগুলো আমি লেখব কি? তিনি বললেন ঃ লেখ। যে আল্লাহ আমাকে সত্য নবী করেছেন তাঁর কসম- এ থেকে অর্থাৎ এ মুখ থেকে সত্য ছাড়া আর কিছু বের হবে না। তিনি এ কথা বলেননি, আমি ক্রুদ্ধ হই না; বরং বলেছেন, ক্রোধ আমাকে সত্যের সীমা অতিক্রম করতে দেয় না; অর্থাৎ আমি ক্রোধের দাবী অনুযায়ী আমল করি না। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার ক্রুদ্ধ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তোমার কি হয়েছে? তোমার শয়তান তোমার কাছে এসেছে? হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার শয়তান নেই? তিনি বললেন ঃ কেন থাকবে না, কিন্তু আমার দোয়ায় সে মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে একথা বলেননি যে, আমার শয়তান নেই; বরং বলেছেন, সে আমাকে অনিষ্টের আদেশ করে না। এখানে শয়তান বলে ক্রোধ বুঝানো হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও দুনিয়ার জন্যে ক্রোধ প্রদর্শন করতেন না। সত্যের ব্যাপারে ক্রোধ হলে তা কেউ টের পেত না এবং তাঁর ক্রোধের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো থাকত

না। এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্রোধ যদিও আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য বিষয় ছিল, কিন্তু তাতে মোটামুটিভাবে ওসিলারও দখল ছিল।

হাঁ, মাঝে মাঝে যখন কোন ব্যক্তি কোন অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মশগুল থাকে, তখন প্রয়োজনীয় বস্তু বেহাত হয়ে গেলেও সে ক্রুদ্ধ হয় না। কেননা অন্তর অন্য বিষয়ে মশগুল থাকে। এতে ক্রোধের অবকাশ থাকে না এবং মগ্নতার কারণে অন্য কিছু কল্পনায়ও আনে না। সেমতে হযরত সালমান (রাঃ)-কে যখন কেউ গালি দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমলের দাঁড়িপাল্লায় আমার নেকী কম হলে তুমি যা বলছ, আমি তদপেক্ষাও অধম। আর নেকী ভারী হলে তোমার কথায় আমার কোন ক্ষতি হবে না। এখানে তাঁর অন্তর আখেরাতে মশগুল ছিল বিধায় গালি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এমনিভাবে রবী ইবনে খায়সামকে কেউ গালি দিলে তিনি বললেন ঃ তোমার কথা আল্লাহ্ শুনেন। জান্নাতের এদিকে একটি উপত্যকা আছে। যদি আমি সেটি অতিক্রম করতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কিছু যায় আসে না। আর যদি অতিক্রম না করতে পারি, তবে তুমি যা বলছ, আমি তার চেয়েও অধম। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দিলে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোর যে সকল দোষ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন, সেগুলো অনেক। তিনি যেন নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার মধ্যে মশগুল ছিলেন। জনৈকা মহিলা মালেক ইবনে দীনারকে 'হে রিয়াকার' বললে তিনি রাগ করলেন না। কেননা, তিনি পূর্ব থেকেই নিজেকে রিয়াকার ভাবছিলেন। হযরত শা'বীকে কেউ মন্দ বললে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন, আর তুমি মিথ্যাবাদী হলে তোমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। এসব কাহিনী থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়, এই বুযুর্গগণের ক্রোধ না করার কারণ এটাই ছিল যে, তাঁদের অন্তর ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল ছিল। এটাও সম্ভবপর যে, গালি তাদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু তাঁরা এদিকে মনোযোগ দেননি। অন্তরে যা প্রবল ছিল, তার প্রতিই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং ক্রোধ না হওয়ার এ পর্যন্ত দুটি কারণ বর্ণিত হল, অন্তরের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল থাকা এবং তওহীদের বিশ্বাস প্রবল হওয়া। তৃতীয় আর একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে, এরূপ বিশ্বাস করা যে, ক্রোধ আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বতের কারণে ক্রোধ দমিত হয়ে যাবে। এটাও অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এরূপ হয়ে

থাকে। আল্লাহ্ তাআলা আপন কৃপায় আমাদেরকে ক্রোধ দমন করার তওফীক দান করুন। আমীন

ক্রোধের কারণ ও তা দূর হওয়ার উপায় ঃ যেহেতু রোগ ব্যাধি দূর হওয়াও তার কারণ হওয়ার মধ্যে সীমিত। এ কারণে ক্রোধের কারণাদি এবং তা দূর করার উপায়সমূহ জানা উচিত। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, সর্বাধিক কঠোর বস্তু কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ক্রোধ অত্যন্ত কঠোর। এরপর প্রশ্ন করা হয়, এর কাছাকাছি কঠোর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মানুষের ক্রোধ। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ ক্রোধ কিসের দ্বারা প্রকাশিত ও লালিত হয়? তিনি বললেন ঃ অহংকার, গর্ব, সম্মান কামনা ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এ থেকে বুঝা গেল, ক্রোধ তীব্র হওয়ার কারণ এগুলো ঃ অহংকার, আত্মগর্ব, পরিহাস, অনর্থক হাসি-ঠাট্টা, অপরকে দোষারোপ করা, জেদ করা, প্রতারণা করা, অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভ করা ইত্যাদি। শরীয়তে নিন্দনীয় এসব অভ্যাস থাকা অবস্থায় ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই বিপরীত গুণ দ্বারা এসব দোষ বিদূরিত করা জরুরী; অর্থাৎ বিনয় দ্বারা অহংকার এবং নিজেকে সঠিকভাবে চেনা দ্বারা আত্মপ্রীতি দূর করবে। অহংকার ও আত্মপ্রীতি অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হবে।

গর্বকে এভাবে চিন্তা করে দূর করবে যে, আমিও তো মানুষই। আমার যেসকল বাঁদী গোলাম রয়েছে, সকলেরই আদি পিতা একজনই। পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। আদম সন্তান হওয়ার বেলায় সকলেই সমান। গর্ব উত্তম বিষয়ে করা উচিত। অহংকার, আত্মপ্রীতি ও আস্ফালন তো হীন অভ্যাস। এগুলো নিয়ে কিসের গর্ব? পরিহাস দূর করার উপায় হচ্ছে, এমন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত হওয়া, যেন সারাজীবন পরিহাস করার ফুরসতই না পাওয়া যায়। অনর্থক হাসি-ঠাট্টা থেকে বাঁচার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক সদগুণাবলীর অন্বেষণে এবং ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনে সচেষ্ট হবে, যদ্দারা পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হবে। উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি দোষের প্রতিকারে অনেক সাধনা, ধৈর্য ও পরিশ্রম প্রয়োজন।

মূর্খদের মধ্যে ক্রোধের একটি বড় কারণ হচ্ছে, তারা ক্রোধের নাম রেখেছে বীরত্ব, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, শৌর্য ইত্যাদি। ফলে তাদের নফস এদিকে আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধির দৈন্যও এ রোগের একটি কারণ। এ কারণেই যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল অথবা ত্রুটিযুক্ত, তারা দ্রুত এ রোগে আক্রান্ত হয়। দেখ, সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় রুগ্ন ব্যক্তির ক্রোধ তাড়াতাড়ি

হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর, প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় বৃদ্ধের ক্রোধ দ্রুত হয়। শক্তিশালী সে, যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ـ

–ভূতলশায়ী করে শক্তিশালী হওয়া যায় না। শক্তিশালী সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজের মালিক থাকে। যার অবস্থা এরূপ নয়, তার সামনে ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীলদের কাহিনী বর্ণনা করা উচিত, যাতে সে নিজের চিকিৎসা করে।

জোশের সময় ক্রোধের প্রতিকার ঃ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রোধের কারণসমূহ দূর করা উচিত, যাতে ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ না করে। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি কোন কারণে ক্রোধ তীব্র হয়ে যায়, তবে এমন দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার যেন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অস্থির হয়ে তদনুযায়ী অশালীন পন্থায় কাজ না করে বসে। এলেম ও আমলের প্রতিষেধক দ্বারা এই দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এলেম সম্পর্কিত বিষয় ছয়টি। (১) ক্রোধ হজম ও সহনশীল হওয়ার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে সওয়াব লাভের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এতে আশ্চর্য নয় যে, সওয়াবের লোভে ক্রোধের তীব্রতা দূর হয়ে যাবে এবং প্রতিশাধ গ্রহণে বিরত থাকবে। হযরত মালেক ইবনে আউস বলেন ঃ একবার হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে প্রহার করার আদেশ দেন। তখন আমি এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ

خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجهلين ـ

'ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাক।'

হযরত ওমর (রাঃ) আয়াতটি বার বার পাঠ করছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন আয়াত তাঁর সামনে পাঠ করা হলে তিনি অনেকক্ষণ তার মর্ম বুঝার জন্যে চিন্তা ভাবনা করতেন। তদনুযায়ী চিন্তা করে তিনি লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রহার করার আদেশ দেয়ার পর নিজেই এই আয়াত পাঠ করতে লাগলেন ঃ

والكظمين الغيظ والعافين عن الناس ـ

–ক্রোধ হজমকারী ও মানুষকে মার্জনাকারী।

এরপর অবিলম্বে লোকটিকে মার্জনা করে দিলেন।

(২) নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করবে এবং এভাবে চিন্তা করবে– এ ব্যক্তির উপর আমার যে ক্ষমতা, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার আমার উপর রয়েছে। আজ তার উপর যদি আমি ক্রোধ কার্যকর করি, তবে কাল কেয়ামতে আল্লাহর ক্রোধ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তখন আমারও ক্ষমার প্রয়োজন হবে। সুতরাং অপরকে ক্ষমা করলে সম্ভবতঃ আমি ক্ষমা পেয়ে যাব। এক সহীফায় আল্লাহ তাআলার এই উক্তি বর্ণিত আছে– হে আদম সন্তান! তোমার ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ কর, আমার ক্রোধের সময় আমি তোমাকে স্মরণ করব। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক খাদেমকে কাজের জন্যে প্রেরণ করেন। সে অনেক বিলম্ব করে ফিরে আসে। তিনি বললেন ঃ

لَوْلَا الْقِصَاصُ لَاَوْجَعْتُكَ অর্থাৎ, কেয়ামতের প্রতিশোধ না থাকলে আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতাম।

কথিত আছে, বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক বাদশাহর সাথে একজন করে পণ্ডিত ব্যক্তি থাকত। বাদশাহ যখন ক্রুদ্ধ হত, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি তার হাতে একটি চিরকুট দিত। তাতে লেখা থাকত ঃ মিসকীনের প্রতি সদয় হও, মৃত্যুকে ভয় কর এবং কেয়ামতের কথা স্মরণ কর। চিরকুট দেখেই বাদশাহের ক্রোধ দমিত হয়ে যেত।

(৩) যদি পরকালীন আযাবের ভয় না থাকে, তবে ক্রোধের কারণে উদ্ভূত ইহকালীন দুঃখ বিপদাপদের কথাই চিন্তা করবে। অর্থাৎ এভাবে ভাববে– যার প্রতি ক্রুদ্ধ হব, সে আমার শত্রু হয়ে যাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নাশকতা, নিপীড়ন ও মানহানি করতে সচেষ্ট হবে। এ চিন্তার সারমর্ম হচ্ছে, দুনিয়ার একটি অনিষ্ট অন্য একটি অনিষ্টের চিন্তা দ্বারা হটিয়ে দেয়া। তাই এটা আখেরাতের আমলের মধ্যে গণ্য হবে না এবং এজন্যে সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

(৪) ক্রোধের সময় অন্য লোকের চেহারা যেমন বীভৎস হয়ে যায়, নিজের চেহারাকে ক্রোধের বেলায় সেরূপ কল্পনা করবে এবং ধ্যান করবে, ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চেহারা ও আকার-আকৃতি ক্ষেপা কুকুর অথবা হিংস্র প্রাণীর মত হয়ে যায়। এর বিপরীতে সহনশীল, গম্ভীর ও ক্রোধ বর্জনকারী ব্যক্তির চেহারা পয়গম্বর, ওলী, আলেম ও দার্শনিকের চেহারার মত থাকে। এখন কোন্ চেহারা সে অবলম্বন করবে, তা নিজেই বেছে নেবে। বুদ্ধিমান হলে মহাপুরুষদের চেহারাই বেছে নিতে বাধ্য হবে।

(৫) যে কারণে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং ক্রোধ হজম করতে পারে না, সেই কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, সেটা কি? উদাহরণতঃ শয়তান প্ররোচনা দেয়, তুমি প্রতিশোধ না নিলে প্রতিপক্ষ তোমাকে দুর্বল মনে করবে এবং মানুষের কাছেও তুমি লাঞ্ছিত অপমানিত হবে। যদি কারণ এটাই হয়, তবে আপন নফসকে বুঝাবে– আশ্চর্যের বিষয়, সহনশীলতা তোমার কাছে মন্দ মনে হয়। অপরপক্ষে মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়ার খুব আশংকা কর, কিন্তু আল্লাহ, ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণের দৃষ্টিতে হেয় হওয়ার ভয় মোটেই কর না। আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ হজম করে ফেললেই মর্তবা বেশী হবে।

(৬) একথা ভাববে যে, আমার ক্রোধের কারণ হচ্ছে আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ না হওয়া। বলাবাহুল্য, আল্লাহর মর্জির উপর নিজের মর্জিকে অগ্রাধিকার দেয়া নেহায়েত নির্বুদ্ধিতা। সম্ভবতঃ এ কারণে আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ আমার ক্রোধের চেয়েও বেশী হবে।

ক্রোধের আমল সম্পর্কিত প্রতিষেধক হচ্ছে, মুখে বলবে–

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ –আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

–ক্রোধের সময় এটাই বলার আদেশ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন ক্রুদ্ধ হতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নাক ধরে বলতেন– হে আয়েশা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ ـ

–হে আল্লাহ, পয়গম্বর মুহাম্মদের পালনকর্তা, আমার গোনাহ মাফ কর, আমার মনের ক্রোধ দূর কর এবং আমাকে বিভ্রান্তকারী ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও।

অতএব এ দোয়াটি বলাও মোস্তাহাব। যদি এই দোয়ায় ক্রোধ দূর না হয়, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। উদ্দেশ্য, নিজেকে মাটির নিকটবর্তী করে দেবে– যাতে জানতে পার যে, তুমি এই মাটি দ্বারা সৃজিত এবং পরিণামে এই মাটিতেই যেতে হবে। এই আমলের বদৌলতে নফসের হীনতা বোধগম্য হয়ে যাবে। কেননা ক্রোধ উত্তাপের কারণে হয় এবং উত্তাপ গতিশীলতার কারণে। বসা অথবা শয়ন দ্বারা যখন গতিশীলতা দূর হয়ে যাবে, তখন আশা করা যায়,

ক্রোধও দূর হয়ে যাবে। এ আমলটিও হাদীসে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে–

إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي الْقَلْبِ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِّنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ ـ

–ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তোমরা দেখ না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে যায়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়? তোমাদের কেউ যদি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে এবং বসা থাকলে যেন শুয়ে পড়ে।

যদি এরপরও ক্রোধ দূর না হয়, তবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু অথবা গোসল করে নেবে। কারণ, পানি ছাড়া অগ্নি নির্বাপিত হয় না।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ بِالْمَاءِ فَإِنَّمَا الْغَضَبُ مِنَ النَّارِ

–যখন তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হয়, তখন যেন পানি দিয়ে ওযু করে। কারণ ক্রোধ অগ্নি থেকে উৎপন্ন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

–নিশ্চয় ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে, শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃজিত আর পানি দ্বারা অগ্নি নিভে যায়। অতএব তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন ওযু করে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে–

أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِيْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ ـ

–সাবধান, ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ, যা আদম সন্তানের অন্তরে থাকে। দেখ না, তার চক্ষুদ্বয়ের রক্তিম বর্ণ এবং ঘাড়ের শিরাসমূহের স্ফীতি? যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, সে যেন আপন গণ্ডদেশকে মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়।

এ হাদীসে সেজদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহের সেরা

অঙ্গটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটিতে রাখা উচিত, যাতে নফস তার হীনতা বুঝতে পেরে ক্রোধের কারণ অহংকার থেকে বিরত থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে নাকে পানি দিতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে হয় এবং এই আমল দ্বারা শয়তান দূর হয়ে যায়। ওরওয়া ইবনে মুহাম্মদ বলেন ঃ আমি যখন মাদইয়ানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলাম, তখন আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ তুমি শাসনকর্তা হয়েছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ যখন তোমার ক্রোধ হয় তখন আকাশ ও পৃথিবীকে দেখে এদের স্রষ্টার মাহাত্ম্য স্বীকার করবে, অর্থাৎ সেজদা করবে।

ক্রোধ হজম করার ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থানে এরশাদ করেন وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ এবং যারা ক্রোধকে হজম করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى رَبِّهٖ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ وَمَنْ خَذَلَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ ـ

-যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে বাধা দেয়, আল্লাহ তার আযাবকে বাধা দেবেন। যে তার পালনকর্তার কাছে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন। যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন। তিনি আরও বলেন ঃ

اَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَاَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ ـ

-তোমাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় আপন নফসের উপর প্রবল হয় এবং তোমাদের মধ্যে অধিক সহনশীল সে ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে।

আরও বলা হয়েছে-

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ اَنْ يُّمْضِيَهُ اَمْضَاهُ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

-যে ব্যক্তি এমন সময়ে ক্রোধ দমন করে যে, ইচ্ছা করলে তা অব্যাহত রাখতে পারে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা তার অন্তর পূর্ণ করে দেবেন।

এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে-

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً اَعْظَمَ اَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

-আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ক্রোধ গিলে ফেলার সমান সওয়াব কোন কিছুর মধ্যে নেই, যা বান্দা গলাধঃকরণ করে।

আইউব (রহঃ) বলেন ঃ এক মুহূর্ত সহ্য করা অনেক অনিষ্ট দূর করে দেয়। একবার হযরত সুফিয়ান সওরী, আবু খুযায়মা ও ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) এক জায়গায় একত্রিত হন এবং সংসার নির্লিপ্ততা সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন অবশেষে সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ক্রোধের সময় সহ্য করা এবং লোভের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলল ঃ আপনি ইনসাফ সহকারে বিচার করেন না এবং বেশী দান করেন না। এতে তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, মুখমন্ডলে তার প্রভাব ফুটে উঠল। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আপনি কি করতে চান? এ ব্যক্তি মূর্খ, যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাক।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর যেন একটি অগ্নি দফ করে নিভে গেল।

মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন ঃ তিনটি বিষয় কারও মধ্যে একত্রিত হলে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এক, যখন খুশীর অবস্থায় থাকে, তখন যেন বাতিল বিষয়াদিতে প্রবেশ না করে। দুই, যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন যেন সত্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে না যায়। তিন, যখন ক্ষমতা থাকে, তখন যে বস্তু নিজের নয়, তা যেন না নেয়।

সহনশীলতার ফযীলত ঃ ক্রোধেরই একটি বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সহনশীলতা। তা হচ্ছে ক্রোধের মধ্যে স্ফুটন না হওয়া; যদি হয়ও তবে দমন করতে কষ্ট না হওয়া। এ অবস্থা ক্রোধ হজম করার চেয়ে উত্তম। কেননা, ক্রোধ হজম করার মানে হচ্ছে জোরে জবরে সহনশীল হওয়া। সুতরাং এটা বানোয়াট। আর সহনশীলতা বলা হয় একটি মজ্জাগত স্বভাবকে, যদ্দ্বারা বুদ্ধির পূর্ণতা প্রমাণিত হয় এবং ক্রোধশক্তি

অনুগত ও পরাভূত থাকে, কিন্তু শুরুতে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে এ স্বভাবটি অর্জিত হয়।

সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَمَنْ يَتَخَيَّرِ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَيْهِ ـ

-এলেম আসে শিক্ষার মাধ্যমে এবং সহনশীলতা আসে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি কল্যাণের ইচ্ছা করে, তা প্রাপ্ত হয় এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচে সে নিরাপদ থাকে।

এ থেকে জানা গেল, সহনশীলতা অর্জনের উপায় হচ্ছে প্রথমে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়া; যেমন এলেম অর্জন করার ওসিলা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ وَلِينُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ وَلِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبْ جَهْلُكُمْ عَلٰى عِلْمِكُمْ ـ

এলেম অন্বেষণ কর এবং এলেমের সাথে গাম্ভীর্য ও সহশীলতা অন্বেষণ কর। তোমরা নম্র হও তার জন্যে, যাকে শেখাও এবং যার কাছ থেকে শেখ। স্বেচ্ছাচারী আলেম হয়ো না। তাহলে তোমাদের মূর্খতা এলেমের উপর প্রবল হয়ে যাবে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্রোধে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এটাই নম্রতা ও সহনশীলতার অন্তরায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِىْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِىْ بِالْعَافِيَةِ ـ

-হে আল্লাহ, আমাকে এলেম দ্বারা ধনী কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الرحى الْغَنِيَّ الْمُتَعَفِّفَ التَّقِيَّ وَيُبْغِضُ

الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ سَائِلَ الْمُلْحِفَ ـ

–আল্লাহ তা'আলা পছন্দ কলেন সহনশীল, লজ্জাশীল, ধনী, পবিত্র মুত্তাকীকে এবং ঘৃণা করেন নির্লজ্জ, বকবককারী নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়ালকারীকে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রীত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে- গুণী ব্যক্তিরা কোথায়? এতে অল্প সংখ্যক লোক দাঁড়াবে এবং জান্নাতের দিকে দৌড় দেবে। ফেরেশতা তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করবে– তোমরা দৌড়ে যাচ্ছ? তারা বলবে হাঁ, আমরা গুণীজন। ফেরেশতারা শুধাবে- তোমাদের মধ্যে কি গুণ ছিল? তারা জওয়াব দেবে, আমাদের উপর জুলুম করা হলে আমরা সবর করতাম। কেউ আমাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে আমরা ক্ষমা করে দিতাম। কেউ মূর্খতা করলে আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম। ফেরেশতা বলবে ঃ তা হলে এখন জান্নাতে চলে যাও।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ অর্থ সম্পদ বেড়ে যাবে এবং সন্তান সন্ততি অনেক হবে বরকত এর নাম নয়। বরকত হচ্ছে এলেম ও সহনশীলতা অধিক হওয়া। আকসাম ইবনে সায়ফী বলেন ঃ বুদ্ধির স্তম্ভ হচ্ছে সহনশীলতা এবং সব কথার মূল হচ্ছে সবর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সহনশীল ব্যক্তি সহনশীলতার কারণে প্রথম পুরস্কার এটাই পায় যে, সকল মানুষ তার সপক্ষে থেকে তার অনিষ্টকারীর পেছনে লাগে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আমর ইবনে আসামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বীরপুরুষ কে? তিনি বললেন ঃ যে আপন সহনশীলতা দ্বারা মূর্খতাকে হটিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন হল ঃ দানবীর কে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ যে দুনিয়াতে দ্বীনের কল্যাণার্থে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন -

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ـ

–অতঃপর তুমি দেখবে, তোমার মধ্যে ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এটা তারাই পায়, যারা সবর করে এবং এটা সে-ই লাভ করে, যে মহাভাগ্যবান।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ

এখানে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যাকে তার কোন ভাই গালি দিলে সে প্রত্যুত্তরে বলে- তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আর তুমি সত্যাবাদী হলে আল্লাহ্ আমাকে মার্জনা করুন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একবার এরাবা ইবনে আউস আনসারীকে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সরদার হলে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যারা মূর্খ, আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি। আর যারা সওয়াল করে, তাদেরকে দান করি এবং অভাব মোচনে চেষ্টা করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার মত কাজ করবে, সে আমার মত হবে, যে আমার চেয়ে বেশী কাজ করবে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি কম কাজ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম হব। এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমারও কিছু লোকের মধ্যে বিবাদ আছে । আমার ইচ্ছা বিবাদ মিটিয়ে ফেলি, কিন্তু লোকে বলে, এতে যিল্লতী আছে। ইমাম জাফর সাদেক বললেন ঃ যিল্লতী জালেমেরই হয়। তোমার কোন যিল্লতী নেই।

প্রতিশোধের জন্য যে পরিমাণ কথা বলা দুরস্ত ঃ জুলুমের বদলে জুলুম করা এবং অন্যায়ের মোকাবিলায় অন্যায় করা তো সম্পূর্ণ নাজায়েয। উদাহরণতঃ গীবতের বিনিময়ে গীবত করা এবং গালির জওয়াবে গালি দেয়া জায়েয নয়। হাঁ, প্রতিশোধের নিমিত্ত শরীয়তে যতটুকু করা বর্ণিত আছে, সে পরিমাণই জায়েয। গালির বদলে গালি দেয়া কিছুতেই উচিত নয়। কেননা, হাদীসে আছে-

إِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِمَا فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا فِيهِ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ -

-যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার বাস্তব দোষ ধরে লজ্জা দেয়, তবে তুমি তাকে তার দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না। যারা একে অপরকে গালি দেয়, তারা উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরে মিথ্যা বলে।

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে গালি দিল। তিনি চুপচাপ শুনলেন। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কিছু বলা শুরু করলেন, তখনই রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্থানোদ্যত হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, যখন লোকটি আমাকে মন্দ বলছিল, তখন আপনি নির্বিকার রইলেন। এখন আমি প্রতিশোধ নিতে চাইলে আপনি প্রস্থানোদ্যত হলেন। এর কারণ কি? রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে.

ফেরেশতারা তোমার পক্ষ থেকে জওয়াব দিচ্ছিল, যখনই তুমি মুখ খুললে ফেরেশতা চলে গেল এবং শয়তান আগমন করল। যে মজলিসে শয়তান থাকে, আমি সেখানে থাকতে চাই না।

কেউ কেউ বলেন, মোকাবিলায় এমন কথা বলা জায়েয, যাতে মিথ্যা নেই। হাদীসে সাবধানতার কারণে নিষেধ করা হয়েছে; অর্থাৎ এমন কথাও বর্জন করা উত্তম, কিন্তু বললে গোনাহগার হবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ বলা ঃ তুমি কে? তুমি অমুকের সন্তান না? যেমন সা'দ (রাঃ) হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি কি বনী হুযায়লেরই একজন না? জওয়াবে ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ তুমি কি বনী উমাইয়ারই একজন না? অথবা কাউকে নির্বোধ বলাও জায়েয। কেননা, মুতরিফ (রঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সকল মানুষই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে নির্বোধ। তবে কেউ কম এবং কেউ বেশী। হাদীস শরীফে এরূপই বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে কাউকে মূর্খ বলে দেয়াও জায়েয। কেননা, কোন না কোন প্রকার মূর্খতা সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। মোট কথা, এ ধরনের কথা দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে ঠিক, কিন্তু তা মিথ্যা হয় না। তবে চোগলখোরী, গীবত ও পিতামাতাকে গালি দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

যে কথা মিথ্যা নয়, তা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে বলা জায়েয। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন- একবার পত্নীগণ সকলে মিলে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে পিতার কাছে আরজ করলেন ঃ আপনার পত্নীগণ আমাকে এই উদ্দেশে পাঠিয়েছেন যে, আপনি আয়েশাকেও তাদের সমান মনে করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শায়িত ছিলেন।

তিনি বললেন ঃ ফাতেমা! আমি যাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসবে? তিনি আরজ করলেন ঃ অবশ্যই। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তুমি আয়েশাকে ভালবাস। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফিরে গিয়ে পত্নীদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন ঃ তুমি তো কিছুই করতে পারলে না। খালি হাতেই ফিরে এসেছ। অতঃপর তাঁরা যয়নব বিনতে জাহাশকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ যয়নব আমার সমান মহব্বত দাবী করতেন। তিনি এসে বলতে শুরু করলেন ঃ আবু বকরের কন্যা এমন, আবু বকরের কন্যা অমন; এভাবে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে গেলেন। আমি চুপচাপ শুনলাম; কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিন। তিনি যখন

আমাকে অনুমতি দিলেন, তখন আমি এত বললাম যে, বলতে বলতে মুখ শুকিয়ে গেল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) হযরত যয়নবকে বললেন ঃ আবু বকরের কন্যাকে দেখলে? তার মোকাবিলা করার সাধ্য তোমার নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) যয়নব (রাঃ)-কে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাতে অশ্লীলতা ছিল না– কেবল তাঁর কথার ঠিক ঠিক জওয়াব ছিল। এক হাদীসে আছে–

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْمُبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِي الْمَظْلُوْمُ۔

–দুগালিগালাজকারী যা কিছু বলে তা যে শুরু করে, তার উপর বর্তায়, যে পর্যন্ত মজলুম সীমালঙ্ঘন না করে।

এ থেকে জানা গেল, মজলুম প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রাখে, যদি সীমালঙ্ঘন না করে।

সুতরাং পূর্ববর্তীগণ যে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন তা যে পরিমাণ কষ্ট হয়, সেই পরিমাণ শোধ নেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু এটাও বর্জন করা উত্তম। কেননা, এতে বাড়াবাড়ি হওয়ার আশংকা থাকে এবং ওয়াজিব পরিমাণ শোধ নিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

এখন জানা দরকার, কতক মানুষ ক্রোধের তীব্রতায় আত্মসংবরণ করতে পারে না। আবার কেউ কেউ শুরুতে ক্রোধ করে নেয়; কিন্তু চিরকালের জন্যে অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। এ দিক দিয়ে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা ঘাসের ন্যায় দ্রুত জ্বলে উঠে এবং দ্রুত নিভে যায়। দুই, যারা পাথরের কয়লার মত বিলম্বে প্রজ্বলিত হয় এবং বিলম্বেই নেভে। তিন, যারা ভেজা লাকড়ির মত বিলম্বে জ্বলে কিন্তু দ্রুত নিভে যায়। এ অবস্থা খুব ভাল, যদি নম্রতা অসম্মান না হয়। চার, যারা দ্রুত জ্বলে উঠে এবং বিলম্বে নির্বাপিত হয়। এটা সবগুলোর মধ্যে মন্দ। হাদীসে বলা হয়েছে– ঈমানদার দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত শান্ত হয়ে যায়। এভাবে অভ্যাসের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ যাকে ক্রোধের কথা বললেও ক্রুদ্ধ হয় না, সে গাধা। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ বিভিন্ন প্রকার। কতক বিলম্বে ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কতক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত ক্রোধ ফানা হয়ে যায়। এক বিষয়ের ক্ষতি অন্য বিষয় দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। আবার কতক লোক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং বিলম্বে ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু সকলের মধ্যে

উত্তম সে, যার ক্রোধ হয় বিলম্বে এবং থেমে যায় দ্রুত। পক্ষান্তরে সকলের মধ্যে মন্দ সে-ই, যার ক্রোধ হয় দ্রুত এবং থামে অনেক বিলম্বে। ক্রোধের তীব্রতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিধায় যারা শাসক, তাদের জন্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায় কাউকে সাজা না দেয়া জরুরী; নতুবা সাজা ওয়াজিব পরিমাণের বেশী হয়ে যাওয়া অবান্তর নয়। এ কারণেই সাজা কেবল আল্লাহর কাছে অপরাধের কারণে দেবে– আপন স্বার্থের জন্যে দেবে না। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক মাতালকে দেখে শাস্তি দিতে চাইলেন। ইত্যবসরে মাতাল তাকে গালি দিল। তিনি ফিরে এলেন। লোকেরা আরজ করল ঃ গালি দেয়ার কারণে আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ তার গালির কারণে আমার রাগ ধরেছিল। এমতাবস্থায় তাকে প্রহার করলে তাতে আমার নিজের ক্রোধেরও সম্পর্ক থাকত। অথচ আমি চাই যেন আমার নিজের জেদের কারণে কোন মুসলমানকে প্রহার না করি।

বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল ঃ যখন মানুষ ক্রোধের প্রতিশোধ নিতে অসমর্থ হয়, তখন ক্রোধ হজম করে নিতে হয়, ফলে তা অন্তরে পতিত হয়ে বিদ্বেষ হয়ে যায়। বিদ্বেষের অর্থ হচ্ছে কাউকে অসহ্য মনে করা এবং তার প্রতি অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা। এটা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُوْدٍ –মুমিন বিদ্বেষপরায়ণ নয়। বিদ্বেষ ক্রোধের ফল এবং এ থেকে আটটি বিষয় উৎপন্ন হয়।

প্রথম, হিংসা অর্থাৎ অপরের কাছ থেকে নেয়ামতের অবসান কামনা করা, তার নেয়ামতপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হওয়া এবং তার বিপদে পতিত হওয়ায় আনন্দ করা।

দ্বিতীয়, অন্তরে হিংসা এমন বেড়ে যাওয়া যে, অপরের বিপদে শত্রুর ন্যায় হাসতে প্রস্তুত থাকা।

তৃতীয়, অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যদিও সে সম্পর্ক বজায় রাখতে ও কাছে আসতে চায়।

চতুর্থ, অপরকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করা।

পঞ্চম, তার সম্পর্কে অবৈধ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা; যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, গোপন তথ্য ফাঁস করা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ, কথাবার্তায় তার সাথে কৌতুক ও পরিহাস করা।

সপ্তম, তাকে প্রহার করে দৈহিক কষ্ট দেয়া।

অষ্টম, তার কিছু প্রাপ্য থাকলে তা শোধ না করা। এ আটটি বিষয়ই হারাম। বিদ্বেষের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে উপরোক্ত আটটি বিষয় থেকে বেঁচে

থাকা এবং কেবল অন্তরে অপরকে মন্দ জানা; এমনকি পূর্বে তার সাথে যা যা করত, তা না করা; যেমন তাকে দেখে খুশী না হওয়া, নম্রতা ও দান খয়রাত না করা, তার অভাব মোচনে সাহায্য না করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ের কারণে দ্বীনদারীতে মানুষের মর্তবা হ্রাস পায়, যদিও সে শাস্তির যোগ্য হয় না। দেখ, হযরত আবু বকর (রাঃ) মেসতাহকে কিছু দেবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। মেসতাহ্ ছিলেন তাঁর আত্মীয়, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপে তাঁরও কিছু ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ -

–তোমারদের মধ্যে যারা গুণী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল, তারা যেন আত্মীয়, মিসকীন ও মুহাজিরদেরকে দান করার ব্যাপারে কসম না খায়। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।

এই আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, আমরা আল্লাহর মাগফেরাত পছন্দ করি। এরপর পূর্বে যা দিতেন, তা পুনর্বহাল করে দিলেন। এ থেকে জানা গেল, পূর্ববৎ ব্যবহার অব্যাহত রাখাই উত্তম। যদি মনের উপর জোর দিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণহেতু কিছু বেশী দান করে, তবে এটা সিদ্দীকগণের স্তর।

ক্ষমার ফযীলত ঃ ক্ষমার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছে যা প্রাপ্য থাকে, তা ছেড়ে দেয়া; যেমন কেসাস ও কর্জ ইত্যাদি কারও যিম্মায় থাকলে তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর অনেক প্রশংসা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -

ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মুর্খদের থেকে বিরত থাক।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى –আর ক্ষমা করা খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ তিনটি বিষয় আমি কসম খেয়ে বলতে পারি - এক, দান খয়রাত দ্বারা ধন-সম্পদ হ্রাস পায় না। দান খয়রাত করা উচিত। দুই, যদি কোন ব্যক্তি নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে আপন প্রাপ্য ছেড়ে দেয়, তবে

আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তিন, যে ব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের দরজা উন্মোচন করে, আল্লাহ তাআলা তার সামনে দারিদ্র্যের দরজা প্রশস্ত করে দেন। এক হাদীসে আছে-

اَلتَّوَاضُعُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوْا يَرْفَعْكُمُ اللّٰهُ وَالْعَفْوُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزَّكُمُ اللّٰهُ وَالصَّدَقَةُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوْا يَرْحَمْكُمُ اللّٰهُ -

-বিনয় বান্দার কেবল উচ্চতাই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা বিনয় প্রদর্শন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে উচ্চতা দেবেন। ক্ষমা বান্দার কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দেবেন। দান-খয়রাত কেবল প্রাচুর্যই বাড়ায়। অতএব তোমরা দান খয়রাত কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন।

হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। এরপর সঠিক বলতে পারব না, আমি প্রথমে তাঁর হাত ধরলাম না তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি বললেন ঃ হে ওকবা, দুনিয়া ও আখেরাতে লোকদের চরিত্রের যে বিষয়টি উত্তম তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি- যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, বান্দাদের মধ্যে তোমার কাছে কে অধিক প্রিয়। এরশাদ হল ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রাপ্যের নালিশ পেশ করল। তিনি তার পক্ষে রায় দেয়ার ইচ্ছায় তাকে বসতে বললেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন ঃ اِنَّ الْمَظْلُوْمِيْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -কেয়ামতের দিন মজলুমরাই সফলকাম হবে। লোকটি এ কথা শুনে তার প্রাপ্য মাফ করে দিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা গৃহের তওয়াফ করেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করে কাবায় তশরীফ আনেন। এরপর কাবার চৌকাঠ ধরে সমবেত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? লোকেরা আরজ করল ঃ আপনি আমাদের ভাই এবং মেহেরবান পিতৃব্য পুত্র। তারা একই কথা তিন বার উচ্চারণ করল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি সেই কথাই বলছি যা আমার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন–

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ

–আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সবার উপরে দয়াশীল।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ লোকেরা একথা শুনে আপন আপন গৃহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে এল, যেমন কবর থেকে বের হয়। অতঃপর সকলেই মুসলমান হয়ে গেল।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি সহনশীল নয়, যে জুলুমের সময় চুপ থাকে, এরপর সক্ষম হলে প্রতিশোধ নেয়; বরং সহনশীল তাকে বলা হয়, যে জুলুমের সময় সহ্য করে এবং সক্ষম হলে মাফ করে। একবার হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বাজারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিছু সওদা ক্রয় করে মূল্য দেয়ার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, পকেটের দেরহামগুলো চুরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত এখানে বসা আছি, দেরহামগুলো পকেটে ছিল। লোকেরা চোরকে বদদোয়া দিতে লাগল, তার হাত কাটা যাক, তার অমঙ্গল হোক, কিন্তু হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, যদি সে অভাবে পড়ে নিয়ে থাকে, তবে তাকে বরকত দাও, যাতে অভাব দূর হয়ে যায়। আর যদি গোনাহের প্রতি বেপরওয়া হয়ে নিয়ে থাকে, তবে এ গোনাহ্‌কেই তার শেষ গোনাহ্‌ করে দাও।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে ইবনে আশআসের বন্দীরা আগমন করলে তিনি তাদের সম্পর্কে রেজা ইবনে হায়াতের সাথে সলাপরামর্শ করলেন। রেজা আরজ করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার পছন্দসই বিষয় অর্থাৎ বিজয় দান করেছেন। এর বিনিময়ে আপনি তা করুন যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দসই অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমা পছন্দ করেন। আপনিও ক্ষমা করুন। এ কথা শুনে খলীফা সকল বন্দীকে ক্ষমা করলেন।

নম্রতার ফযীলত ঃ নম্রতা একটি উত্তম গুণ, যা সচ্চরিত্রতার ফল। এর বিপরীতে কঠোরতা হচ্ছে ক্রোধের ফল। কঠোরতা কখনও ক্রোধ থেকে এবং কখনও তীব্র লালসা থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু নম্রতা সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্রতারই ফল। সচ্চরিত্রতা তখনই অর্জিত হয়, যখন ক্রোধশক্তি ও খাহেশ শক্তিকে সমতার পর্যায়ে রাখা হয়। এ কারণেই 'রিফক' তথা

নম্রতা হাদীস শরীফে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

—হে আয়েশা, যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ পেয়েছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের অংশ পেয়েছে। আরও বলা হয়েছে—

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

—যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন পরিবারের লোকজনকে মহব্বত করেন, তখন তাদের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করে দেন। আর এক হাদীসে আছে— مَنْ يُّحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ

—যে নম্রতা পেল না, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে শাসক নম্রতা প্রদর্শন করে, তার সাথে কেয়ামতে নম্রতা করা হবে। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সকল মুসলমানই আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আপনার কাছ থেকে উপকার লাভ করে। কোন উত্তম কথা আমার জন্যেও নির্দিষ্ট করে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই অথবা তিন বার আলহামদু লিল্লাহ্ বললেন এবং লোকটির প্রতি মনোযোগী হয়ে দুই অথবা তিন বার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমিই উপদেশ চাও? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি কোন কাজ করার ইচ্ছা কর, তখন পরিণাম চিন্তা করে নাও। যদি ভাল দেখ, কর; নতুবা বিরত থাক।

হযরত সুফিয়ান সওরী তাঁর সহচরগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'রিফক' কাকে বলে তোমরা জান? তারা আরজ করল ঃ আপনিই বলে দিন। তিনি বললেন ঃ কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা এবং নম্রতার জায়গায় নম্রতা প্রদর্শন করা। এ থেকে জানা গেল, নম্রতার সাথে কঠোরতার মিশ্রণও দরকার, কিন্তু মানুষের স্বভাব অধিক কঠোরতাপ্রবণ বিধায় নম্রতার প্রতি অধিক মাত্রায় উৎসাহ প্রদান জরুরী। এ কারণেই শরীয়তে নম্রতার প্রশংসা অনেক করা হয়েছে এবং কঠোরতার প্রশংসাই পাওয়া যায় না, কিন্তু স্ব স্ব স্থানে উপযোগিতা অনুসারে উভয়টি ভাল। তবে যে স্থানে কঠোরতা জরুরী, সেখানে সত্য মানসিক প্রবৃত্তির সাথে মিশে যায় এবং ঘি চিনির চেয়েও অধিক সুস্বাদু মনে হয়।

হিংসার নিন্দা ঃ হিংসাও বিদ্বেষের একটি শাখা এবং বিদ্বেষ ক্রোধের শাখা। অতএব হিংসা ক্রোধের শাখা এবং ক্রোধ হল মূল কাণ্ড। এরপর

হিংসার এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা বিস্তৃত হয়, যেগুলো গণনাও করা যায় না। হিংসার নিন্দায় বহু হাদীস বর্ণিত আছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ –অগ্নি যেমন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসা নেককাজসমূহ খতম করে দেয়।

অন্য এক হাদীসে হিংসা, তার ফলাফল ও কারণসমূহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ

لَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَقَاطَعُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

–পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা করো না এবং আত্মীয়তা ভঙ্গ করো না। তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ এখন এ পথে একজন জান্নাতী ব্যক্তি তোমাদের সামনে আসবে। এমন সময় জনৈক আনসারী বাম হাতে জুতা নিয়ে আবির্ভূত হল। তার দাড়ি থেকে ওযুর পানি টপকে পড়ছিল। সে এসেই "আস্সালামু আলাইকুম" বলল। দ্বিতীয় দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার পূর্ববৎ উক্তি করলেন। সেদিনও সে ব্যক্তিই আগমন করল। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা সংঘটিত হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে চলে গেলে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস আনসারী ব্যক্তির পেছনে পেছনে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ আমার পিতার সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এতে আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন তাঁর কাছে যাব না। আপনি অনুমতি দিলে তিন দিন আপনার গৃহেই রাত কাটাব। লোকটি বলল ঃ কোন অসুবিধা নেই। আপনি থাকুন। হযরত আবদুল্লাহ তিন রাত্রি পর্যন্ত তার গৃহে শয়ন করে দেখলেন, সে রাতে গাত্রোত্থান করে না, তবে প্রত্যেক পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় আল্লাহর যিকির করে নেয়। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় শয্যাত্যাগ করে না। অবশ্য এতটুকু জানা গেল, সে যখন কোন কথা বলেছে, ভাই বলেছে। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত আদুল্লাহ তার আমলের কোন ওজনই বুঝতে পারলেন না। অগত্যা তিনি লোকটিকে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিতার সাথে আমার কোন বাদানুবাদ হয়নি; কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে আপনার শানে একথা শুনেছিলাম। তাই আপনি কি

আমল করেন, তা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আপনাকে তো খুব বেশী আমল করতে দেখলাম না। বলুন তো, কিভাবে আপনি জান্নাতী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন? লোকটি বলল ঃ আমার আমল তো তাই, যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আমি তার কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিছু দূর অগ্রসর হতেই সে আমাকে ডেকে নিল এবং বলল ঃ ভাই, আমল তো তাই, যা আপনি দেখেছেন, কিন্তু ব্যাপার এতটুকু, যে নেয়ামত আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে দান করেন, তাতে আমার মনে কোনরূপ মলিনতা ও হিংসা আসে না। আমি বললাম ঃ ব্যস, এ কারণেই আপনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন। আমাদের দ্বারা এটা সম্ভবপর নয়।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিষয় থেকে কেউ মুক্ত নয়। এক- ধারণা, দুই- কুলক্ষণ, তিন- হিংসা, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এগুলো থেকে মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছি। যখন মনে কোন ধারণা আসে, তখন তা ঠিক মনে করবে না। যখন কুলক্ষণ দেখ, তখনও নিজের কাজ করে যাও। আর হিংসার উদ্রেক হলে খাহেশ করো না। এ হাদীস হতে হিংসা থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা বুঝা যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন পরওয়ারদেগারের সাথে কথা বলার জন্য গমন করেন, তখন এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় দেখে ঈর্ষা করতে থাকেন যে, এহেন উচ্চ মর্যাদা যদি আমারও নসীব হত! সেমতে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে লোকটির নাম বলে দেয়ার আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন ঃ তার নাম দিয়ে কি করবে, কাম শুনে নাও। সে তিনটি কাজ করত- এক, মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দেখে হিংসা করত না। দুই, পিতা-মাতার নাফরমানী করত না। তিন- চোগলখোরী করত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে এ বিষয়ের আশংকা বেশী করি যে, তাদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং তারা পরস্পরে হিংসা করে খুনাখুনি করবে।

বর্ণিত আছে, ফযল ইবনে মুহাল্লাব যখন ওয়াসেতের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন আউন ইবনে আবদুল্লাহ তার কাছে যান এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই। ফযল বললেন ঃ বলুন। তিনি বললেন ঃ

প্রথমঃ অহংকার থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার প্রথম নাফরমানী এর কারণেই হয়েছে। সেমতে কোরআন পাকে এর সত্যায়ন বিদ্যমান-

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

–স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন তারা সেজদা করল; কিন্তু ইবলীস করল না। সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেরেদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঃ লালসা থেকে বেঁচে থাকবে। এটা বড় বিপদ, যার কারণে হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জান্নাতে স্থান দেন, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সেখানে তাঁকে সকল বস্তু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়; কেবল একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু তিনি লালসার বদৌলতে সেই ফল খান এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁকে আদেশ করা হয়- اِهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ –তোমরা সকলেই জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু।'

তৃতীয় ঃ হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। এ হিংসার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কাবিল তার ভাই হাবিলকে খুন করেছিল। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ـ

–তাদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনান, যখন তারা উভয়েই কোরবানী করল, অতঃপর একজনের কোরবানী কবুল হল এবং অপরজনের হল না, তখন সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে খুন করব।

আরেকটি বিষয়, যখন সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, জ্যোতির্বিদ্যার কথা আলোচনা করা হয় তখন তুমি চুপ থাকবে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসানকে প্রশ্ন করল ঃ ঈমানদার হিংসা করে? তিনি বললেন ঃ তুমি কি ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্রদের কথা ভুলে গেছ? তারা ঈমানদার ছিল। সুতরাং ঈমানদার হিংসা করে, কিন্তু তার উচিত বুকের মধ্যেই তা গোপন রাখা। কেননা হাতে ও মুখে বাড়াবাড়ি না করা পর্যন্ত হিংসা দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করবে, তার হাসি ও হিংসা উভয়টি হ্রাস পাবে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখি; কিন্তু নেয়ামতের কারণে যে হিংসা করে, তাকে

সন্তুষ্ট করতে পারি না। সে নেয়ামতের বিলুপ্তি ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ হিংসা একটি ক্ষত, যা কখনও শুকায় না।

হিংসার স্বরূপ, প্রকার ও বিধান ঃ বলাবাহুল্য, নেয়ামতের উপর ভিত্তি করেই হিংসা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করেন, তখন অপর ব্যক্তির দু'রকম অবস্থা হতে পারে।

প্রথম হচ্ছে, সেই নেয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে এবং সে তার বিলুপ্তি কামনা করবে। তার এই অবস্থার নামই হিংসা। এ থেকে জানা গেল, হিংসার সংজ্ঞা হচ্ছে, অপরের নেয়ামত দেখে দুঃখিত হওয়া এবং তার কাছ থেকে তার বিলুপ্তি কামনা করা।

দ্বিতীয় হচ্ছে, অপরের সেই নেয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে না এবং সে তার বিলুপ্তিও কামনা করবে না; বরং তার মন চাইবে, এই নেয়ামত আমিও পাই। এই অবস্থাকে বলা হয় "গিবতা" তথা ঈর্ষা। কখনও হিংসাকে ঈর্ষার জায়গায় এবং ঈর্ষাকে হিংসার জায়গায় ব্যবহার করা হয়। অর্থ জানা থাকলে এতে কোন অসুবিধা হয় না।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

المؤمن يغبط والمنافق يحسد

–মুমিন ঈর্ষা করে এবং মোনাফেক হিংসা করে।

অতএব হিংসা সর্বাবস্থায় হারাম, কিন্তু যে নেয়ামত কোন পাপাচারী অথবা কাফেরের হাতে পড়ে এবং তদ্দ্বারা সে ফেতনা ফাসাদ ও উৎপীড়ন করে, সেই নেয়ামতকে ঐ ব্যক্তির হাতে খারাপ মনে করা এবং তার বিলুপ্তি কামনা করা গোনাহ্ নয়। কেননা, এখানে স্বয়ং নেয়ামতের উপর হিংসা হয় না; বরং সেটা ফেতনা ফাসাদের সামগ্রী বিধায় হিংসা করা হয়। হিংসা যে হারাম, এ বিষয়ে হাদীসসমূহ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া অপরের নেয়ামতকে খারাপ মনে করা আল্লাহ্ তাআলার বিধানে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার নামান্তর যে, তিনি এক বান্দাকে অপর বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন কেন?

আল্লাহ্ তা'আলাও বহু জায়গায় হিংসার নিন্দা করেছেন। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ-

ان مستكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها

–যদি তোমরা কিছু কল্যাণ প্রাপ্ত হও তবে তাদের খারাপ লাগে। আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ ঘটে তবে তারা তজ্জন্যে উলসিত হয়ে উঠে।

ود كثير من اهل الكتب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم -

গ্রন্থধারীদের অনেকেই কামনা করে, তোমাদেরকে মুমিন হওয়ার পরে কাফেরে পরিণত করে দেয়- নিজেদের পক্ষ থেকে হিংসার কারণে। এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যে ঈমানরূপী নেয়ামতের অবসান চায়, তা হিংসার কারণে।

لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء যদি তোমরাও কাফের হয়ে যাও যেমন তারা কাফের হয়েছে, অতঃপর সকলেই সমান হয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদের হিংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের মনের কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে-

اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفى ضلل مبين اقتلوا يوسف اواطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم -

-যখন তারা বলল ঃ অবশ্য ইউসুফ ও তার ভ্রাতা আমাদের পিতার অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি বড় দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছেন। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন দেশে পাঠিয়ে দাও। এতে তোমরা তোমাদের পিতার মনোযোগ একান্তভাবে পাবে। অর্থাৎ হযরত ইউসুফের প্রতি পিতার মহব্বত যখন ভ্রাতাদের কাছে দুর্বিষহ ঠেকল, তখন তার অবসানের কথা চিন্তা করে তাকে পিতার দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিল।

ولا يجدون فى صدورهم حرجا مما اوتوا

-তারা আপন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে না অন্যেরা যা প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে।

এতে যারা হিংসা করে না, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

ايحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله -আল্লাহ্ মুমিনদেরকে যে কৃপা দান করেছেন, তজ্জন্যে তারা হিংসা করে কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে ইহুদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হত, তখন এই বলে দোয়া

করত, ইলাহী! সেই পয়গম্বরের ওসিলায়, যাঁকে প্রেরণ করার ওয়াদা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ এবং সেই কিতাবের ওসিলায়, যা তাঁর প্রতি নাযিল করবে, আমাদেরকে বিজয় দান কর। এই দোয়ার বরকতে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত, কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হয়ে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন পরিচয় পেয়ে তারা মানতে অস্বীকার করল। সেমতে আল্লাহ বলেন–

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ -

–ইতিপূর্বে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। অতঃপর যখন পরিচিতিজন আগমন করল, তখন তারা তাকে মানতে অস্বীকার করল।'

উম্মুল মুমেনীন সফিয়্যা বিনতে হুয়াই একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন ঃ একদিন আমার পিতা ও চাচা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহে গেলেন। আমার পিতা চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি হযরতের শানে কি বল? চাচা জওয়াব দিলেন ঃ আমার জানামতে তিনি সেই পয়গম্বর, যাঁর সুসংবাদ হযরত মূসা (আঃ) দিয়েছিলেন। এরপর চাচা পিতাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি বিশ্বাস ? পিতা বললেন ঃ আমি তো সারাজীবন তার শত্রুই থাকব।

এখন ঈর্ষার বিধান জানা উচিত। ঈর্ষা হারাম নয়। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে– وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ এ বিষয়ে ঈর্ষাকারীদের ঈর্ষা করা উচিত। হাদীস শরীফে এ কথা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لَاحَسَدَ اِلَّا فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ النَّاسَ -

'দু'ব্যক্তির ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায় –প্রথম, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দ্বিতীয়, যাকে আল্লাহ এলেম দিয়েছেন। অতঃপর সে তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।'

এই হাদীসে حسد (হিংসা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ আলোচনা ছিল ঈর্ষার। এর জওয়াব পূর্বেই লেখা হয়েছে, غبطه ও

حسد একে অপরের জায়গায় ব্যবহৃত হয় এবং স্থানের ইঙ্গিতে অর্থ নেয়া হয়।

জানা উচিত, যে নেয়ামতের উপর ঈর্ষা করা হয়, তা যদি ধর্মীয় ও ফরয নেয়ামত হয়; যেমন-ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদি, তবে ঈর্ষা করা ওয়াজিব; অর্থাৎ এরূপ কামনা করা ওয়াজিব যে, এ নেয়ামত আমারও নসীব হোক। আর যদি ফযীলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত নেয়ামত হয়; যেমন নফল দান-খয়রাতে অর্থকড়ি ব্যয় করা, তবে ঈর্ষা করা মোস্তাহাব।

হিংসার কারণ ঃ হিংসার কারণ সাধারণতঃ সাতটি ঃ (১) শত্রুতা। এটি হিংসার সর্বাধিক শক্তিশালী কারণ। কেননা, যাকে কেউ কোন কারণে জ্বালাতন করে, সে জ্বালাতনকারীর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক থাকে। যদি নিজেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম পায়, তবে কমপক্ষে এটা করে যে, প্রতিপক্ষ কোন বালামসিবতের সম্মুখীন হলে সে মনে করে, এটা কেবল আমার উপর জুলুম করার করণে হয়েছে। সে তখন বলতে থাকে, আল্লাহ্ আমার ফরিয়াদ শুনেছেন। পক্ষান্তরে যদি প্রতিপক্ষ কোন নেয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়, তবে সে খারাপ মনে করে এবং বলতে থাকে, আল্লাহ আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন না এবং আমার শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন না; বরং আরও নেয়ামত দান করেছেন। সার কথা, যেখানে বিদ্বেষ ও শত্রুতা, সেখানে হিংসা অপরিহার্য। এ হিংসা কেবল সমকক্ষের সাথেই হয় না; বরং নীচতম ব্যক্তিও রাজা-বাদশাহদের সাথে করতে থাকে; অর্থাৎ শত্রুতার কারণে সে চায়, তার ধনৈশ্বর্য বিলীন হয়ে যাক। পরহেযগার সাবধানী ব্যক্তির উচিত এ ধরনের হিংসা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা। এ হিংসার কারণেই কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

–তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা মুসলমান। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে রাগে অঙ্গুলি কাটে। বলে দিন– তোমরা তোমাদের শত্রুতা নিয়ে মর। আল্লাহ্ অন্তরের কথা জানেন।

এই শত্রুতাজনিত হিংসার ফলে কখনও মারামারি ও খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়, কখনও নেয়ামত দূর করার উপায় চিন্তা করতে করতে সারাজীবন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিংবা সর্বদা চোগলখোরী ও মানহানিকর কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকে।

(২) সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া। উদাহরণতঃ যদি কোন সমকক্ষ ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা, ধন-সম্পদ অথবা বিদ্যার অধিকারী হয়ে যায়, তবে হিংসাকারী আশংকা করে সে যেন তার সাথে অহংকার ও গর্ব করতে পারে। সে নিজে তো অহংকার করতে চায় না; কিন্তু অপরের অহংকার ও আস্ফালন সহ্য করতে পারে না। তাই হিংসা করতে থাকে, অপর ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীগুণী কেন হবে?

(৩) অপরকে হেয় জ্ঞান করা। উদারণতঃ এক ব্যক্তি অপরকে হেয় ও নগণ্য জ্ঞান করে তার কাছ থেকে খেদমত এবং আনুগত্য আশা করে। এখন সে যদি নেয়ামত ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তবে হিংসাকারী আশংকা করে, এখন সে হয় তো তার আনুগত্য করবে না এবং সমকক্ষ হওয়ার দাবী করবে, ফলে তার সরদারী মাঠে মারা যাবে।

এ ধারণার বশবর্তী হয়েই কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হিংসা করত। যেমন কোরআন পাক সাক্ষ্য দেয়-

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

-কাফেররা বলত, এই কোরআন দুজনপদের (মক্কা ও তায়েফের) এক মহান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) মহান ব্যক্তি হলে তার আনুগত্য আমাদের জন্যে কঠিন হত না। একজন এতীম বালকের সামনে মাথানত করা কিরূপে সম্ভবপর? এমনিভাবে কোরায়শ কাফেররা আরও বলত-

اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ -

-আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে জানেন না?'

মুসলমানদেরকে হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করার কারণে তারা এ উক্তি করত।

(৪) হিংসার চতুর্থ কারণ আশ্চর্যবোধ করা; অর্থাৎ হিংসাকারী যখন কোন ব্যক্তির কাছে কোন বড় নেয়ামত অথবা বড় পদমর্যাদা দেখে, তখন এই ভেবে আশ্চর্যবোধ করে যে, আমিও তো তারই মত একজন, অথচ আমি পাইনি, সে এই মর্যাদা পেয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন- مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
-তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।

وَقَالُوا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا –তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই একজন মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব!

لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَخٰسِرُوْنَ –যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের কথা মেনে চল, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এসব আয়াতে কাফেরদের বিস্ময়ই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদেরই মত মানুষ, সে রেসালত, ওহী ও নৈকট্যের মর্তবায় কিরূপে পৌঁছে গেল। এর ভিত্তিতেই তারা রসূলগণের সাথে হিংসা করেছে। এখানে অন্য কোন কারণ, যেমন শত্রুতা, অহংকার, ক্ষমতা অন্বেষণ ইত্যাদি ছিল না।

(৫) প্রার্থিত লক্ষ্য হাতছাড়া হওয়ার ভয়; অর্থাৎ অপরের নেয়ামতের কারণে আপন লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যাবে – এরূপ আশংকা করার কারণে হিংসা করা। এই প্রকার হিংসা এমন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যার দাবীদার দু'জন। তাদের মধ্যে কেউ যখন এমন বস্তু পেয়ে যায়, যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। তখন অপরজন অহেতুক তার সাথে হিংসা করতে থাকে। দু'ভাইয়ের মধ্যেও এরূপ হিংসা হয় যখন প্রত্যেকেই পিতামাতার অন্তরে আসন করে নিতে আগ্রহী হয়, যাতে তাদের কাছে যোগ্য প্রতিপন্ন হয়ে ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায়।

(৬) ক্ষমতার মোহ; অর্থাৎ এরূপ কামনা করা যে, আমি যেমন কবি, সাহিত্যিক, কারিগর অথবা বীর, তেমনটি আর কেউ না হোক। আমার শাস্ত্রে আর কোন সমতুল্য ব্যক্তি না থাকলে মানুষ আমার প্রশংসা করবে এবং আমাকে অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলবে। এ ব্যক্তি যদি তার আশেপাশে প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা শুনে, তবে অবশ্যই খারাপ মনে করবে এবং হয় মৃত্যু কামনা করবে, না হয় সেই শাস্ত্রের বিলুপ্তি কামনা করবে, যার কারণে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও অংশীদার হয়েছে। এই হিংসা বীরত্ব, বিদ্যা, এবাদত, পেশা, দৈহিক সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ ইত্যাদি যেকোন শাস্ত্রে ও ক্ষেত্রে হতে পারে। একেই বলা হয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহ। ইহুদী আলেমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিনতে পেরেও ও তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকার করত, তার কারণ এটাই ছিল। তারা আশংকা করত, যখন তাদের এলেম রহিত সাব্যস্ত হবে, তখন তাদের প্রতিপত্তির বড়াই চূর্ণ হয়ে যাবে। কেউ তাদের অনুসরণ করবে না।

(৭) অন্তরের ভ্রষ্টতা ও হীনমন্যতার কারণে হিংসা করা হবে; অর্থাৎ হিংসার কারণ উপরে বর্ণিত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে একটিও হবে না;

বরং নিছক হীনমন্যতা ও নীচাশয়তাই হবে হিংসার কারণ। বলাবাহুল্য এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি মোহ নেই, অহংকার নেই এবং অর্থলোভও নেই; কিন্তু যখন তাদের সামনে আলোচনা করা হয়, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত দান করেছেন, তখন এটা তাদের কাছে দুঃসহ ঠেকে। পক্ষান্তরে তাদের সামনে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলা হলে তারা আনন্দিত হয়। এ ধরনের মানুষ সর্বদাই অপরের বিপর্যয় কামনা করে। মানুষের প্রতি আল্লাহর দান তারা দেখতে পারে না। মানুষকে যা দেয়া হয় তা যেন তাদেরই ধনভাণ্ডার থেকে দেয়া হয়। এরূপ লোককে বলা হয় "শাহীহ্" অর্থাৎ কৃপণ থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ কৃপণ তাকে বলা হয়, যে নিজের মাল কাউকে দেয় না। আর শাহীহ্ ঐ ব্যক্তি যে অপরের মালে কৃপণতা করে। এই হিংসাকারীরাও অহেতুক আল্লাহ্ তাআলার দানে নাখোশ হয়; অথচ দান যারা পায় তাদের সাথে এই হিংসাকারীদের কোন শত্রুতা থাকে না। হীনমন্যতা ছাড়া তাদের হিংসার কোন বাহ্যিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ধরনের হিংসার প্রতিকার খুবই কঠিন। কেননা, অন্যান্য কারণের বেলায় ধরে নেয়া যায় যে, কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে হিংসাও দূরীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু এটা হচ্ছে সৃষ্টিগত ভ্রষ্টতা। এটা দূর করা অত্যন্ত দুরূহ।

উল্লিখিত সাতটি কারণের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে কতক কিংবা অধিকাংশ কারণ একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়। তখন তার হিংসার মাত্রাও বেড়ে যায়, যা সে গোপন করতে পারে মা। আমাদের যুগে প্রচলিত অধিকাংশ হিংসার মধ্যে একাধিক কারণই একত্রিত থাকে– একা এক কারণ থাকে না।

আপনজনের সাথে হিংসা বেশী হয় কেন? প্রকাশ থাকে যে, হিংসার উপরোক্ত কারণসমূহ তাদের মধ্যেই বেশী থাকে, যারা পরস্পর বেশী সম্পর্কশীল। ফলে তারা মজলিসে বসে পরস্পরে কথাবার্তা বলে এবং আপন আপন মতলব বর্ণনা করে। তখন যদি কেউ কারও মতলবের বিপক্ষে বলে তবে মতলবওয়ালা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে এবং কোন না কোনরূপে এর শোধ নিতে চায়। মোট কথা, কাছে বসা এবং মতলবের কথা বলা থেকে হিংসার উৎপত্তি। এ কারণেই এক ব্যক্তি এক শহরে এবং অন্য ব্যক্তি অন্য শহরে বাস করলে তাদের মধ্যে হিংসা হয় না। এমনকি, দূরবর্তী দু'মহল্লায় বাস করলেও হিংসা হয় না। তবে এক মজলিস, এক মাদ্রাসা, এক মসজিদ অথবা এক বাজারে একত্রিত থাকলে এবং একই মতলবের দাবীদার হলে

হিংসা হয়। এ জন্যেই আলেম ব্যক্তি আলেমের সাথে হিংসা করে– মুজাহিদের সাথে করে না। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর সাথে হিংসা করে– মুচির সাথে করে না। কেননা, তারা এক পেশায় একত্রিত নয়। এই একই কারণে মানুষ তার ভাই ও চাচাত ভাইয়ের সাথে অন্যের তুলনায় বেশী হিংসা করে। দুই সতীন পরস্পরে শাশুড়ী ও ননদের তুলনায় বেশী হিংসা করে। মোট কথা, যেখানেই দু'ব্যক্তির মতলব এক হবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমাবেশ ও উঠাবসা হবে, সেখানেই হিংসা বেশী হবে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, হিংসার যত কারণ রয়েছে, সবগুলোর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। কেননা, দুনিয়ার বস্তুসমূহ অংশীদারদের জন্যে যথেষ্ট হয় না। একজনের কাছে গেলে অন্যজনের হাত খালি থেকে যায়, কিন্তু আখেরাতের বস্তুসমূহের মধ্যে কোন অভাব অনটন নেই। সেগুলোর ধারণ ক্ষমতা অপরিসীম। অংশীদার যতই হোক, বস্তুর কমতি নেই; বরং বিদ্যার মত "যতই করবে দান ততই যাবে বেড়ে।" সুতরাং যে কেউ আল্লাহর মারেফত অর্জন করে, সে তাতে অন্যের সাথে হিংসা করে না। কারণ, মারেফতে কোন কমতি নেই যে, একজন সাধক যে হাল জেনে নেয়, অন্যজন তা জানতে পারবে না; বরং লাখো সাধক একটি হাল জেনেই আনন্দিত হয় এবং স্বাদ গ্রহণ করে। একজনের আনন্দে অন্যজন অন্তরায় হয় না; বরং তাদের সংখ্যা যত বেশী হয়, স্বাদও তত বেশী হয়। এ কারণেই যাঁরা হক্কানী আলেম, তাঁদের মধ্যে হিংসা নেই। কারণ, তাঁদের মতলব হচ্ছে আল্লাহর মারেফত ও নৈকট্যলাভ। এগুলো হচ্ছে অতল সমুদ্র। হাঁ, এলেম দ্বারা আলেমদের উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে হিংসা দেখা দেবে। কেননা, ধন-সম্পদ এমন শরীরী বস্তু, যা একজনের থাকলে অন্যজনের থাকে না। আর প্রভাব প্রতিপত্তির মানে হচ্ছে অন্তরে স্থান করে নেয়া। যখন কারও অন্তরে একজন আলেমের স্থান হয়ে যাবে, তখন অপরের জন্যে স্থান থাকবে না অথবা হ্রাস পাবে। এটাই হবে শত্রুতা ও হিংসার কারণ।

হিংসার চিকিৎসা ঃ হিংসা অন্তরের বড় রোগসমূহের অন্যতম। প্রত্যেক আন্তরিক রোগের চিকিৎসা এলেম ও আমল দ্বারা হয়ে থাকে। হিংসা রোগের জন্যে যে এলেম উপকারী, তা একথা নিশ্চিতরূপে জানা যে, হিংসা হিংসাকারীর জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে আদি অন্ত ক্ষতিকর এবং যার সাথে সাথে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়া ও আখেরাতের কিছুই ক্ষতি হয় না; বরং উপকারই উপকার হয়। একথা জানার পর যদি কেউ নিজের দুশমন না হয়, তবে অবশ্যই হিংসা ত্যাগ করবে। হিংসার কারণে

হিংসাকারীর যে ধর্মীয় ক্ষতি হয়, তা হল, সে আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে না এবং যে নেয়ামত তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে বন্টন করেছেন তাকে খারাপ মনে করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহর তকদীরে রাযী না থাকার চেয়ে বড় গোনাহ্ ধর্মে আর কি হবে? তদুপরিহিংসার কারণে হিংসাকারী একজন মুসলমানের সাথে শুভেচ্ছামূলক ব্যবহার করে না। ফলে সে নবী ওলীগণের কাতার থেকে খারিজ হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। শয়তান, ইবলীস ও কাফেররা মুমিনদের অকল্যাণ কামনা করে। হিংসাকারী ব্যক্তিও অনুরূপ কাজ করার কারণে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। এসকল বিষয় হচ্ছে অন্তরের নষ্টামি, যা পুণ্য কর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন অগ্নি লাকড়ি খেয়ে ফেলে এবং পুণ্য কর্মের চিহ্ন এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন রাত দিনের চিহ্ন মুছে দেয়।

দুনিয়াতে হিংসাকারীর ক্ষতি হচ্ছে, সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও যন্ত্রণার মধ্যে থাকে। তার শত্রুদের প্রতি যতই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে, ততই তার অন্তর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শত্রুদের বিপদ যতই চলতে থাকে, ততই উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা তাকে গ্রাস করতে থাকে। সে বিমর্ষ ও বঞ্চিত সেজে চলাফেরা করে। সে তার শত্রুর জন্যে যে বিষয়টি কামনা করে, তাতে নিজেই পতিত হয়। তার বাসনা ছিল, শত্রু দুঃখ-কষ্টে পড়ুক; কিন্তু নিজেই দুঃখ যন্ত্রণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ যার সাথে হিংসা, তার নেয়ামতও বিনষ্ট হয় না। যদি কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের প্রতিও মানুষের ঈমান না থাকে, তবুও বুদ্ধিমানের জন্যে বুদ্ধিমত্তার দাবী এটাই যে, সে হিংসা থেকে বেঁচে থাকুক। আখেরাতের আযাবের প্রতি বিশ্বাস থাকলে তো হিংসা থেকে বেঁচে থাকা আরও উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তির সাথে হিংসা করা হয়, তার দ্বীন ও দুনিয়াতে হিংসার কারণে কোন ক্ষতি হয় না, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, হিংসার কারণে তার নেয়ামত বিলুপ্ত হয় না, হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা কারও জন্যে যে নেয়ামত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে। একে প্রতিহত করার উপায় নেই। এ কারণেই জনৈকা মহিলাকে শাসক হয়ে প্রজাদের উপর জুলুম করতে দেখে যখন একজন পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলেন, তখন এরশাদ হয়ঃ আমি আদিকালে যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছি, তাতে পরিবর্তন হতে পারে না। যে পরিমাণ সৌভাগ্য ও পদমর্যাদা এই মহিলার জন্য লেখা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার যদি খারাপ লাগে, তবে তার সম্মুখ থেকে চলে যাও। মোট কথা, যখন হিংসার কারণে নেয়ামত দূর হয় না,

তখন যার হিংসা করা হয়, তার দুনিয়াতে আর কি ক্ষতি হবে এবং আখেরাতেই তার কি গোনাহ্ হবে! যদি হিংসার কারণেই নেয়ামত দূর হয়ে যেত, তবে দুনিয়াতে কারও কাছে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত থাকত না; ঈমানের নেয়ামতও কেউ লাভ করতে পারত না। কেননা, কাফেররা তো ঈমানের উপরই মুসলমানদের সাথে হিংসা করে যেমন কোরআন বলে ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم -

গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেরই বাসনা, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমানের পরে কাফের বানিয়ে দিতে পারে! এটা তাদের তরফ থেকে হিংসার কারণে।

সুতরাং যদি কেউ কামনা করে, তার হিংসার কারণে অপরের নেয়ামত বিলুপ্ত হোক, তবে সে যেন এটা চায়, কাফেরদের হিংসার কারণে তার ঈমানরূপী নেয়ামত বিলুপ্ত হোক। অন্যান্য নেয়ামতের বেলায়ও এরূপ বুঝা দরকার।

এ পর্যন্ত এলেম দ্বারা হিংসা রোগের চিকিৎসার কথা বলা হল। এখন আমল দ্বারা চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে।

হিংসা যা দাবী করে কথায় কাজে তার খেলাফ করতে হবে। উদাহরণতঃ হিংসা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বর্ণনা করার দাবী করে, তবে মনের উপর জোর দিয়ে মুখে তার প্রশংসা করবে। আর যদি হিংসার কারণে অহংকার করতে মনে চায়, তবে জোরপূর্বক বিনীত ও নম্র ব্যবহার করবে। যদি হিংসা দান না করতে প্ররোচিত করে, তবে পূর্বে যেরূপ দান করা হত তার চেয়ে বেশী পরিমাণে দেয়ার অভ্যাস করবে। যখন মনের উপর জোর দিয়ে চেষ্টা সহকারে এসব কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানবে, তখন সে খুশী হয়ে যাবে এবং মহব্বত করতে শুরু করবে। তার পক্ষ থেকে মহব্বত হলে হিংসাকারীও মহব্বত করতে বাধ্য হবে। পারস্পরিক এই ঐক্য ও মহব্বতের কারণে হিংসার বীজ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শয়তান হিংসাকারীকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তুমি বিনয় ও প্রশংসা করলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে, বিপজ্জনক অথবা কপট প্রতিপন্ন হবে। মানুষের উচিত শয়তানের এহেন প্রতারণায় না পড়া; বরং জানা দরকার, সদ্ব্যবহার জোরপূর্বক হোক কিংবা স্বভাবগতভাবে হোক– উভয়পক্ষের শত্রুতা নির্মূল করে দেয়, হিংসার দাঁত

ভেঙ্গে যায় এবং অন্তর সম্প্রীতি ও মহব্বতের দিকে ফিরে আসে। হিংসার এই চিকিৎসাটি খুবই উপকারী। কারণ, এটা অত্যধিক তিক্ত। যে ব্যক্তি ওষুধের তিক্ততায় সবর করে না, সে আরোগ্য লাভের মিষ্টতা আস্বাদন করে না।

যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব ঃ জানা উচিত, কষ্টদাতার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্রোধ হয়। উদাহণতঃ যদি তোমাকে কেউ কষ্ট দেয়, তবে তুমি তার প্রতি শত্রুতা না রাখ, অথবা সে কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে তুমি তা খারাপ মনে না করা সম্ভব হবে না। তার ভাল-মন্দ উভয় অবস্থায় তোমার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই হবে। এদিকে শয়তানও তোমাকে সর্বদা হিংসার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকবে। যদি হিংসার প্রেরণা প্রবল হয়ে যায় এবং তোমার ইচ্ছাকৃত কথা ও কাজে তা প্রকাশ পেতে থাকে, তবে তুমি হিংসাকারী ও পাপী সাব্যস্ত হবে। আর যদি তুমি তোমার বাহ্যিক অবস্থাকে এসব বিষয় থেকে বিরত রাখ, কিন্তু অন্তরে তার নেয়ামর বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর এবং একে খারাপও মনে না কর, তবুও তুমি হিংসাকারী ও গোনাহগার হবে। কেননা, হিংসা অন্তরের একটি অবস্থাকে বলা হয়। হিংসার কারণে যেসকল কাজ প্রকাশ পায়, যেমন গীবত, মিথ্যাচার ইত্যাদি, সেগুলো সাক্ষাৎ হিংসা নয়। হিংসার স্থান অন্তরই– বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গে নয়। হাঁ পার্থক্য হচ্ছে, যে হিংসা কেবল অন্তরেই থাকে এবং বাহ্যিক কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মে প্রকাশ পায় না, তাতে বান্দার কোন হক থাকে না যে, ক্ষমা করিয়ে নেয়া ওয়াজিব হবে; বরং এই প্রকার হিংসার কারণে হিংসাকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কাছে গোনাহ্গার সাব্যস্ত হয়। হিংসার কারণাদি যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠে, সেখানেই কেবল মাফ করিয়ে নেয়া ওয়াজিব হয়।

এখন যদি কেউ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার পর অন্তর দিয়ে নেয়ামতের বিলুপ্তি কামনাও খারাপ মনে করে, তবে এটা বিবেকের পক্ষ থেকে হবে; অর্থাৎ স্বভাবের দিক থেকে নেয়ামত বিলুপ্তির যে খাহেশ পাওয়া যাবে, বিবেক তা বদলে দেবে। মানুষ দুনিয়ার আনন্দ জালে জড়িত থাকলে স্বভাবকে এভাবে বদলে দেয়া অসম্ভব। হাঁ, যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত থাকে এবং তাঁর এশকের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যায়, তবে এটা সম্ভব। এমতাবস্থায় সে মানুষের পৃথক পৃথক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। সকলকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের ক্রিয়াকর্মকে আল্লাহর ক্রিয়াকর্ম মনে

করবে। এ অবস্থা কারও অর্জিত হলেও সার্বক্ষণিক হয় না। বিদ্যুতের মত এসে মুহূর্তের মধ্যে উবে যায়। এরপর অন্তর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অভিশপ্ত শয়তান পুনরায় তার মনে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করতে থাকে। যদি কেউ এই বিতাড়িত শয়তানের মোকাবিলায় বিবেকের জোরে তার কথা অপছন্দ করে, তবে সে নিজের উপর ওয়াজিব কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলে।

কেউ কেউ বলেন ঃ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিংসা প্রকাশ না পেলে গোনাহ্ হয় না। হযরত হাসানকে কেউ হিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ হিংসা গোপন রাখা উচিত। এতে কোন ক্ষতি হবে না। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত হাসান থেকে 'মওকুফ' (তাঁর উক্তি) এবং 'মরফু' (রসূলুল্লাহর উক্তি) উভয় প্রকারে বর্ণিত আছে–

ثَلَاثَةٌ لَا يَخْلُو مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدِ اَنْ لَّا يَبْتَغِيَ ـ

তিনটি বিষয় থেকে কোন মুমিন মুক্ত হয় না; কিন্তু তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ আছে। হিংসা থেকে নিষ্কৃতির পথ হচ্ছে সীমালঙ্ঘন না করা।

কিন্তু এর অর্থ তাই নেয়া উত্তম যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি; অর্থাৎ অন্তরে হিংসা থাকা অবস্থায় তা খারাপ মনে করতে হবে এবং এ কারণেই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সারকথা, মানুষ যদি কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করে এবং বাইরে তার কোন প্রভাব না থাকে, তবে এ ধরনের হিংসা যে গোনাহ তাতে মতভেদ আছে। আয়াত ও হাদীস দ্বারা তাই জানা যায়, যা আমরা লিপিবদ্ধ করেছি।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল– শত্রুর সাথে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়ে থাকে– (১) স্বভাবের দাবী অনুযায়ী শত্রুর অমঙ্গল চাওয়া; কিন্তু বিবেক দ্বারা এই অমঙ্গল চাওয়াকে খারাপ মনে করা এবং নিজের প্রতি রাগ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই মাফ। কেননা মানুষের ক্ষমতায় এর বেশী কিছু নেই। (২) অন্তরে শত্রুর নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার বাসনা রাখা এবং তার অমঙ্গলের মুখে অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই নিষিদ্ধ। (৩) কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করা, বাহ্যিক অঙ্গে তা প্রকাশ না পাওয়া; কিন্তু একে খারাপ মনে না করা। এই প্রকার হিংসার বৈধতায় মতভেদ আছে।

॥ সমাপ্ত ॥